প্রকাশক : শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
২'১বি, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬০

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২০।২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

পাঠ্যসূচী

*এই কয়টি প্রকরণ লইয়া ১০০ নম্বরের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

*শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের পাদদেশে নির্দিষ্ট সিলেবাস উদ্‌ধৃত হইয়াছে।



সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা


আমাদের দেশ



প্রথম প্রকরণ

আমাদের দেশ

আমরা যে-দেশে বাস করি তাহার নাম ভারতবর্ষ। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ চিরদিন পৃথিবীর বিস্ময় জাগাইয়াছে। নানা জাতি-উপজাতির লোকজন, বিচিত্র বেশভূষা, ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, দেবদেবী, অপূর্ব স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পকলা এবং শান্তি প্রীতি সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার জীবন-দর্শন সকলের মনে এই বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। 'ভারততীর্থ' কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ভারতের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করিয়াছেন—

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

'একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া'—আজও ভারতের কণ্ঠে ঐক্যের সেই মহা-ওঙ্কারধ্বনি অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে। আজও তাই ভারতবর্ষ ও ভারতজন সারা পৃথিবীর কাছে অফুরন্ত বিস্ময়ের উৎস।

Sullabus A. Introduction

Unit 1. The country we live in - its physical background—geographical position in relation to the rest of the world—the political set-up—the Indian Union and the constituent States—Living as citizens of Free India.

পরবর্তী প্রত্যেক অধ্যায়ে এইভাবে 'সিলেবাস' দেওয়া হইয়াছে।

ভারত। হিন্দুস্থান। ইণ্ডিয়া

পুরাণকাররা বলেন যে, অতিপ্রাচীনকালে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নামে এদেশের নাম হইয়াছে 'ভারতবর্ষ।' প্রাচীন আর্যদের ভরত নামে একটি গোত্রও ছিল। ভরত রাজার দেশ, অথবা ভরত-গোত্রের আর্যদের দেশ বলিয়া আমাদের পূর্বপুরুষরা এদেশের নাম রাখিয়াছেন ভারতবর্ষ। বেদ-রচয়িতা আর্যদের আদি লীলাভূমি ছিল সিন্ধু অঞ্চল। 'সিন্ধু' হইতে 'হিন্দু' হইয়াছে, 'সপ্তসিন্ধু' হইয়াছে 'হপ্ত হিন্দু'। এই 'হিন্দু' হইতে পরে এদেশের নাম হইয়াছে 'হিন্দ' বা 'হিন্দুস্থান'। 'ইণ্ডিয়া' নামের প্রচলন করিয়াছেন গ্রীকরা। প্রতিবেশী চীনারা ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত হন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। 'হিন্দু' নামের চৈনিক উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা এদেশকে বলিতেন 'ইন-টু'। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনীতিক নাম 'প্রজাতান্ত্রিক ভারত-যুক্তরাষ্ট্র'।

ভারতের আয়তন ও লোকসংখ্যা

ইউরোপ, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় মহাদেশের মতো ভারতবর্ষও একটি মহাদেশ। তবে অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় আকারে একটু ছোট বলিয়া ভৌগোলিকরা ভারতকে একটি উপ-মহাদেশ বা 'সাব-কন্টিনেন্ট' বলেন। রাশিয়া বাদ দিয়া সমগ্র ইউরোপের প্রায় তিনভাগের দুইভাগ ভারতবর্ষ, গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় তেরগুণ। পাকিস্তান হইবার পরে ভারতবর্ষের মোট জমির আয়তন হইয়াছে ১২ লক্ষ ৬১ হাজার বর্গমাইল। এখনও শুধু আয়তনের দিক দিয়া বিচার করিলে পৃথিবীর বড় বড় দেশের মধ্যে এদেশের স্থান সপ্তম। উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ২০০০ মাইল এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রায় ১৮৫০ মাইল ইহার বিস্তার। স্থলসীমানা প্রায় ৯৫০০ মাইল এবং উপকূলরেখা প্রায় ৩৫০০ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত। এই বিশাল বিস্তার ও প্রসারের কথা চিন্তা করিলে মনে হয় যে প্রকৃতি যদি সহায় না হইতেন তাহা হইলে বাহিরের বিপদ-আপদ হইতে এদেশের পক্ষে আত্মরক্ষা করা খুবই কঠিন হইত।

বর্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৪৪ কোটি। পৃথিবীতে যত লোক আছে তাহার পাঁচভাগের একভাগ লোক আমাদের দেশে বাস করে। সারা

পৃথিবীর লোক যদি লাইন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে প্রত্যেক চারজনের পর দেখা যাইবে একজন করিয়া ভারতবাসী রহিয়াছে। দেশটি যে আমাদের কেবল আয়তনে বড় তাহা নহে, লোকজনের দিক হইতেও বেশ কলরবমুখর। এই বিরাট দেশের কোটি কোটি লোকের খাওয়া-পরা, বাসস্থান, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সকল রকমের প্রয়োজনের কথা দেশের সমাজকর্মী ও রাষ্ট্রকর্মীদের চিন্তা করিতে হয়।

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ

এই বিরাট দেশটিকে প্রকৃতি যেন মায়ের মতো দুইটি বাহু দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছেন। একটি বাহু উত্তরের আকাশস্পর্শী হিমালয় পর্বতমালা, আর একটি বাহু দক্ষিণের দিগন্তলীন ভারতমহাসাগর। পর্বত বা মহাসাগর কোনটাই সহজে লঙ্ঘন করা যায় না। উত্তরে হিমালয় পর্বত পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে পশ্চিম-পূর্বে প্রসারিত। উত্তরের সীমান্ত হিমালয়ের জন্য প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া রহিয়াছে। এই সীমান্তের অপর পারে চীনদেশ। নেপাল উত্তরসীমানা ঘেঁষিয়া হিমালয় অঞ্চলের কিছুটা অংশ দখল করিয়া আছে। এই অঞ্চলে সিকিম ও ভূটান রাজ্য দুইটি বিশেষ চুক্তিসূত্রে ভারতের সহিত আবদ্ধ। পূর্বদিকে কয়েকটি পর্বতশ্রেণী বর্মাকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানকে যেন কতকটা ঘিরিয়া আছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য। উত্তরপশ্চিম সীমান্তে রহিয়াছে পশ্চিম-পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। দক্ষিণে ভারত ও সিংহলের মধ্যে রহিয়াছে মান্নার উপসাগর ও পক্ প্রণালী। বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আরবসাগরে লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয়, আমিনদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

ভৌগোলিক অঞ্চল। ভারতবর্ষকে তিনটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়—(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) ইন্দো-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল।

হিমালয় অঞ্চল। উত্তরে ধনুকের মতো পিঠ বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে হিমালয়। হিমালয় গিরিশ্রেণীর শাখা পূর্বে আসামের প্রান্ত দিয়া

নামিয়া আরাকানের কাছে বঙ্গোপসাগরে ঠেকিয়াছে এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান-বেলুচিস্তানের প্রান্ত দিয়া নামিয়া করাচির উত্তরে আরবসাগরে পৌঁছিয়াছে। কালিদাস তাই হিমালয়ের বর্ণনা দিয়াছেন—"পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ"—পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করিয়া আছে।

হিমালয় একটি মাত্র শ্রেণী নহে, সাতনর হারের মতো তিব্বত হইতে উত্তরাখণ্ড পর্যন্ত পরে পরে বিন্যস্ত কতকগুলি হারের সমষ্টি। তিনটি প্রায় সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী লইয়া হিমালয় গঠিত, তাহার মধ্যে মধ্যে আছে বড় বড় মালভূমি ও উপত্যকা, কাশ্মীর ও কুলুর মতো উর্বরতায় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। বিচিত্র ফলফুলের শোভায় মনোহর, পাখির ডাকে, ঝরনা ও পাহাড়ী নদীর কলতানে মুখর এরকম স্বর্গের মতো সুন্দর স্থান পৃথিবীতে দুর্লভ। পাহাড়ের উচ্চতার জন্য স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায় না, কয়েকটি গিরিপথের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। যেমন দার্জিলিং-এর উত্তর-পূর্বে চুম্বি উপত্যকার উপর দিয়া ভারত-তিব্বতের বাণিজ্যপথ জেলেপ-লা ও নাতু-লা গিরিপথের ভিতর দিয়া গিযাছে। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল এবং গভীরতা বা প্রস্থ কোথাও ১৫০, কোথাও বা প্রায় ২০০ মাইল। পূর্বদিকে ভারত-বর্মা ও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে সব পর্বতশ্রেণী আছে তাহাদের উচ্চতা হিমালয় অপেক্ষা অনেক কম। এখানে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও নাগা পর্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত লুসাই ও আরাকান পর্বতশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি। উত্তরভারতে তিনটি বড় বড় নদী ও তাহাদের শাখা-প্রশাখার অববাহিকা অঞ্চল জুড়িয়া এই বিশাল ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি বিস্তৃত। নদী তিনটি হইল—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। আশ্চর্য এই যে ঠিক হিমালয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মতো এই গাঙ্গেয় সমভূমিরও দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ ১৫০ হইতে ২০০ মাইল। এতবড় বিশাল নদীবাহিত পলিমাটির সমভূমি পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। পলিমাটি খুব উর্বর, সহজে তাহাতে ফসল ফলানো যায়। সেইজন্য এই অঞ্চলের লোকবসতিও খুব বেশী। পৃথিবীর ঘনবসতি অঞ্চলের মধ্যে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি অন্যতম। এই সমভূমির মধ্যে রহিয়াছে পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশ। এই ভূমির সমতাও লক্ষ্য করিবার মতো। দিল্লীর

কাছে যমুনানদী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রায় ১০০০ মাইল বিস্তৃত সমভূমি কোথাও ৭০০ ফুটের বেশী অসমতল নহে।

উপদ্বীপ-ভারত। ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের মালভূমিকে কয়েকটি পর্বত উত্তরের সমভূমি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পর্বতগুলির নাম আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মহাকাল, অজন্তা। পাহাড়ের উচ্চতার পার্থক্য আছে, তবে কোন পাহাড়ই ৪০০০ ফুটের বেশী উঁচু নহে। উপদ্বীপের দুই পাশে দুইটি পাঁজরের মতো রহিয়াছে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা। পূর্বঘাট গড়ে প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু এবং পশ্চিমঘাট ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফুট উঁচু। দুই-একটি স্থানে পশ্চিমঘাটের উচ্চতা প্রায় ৮০০০ ফুট। পশ্চিমঘাট পর্বত ও আরবসাগরের মধ্যে একটি সরু ফালির মতো উপকূল অঞ্চল আছে। পূর্বঘাট ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে উপকূল আছে তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক চওড়া। এই উপদ্বীপের দক্ষিণে আছে নীলগিরি পর্বতমালা, যেখানে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট মিলিত হইয়াছে। আরও দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি, দেখিতে ঠিক গোমুখের মতো।

ভারতের জলবায়ু

আমরা চিরদিন জানি যে এদেশের ঋতু ছয়টি—গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। কিন্তু ভারতের হাওয়া বিভাগ (Indian Meteorological Department) জলবায়ুর প্রকৃতি অনুসারে ভারতের চারটি প্রধান ঋতুর আবর্তন স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন :

১। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী বা মার্চ পর্যন্ত—শীতকাল।

২। মার্চ-এপ্রিল হইতে মে পর্যন্ত—গ্রীষ্মকাল।

৩। জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত—বর্ষাকাল।

৪। অক্টোবর ও নভেম্বর—দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমীবায়ুর অপসরণকাল।

দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমীবায়ুর আবির্ভাব হয় পশ্চিম-উপকূলে জুন মাসের গোড়ার দিকে, পরে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। মাদ্রাজ উপকূল ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই মৌসুমীবায়ুর জন্য ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। ইহা যখন ফিরিয়া যায় তখন উত্তর ভারতে শুকনো খটখটে আবহাওয়া শীতের আগমনবার্তা ঘোষণা করে, কিন্তু মাদ্রাজ

ও উড়িষ্যার উপকূলে এই সময়, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপাত অনুসারে ভারতবর্ষকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। কোথাও বেশী বৃষ্টি হয়, কোথাও হয় অল্প, কোথাও মাঝামাঝি। অঞ্চলগুলি এই :

অতিবৃষ্টি অঞ্চল। বছরে ২০০ সেন্টিমিটার বা ৮০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় যে সব অঞ্চলে, যেমন পশ্চিম-উপকূলে, পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে।

মধ্যম-বৃষ্টি অঞ্চল। বছরে ১০০ হইতে ২০০ সেন্টিমিটার বা ৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় যেখানে—যেমন উত্তরপূর্ব মালভূমি ও মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায়।

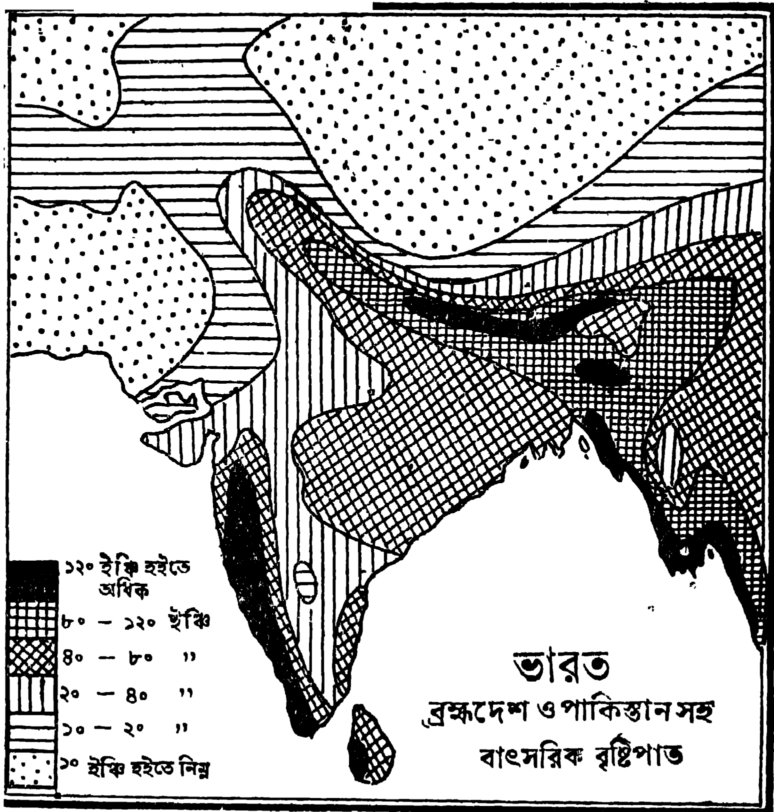
স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চল। বছরে ৫০ হইতে ১০০ সেন্টিমিটার বা ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় যেখানে—যেমন মাদ্রাজে, দক্ষিণ ও উত্তরপশ্চিম দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর-গাঙ্গেয় সমভূমিতে।

এই তিনটি অঞ্চল ছাড়া মনে রাখা দরকার যে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত (very heavy rainfall) হয়।

বৃষ্টিপাতের কথা বলা হইল, এইবার তাপের কথা বলা দরকার। জলবায়ু বিচার করিতে হইলে বৃষ্টি ও তাপ উভয়েরই মাত্রা জানা প্রয়োজন। উত্তর-ভারত ও দক্ষিণভারতের অক্ষাংশের (latitude) মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহার কারণ উত্তরভারত নিরক্ষরেখা (equator) হইতে দক্ষিণভারত অপেক্ষা অনেক দূরে। এই দূরত্বের জন্য ভারতের উত্তর দক্ষিণের মধ্যে তাপের তফাৎ হইয়াছে। কেন হইয়াছে? নিরক্ষরেখা হইতে যে স্থান যত দূরে তাহা তত বেশী ঠাণ্ডা, অর্থাৎ তাহার তাপ তত কম। ঠাণ্ডা হইবার কারণ এই যে মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ সেখানে সোজাসুজি না পড়িয়া বাঁকিয়া পড়ে। সূর্যের কিরণপাতের এই পার্থক্যের জন্য তাপের তফাৎ হয়।

দ্বিতীয় কারণ, সমুদ্রবক্ষ হইতে যে স্থানের উচ্চতা (altitude) যত বেশী তাহা তত বেশী ঠাণ্ডা। প্রতি ৩২০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ১ ডিগ্রী (ফারেনহিট) করিয়া তাপ কমে। এই হিসাবে ৬৪০০ ফুট উঁচুতে উঠিলে (পার্বত্য অঞ্চলে) সমতল অপেক্ষা প্রায় ২০ ডিগ্রী তাপ কমিয়া যাইবে।

তৃতীয় কারণ, সমুদ্র হইতে কোন স্থানের দূরত্ব অনুসারে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে তাহার তাপের তারতম্য হয়। জল গরম হইতে দেরী হয়,



ঠাণ্ডা হইতেও দেরী হয়। মাটি শীঘ্র তাতিয়া ওঠে, আবার শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এইজন্য গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের জল যেমন ধীরে ধীরে গরম হয়, তেমনি একবার গরম হইলে সহজে ঠাণ্ডা হয় না। সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানে তাই গ্রীষ্মকালে হাওয়া দ্রুত গরম হয় না, শীতল থাকে, এবং শীতকালে হাওয়া দ্রুত ঠাণ্ডা হয় না, গরম থাকে। কিন্তু সমুদ্র হইতে যে সব স্থান দূরে সেখানে মাটি গ্রীষ্মকালে তাতিয়া ওঠে। আবার শীতকালে দ্রুত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই কারণে সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থান, যেমন উত্তরভারত, গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম এবং শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা। কিন্তু সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল, যেমন দক্ষিণবঙ্গ, উড়িষ্যা, কি দক্ষিণভারতের পশ্চিম ও পূর্ব-উপকূল অঞ্চল গ্রীষ্মকালে বেশী গরম নহে, শীতকালেও বেশী ঠাণ্ডা নহে। নিরক্ষরেখা ও সমুদ্র হইতে দূরত্ব এবং সমুদ্রবক্ষ হইতে উচ্চতার

পার্থক্যের জন্য উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের শীতগ্রীষ্মের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য আছে। উপকূল ও পার্বত্য অঞ্চলের তাপের পার্থক্যও এই কারণে ঘটিয়া থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণভারতের মধ্যে একটি অঞ্চল আছে, প্রকৃতি যেখানে একেবারে উদাসীন। এই অঞ্চলটি **রাজস্থান**। উত্তরভারত বা আর্যাবর্তকে দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক করিয়াছে সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল, বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বতমালা। রাজস্থানের উত্তরে থর মরুভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু উত্তরে রাজস্থান পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমীবায়ু গাঙ্গেয় ভূমিকে ভিজাইয়া অতদূর পৌঁছাইবার আগেই শুকাইয়া যায়। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলিও শুকনো, কোন তুষারপাত হয় না। তাহার



নানাজাতির ভারতজন

ফলে এখানকার লুনি ও চম্বল নদী বৃষ্টি বা তুষার কোন কিছু হইতেই জল পায় না। জলসেচ চাষবাস ও জীবনযাত্রা নির্বাহ এই অঞ্চলে অত্যন্ত কঠোর শ্রমসাপেক্ষ।

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের আহারবিহারে, পোশাকপরিচ্ছদে, বসবাসে ও জীবনধারণে পার্থক্য ঘটিয়াছে। সে-বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু এই পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতসংস্কৃতির আদর্শ সকল জাতির ভারতজনকে এক নিবিড় আত্মীয়তা ও একতার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। দেহের গড়ন ভিন্ন, বেশভূষা ভিন্ন, আহারবিহার ভিন্ন, ধর্মকর্ম ভিন্ন, কিন্তু বাহিরের এই ভিন্নতার মধ্যে ভারতজনের মনটি একতারে একসুরে বাঁধা। বাঙালী বিহারী আসামী ওড়িয়া পাঞ্জাবী গুজরাটী মারাঠী মাদ্রাজী যে যাই হোক না কেন, সবার উপরে এবং সকলের আগে প্রত্যেকে যে ভারতজন একথা কেহ কোনদিন ভুলিয়া যায় না, ভোলা উচিতও নহে।

বিশ্বের মানচিত্রে ভারত

সমুদ্র ও পর্বতের দুই বাহু বিস্তার করিয়া প্রকৃতিদেবী ভারতবর্ষকে ঘিরিয়া রাখিলেও, বিশ্বসংসার হইতে একেবারে একঘরে করিয়া রাখে নাই। বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া ভারত ভাগ্যবান। সমুদ্রপথে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির সহিত সংযোগরক্ষার পথে তাহার কোন বাধা নাই। সুদূর অতীত হইতে একদিকে মিশর রোম, অন্যদিকে মালয় সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি বাহিরের দেশের সহিত এই সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ আনাগোনা করিয়াছে। ইউরোপ আফ্রিকা হইতে দক্ষিণপূর্ব-এসিয়া, চীন পর্যন্ত তাহার পণ্যবিনিময় ও ভাববিনিময় অবাধে চলিয়াছে।

স্থলপথেও বাহির বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ বন্ধ হয় নাই। এই পথ হিমালয়ের ভিতর দিয়া, অথচ হিমালয়কে আমরা দুর্ভেদ্য প্রাচীর বলিয়া জানি। তাহা হইলে পথ কোথায়? হিমালয় একটি পাহাড় নহে, অনেকগুলি পাহাড়ের শ্রেণী। সুতরাং ভারতের উত্তরে পাহাড়ের প্রাচীর একটি নহে, কয়েকটি প্রাচীর। তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর উপত্যকা ও মালভূমি। এই পর্বত-প্রাচীরের ভিতরে ভিতরে ফাঁক আছে, তাহাকে গিরিবর্ত্ম বা গিরিপথ বলে। পশ্চিমে সুলেমান পর্বতশ্রেণী পাকিস্তানকে বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তান হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইহার দক্ষিণে বোলান গিরিপথ। এখন এই

গিরিপথের ভিতর দিয়া রেলপথ গিয়াছে, কিন্তু পায়ে হাঁটিয়াও এই পথে বহু লোক যাতায়াত করে। ছোট ছোট ঘোড়া ও উটের পিঠে কম্বল ইত্যাদি লইয়া এই অঞ্চলের লোক সিন্ধুপ্রদেশে আসে, সেখান হইতে খাদ্যশস্যাদি লইয়া যায়। বোলানের উত্তরপূর্বে খাইবার গিরিপথ। ইহার ভিতর দিয়া কাবুলে যাওয়া যায়। এসিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগের ইহা অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক পথ। এই গিরিপথেও এখন রেলপথ হইয়াছে। বাহির হইতে যাহারা ভারতে অভিযান করিয়াছে তাহারা অধিকাংশই এই পথে আসিয়াছে। ইহার কাছে হিন্দুকুশ পর্বতমালা। পূর্বদিকে পাহাড় অনেক উঁচু, প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য। দুইটি পর্বতশ্রেণী আছে এখানে, একটিকে আসল হিমালয় বলা হয়, আর একটি কারাকোরাম। কারাকোরাম পার হইলে তিব্বত দেশ, পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। দুইটি গিরিপথ এখানে প্রধান—জোজিলা গিরিপথ ও কারাকোরাম গিরিপথ। আরও পূর্বে আর একটি গিরিপথ আছে, নাম শিপ্‌কা গিরিপথ। দার্জিলিং অঞ্চলের জেলেপ-লা ও নাতু-লা গিরিপথের কথা আগেই বলিয়াছি। এই গিরিপথগুলিই ভারতের ঐতিহাসিক স্থলপথ। এই পথে পশ্চিম-এসিয়া, মধ্য-এসিয়া, তিব্বত, চীন, এমন কি ইউরোপের সহিতও ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছে।

বর্তমানে বিমানপথে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারিদিকে বাহির বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ রক্ষার পথ খুলিয়া গিয়াছে। আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ-আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চীন, জাপান পর্যন্ত মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত এই বিমানপথের ঠিক মাঝখানে ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের আকাশের তলা দিয়া ভারতের বাতাস স্পর্শ না করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে দেশ-দেশান্তরে কাহারও যাতায়াতের উপায় নাই। দুই বাহু বিস্তার করিয়া, পূর্বে ও পশ্চিমে, বিশ্ববাসীকে যেন ভারত আজ আহ্বান করিতেছে। এতকাল স্থলপথে ও জলপথে যে শান্তি ও অহিংসার আহ্বান তাহার ধ্বনিত হইয়াছে, আজ তাহা ধ্বনিত হইতেছে আকাশপথে।

ভারতের রাজনীতিক গড়ন

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইয়া ভারত স্বাধীন হইয়াছে।

যে নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী আজ ভারতরাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে তাহা ভারতীয় সংবিধানে (Constitution) রচিত হইয়াছে। এই সংবিধান কার্যকর হইয়াছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী হইতে। সংবিধানে ভারত-রাষ্ট্রকে বলা হইয়াছে—'Sovereign Democratic Republic'—স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি ১৫টি বড় বড় রাজ্য (State) এবং ত্রিপুরা, দিল্লী প্রভৃতি ৭টি কেন্দ্রাধীন অঞ্চল (Union Territory) লইয়া ভারতরাষ্ট্র গঠিত। একটি বিরাট সংঘের মতো গড়ন 'ভারতরাষ্ট্রের, তাই ইহাকে 'ভারতীয় ইউনিয়ন' বলা হয়। ইহাই ভারতরাষ্ট্রের মূল গড়ন। পরে এই বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করা হইবে (নবম প্রকরণ—'তৃতীয় অধ্যায়')।

স্বাধীন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

একটি কথা অনেককেই একটু রাগ বা অভিমান হইলে প্রায় বলিতে শোনা যায়—"আমার বাড়িতে, আমার ঘরে আমি যা খুশি তাই করব, তাতে কার কি!" কথাটি শুনিলে মনে হয় যেন ইহা একটি প্রাথমিক অধিকারের কথা এবং খুবই সংগত কথা। কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ সংগত নহে। নিজের বাড়িতেও যাহা খুশি তাহা করা যায় না। যেমন নিজের বাড়ি বলিয়া বাহিরের লোক আসিলে তাহাকে অপমান করিতে পারি না। নিজের বাড়ি বলিয়া যদি কেহ সেখানে দিনরাত জোরে জোরে ঢাক বাজাইতে থাকে তাহা কেহ সহ্য করিবে না। নিজের বাড়িতে অশিষ্ট আচরণ করিলে প্রতিবেশীরা তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে। তাহা হইলে, হয়ত মনে হইবে, অধিকারের আর কি রহিল ?

অধিকার (rights) ও কর্তব্য (obligations) হইল টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। অধিকারের চেতনা ও কর্তব্যের চেতনা যদি সমান না হয় তাহা হইলে অধিকারের মর্যাদা নষ্ট হইবে। যদি কোন নির্জন দ্বীপে কেহ একা বাস করিত তাহা হইলে যাহা খুশি সে তাহাই করিতে পারিত। কিন্তু সমাজে ও রাষ্ট্রে আমরা বহু লোকের সহিত একত্রে বাস করি, লেখাপড়া করি, কাজকর্ম করি, চলাফেরা করি। প্রত্যেকটি ব্যক্তির অধিকার সমান। আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি যেমন সচেতন, তেমনি অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়াও আমার কর্তব্য। অন্যের প্রতি আমার কর্তব্য যদি আমি

পালন না করি, তাহা হইলে আমার অধিকারের মর্যাদা সম্বন্ধে অন্যরাও উদাসীন হইবে।

আজ আমরা স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক। আমাদের কতকগুলি 'মৌলিক অধিকার' (fundamental rights) সংবিধানে স্বীকার করা হইয়াছে। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষিত ও বঞ্চিত না হইবার অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার—এগুলি আমাদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার যদি কেহ কখন হরণ করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে স্বাধীন বিচারালয়ে ন্যায়পালের কাছে তাহার ন্যায্য প্রতিবিধান আমরা প্রার্থনা করিতে পারি।

কিন্তু স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের 'অধিকার' যেমন আছে, তেমনি 'কর্তব্য'ও আছে। আমি যেমন শোষিত ও বঞ্চিত হইব না, তেমনি অন্যকেও শোষণ বা বঞ্চনা করিব না। আমার নিজের ধর্ম আচরণের অধিকার যেমন আমার আছে, তেমনি অন্যের ধর্মাচরণেও বাধা না দেওয়া আমার কর্তব্য। এইভাবে দেখা যাইবে যে আমার প্রত্যেক অধিকারের পরিপূরক একটি কর্তব্য আছে। রাষ্ট্র আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য দায়ী, তেমনি আমিও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দায়ী। রাষ্ট্র আমার খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় ইত্যাদির জন্য দায়ী। তেমনি আমিও রাষ্ট্রের সম্পদ উৎপাদনের কাজে আমার কর্মশক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য। স্বাধীন ভারতে আজ তাই আমরা আমাদের অধিকার সম্বন্ধে যেমন সচেতন হইব, তেমনি দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও সজাগ থাকিব।

QUESTIONS

Group A

'Short' and 'Essay' type questions.

1. Why the name of our country is 'Bharatabarsha'? Why it is called 'Hindusthan'? How the name 'India' originated?

2. Briefly describe the essential features of the main geographical regions of India.

3. How big is India in size and population?

4. What are the geographical links of India with the outside world?

5. What are the chief routes across the Himalayas?

6. Give an account of the climatic conditions in India, with reference to rainfall and temperature.

7. Why the temperature varies in the different regions of India?

8. What are your fundamental rights and duties as a citizen of Free India?

9. Puri is neither very hot in summer, nor very cold in winter. Delhi is very hot in summer and extremely cold in winter. Why?

Group B

'Objective' type questions.

I. India is divisible into 3 main geographical regions. These are:

(a) ————

(b) ————

(c) ————

II. (a) The average depth of the Himalayas is——

(b) The average height of the Himalayas is——

(c) The mainland of India measures about——from north to south, and about—from east to west.

III. Bolan, Vindhyas, Sindhu, Eastern Ghats, Natu-la, Aravalli, Lushai, Eastern Ghats, Khyber, Brahmaputra, Satpura, Joji-la, Jamuna.

Arrange the names after classification into mountains, rivers and routes, in three columns like this:

Mountains.	Rivers.	Routes.

IV. The Indian Meteorological Department recognises the following four seasons in India:

a) Cold season from—

b) Hot season from—

c) Rainy season from—

d) Retreating South-West monsoon from—

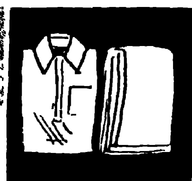
V. Which regions have least rainfall in India? Which regions have very heavy rainfall in India?

Vi. India is a Union of 20 States and 9 Union Territories. Correct the statement.











আমাদের প্রয়োজন
গৃহ
খাদ্য
বস্ত্র
সার্ভিস



দ্বিতীয় প্রকরণ

আমাদের খাদ্য

প্রতিপাদ্য। খাদ্য বস্ত্র গৃহ—এই তিনটি জিনিস না হইলে কোন মানুষ বাঁচিতে পারে না। এগুলি সকল দেশের মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন (basic needs)। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানুষ এই তিনটি মূল প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া ধীরে ধীরে সমাজ ও সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছে। তাহা করিতে লক্ষাধিক বছর কাটিয়া গিয়াছে। তারপর সেই ভিত্তির উপর মাত্র তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে মানুষ সভ্যতার এই বিশাল সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে।

অঞ্চলভেদে খাদ্য বস্ত্র ও বসবাসের গৃহের মধ্যে যে ভিন্নতা আমরা দেখিতে পাই, তাহার প্রধান কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য। পরে ইহার সহিত অভ্যাস, রুচি ও সংস্কার মিশিয়া এই ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যকে স্থায়ী করিয়াছে। আজীবন যে খাদ্য খাইয়া, যে পোশাক পরিয়া, যে-রকম গৃহে বাস করিয়া আমি মানুষ হইয়াছি, হঠাৎ আমার পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও তাহা কষ্টকর।

খাদ্যের বৈচিত্র্য

খাদ্যের বৈচিত্র্যের কথাই ধরা যাক। খাদ্যের গুণের দিক দিয়া বিচার করিয়া কয়েকটি ভাল খাদ্য বাছিয়া যদি সকল দেশের লোককে জোর করিয়া

B. Our Basic Needs.

Unit 2. Food—food taken in different parts of India—influence of environment (natural and social) on food habits—composition of our food and its nutritive value.

A comparative study of food in India and a few typical countries, e. g. Arab countries, Mediterranean countries, Japan, Lapland.

খাওয়ানো যায়, তাহা হইলে কি হইবে? চমৎকার পুষ্টিকর সুসম খাদ্যের একটি থালা, কাহারও আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আপত্তি হইবে, বিভ্রাটও ঘটিবে। প্রত্যেকটি খাদ্যের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেও হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান বৌদ্ধ জৈনরা ধর্মের দিক হইতে, ভারতীয় চীনা জাপানী ইউরোপীয় বর্মী নিগ্রো প্রভৃতিরা জাতিগত সংস্কার, অভ্যাস ও আচারের দিক হইতে এক-একটি খাদ্য খাইতে আপত্তি করিবে। আমার কাছে যাহা সুখাদ্য, অন্যের কাছে তাহা অখাদ্যও হইতে পারে। একরকমের পোশাক হয়ত জোর করিয়া সকলকে পরিতে বাধ্য করা যায়—যেমন যুদ্ধের সময় সৈন্যরা পরিয়া থাকে। কিন্তু একরকমের খাদ্য, সুখাদ্য বা পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও, সকলকে জোর করিয়া খাওয়ানো যায় না। আমাদের দেশে ১৮৫৭ সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহার একটি বড় কারণ ছিল হিন্দু সিপাহীদের বিজাতীয় খাদ্য মুখে স্পর্শ করিতে বাধ্য করা। খাদ্য যে কত বড় সংস্কার তাহা এই একটি উদাহরণ হইতে বোঝা যায়।

ভারতের ডাল-ভাত-চাপাটি খাইয়া একজন ইংরেজ বা আমেরিকান হয়ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অভ্যাস নাই বলিয়া সহজে এই খাদ্য সাহেবের গলা দিয়া নামিতে চাহিবে না। গোমাংস বা শূকরমাংস কাহারও কাছে উত্তম খাদ্য, কাহারও কাছে অখাদ্য। মাছ বাঙালীর কাছে অতি উত্তম খাদ্য, কিন্তু উত্তরভারতের ও দক্ষিণভারতের বহু ব্রাহ্মণের কাছে ইহা অখাদ্য। খাদ্যের বৈচিত্র্যের একটি বড় কারণ যে জাতিগত ও সামাজিক সংস্কার এবং রুচি ও অভ্যাস তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যবস্তু
প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব

ভারতবর্ষে প্রকৃতির বিচিত্র ঋতুলীলা দেখা যায় এবং নানা অঞ্চলে তাহার রূপও নানারকম। মনে হয় যেন পৃথিবীর সকল দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সমাবেশ হইয়াছে এদেশে। সেই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যবস্তুরও পার্থক্য দেখা যায় ভারতবর্ষে। পার্থক্যের কারণ প্রথমত, প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্থানীয় ফসলের প্রভেদ, আবহাওয়ার তফাত। দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও জাতি-বর্ণগত সংস্কার। সংস্কারের মূল এদেশে খুব দৃঢ়, প্রাকৃতিক কারণ অপেক্ষা তাহার গুরুত্ব কম নহে। এই কথা মনে রাখিয়া ভারতের খাদ্যবস্তুর নানা-

দিকের বিচার করিতে হইবে। প্রধান খাদ্যবস্তুর দিক হইতে বিচার করিয়া ভারতবর্ষকে চারটি খাদ্য-অঞ্চলে (food-zone) ভাগ করা যাইতে পারে :

১। প্রধান খাদ্যবস্তু চাল→পূর্বভারত, উত্তর-পূর্বভারত; দক্ষিণভারত।

২। প্রধান খাদ্যবস্তু গম→উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমভারত।

৩। প্রধান খাদ্যবস্তু বজরা,
জোয়ার, রাগী ইত্যাদি মিলেট→পশ্চিমভারত ও মধ্যভারত।

৪। মিশ্র-খাদ্য→অবশিষ্ট অঞ্চল।

চাল-গম-মিলেট, এই তিনটি ভারতীয়দের প্রধান খাদ্যবস্তু, কিন্তু তিনটির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল চাল। তাহার কারণ, ভারতের মাটিতে যেসব ফসল ফলে তাহার মধ্যে প্রধান হইল ধান বা চাল। এসিয়ার মানচিত্রের দিকে চাহিলে ইহার কারণও পরিষ্কার হইয়া যায়। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে ইহা দক্ষিণদিকে অবস্থিত এবং মৌসুমাবায়ুর গণ্ডিভুক্ত ; ভারতে এই মৌসুমাবায়ু গ্রীষ্মকালে দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে এবং শীতকালে উত্তরপূর্ব্বদিক হইতে বহিতে থাকে। সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া মৌসুমীবায়ুর গণ্ডিভুক্ত সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতে গরম বেশী। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতে বৃষ্টিপাত ও তাপ অধিকাংশ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে এবং এই আবহাওয়া ধানচাষের পক্ষে খুব অনুকূল। এইজন্য ধানই ভারতের প্রধান শস্য। বর্মারও পরিবেশ অনেকটা ভারতের মতো, তাই প্রচুর পরিমাণে সেখানে ধান উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক কারণে ভারতের প্রধান খাদ্যবস্তু-চাল বা ভাত।

চালের পরে খাদ্যবস্তু হিসাবে বাজরা জোয়ার রাগী কোদো মারুয়া ইত্যাদি মিলেটের স্থান, গমের নহে। প্রথম চাল, দ্বিতীয় মিলেট, তৃতীয় গম। যেখানে চাল পাওয়া যায় না, অর্থাৎ ধানচাষ ভাল হয় না, সেখানে লোক বাজরা জোয়ার ইত্যাদি মিলেটশ্রেণীর খাদ্য খাইয়া থাকে। ইহার কারণ কেবল প্রাকৃতিক নহে, আর্থিকও। বাজরা জোয়ার রাগী ইত্যাদি খাদ্যের ইটালীয় নাম 'মিলেট'। এই মিলেট যে-সকল দেশে উৎপন্ন হয় সেখানে প্রধানত দরিদ্র লোকেরাই ইহা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মিশর আফ্রিকা চীন জাপান সর্বত্র ইহা দরিদ্রের খাদ্য। যেখানে দরিদ্র লোক বেশী নাই, যেমন আমেরিকায়, সেখানে ইহা পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মিলেট অবশ্য পুষ্টিকর খাদ্য, তবু পুষ্টিকর হইলেই যে তাহা মানুষের সুখাদ্য

হইবে এমন কোন কথা নাই। ঘাসও পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু তাহা গরুর খাদ্য, মানুষের নহে। ভারতের যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয় না, জমিও খুব উর্বর নহে, সেখানেই মিলেটের চাষ হয় এবং তাহার জন্য বেশী লোকজন প্রয়োজন হয় না, মেহনত বেশী করিতে হয় না, জমিতে সার না দিয়াও অল্প খরচে অনায়াসে চাষ করা যায়। ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র বলিয়া এই মিলেটশ্রেণীর খাদ্যবস্তু খাইয়া তাহারা জীবনধারণ করে।

উত্তরভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাকৃতিক আবহাওয়া সর্বত্র একরকমের নহে। উত্তরভাগ নীরস খটখটে, মধ্যভাগ আধা-ভিজা আধা-শুকনা, দক্ষিণভাগ অতিমাত্রায় সরস। এই কারণে নিম্নাঞ্চলের বাঙালীর সহিত উত্তরের উত্তরপ্রদেশবাসীর আকারে ও আহার-বিহারে পার্থক্য দেখা যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকার ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে প্রায় হাজার লোকের বাস। এত ঘন লোকবসতি ভারতের আর কোন অঞ্চলে বিশেষ দেখা যায় না।, লোকবসতি এত ঘন হইবার কারণ কি? কেনই বা বাঙালী ও উত্তরপ্রদেশবাসীর মধ্যে এই পার্থক্য?

এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই তো চাষী, কিন্তু তবু প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে ফসলের পার্থক্য আছে এবং ফসলের পার্থক্যের জন্য খাদ্যবস্তুরও পার্থক্য কাছে। উপত্যকার উত্তরভাগে সেচব্যবস্থা খুব ভাল এবং গমের চাষ খুব ভাল হয়। শীতকালে হয় গম, গ্রীষ্মকালে হয় মিলেট ও তুলা। এই অঞ্চলের লোকের প্রধান খাদ্যবস্তুও গমের রুটি বা চাপাটি, দরিদ্র লোকের মিলেট। উত্তরপশ্চিম ভারতে দিল্লী পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে রুটি-চাপাটি গড়িবার বিভিন্ন রীতি আছে। 'তন্দুর' নামক একরকম উনানের উত্তপ্ত ভিতরপিঠে সাঁটিয়া সেঁকিয়া যে রুটি গড়া হয় তাহাকে 'তন্দুরি' বলে। উপত্যকার মধ্যভাগে আবহাওয়া কিছুটা ভিজা বলিয়া গমের চাষ ভাল হয় না, মিলেট তো হয়ই না। চালই এখানকার প্রধান খাদ্যফসল, গম সামান্য কিছু হয়। খাদ্যবস্তু চাল ও গমের মিশ্রণ, অর্থাৎ ভাতও চলে, রুটিও চলে। উপত্যকার নিম্নভাগে বা দক্ষিণে আবহাওয়া যেমন স্যাঁতসেতে, তেমনি গরম, ধানচাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট, গম বা মিলেট হয় না। এখানকার প্রধান খাদ্যবস্তু চাল বা ভাত। উপত্যকার নিম্নভাগের অধিবাসী বাঙালীদের তাই অন্নগত প্রাণ, কিন্তু উত্তরভাগের অধিবাসী উত্তরপ্রদেশবাসীদের প্রাণ ডাল-চাপাটিগত। উত্তর

প্রদেশবাসীদের চেহারায় পর্যন্ত গমের কঠোরতা ও দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট, বাঙালীদের চেহারায় ভাতের অলসতা ও সরসতা সুপরিস্ফুট। খাদ্যগুণ চেহারাতেও প্রতিফলিত হয়।

উপত্যকার ব-দ্বীপ অঞ্চলে লোকবসতি অত্যধিক ঘন হইবার কারণও এই সরস আবহাওয়া। এত সহজে ও স্বল্পায়াসে আর কোথাও জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নহে। যেখানে মাটিতে কয়েকটি বীজ ছড়াইলেই কেবল মাটির গুণেই ফসল ফলিতে পারে, সেখানে লোকের বসবাসের আগ্রহ বেশী হওয়া স্বাভাবিক। যেখানে প্রকৃতি এত উদার, আবহাওয়া এত মনোরম, বেশী ঠাণ্ডা নহে, বেশী গরমও নহে, অতি সহজে খাদ্য পাওয়া যায় এবং অল্প আয়াসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে লোকবসতি ঘন হইবে না তো মরুভূমি ও পাহাড় অঞ্চলে হইবে?

তাহা হইলে আমরা উত্তরভারতকে খাদ্যবস্তুর দিক হইতে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করিতে পারি :

১। গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরভাগ—আটার চাপাটি + মিলেট।

২। গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যভাগ—ভাত + রুটি।

৩। গাঙ্গেয় উপত্যকার নিম্নভাগ—ভাত।

গঙ্গার তীর ধরিয়া বাংলাদেশ হইতে উত্তরপ্রদেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণে বাহির হইলে নিম্ন, মধ্য ও উত্তর অঞ্চলে ক্রমে ডালভাত, ডালভাত-রুটি ও ডালরুটি খাদ্যের পার্থক্য নজরে পড়িবে। প্রধান খাদ্যবস্তুর এই পার্থক্য ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাদ্যের পার্থক্যও দৃষ্টি এড়াইবে না। বাংলাদেশের সীমানা পার হইলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে 'মাছ' নামে পদার্থটি খাদ্যের থালা হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্ধান করিতেছে। বাঙালী হইলে খাদ্য আর মুখরোচক মনে হইবে না। বাংলার মতো খালবিল নদীনালার প্রাচুর্য বাংলার বাহিরে আর তেমন নাই, কাজেই মাছ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। নদনদীতে যে মাছ পাওয়া যায়, অথবা মাছের যে আলাদা চাষ করা হয় তাহা বেশীর ভাগ বাহিরে চালান দেওয়া হয়, স্থানীয় লোক অধিকাংশই খায় না। না খাইবার কারণ যতটা 'প্রাকৃতিক' নহে তাহা অপেক্ষা বেশী 'সামাজিক' বলিয়া মনে হয়। বিহার-উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিরামিষ খাদ্যকে হিন্দুর আদর্শ খাদ্য বলিয়া মনে করেন। বাংলাদেশে নিরামিষাশী গোঁড়া হিন্দুর সংখ্যা খুব কম। বাঙালী ব্রাহ্মণ যত তৃপ্তির

সহিত মাছমাংস ভোজন করিবেন, বিহার বা উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা থাকিলেও, তাহা করিতে চাহিবেন না। উত্তরভারতে মাংসের অভাব নাই, হিন্দুর খাদ্য ছাগল ও ভেড়ার মাংস যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানকার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অনেকেই তাহা সামাজিক সংস্কারের জন্য খাইতে চান না। অবশ্য এই অঞ্চলের মুসলমানরা পর্যাপ্ত পরিমাণে মাংস আহার করেন। আধুনিক মনোভাবের প্রসারের ফলে এই গোঁড়ামি ধীরে ধীরে কাটিতেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কাটিয়া যাইতে এখনও অনেক দেরী আছে। সামাজিক সংস্কার সহজে মরে না, মরিতে মরিতেও তাহা অনেককাল বাঁচিয়া থাকে। খাদ্যের অভ্যাস বা রুচি যেখানে সংস্কারে পরিণত হইয়াছে সেখানে খুব সহজে তাহার পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

উপকূল অঞ্চলে, ব-দ্বীপে ও নদী-উপত্যকায় ভাল ধানচাষ হয়, কারণ এখানকার মাটি ও আবহাওয়া সাধারণত ধানচাষের অনুকূল হইয়া থাকে। অবশ্য বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। দক্ষিণভারতে পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে, কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর উপত্যকায় ধান খুব ভাল জন্মায়। দক্ষিণভারতে অধিকাংশ স্থানে চাল তাই প্রধান খাদ্যবস্তু। চাল হইতে শুধু ভাত নহে, চালের গুঁড়া দিয়া নানারকমের খাদ্যও তৈরী করা হয়। বাংলাদেশে চালের গুঁড়া দিয়া নানারকমের পিঠা তৈরী করা হয়। অন্ধ্র ও মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহা প্রতিদিনের খাদ্য। চালের গুঁড়ার সহিত কলাই ডাল বাটিয়া মিশাইয়া পাক করা হয়। তাহাকে 'ইড্‌ডলি' বলে। পশ্চিমবঙ্গে যাহাকে সরুচাকলি বলা হয়, দক্ষিণে তাহাকেই বলা হয় 'ধোসে'।

আনুষঙ্গিক খাদ্যবস্তুতেও উত্তর ও দক্ষিণভারতের মধ্যে পার্থক্য আছে। দক্ষিণে টক, ঝাল, বড়াবড়ি ও ভাজাভুজির মাত্রা কিঞ্চিৎ বেশী, অন্তত উত্তরের তুলনায়। উত্তরপূর্ব অঞ্চল (বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম) ও পাঞ্জাব ছাড়া উত্তরভারতের বাকি অঞ্চলের মতো দক্ষিণভারতেও নিরামিষ খাদ্যের প্রাধান্য আছে। নিরামিষের মধ্যেও আবার উত্তরে ও দক্ষিণে তফাত আছে। উত্তরের ডাল ও দক্ষিণের ডাল এক পদার্থ হইলেও একরকমের খাদ্য নহে। উত্তরের ডাল ঘৃতঘন, দক্ষিণের ডাল টক ও তরল। উত্তরের দই ঘন, দক্ষিণের দই তরল ঘোল। একই মূল খাদ্যের বিভিন্ন রূপ। একই দুগ্ধজ খাদ্যের রূপ বাংলাদেশে একরকম, বিহার হইতে পাঞ্জাব এবং গুজরাট-মহারাষ্ট্র হইতে

কেরল পর্যন্ত অন্যরকম। বাংলাদেশের দুগ্ধজ খাদ্য চারুকলার পর্যায়ে উঠিয়াছে, নবান্ন ও মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন তাহার নামের বাহার, তেমনি তাহার রূপের বৈচিত্র্য। কিন্তু বাংলাদেশের সীমানা ছাড়াইয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে দেখা যায় যে সরস ভাত-ঝোলের বদলে ক্রমেই যত নীরস ডাল-চাপাটির আধিপত্য বাড়িতে থাকে তত দুগ্ধজ খাদ্যগুলিও শুকাইয়া শক্ত হইতে থাকে, প্যাঁড়া ও লাড্ডু মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ খাদ্যবস্তুকে রূপ দেয় ঠিকই, কিন্তু পরে সংস্কার ও রুচিবোধ মিলিত হইয়া তাহার বৈচিত্র্য বিস্তারে সাহায্য করে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যবস্তুর এই বিবরণ হইতে কি বোঝা যায়? অঞ্চলভেদে খাদ্যবস্তুর পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আছে। এই পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের কারণ কি? কারণ দুইটি—প্রথম কারণ প্রাকৃতিক, দ্বিতীয় কারণ সামাজিক। প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও মাটির গুণের পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের খাদ্যফসল উৎপন্ন হয় এবং তাহাই সেই অঞ্চলের লোকের প্রধান খাদ্যবস্তু হয়। ক্রমে এই খাদ্যবস্তু জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায় এবং পরে নানাবিধ সামাজিক সংস্কার তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বিশিষ্ট রূপ দান করে। ধর্মগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিবর্ণগত সংস্কারের প্রভাব ভারতীয়দের খাদ্যবস্তুর উপর খুবই প্রবল। হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে অনেক সংস্কার হইতে আমরা মুক্ত হইব, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ যে কত দূরে তাহা আজই বলা যায় না। কারণ আগেই বলিয়াছি, 'সংস্কার' সহজে মরে না, এবং খাদ্যও যে একটি বড় 'সংস্কার' তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতজনের খাদ্য ও তাহার পুষ্টিগুণ

দেহের বৃদ্ধি, রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য খাদ্য আবশ্যক। একথা আমরা সকলেই জানি। খাদ্য হইতে যে তাপসঞ্চার হয়, সেই তাপ রূপান্তরিত হয় কর্মশক্তিতে। স্টীমইঞ্জিনে যে কয়লা ও জল দেওয়া হয় তাহা খাদ্য। আগুনের তাপে সেই কয়লা ও জল যে বাষ্পে পরিণত হয় তাহা কর্মশক্তি। আমরা যে কাজকর্ম করি, চলাফেরা করি, কথাবার্তা বলি, তাহার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয় এবং শক্তি ক্রমেই ক্ষয় হইতে থাকে। ইঞ্জিনও যে চলে তাহার জন্য

বাষ্পীয় শক্তি ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কয়লা ও জল দিতে হয়। মানুষের খাদ্যও সেইরকম। খাদ্যের সারাংশ হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয় ও পুষ্টিলাভ হয়। আবার খাদ্যের ভিতরে **ভিটামিন** নামে এমন কতকগুলি বিশেষ উপাদান থাকে যাহার জন্য বহু রোগব্যাধির হাত হইতেও আমরা মুক্তি পাই।

যে-সকল খাদ্য আমরা খাই তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উপাদান বা গুণ থাকে। খাদ্যবিশেষে এই গুণের প্রভেদ হয়। কোন 'গুণ' বা 'উপাদান' একটি বিশেষ খাদ্যের মধ্যে হয়ত বেশী থাকিতে পারে, কমও থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। সেইজন্য খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান সকলের থাকা দরকার। কোন্ খাদ্যের কি গুণ তাহা না জানিলে দেহরক্ষার জন্য, পুষ্টির জন্য অথবা রোগব্যাধির প্রতিষেধের জন্য কি কি খাদ্য কতটা পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক তাহা আমরা বিচার করিতে পারিব না। বিচার করিয়া ও বাছিয়া খাদ্য না খাইলে আমাদের দেহের শক্তি ক্ষয় হইবে, কর্মশক্তি কমিয়া যাইবে, অথবা কোন বিশেষ খাদ্যগুণের অভাবের জন্য অসুখবিসুখে আমরা ভুগিতে থাকিব। খাদ্যের প্রধান উপাদান বা গুণ হইল প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, ফ্যাট বা স্নেহ, লবণ ও ভিটামিন। এই গুণগুলি কি ধরনের এবং কোন্ খাদ্যের মধ্যে কি পরিমাণে তাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখিব।

প্রোটিন। প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য আমাদের বাঁচার জন্য খাওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রোটিনের অভাব হইলে বেশীদিন বাঁচা সম্ভব নহে। পরিপূর্ণ ও আদর্শ প্রোটিনখাদ্য হইল মাংস। আমাদের শরীরের মাংসের সহিত অন্যান্য জীবের শরীরের মাংস অনেকটা সমগুণসম্পন্ন বলিয়া তাহা আমাদের দেহের মধ্যে সহজে মিশিয়া যায় এবং পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে। সহজপাচ্য মাংসের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ জল, ২০ ভাগ পেশীবস্তু (যাহা আসল প্রোটিন) আর বাকী ফ্যাট বা চর্বি থাকে। ইহা ছাড়া কিছু কিছু ভিটামিন থাকে, লোহা প্রভৃতি ধাতব লবণ থাকে, কিন্তু কার্বোহাইড্রেট একেবারেই থাকে না। প্রোটিনের ভাগ খুব বেশী পরিমাণে থাকে পাখির মাংসে (যেমন মুরগী), কারণ চর্বি তাহাতে প্রায় থাকেই না। মাংসমাত্রই খুব সহজে হজম হয়, যদি অবশ্য তাহা গুরুপাক না করা হয়।

মাংস ছাড়া মাছ ডিম দুধ প্রভৃতি ভাল প্রোটিনখাদ্য। কিন্তু দুধ ছাড়া অন্যান্য যেসব প্রোটিনখাদ্যের কথা বলা হইল তাহা আমিষ। নিরামিষ



খাদ্যের মধ্যেও প্রোটিন আছে—দুধ ফলমূল ডাল ইত্যাদির মধ্যে। মুসুর মুগ ও ছোলার ডালে প্রোটিন সবচেয়ে বেশী আছে। কিন্তু মাংস ও ডিমের প্রোটিনের সহিত অন্য কোন খাদ্যের প্রোটিনের তুলনা হয় না, কারণ প্রাণিজ প্রোটিন আমাদের শরীর সহজে আত্মসাৎ করিতে পারে।

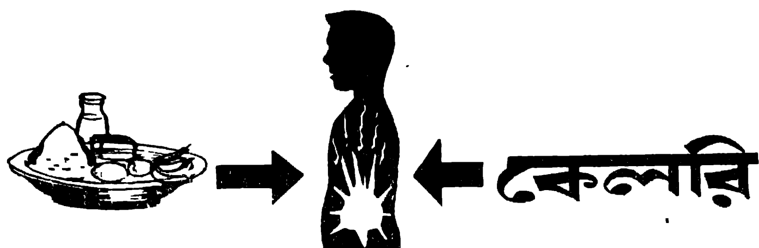
কার্বোহাইড্রেট। যে খাদ্যের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রে রাসায়নিক সংমিশ্রণে আছে তাহাই 'কার্বোহাইড্রেট'। এই উপাদান আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা না হইলে আমরা কর্মক্ষম থাকিব না। ধান গম ইত্যাদি প্রধান কার্বহাইবড্রেট খাদ্য। ইহার মধ্যে স্টার্চ বা শ্বেতসার থাকে বেশী। প্রোটিন যে একেবারে নাই তাহা নহে, খুব সামান্য আছে। চাল জোয়ার বাজরা ভুট্টা রাগী ও ছোলার ছাতুতে স্টার্চই বেশী। যব গম প্রভৃতি রবিশস্যে স্টার্চ আছে ভাত মিলেট অপেক্ষা কিছু কম, প্রোটিন বেশী।

ফ্যাট। ঘি মাখন চর্বি প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্যে এবং উদ্ভিজ্জাত তেল, বনস্পতি প্রভৃতি খাদ্যে ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় উপাদান বেশী আছে।

লবণ। খাদ্যলবণ কেবল আস্বাদের জন্য ছাড়াও অন্যান্য নানাকারণে খাওয়া উচিত। প্রায় প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যেই কিছু না কিছু লবণ থাকে।

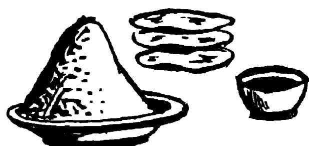
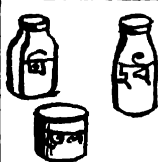
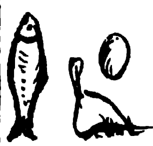
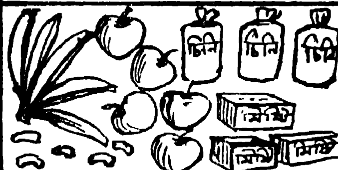
ভিটামিন। ভিটামিন বস্তুটি যে কি তাহা ভাষায় তো দূরের কথা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও সঠিক ধরা সম্ভব হয় নাই। শুধু এইটুকু দেখা গিয়াছে যে ইহার অভাবে নানারকমের অসুখবিসুখ হয় এবং দেহের পুষ্টিও ভাল হয় না। এইকারণে রোগনিবারণ ও দেহের পুষ্টির জন্য ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খাওয়া খুবই প্রয়োজন।

প্রত্যেক খাদ্যের গুণ একরকম নহে বলিয়া আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে দৈনন্দিন খাদ্যসমষ্টিতে কোন উপাদান বেশী বা কম না হয় এবং দেহের পুষ্টি ও রোগব্যাধির প্রতিষেধের জন্য যে-উপাদান যতটুকু দরকার তাহা

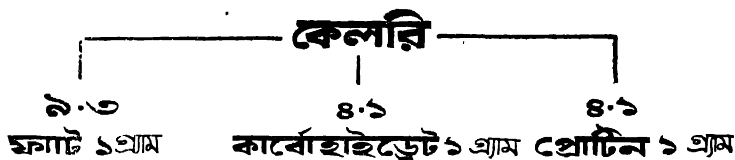


যেন খাদ্য হইতে পাওয়া যায়। এইরকম খাদ্যসমষ্টিকে বলা হয় 'সুসম' বা 'সুসমঞ্জস' খাদ্য (balanced diet)। বয়স, আবহাওয়া, দৈহিক পরিশ্রম ও অন্যান্য বিশেষ অবস্থা অনুসারে বৈজ্ঞানিকরা কতটুকু খাদ্য প্রয়োজন তাহা 'কেলরি'র মাপে নির্ধারিত করিয়া থাকেন। **কেলরি** (calorie) কাহাকে বলে? এক কিলোগ্রাম জলের তাপ মাত্র এক ডিগ্রি বাড়াইতে যতটুকু উত্তাপ আবশ্যক হয় তাহাকে কেলরি বলে। খাদ্য ঠিক ইন্ধনের মতো, উহা অক্সিজেনে দাহ হইয়া শক্তি বা এনার্জি জন্মায়। এই শক্তি উত্তাপরূপে অথবা কর্মরূপে প্রকাশ পায়। কাজকর্মের পরিমাণ মাপা যায় না, কিন্তু তাহার জন্য শরীরের যে তাপ খরচ হয় তাহা মাপা যায়। যে-খাদ্য যত তাপ সঞ্চার

ভারতের খাদ্য

অসম	সুসম
যাহা খাই	খাওয়া উচিত
	
	
	
	
	

করিতে পারে তাহার কেলরিমূল্য তত। ইহা মাপিবার একরকম যন্ত্র আছে, নাম 'কেলরি-মিটার'। কোন্ খাদ্যের কেলরিমূল্য কত তাহা এখন আমরা



অনেকেই জানি। খাদ্য বলিতে খাদ্যের উপাদানের কথা বলা হইতেছে। যেমন :

১ গ্র্যাম প্রোটিন	=	৪·১ কেলরি
১ গ্র্যাম কার্বোহাইড্রেট	=	৪·১ কেলরি
১ গ্র্যাম ফ্যাট	=	৯·৩ কেলরি

প্রত্যেক কাজকর্ম ও পরিশ্রমের জন্য কত কেলরি শক্তি খরচ হয় তাহাও মাপিয়া বলা যায় যেমন :

অল্প পরিশ্রমের জন্য	॥	৩০০০ কেলরি
মাঝারি পরিশ্রমের জন্য	॥	৩৫০০ কেলরি
কঠোর পরিশ্রমের জন্য	॥	৪০০০ কেলরি

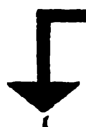
এই হিসাব হইতে বোঝা যায় যে গড়পড়তা প্রত্যেক কর্মক্ষম লোকের প্রতিদিন অন্তত ৩০০০ হইতে ৩৫০০ কেলরিমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কিভাবে এই খাদ্য গ্রহণ করিবে? এই প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। চর্বিজাতীয় খাদ্যের কেলরিমূল্য বেশী, তাই বলিয়া কি শুধু চর্বি খাইব? কখনই না। সমস্ত খাদ্য ও তাহার পরিমাণ এমনভাবে ঠিক করিতে হইবে যাহাতে খাদ্যের প্রত্যেকটি উপাদান শরীরের প্রয়োজন অনুপাতে থাকে এবং সবগুলি মিলাইয়া ৩০০০।৩৫০০ কেলরি হয়। ইহাই প্রকৃত সুসম খাদ্যসমষ্টি।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও কেলরি সম্বন্ধে এই কথাগুলি এখানে এইজন্য বলা হইল যে ইহা না জানিলে আমরা আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয়দের খাদ্য সুসম কি অসম, কোথায় তাহার ত্রুটি, কিসেরই বা অভাব এবং কিসেরই বা আধিক্য তাহা বুঝিতে পারিব না, বিচারও করিতে পারিব না। সুসম খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে খাদ্যসমষ্টি এমনভবে বাছাই করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনীয় কেলরির তিনভাগ ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট-

পরিশ্রম















কেলরি

জাতীয় উপাদান হইতে পাওয়া যায় এবং বাকী অন্তত একভাগ প্রোটিন হইতে পরিপূরণ হইতে পারে। অর্থাৎ সুসম খাদ্য হইতেছে এই :

ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট : ৩০০০ এর ¾ = ২২৫০ কেলরি
প্রোটিন : ৩০০০ এর ¼ = ৭৫০ কেলরি

আমরা আগে দেখিয়াছি যে গ্র্যাম প্রোটিনের কেরলিমূল্য ৪.১, তাহা হইলে এই হিসাবে প্রতিদিন আমাদের প্রায় ১৮৫ গ্র্যাম প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। ইহার মধ্যে আবার অন্তত তিনভাগের একভাগ, প্রায় ৬২ গ্র্যাম প্রাণিজ প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম) খাওয়া বাঞ্ছনীয়। এইবার আমরা আমাদের খাদ্যের বিচার করিব।

ভারতীয়দের সাধারণ খাদ্যতালিকা ও তাহার উপাদানমূল্যের পাশাপাশি যদি সুসম খাদ্যের একটি তালিকা দেওয়া যায় তাহা হইলে একনজরে বোঝা যাইবে যে আমাদের খাদ্যের ত্রুটি কোথায়। নীচে এই ধরনের একটি তালিকা দেওয়া হইল :

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তির, ('গ্র্যাম' হিসাবে)

খাদ্যের নাম	যাহা খাওয়া হয়	সুসম খাদ্য বা যাহা খাওয়া উচিত
চাল, গম, মিলেট	৪৭১.০	৩৯৬.৯
ডাল	৬৪.০	৮৫.০
পাতা সবজি	২৪.৪	১১৩.৪
অন্য সবজি	১১৬.২	১৭০.১
ঘি ও তেল	২৬.১	৫৬.৭
দুধ ও দুধের খাদ্য	৯৩.৮	২৮৩.৫
মাছ, মাংস, ডিম	২৬.৬	১১৩.৪
ফলমূল, বাদাম	১৬.৪	৮৫.০
চিনি ও মিষ্টি	১৮.৯	৫৬.৭

এই খাদ্যসমষ্টির উপর চোখ বুলাইলেই দেখা যায় যে একমাত্র চাল-গম-বাজরা ও জোয়ার ছাড়া বাকি প্রায় সমস্ত খাদ্য আমরা কম খাই, এমন কি ডালও যেমন খাওয়া উচিত তাহা খাই না। পাতা-সবজি যাহা খাই তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচগুণ বেশী খাওয়া উচিত, অন্যান্য সবজিও কিছু পরিমাণে বাড়াইলে

ভাল হয়। মাছ মাংস ডিম আরও পাঁচগুণ বেশী খাওয়া প্রয়োজন, ফলও প্রায় তাই। দুধ, দুধের খাদ্য এবং চিনি বা মিষ্টি আরও অন্তত তিনগুণ বেশী খাইলে প্রয়োজন মিটিতে পারে। আমাদের খাদ্যের প্রধান ত্রুটি হইতেছে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় উপাদানের মাত্রাধিক্য, এবং তাহাতেও আবার স্টার্চের মাত্রা অত্যধিক। ইহাতে কর্মশক্তি পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই শক্তি বাষ্পের মত উড়িয়া যায়, শরীরের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। প্রোটিন ও ভিটামিন-জাতীয় উপাদান আমাদের ভারতীয়দের খাদ্যে অত্যন্ত কম, এত কম যে তাহাতে শরীরের পুষ্টি বা ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব।

পরিশ্রম অনুপাতে খাদ্যের কেলরির মূল্যের যে হিসাব আগে দেওয়া হইয়াছে ভারতের 'নিউট্রিশন অ্যাডভাইজরি কমিটি' ভারতীয়দের জন্য তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ভারতীয়দের দৈহিক গঠনের কথা বিবেচনা করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় কেলরির কিছু অদল বদল করা হইয়াছে:

প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কেলরি

অল্প পরিশ্রমের জন্য	:	২৪০০ কেলরি
মাঝারি পরিশ্রমের জন্য	:	৩০০০ কেলরি
বেশী পরিশ্রমের জন্য	:	৩৬০০ কেলরি

কৃষক, মজুর, সাধারণ মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনিকদের দৈনন্দিন খাদ্যসমষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতীয় সমাজের উপরের মুষ্টিমেয় লোকের স্তরটি ছাড়া বাকি সাধারণ স্তরের অধিকাংশ লোকের খাদ্যে প্রয়োজনীয় কেলরি ও প্রোটিন দুইয়েরই অভাব খুব বেশী। অর্থাৎ ভারতের বেশীর ভাগ লোকের খাদ্য সুসম নহে, এমনকি সাধারণ প্রাণধারণের স্তর হইতে নিচু। এইজন্য 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসার্চ' তাঁহাদের 'ডায়েট সার্ভে' রিপোর্টে বলিয়াছেন যে সমস্ত দিক বিচার করিয়া সাধারণ ভারতীয়ের খাদ্যসমষ্টিতে তিনটি প্রধান ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। চাল গম বাজরা জোয়ার ইত্যাদি খাদ্যশস্যের আধিক্য। অন্যান্য খাদ্যের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই।

২। দেহরক্ষক প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের অত্যধিক অভাব। এই অভাবের ফলে গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটে, নানারকম কঠিন রোগব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং জীবনীশক্তিও কমিয়া যায়।

৩। অত্যাবশ্যক ভিটামিনের অভাব। ইহার জন্যও নানারকমের রোগব্যাধি হয়।

প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য যে ভারতীয়েরা কত কম খায় তাহা মাছমাংস খাওয়া হইতেই বোঝা যায়। অনেকের ধারণা আছে যে ভারতীয়রা মাছ যথেষ্ট পরিমাণে খায়। কিন্তু এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। পৃথিবীতে যতরকম জাতির লোক মাছ খায় তাহাদের মধ্যে ভারতীয়দের মতো এত কম মাছ আর কেহ খায় না। এই হিসাব হইতে পরিষ্কার তাহা বোঝা যায়—

গড়ে বছরে প্রত্যেক ব্যক্তি মাছ খায়

জাপান	:	১০০ পাউণ্ড
ফিলিপাইন	:	৪০ ”
মালয়	:	৪০ পাউণ্ড
যুক্তরাষ্ট্র	:	৩৫ ”
থাইল্যাণ্ড	:	২৫ ”
ইন্দোচীন	:	১৫ ”
কোরিয়া	:	১২ ”
ইন্দোনেশিয়া	:	১২ ”
চীন	:	৭ ”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	:	৬ ”
ভারতবর্ষ	:	৪ ”

ভারতের লোক অন্যান্যদের তুলনায় মাছ অনেক কম খায়। মাংসও যে খুব বেশী খায় তাহা নহে।

ভারতীয় খাদ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বিচার করিলে মাছ অপেক্ষা খাদ্যের মধ্যে মাংসেরই বেশী আদর ছিল দেখা যায়। মহাভারতে কোন কোন স্থানে মাংসভক্ষণের নিন্দা আছে, কিন্তু তাহার গুণগানও যথেষ্ট করা হইয়াছে। তুলনা করিলে মাংসের নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসাই মহাভারতে বেশী করা হইয়াছে মনে হয়। ব্রাহ্মণও মাংসভক্ষণ করিতেন। বনবাসকালে

জাপান

ফিলিপাইন

মালয়

কোরিয়া

চীন

ইন্দোচীন

থাইল্যাণ্ড

ইন্দোনেসিয়া

বর্মা

ভারতবর্ষ

যুক্তরাজ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে বছরে মাছ খায়

পাণ্ডবরা ফলমূল ও মাংস আহার করিতেন। মাংসই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। জয়দ্রথ বনে পাঞ্চালীর কুটিরে উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী যথানিয়মে অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, "আমার পতিরা মৃগয়ায় গিয়াছেন, ফিরে এলে আপনাকে হরিণ শরভ শশ ঋক্ষ রুরু শম্বর গবয় মৃগ বরাহ মহিষ এবং অন্যান্য পশু ভক্ষণ করিতে দেওয়া হবে"। বহু ভোজনের বিবরণে মাংসেরই বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের এই সব উদাহরণ হইতে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে সর্বশ্রেণীর ও সর্বজাতির মধ্যে মাংসভক্ষণ রীতিমত প্রচলিত ছিল এবং মাছ অপেক্ষা তাহা আদৃত হইত বেশী। মনে হয় মধ্যযুগে মাংসভক্ষণ সমন্ধে জাতিবর্ণগত সংস্কার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্যান্য বিদেশী জাতির খাদ্য

কেবল ভারতবর্ষের নহে, প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত দেশে সাধারণ লোকের খাদ্যে প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব খুব বেশী। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য দারিদ্র্য। প্রাচ্যের অধিকাংশ লোক চাল গম যব জোয়ার প্রভৃতি স্টার্চপ্রধান খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে। মাছ মাংস ডিম ও অন্যান্য প্রাণিজ প্রোটিনপ্রধান খাদ্য হয় তাহারা খায় না অথবা অভাবের জন্য খাইতে পায় না।

আরব। আরবে গম বার্লি, মাংস প্রভৃতি খাদ্য অনেকে খায়, কিন্তু আরবদের প্রধান খাদ্য হইতেছে খেজুর। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে খেজুর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভারতীয়দের যেমন ভাত ও রুটি প্রধান খাদ্য, আরবদের তেমনি খেজুর। ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ নাকি আরববাসীদের বলিয়াছিলেন যে নিজের পিতামাতাকে তোমরা যেমন ভালবাস, ভক্তিশ্রদ্ধা কর, খেজুরকেও তেমনি ভালবাসিবে ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে। মহম্মদের একথা বলিবার কারণ, খেজুর আরবজাতির প্রাণস্বরূপ। আমাদের দেশে ভাত বা অন্ন মানুষের প্রাণ বলিয়া লোকে দেবতার মতো তাহার পূজা করিয়া থাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন দান করেন বলিয়া তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা। খেজুরও আরবদের প্রধান অন্ন। দুধের মধ্যে উটের দুধই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তাহাই অন্যতম খাদ্য। উট আরবদের

মরুভূমির যান এবং উটের দুধ তাহাদের প্রাণ। উটের দুধের সহিত খেজুর মিশাইয়া খাইতে আরবরা ভালবাসে, ইহা তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। আরবরা ভেড়ার দুধও খায়, মাংসও খায়, তবে ইউরোপের অন্যান্য জাতির মতো তাহারা মাংসাশী নহে।

ভূমধ্যসাগর অঞ্চল। ভূমধ্যসাগর অঞ্চল বলে উত্তর-আফ্রিকার খানিকটা অংশকে। এই অঞ্চলটি আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা। এখানকার আবহাওয়া সহনীয় এবং বৃষ্টি হয় শীতকালে। এইজন্য পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে এই ধরনের আবহাওয়া আছে—শীত ও গ্রীষ্ম সহনীয় এবং শীতকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়—সেই সব অঞ্চলকে 'ভূমধ্যসাগর অঞ্চল' বা 'মেডিটারেনিয়ান রিজিয়ন' বলা হয়। এখানকার প্রধান ফসল হইতেছে 'আঙুর' ও 'অলিভ'। ফলের মধ্যে কমলালেবু ও লেবু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। সাগরের উপকূলের কাছে পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে সমভূমি ও উপত্যকা আছে। এই সব জমি খুব উর্বর, কৃষকরা এখানে গম ফলাইতে পারে। এই অঞ্চলের লোকের খাদ্য কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। গম বা বার্লির রুটি হইতে কার্বোহাইড্রেট এবং অলিভের তেল হইতে ফ্যাট; সমুদ্রের মাছ হইতে এবং আঙুর, কমলা প্রভৃতি ফল হইতে প্রোটিন ও ভিটামিন পাওয়া যায়। কিন্তু এই অঞ্চলের লোকের দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে মাছ-মাংসের পরিমাণ খুব অল্প। সেইজন্য সাধারণ লোকের খাদ্যে প্রোটিনের বেশ অভাব দেখা যায়, অনেকটা ভারতবর্ষের লোকের খাদ্যের মতো।

চীন ও জাপান। চীন ও জাপানের উত্তর-দক্ষিণে খাদ্যের পার্থক্য ও সাদৃশ্য প্রায় একরকম দেখা যায়। চীনের দক্ষিণ অঞ্চলে চাল এবং শীতপ্রধান উত্তর অঞ্চলে গম ও মিলেট প্রধান খাদ্য। চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় 'সোয়াবিন' নামে একরকম ডালের মতো বস্তু ভাল চাষ হয় এবং তাহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই সোয়াবিনের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ, মাংসাদির মধ্যেও এতটা পরিমাণ প্রোটিন নাই। নিরামিষাশীদের খাদ্যে প্রোটিনের যে অভাব থাকে তাহা সোয়াবিনের দ্বারা অনায়াসে পূরণ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এখনও ইহার তেমন সমাদর ও প্রচলন হয় নাই। চীনারা মুরগি শুয়োর ইত্যাদির মাংস যতটা খায় মাছ ততটা খায় না। জাপানীদের সহিত চীনাদের খাদ্যের প্রধান পার্থক্য এইখানে। জাপানীরা

যেখানে বছরে প্রত্যেকে প্রায় গড়ে ১০০ পাউণ্ড করিয়া মাছ খায়, সেখানে চীনারা খায় মাত্র ৭ পাউণ্ড, অবশ্য ভারতীয়দের তুলনায় বেশী। ইহা ছাড়া জাপানীদের মাছ খাওয়ার সহিত ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙালীদের কিছুটা তুলনা করা যাইতে পারে।

ল্যাপল্যাণ্ড। উত্তরপশ্চিম ইউরোপে ল্যাপদের বাসস্থানকে বলা হয় 'ল্যাপল্যাণ্ড'। এখানকার মেরু অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়া অত্যন্ত কঠোর। প্রকৃতিদেবী এই অঞ্চলের লোকদের প্রতি আদৌ সদয় নহেন। যাহারা এখানে বাস করে তাহাদের প্রধান পালিত পশু বল্গাহরিণ। যাহারা উপকূল অঞ্চলে থাকে তাহারা সমুদ্রে মাছ শিকার করিয়া বেড়ায়। অধিকাংশ অঞ্চল তুন্দ্রায় ঢাকা, বল্গাহরিণের চরিবার পক্ষে ভাল, কিন্তু চাষ-আবাদের অনুকূল নহে। স্থায়ী বসতি অঞ্চলে ল্যাপরা আলুর চাষ করে, গরু-ভেড়াও প্রতিপালন করে। যাযাবরদের প্রধান সম্বল বা খাদ্য বল্গা-হরিণের মাংস ও সমুদ্রের মাছ। স্থায়ী বাসিন্দারা আলু, দুধ, গরুভেড়ার মাংস প্রভৃতি খায়। খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন-জাতীয় উপাদান খুব বেশী এবং তাহা না হইলে এই শীতপ্রধান অঞ্চলে জীবনধারণ করা অসম্ভব বলা যাইতে পারে।

উপসংহার। প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের খাদ্যের যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহা এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। আরব ও ইরানের খেজুর ও উটের দুধ, জাপান ও বাংলাদেশের মাছ, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অলিভের তেল ও ফল, ল্যাপদের বল্গাহরিণের মাংস ও সমুদ্রের মাছ এবং ভারত হইতে চীন-জাপান পর্যন্ত এসিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে চাল গম ও মিলেট ইত্যাদি খাদ্য ইহার দৃষ্টান্ত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যবস্তুর পার্থক্য হইতেও এই প্রাকৃতিক প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা হয়।

খাদ্যের পরিপুষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অধিকাংশ লোক তো বটেই, এসিয়ার বেশীর ভাগ লোকই সুসম খাদ্য খায় না, অভাবের জন্য খাইতে পায় না। স্টার্চপ্রধান খাদ্যই এসিয়ার লোক বেশী খায় এবং স্টার্চের তুলনায় প্রোটিন ও ভিটামিন-জাতীয় উপাদান খাদ্যের মধ্যে অল্পই থাকে।

প্রাকৃতিক প্রভাব ছাড়াও দেশীয় প্রথা ও সংস্কারের প্রভাব খাদ্যের উপর যথেষ্ট আছে। ভারতীয়দের খাদ্যবস্তুতে এই প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রথা-সংস্কার খাদ্যবস্তুকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী হইলে ক্রমে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং অনভ্যস্ত খাদ্য খাইতে রুচিতেও বাধে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও নানাজাতির লোকের খাদ্যের মধ্যে এই অভ্যাস ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

QUESTIONS

Group A

1. How far natural environment has influenced the food-habits of Indian people ?

2. Is there any influence of social custom on the food-habits of Indian people ?

3. What is a balanced diet ? How can the nutritional deficiencies in an average Indian diet be made up ?

4. How should an Indian vegetarian select his food items for a balanced diet ?

5. Prepare a list of food items which a hard-working labourer of India should take.

6. Estimate the influence of natural environment on the food composition of the Arabs and the Lapps.

7. Give a comparative study of food in India and Japan.

Group B

I. What is the principal food of common people in the following regions of India ? Mark 'R' for Rice, 'W' for Wheat and 'M' for Millets in the space after each region :

Western and Central India——
Eastern and Southern India——
Northern and North-Western India——

II. There are listed below 9 food items. What quantity (in 'grammes') of each item an adult in India should take to make a balanced diet ? Mention the quantity in the space after each item :

1. Rice, Wheat, Millet——
2. Dal——
3. Leafy vegetables——
4. Vegetables——
5. Ghee and oil——
6. Milk and milk-products——
7. Fish, meat and egg——
8. Fruits and nuts——
9. Sweets——

III. How much protein one should take in daily from his food ?

IV. The names of countries in the 2nd column are incorrectly arranged in relation to food items (1st column) taken by them. Re-arrange it correctly in the 3rd column.

1st Column	2nd Column	3rd Column
Fish	Arabia	———
Wheat	Japan	———
Date-palm	Lapland	———
Reindeer-meat	Mediterranean	———
Olive Grapes	North-West India	———

V. India
Malaya
Japan
U. K.
Philippines

These are fish-eating countries. How much quantity of fish is eaten annually per person in each country ? Arrange the names in order of quantity.



তৃতীয় প্রকরণ

আমাদের বেশভূষা

প্রতিপাদ্য। ভাতের পর কাপড়। আমরা কথায় বলি যে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হইলে মানুষ আর বিশেষ কিছু চায় না, অবশ্য যদি তাহার সহিত বসবাসের গৃহটিও থাকে। খাদ্য যেমন মানুষের দেহের পরিপুষ্টির জন্য আবশ্যক, বস্ত্র ও বেশভূষাও তেমনি প্রাকৃতিক আবহাওয়া হইতে আত্মরক্ষার জন্য এবং দেহের আচ্ছাদনের জন্য না হইলে চলে না। পৃথিবীর আদিবাসিদের মধ্যে যাহারা আদিমতম অবস্থায় অত্যন্ত প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে তাহারাও আত্মরক্ষার জন্য গাছের বল্কল বা পশুর চামড়া ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। যে সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে শীত অত্যধিক সেখানে একেবারে বস্ত্রহীন অনাবৃত দেহে মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হয়ত তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সেখানেও সংকোচ ও সৌন্দর্য-বোধের প্রশ্ন আছে। পোশাকের সহিত কেবল প্রাকৃতিক প্রয়োজন নহে, এই সংকোচ ও সৌন্দর্যবোধও জড়িত। তবে প্রাকৃতিক কারণ অবশ্যই প্রধান বিচার্য বিষয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পোশাক আর শীতপ্রধান দেশের পোশাক যে এক হইতে পারে না তাহা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। আমরা যখন শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াইতে যাই তখন পশমের কোট,

---

Unit 3. Clothing—clothing worn in different parts of India—influence of environment (natural and social) on clothing—aesthetic factors in clothing.

A comparative study of clothing in India and a few typical countries, e.g. Desert Lands, undeveloped African countries, European countries, Polar regions.

চাদর, কম্বল ইত্যাদি না লইয়া যাই না। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী যদি পোশাকের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা দরকার হইত না, একই পোশাক পরিয়া আমরা সর্বত্র যাইতে পারিতাম।

বেশভূষার উপর প্রাকৃতিক প্রভাবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দেশে দেশে পোশাকের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মানুষের রুচি, সৌন্দর্যবোধ, সামাজিক সংস্কার, আচার প্রথা ইত্যাদিও যুগে যুগে বসনের বৈচিত্র্যময় বিকাশে প্রকৃতি অপেক্ষা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। কি কারণে প্রথমে মানুষ বসনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছে সেই বিষয়েই নৃবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদের আজও অবসান হয় নাই। প্রকৃতিবাদীরা পরিবেশের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের স্বভাবজাত রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের উপর বেশী জোর দেন।

ভারতবাসীর বেশভূষা

ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিবেশমণ্ডলে ভাগ করিলে ঠিক পরিবেশ অনুযায়ী পোশাকের পার্থক্য সর্বত্র দেখা যাইবে না। অর্থাৎ পরিবেশ ও পোশাকের সহিত যান্ত্রিক সম্পর্ক ভারতের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে নাই। তাহার কারণ অঞ্চলভেদে ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে পার্থক্য আছে তাহাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পোশাকের আমূল পরিবর্তন ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই, একমাত্র পার্বত্য অঞ্চলে ছাড়া। বাকি অধিকাংশ অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মের মাত্রার তফাত হইলেও তাহা পোশাকের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেরকম কিছু নহে। ভারতবর্ষ প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিত্যব্যবহার্য পোশাকের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে। পোশাকের বৈচিত্র্যের যে অভাব আছে তাহা নহে, কিন্তু তাহা বাহিরের রূপের বৈচিত্র্য। ভারতসংস্কৃতির বাহিরের অপরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন ভিতরে একটি আদর্শগত সুরের ঐক্য ও সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, ভারতীয়দের পোশাকেও কতকটা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই ঐক্য বুঝিতে পারা যায় ভারতের যে-কোন অঞ্চলের চাষী ও সাধারণ মানুষের বেশভূষা দেখিলে। আসাম হইতে গুজরাট পর্যন্ত, পাঞ্জাব হইতে

কোচিন, মাদুরা পর্যন্ত ভারতবাসীর দৈনন্দিন পোশাকের সাদৃশ্য যে-কোন পর্যটকের চোখে পড়িবে। এই সাধারণ পোশাক হইল হিন্দু পুরুষদের ধুতি ও চাদর বা গামছা, মুসলমানদের লুঙ্গি এবং মেয়েদের শাড়ি, শেমিজ ও ব্লাউজ। একই ধুতি পরিধানের ভঙ্গিতে ও বিন্যাসে পার্থক্য আছে, কিন্তু আসল ধুতির কোন পরিবর্তন নাই। যেখানে কাছাকোঁচা দিয়া ধুতি পরিপূর্ণ ধুতির মতো ব্যবহার করা হয় সেখানে তাহা আকারে বড়, নয়-দশ হাত পর্যন্ত, আর যেখানে তাহা পরা হয় না, কোমরে লুঙ্গির মতো জড়াইয়া রাখা হয় (যেমন দক্ষিণভারত), সেখানে তাহা আকারে ছোট, পাঁচ-ছয় হাত পর্যন্ত, এবং ধুতি বলিয়া পরিচিত নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া ভারতীয়দের পোশাক খুবই সাদাসিধা। ভারতীয় পোশাকের প্রধান উপাদান হইল তুলার সূতা এবং তূলা ভারতে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। তকলিতে ও চরকায় মেয়ে-পুরুষে মিলিয়া তুলা হইতে সূতা কাটিবার রীতি দীর্ঘকাল এদেশে প্রচলিত আছে। গ্রামে গ্রামে তাঁতিরও অভাব নাই, যাহারা সেই সূতা হইতে কাপড় বুনিয়া দিবে। এই সূতার কাপড় ভারতবাসীর প্রধান বস্ত্র। এই কাপড় হইতেই ধুতি হয়, লুঙ্গি হয়, পাজামা ও জামা-কামিজ হয়, পাগড়ি ও চাদর হয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পোশাক তৈরী হয়।

পার্বত্য অঞ্চলে লোক শীতের জন্য ভিতরে তুলা দিয়া সেলাই করা বালাপোশের মতো জামা পরে, তাহাতে শীত হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। উল বা পশমের তৈরী গেঞ্জি, কোট, কম্বল ও চাদরও তাহাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। পশমের মোজা বা ফেট্টি এবং কান-ঢাকা টুপি শীতের সময় ব্যবহার না করিলে চলে না। পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা অবসর সময়ে ও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পশমের জামা বুনিয়া থাকে। কথা বলিতে বলিতে, চলিতে চলিতে, যে-কোন অবস্থায় তাহারা এই কাঁটা দিয়া পশম বোনার কাজে অভ্যস্ত ও দক্ষ। আলমোড়া ভোট অঞ্চলে হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত অবহিমালয় প্রদেশের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মেয়েরা এই পশম-বোনার কাজে পারদর্শী। পাহাড়ীরা গ্রীষ্মকালে যখন শীত সহনীয় থাকে তখন সূতার কাপড়ের আঁটসাঁট পাজামার সহিত গায়ে শার্ট-পাঞ্জাবি পরিয়া তাহার উপর ছোট তুলার কুর্তা বা পশমের গেঞ্জি ব্যবহার করে। মাথায় টুপি থাকে এবং পায়ে থাকে জুতা ও মোজা। শীতকালে গায়ে পশমের কোট বা বড় ওভারকোট এবং তাহার সহিত কম্বল বা চাদর ব্যবহার করিতে হয়।

মেয়েরা শাড়ি পরে, ঘাগরাও পরে, গায়ে থাকে পশমি জামা। মাথায় রুমালের মতো একটুকরা কাপড়ও বাঁধা থাকে।

ভারতীয় বেশভূষার ঐতিহ্য

ভারতের মহাকাব্য মহাভারতে দেখা যায়, এদেশে ব্রাহ্মণরা সাদা কাপড় ও সাদা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিতেন। শ্বেতবস্ত্র আবহমানকাল হইতে এদেশে শুচিতার নিদর্শনরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। একদা ব্রাহ্মণরা মৃগচর্মও বসনরূপে ব্যবহার করিতেন। বিভিন্ন সময় বিবিধ কাজকর্মের জন্য বিভিন্ন রকমের বস্ত্র ব্যবহারের বিধান ছিল—শয়নের সময় একরকম, চলাফেরার সময় একরকম, পূজার্চনা ও অন্যান্য কাজের সময় এক-একরকম। যুদ্ধের সময় বীরেরা রক্তবস্ত্র পরিতেন। নানা রং-এর কাপড় পরিবার রীতিও প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। অঞ্চলভেদে পোশাকের পার্থক্য ছিল, রাজসূয়যজ্ঞে সিংহল হইতে সমাগত ব্যক্তিদের পরিধানে ছিল মণিখচিত বস্ত্র। পার্বত্য অঞ্চলে কিরাতরা (অর্থাৎ অবহিমালয় অঞ্চলের লেপ্চা ভোট প্রভৃতি জাতি) পশুর চামড়া বস্ত্রের মতো ব্যবহার করিত। ভারতের সকল অঞ্চলেই উষ্ণীষ ব্যবহারের প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। কেবল কাজকর্মভেদে নহে, জীবনের পর্বান্তরের সহিতও পোশাকের রূপান্তর ঘটিত। গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পোশাক একরকম ছিল না। ব্রহ্মচারীকে সবসময় হাতে একটি দণ্ড রাখিতে হইত, দণ্ডটি পলাশ অথবা বেলকাঠের। তৃণের মেখলা, যজ্ঞোপবীত এবং জটা ধারণ করাও ব্রহ্মচারীর কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে পশুর চামড়া ও গাছের ছাল পরিতে হইত।

ভারতের মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ বর্ণনা রামায়ণ-মহাভারতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অলংকার ও প্রসাধনের বর্ণনা প্রচুর পাওয়া যায়। বিবাহের সময় দ্রৌপদী ক্ষৌমবস্ত্র এবং সুভদ্রা রক্তবর্ণের কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া পোশাকের আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করা যায় না। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্রাবলী অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে ভারতীয় নারীর পোশাকের তিনটি প্রধান বস্ত্র হইতেছে—**ঘাগরা, চোলি** ও **ওড়না**। ওড়নার একটি কোণ ঘাগরায় গুঁজিয়া মাথায় ঘোমটা দেওয়া হইত। কালক্রমে ওড়না দীর্ঘ হইতে থাকে এবং ঘাগরার উপরেও তাহা জড়ানো হয়। ক্রমে আরও দীর্ঘ হইয়া এই ওড়নাই বর্তমান

শাড়ির রূপ ধারণ করিয়াছে এবং পূর্বের ঘাগরা হইয়াছে 'সায়া' বা অন্তর্বাস। চার্লস ফেব্রি তাঁহার *A History of Indian Dress* গ্রন্থে শাড়ির এই ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'চোলি' বা বক্ষাবরণ ক্রমে 'ব্লাউস' হইয়াছে।



ঘাগরা-ওড়না-চোলি হইতে শাড়ি

ভারতীয় পোশাকের এই প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হইল, প্রাকৃতিক পরিবেশগত পার্থক্যের মধ্যেও ভারতীয় পোশাকের সামাজিক প্রথানুগত সাদৃশ্য। জীবনের বিভিন্ন আশ্রমে যে পোশাক পরিধানের বিধান ছিল, অঞ্চলভেদে তাহার পরিবর্তন হইত না। পূজার পোশাক অথবা ব্রাহ্মণের পোশাক উত্তরভারতে একরকম এবং দক্ষিণভারতে অন্যরকম ছিল না। ভারতীয় পোশাকের মধ্যে এই সামাজিক আচারগত ঐক্য বহুকাল হইতে ছিল এবং এখনও অনেকটা তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল অঞ্চলভেদে ভারতে দীর্ঘকাল হইতেই পোশাকের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ইহার একমাত্র কারণ নহে, আঞ্চলিক আচারপ্রথাও অন্যতম কারণ।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল, ভারতীয় পোশাকের সারল্য। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই সারল্য কোথাও নষ্ট হয় নাই। রাজা-রাজড়া ও তাঁহাদের

আমার-অমাত্যরা যে-সব দরবারী পোশাক পরিতেন তাহা যথেষ্ট মূল্যবান ও জমকাল ছিল, কিন্তু এই দরবারী পোশাক দিয়া সাধারণ ভারতীয়দের পোশাকের বিচার করা যায় না।

চতুর্থ লক্ষণীয় বিষয় হইল, অঞ্চলভেদে ভারতে যে বস্ত্রভেদ ছিল তাহার অন্যতম কারণ বস্ত্রশিল্পের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাসবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও পশমবস্ত্রের বিশিষ্ট বিকাশের জন্য পোশাকের এই বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল। কাম্বোজের রাজা (পূর্বোত্তর আফগানিস্থানের) রাজসূয়যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরকে নানারকমের বস্ত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন—মেষের লোমে প্রস্তুত 'ঔর্ণ', মূষিকের লোমে প্রস্তুত 'বৈল,' বিড়ালের লোমে প্রস্তুত 'বার্ষদংশ' ইত্যাদি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র। বস্ত্রের তন্তুর মধ্যে সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্তুও ছিল। বাহ্লীক দেশে (সিন্ধু ও শতদ্রুর সংগমস্থলে) নানারকমের পশমী, রেশমী ও পট্টবস্ত্র তৈরী হইত। মেষের ও হরিণের লোম দিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত এবং সেগুলি চিত্রিত হইত। পাটের ও কীটজ রেশমের পদ্মবর্ণ বস্ত্র প্রচুর উৎপন্ন হইত এবং সূক্ষ্মতা ও মসৃণতার দিক দিয়া তাহাদের তুলনা হইত না। ভীমসেন পূর্বভারত জয় করিয়া বাংলাদেশ ও আসামের রাজাদের কাছ হইতে যে কর আদায় করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্যান্য ধনসম্পদের সহিত চমৎকার সব বস্ত্র ও কম্বলও ছিল। ধনঞ্জয় উত্তরকুরু জয় করিয়া যে কর আদায় করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দিব্যবস্ত্র, ক্ষৌম, অজিন প্রভৃতি যথেষ্ট ছিল। সহদেব দক্ষিণভারত জয় করিয়া প্রচুর বহুমূল্য বস্ত্র উপঢৌকন আদায় করিয়াছিলেন। এই সব বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বহুকাল হইতে ভারতের সকল প্রদেশে নানারকমের বস্ত্র প্রস্তুত হইত এবং বস্ত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ভারতীয় বেশভূষার বৈচিত্র্য

উত্তরভারতে খুব সুন্দর সূক্ষ্ম সূতির কাপড় তৈরী হয়, রঙীন ও সাদা দুই-ই। বুনুনির সময় প্যাটার্ন বা নক্সা তৈরী করা হয়, এখন অবশ্য নানারকমের নক্সার ছাপানো কাপড়ও পাওয়া যায়। চেক-নক্সার কাপড়কে বলা হয় 'খেস' এবং 'স্ট্রাইপ' দেওয়া বা দাগ-কাটা কাপড়কে বলা হয় 'সুসি'। 'সুসি' সাধারণত উত্তরভারতের মেয়েদের পাজামার জন্য ব্যবহার করা হয়। হিন্দুরা প্রধানত লালরঙের মুও সলমানরা নীলরঙের 'সুসি' ব্যবহার করে,



দক্ষিণভারতীয়। উত্তরভারতীয়। বাঙালী



ভারতীয় নারীর বেশ : দক্ষিণভারত। উত্তরভারত। বাংলাদেশ

রঙের সঙ্গে সাদারও নক্সা থাকে। পুরুষদের মধ্যে পাজামা ও ধুতি দুইয়েরই প্রচলন আছে। পাজামার ছাঁটকাট সর্বত্র এক নহে। রাজপুতদের যোধপুরী বা জয়পুরী পাজামা ঢিলাঢালা নহে, হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত গায়ের সহিত সাঁটিয়া থাকে, উপরের অংশের বিস্তার থাকে বেশী। ইহার কাটিং ও সেলাই অন্যরকম, এবং কোথাও ইহাকে 'চোস্ত', কোথাও বা 'যোধপুরী পাজামা বলা হয়। পাঞ্জাবীদের পাজামা এরকম গা-সাঁটা নহে, ঢিলাও নহে, ভাঁজের পর ভাঁজে ফাঁপানো। মুসলমানদের মধ্যে ঢিলা ও সাঁটা দুইরকমের পাজামারই ব্যবহার আছে। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পাজামার কোন পার্থক্য নাই, কেবল কাপড়ের নক্সা ও রঙের পার্থক্য আছে। পুরুষরা গায়ে কামিজ দিয়া তাহার উপর জ্যাকেট বা বাণ্ডি পরে, মেয়েরা শাড়ির নিচে ছোট বডিস পরিয়া থাকে, 'চোলি' বলা হয়। পাঞ্জাবে খুব ভাল খেস, পাগড়ি ও লুঙ্গি তৈরী হয়। উত্তরপ্রদেশে বারাণসী ফৈজাবাদ জৌনপুর মির্জাপুর আগ্রা আলিগড় প্রভৃতি অঞ্চল তঞ্জেব, কানাওয়েজ, নাখুনা প্রভৃতি বিশিষ্ট ধরনের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। মধ্যপ্রদেশে ধুতিশাড়ি খুব ভাল তৈরী হয়। বিহার উড়িষ্যা বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ধুতিশাড়ির প্রচলন খুব বেশী। উত্তরভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ধুতির প্রচলন থাকিলেও তাহা পরিধানের ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। বাঙালীর ধুতি পরা এবং বিহারী বা মাড়ওয়ারীর ধুতি পরা এক নহে। মেয়েদের শাড়ি পরার ধরন উত্তরভারতে প্রায় একরকম, কেবল আসামীদের একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

দক্ষিণভারতে অন্ধ্র মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে শাড়ি পরার ভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে, মালকোঁচার ভঙ্গিতে। কিন্তু দক্ষিণে সর্বত্র ও সকল শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে ইহা প্রচলিত নহে, ক্রমে ইহা উঠিয়াও যাইতেছে। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত শাড়ির অঙ্গসজ্জায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, যেখানে যেটুকু ছিল তাহাও আধুনিকতার টানে এক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণভারতের পুরুষদের মধ্যে ধুতির বদলে সাধারণত লুঙ্গির প্রচলন বেশী। পুরা বহরের ধুতির বদলে অর্ধেক বহরের (৫ হাত) কাপড় লুঙ্গির মতো ভাঁজ করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়।

সুতির কাপড় ছাড়া রেশমের নানারকম কাপড় উত্তর ও দক্ষিণভারতে সর্বত্র তৈরী হয় এবং তাহার প্রচলনও যথেষ্ট আছে। আসামে, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় ও ছোটনাগপুরে রেশমের চাষ হয় এবং উৎকৃষ্ট রেশমের কাপড় তৈরী



রাজস্থানী। উত্তরপ্রদেশী। বিহারী



ভারতীয় নারীর বেশ : রাজস্থান। উত্তরপ্রদেশ। মারাঠা

হয়। উত্তরপ্রদেশে দেরাদুন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-মির্জাপুরে রেশম উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে কাংড়া অঞ্চলে ও কাশ্মীরে রেশমশিল্প খুব উন্নত। মধ্যপ্রদেশে তসর প্রচুর হয়। বোম্বাই ও মহীশূর বহুকাল হইতে রেশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত। রেশমের শাড়ির চাদর ও কাপড যে কতরকমের উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা করিয়া



পাঞ্জাবী পুরুষ ও নারী

শেষ করা যায় না। আমেদাবাদ বারাণসী মুর্শিদাবাদ সুরাট কাথিয়াওয়াড় ঔরঙ্গাবাদ তাঞ্জোর ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে সোনালী ব্রকেডের কিংখাব, জামদানী, বুটিদার, মশরু, গুলবদন, পাটোলা, ফুলিয়া ইত্যাদি নানারকমের রেশমের কাপড় তৈরী হয়। এগুলি অবশ্যই দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নহে, রুচি সৌন্দর্যবোধ ও বিলাসের বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য।

এতক্ষণ বেশভূষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল। এইবার আরও একটু নির্দিষ্টভাবে, স্থানীয় নামসহ, ভারতীয় বেশভূষার বিবরণ দেওয়া হইতেছে :

কাছামুক্ত ও কাছাযুক্ত বস্ত্র। কাছাযুক্ত বস্ত্র বা ধুতি পরার রীতি এই সকল অঞ্চলে প্রচলিত আছে দেখা দেখা যায়—আসাম বাংলা বিহার উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র মহীশূর গুজরাট (পূর্ব ও উত্তরাংশ) পাঞ্জাব (দক্ষিণাংশ) মধ্যপ্রদেশ হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশ। অবশ্য এই কাছাযুক্ত ধুতি পরার রীতির মধ্যে অঞ্চলভেদ পার্থক্য আছে, যেমন কোথাও সুন্দর পাট করিয়া কাছা দিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া ধুতি পরা হয়, কোথাও কাছা পাকাইয়া কোঁচার কাপড় কোমরের বেড় দিয়া বাঁধা হয়, কোথাও বা মাল-কোঁচা দেওয়া হয়। প্রথম রীতি বাংলাদেশ আসাম উড়িষ্যা প্রদেশে উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রীতি বিহার উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে অধিক দেখা যায়।

কাছামুক্ত বস্ত্রকে সাধারণ ভাষায় লুঙ্গি বলা হয়। তামিল ভাষায় ইহাকে 'বেষ্টি' বলে ('বেষ্টন' শব্দ হইতে) এবং মালয়ালমে বলে 'মুণ্ডু'। দক্ষিণভারতে সাধারণত পুরুষেরা কাছামুক্ত ধুতি বা লুঙ্গি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তামিল ব্রাহ্মণেরা বিবাহ হইলে কাছা দিয়া কাপড় পরিয়া থাকেন, অবিবাহিতদের কাছাযুক্ত কাপড় পরা নিষিদ্ধ। পাঞ্জাবেও কাছামুক্ত বেষ্টি পরিবার রীতি আছে, কিন্তু কাঙ্গড়া অঞ্চলে ও দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় ইহার ব্যবহার নাই। রাজস্থানেরও কোন কোন অংশে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পায়জামা। পায়জামার প্রচলন প্রধানত ভারতের দুইটি পৃথক অঞ্চলে বিস্তৃত। প্রথম অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর হিমাচলপ্রদেশ পাঞ্জাব (কাঙ্গড়া লুধিয়ানা পাতিয়ালা প্রভৃতি অঞ্চল) উত্তরপ্রদেশ (আলমোড়া নৈনীতাল গাঢ়ওয়াল দেরাদুন সাহারানপুর মোরাদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল) পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় অঞ্চলটি হইল গুজরাটের সৌরাষ্ট্র কচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চল। তৃতীয় আর-একটি অঞ্চল আছে, তাহা পূর্বভারতে বাংলাদেশের দার্জিলিং জেলা। এখানকার নেপালী ভুটিয়া লেপচা প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে আঁটসাঁট চুড়িদার পায়-জামার প্রচলন আছে। পায়জামা ঢিলা হয়, অতিঢিলা হয় (যেমন সালওয়ার), আঁটসাঁট হয় (যেমন চোস্ত বা যোধপুরী)।

জামা। ঊর্ধ্বাঙ্গের পরিচ্ছদকে জামা বলা যায়। অবশ্য ভারতের প্রায় সর্বত্র ঊর্ধ্বাঙ্গে গায়ের 'চাদর' ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু চাদরকে জামা বলা যায় না। জামার মধ্যে যথেষ্ট রকমভেদ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি :

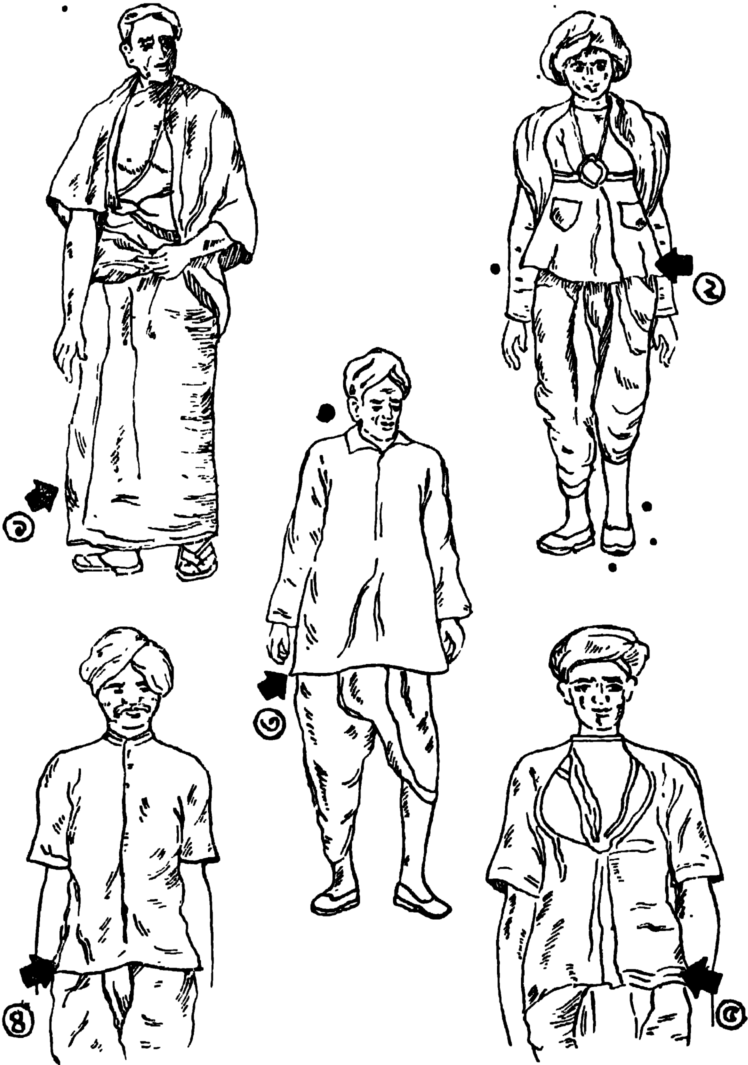
১। দক্ষিণভারতে সাধারণ লোকের মধ্যে জামার পরিবর্তে একখণ্ড চাদরের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া রাখা হয়। ইহা কেরলপ্রদেশেই অধিক প্রচলিত। অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজে জামার চলন থাকিলেও, কাঁধের উপর একখানি কাপড় ঝোলানো থাকে, ইহাকে তামিল ভাষায় 'থুরথুমুণ্ডু' বা 'অঙ্গবস্ত্রম' বলা হয়।

২। ঢিলা পুরাহাতা কলারবিহীন জামাকে 'কুর্তা' বলে। পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশে ইহার প্রচলন আছে। রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ গুজরাট বিহার উড়িষ্যা বাংলা আসাম মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নানারকমের কুর্তার চলন আছে তবে ইহা সমাজের উচ্চ ও মধ্যস্তরের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাজস্থান অঞ্চলে 'কমরী' নামে একরকমের জামা পুরুষেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্বে পশ্চিমভারত অঞ্চলে একরকমের হাতকাটা (আধা-হাতা) গলাখোলা কুর্তা সাধারণ লোকের মধ্যে চলিত ছিল, তাহাকে 'করূজা' বলা হইত। এখন ইহা প্রাশ উঠিয়া যাইতেছে।

৩। 'মিরজাই' বলা হয় কলারবিহীন পুরাহাতা আঁটসাঁট জামাকে। ইহার বোতাম নাই, ফিতা দিয়া বাঁধা হয়। ছোট আধ-হাতা মিরজাইও দরিদ্র লোকেরা পরিয়া থাকে। বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রচলন আছে। গুজরাটে মিরজাইয়ের নাম 'অঙ্গদি' বা 'পাসবন্দী কেডিয়ু 'বলা হয়'। মহারাষ্ট্রে ইহার নাম 'বারবন্দী' রাজস্থানে 'বখতারি'।

নারীর বেশভূষা

পায়জামা, সালওয়ার বা সুতন। জম্মু-কাশ্মীর হিমাচলপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিকাংশ নারীর পোশাক রূপে ইহা প্রচলিত। সুতনের মুহরি সালওয়ার অপেক্ষা সরু ও আঁট হয়।



১। 'মুণ্ডু' পরিহিত কেরল ব্রাহ্মণ ২। 'কমরী'-পরা রাজস্থানী
৩। ধূতি ও কুর্তা-পরা উত্তরপ্রদেশবাসী ৪। 'কবজা' পরা রাজস্থানী
৫। আধহাতা আঙ্গরাখা-পরা রাজস্থানী।

লহঙ্গা বা ঘাগ্‌রা। ইহার প্রচলন রাজস্থান গুজরাট মধ্যপ্রদেশ (উত্তরপূর্বাংশ) ও উত্তরপ্রদেশ (পশ্চিমাংশ) নারীর অন্যমত পরিচ্ছদ। ঘাগ্‌রা দুইরকমের হয়—কুঁচি সেলাই দিয়া অথবা তেকোণা কাপড়ের টুকরা জুড়িয়া সেলাই করিয়া। ঘাগ্‌রার সহিত 'কাঁচুলি' পরা বিধেয়। উত্তর-বিহারে মৈথিলী কুমারী ব্রাহ্মণ মেয়েরা শাড়ি পরে, কিন্তু বিবাহের সময় তাহাদের ঘাগ্‌রা পরিতে হয়। গুজরাটেও এইরকম রীতি আছে। আসামের মেয়েরা 'মেখলা' নামে একরকমের সুন্দর পরিধেয় ব্যবহার করেন, তাহার উপরে জামা এবং চাদর বা 'রিহা' থাকে।

শাড়ি। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে নারীর প্রধান পরিধেয় শাড়ি। অবশ্য যেমন পুরুষদের ধুতি, তেমনি মেয়েদের শাড়ি পরিবার রীতির অঞ্চল-ভেদে পার্থক্য আছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ (কতকাংশ) মহীশূর মাদ্রাজ অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে শাড়ির প্রচলন বেশী। শাড়ির সহিত কোনরকম জামা বা 'ব্লাউজ' পরিবার রীতি পূর্বে এদেশে ছিল না, বিশেষ করিয়া দক্ষিণভারতে ও পূর্বভারতে। ব্রিটিশ আমলে উনবিংশ শতাব্দীতে, অনেক পরে, মেয়েদের মধ্যে জামা পরিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। এখানে সেকালের বেশভূষার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রাচীন পত্রিকা হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি :

> শীতকালে সধবা মেয়েরা এক একখানি ফরাসী ছিটের দোলাই পাইতেন ; সেকালের মেয়েদের কোনও প্রকারের জামা পরিবার রীতি ছিল না। বালক বালিকারা কুর্তা ও ছিটের দোলাই পাইত, তাহাতেই তাহাদিগের আনন্দ উছলিয়া উঠিত। কিন্তু প্রায়ই তাহাদিগকে কুর্তার পরিবর্তে 'গাঁথি' পরান হইত। একখানি কাপড় এমনভাবে গায়ে জড়াইয়া একটিমাত্র বাঁধ দেওয়া হইত যাহাতে সেটি জামার মত হইত, এবং সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিত। তাহারই নাম 'গাঁথি'। তখনকার মেয়েরা সকলেই গাঁথি করিতে জানিতেন ; এখনকার মেয়েরা নামও জানেন না। পুরুষদিগের মধ্যে আঙ্গরাখার ব্যবহার ছিল। আঙ্গারাখা আর কিছুই নয়, চাপকানের নীচের অংশ কাটিয়া ফেলিলেই আঙ্গরাখা হয়।* মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কাপড়ের বাঁধ দেওয়া আঙ্গরাখা গায়ে দিতেন ;

*রাজস্থানী আঙ্গরাখার চিত্র দ্রষ্টব্য, ৫৩ পৃষ্ঠা ৫ নম্বর।

বড়লোকের আঙ্গরাখার বোতাম থাকিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কোনরূপ জামা ব্যবহার করিতেন না। তুলাভরা জামা ও তুলাভরা টুপীরও ব্যবহার ছিল। অবস্থানুসারে কেহ দোহর ও কেহ গ্রাম্য তাঁতির প্রস্তুতি ডবল তিহাতি কাপড় গায়ের উপর জড়াইয়া দিত। চওড়া মগজি হইলে দোলাই হয়, সূক্ষ্ম মগজি হইলে দোহর হয়। পুরুষ গায়ে দোলাই দিত না। কাল ও লাল বনাতেরও খুব ব্যবহার ছিল। বড়লোকেরা সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যের কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতেন; অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও সময়ে সময়ে শাল ব্যবহারের রীতি ছিল। পায়ে



দক্ষিণ ভারতের আয়ার রমণীর শাড়ির সম্মুখ ও পিছন

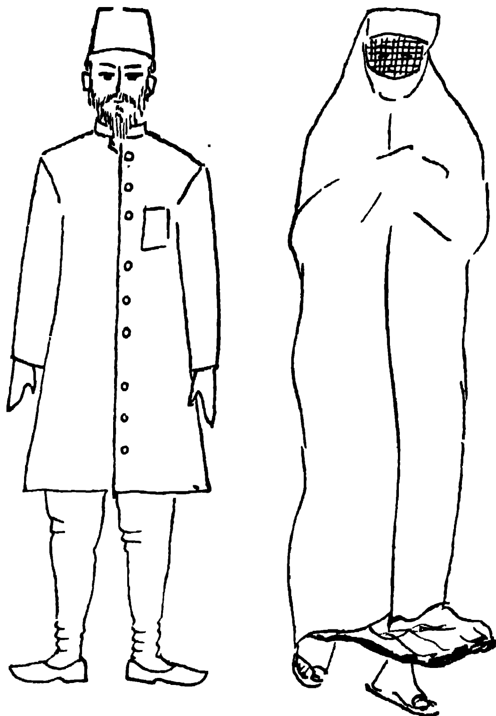
মোজা কাহারও দেখিয়াছি মনে হয় না। সেকালে শীতবস্ত্রের এত আড়ম্বর ছিল না; সেকালের লোকে অনেক সময়েই ধুতির কোঁচা গায়ে দিয়া শীত কাটাইত। প্রবাদ আছে, যত কাপড়, তত শীত।*

যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিত সেকালের পরিচ্ছদের এই বিবরণ হইতে অনেক বিষয় জানা যায় এবং পরিস্কার বোঝা যায় যে মেয়ে-পুরুষ কাহারও মধ্যে জামার প্রচলন বিশেষ ছিল না, বরং চাদরের প্রচলন ছিল।

শাড়ি পরার রীতি, কাছা-দেওয়া ও কাছা না-দেওয়া। কাছা দিয়া শাড়ি পরার রীতি প্রধানত দক্ষিণভারতে এবং মধ্যভারতের কতকাংশে প্রচলিত আছে। মধ্যপ্রদেশে মান্দলা জব্বলপুর ও সাগর জেলায় কাছা

* সাহিত্য, কার্তিক ১৩২০ সাল: 'সেকালের কথা'—যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

দিয়া শাড়ি পরার চলন আছে। রায়পুর বিলাসপুর রায়গড় ইন্দোর অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকেরা কাছা দিয়া শাড়ি পরেন না, কেবল নিম্নবর্ণের মধ্যে ইহার প্রচলন আছে। **মাদ্রাজ মহীশূর** (কুর্গ জেলা বাদে) ও **অন্ধ্রপ্রদেশের** অধিকাংশ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ মহিলাদের মধ্যে কাছার চলন আছে, অন্যদের মধ্যে নাই। **কেরলে** ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মধ্যে কাছার চলন আছে। তামিল ভাষায় কাছা-দিয়া শাড়ি পরাকে 'মডিসারু' বলা হয়। কেরলে নাম্বুদ্রি মেনন ও নায়ারদের মধ্যে কাছা-দিয়া শাড়ি

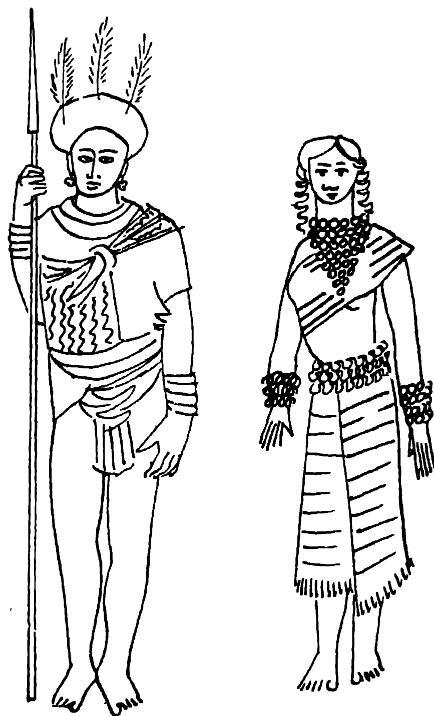


উত্তরভারতের মুসলমান পুরুষ ও নারী

পরার রীতি অন্যান্য প্রদেশ হইতে ভিন্ন। পাঁচ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়াইয়া পায়ের মধ্যে দিয়া কৌপীনের মতো বাঁধা হয়, তাহারি উপরে পাঁচ-ছয় হাত একখানি শাড়ি পরার ফলে ভিতরের কাছা একেবারে ঢাকিয়া যায়।

ভারতের আদিবাসী ও উপজাতিদের পোশাক। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতিদের পোশাকের সরল সমারোহ ও

বৈচিত্র্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা ছাড়াও সৌন্দর্যবোধ বেশভূষার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মণিপুর দার্জিলিং ত্রিপুরা ও নাগা অঞ্চলের লোকজন, ছোটনাগপুর উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশে কোল ভিল ওরাঁও মুণ্ডা সাঁওতাল, আলমোড়ার ভোট, দক্ষিণের চেঞ্চু টোডা প্রভৃতি বিভিন্ন আদিবাসীদের পোশাকের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। পোশাকের উপাদান যে মূল্যমান তাহা নহে, তাহার নানারঙের নক্সা বা ডিজাইন শিল্পরুচিবোধের চমৎকার নিদর্শন। মোটা সূতার মোটা কাপড় ভাঁজ করিয়া পরিবার জন্য বা গায়ে জড়াইবার জন্য বোনা হয়, কিন্তু তাহার উপর উজ্জ্বল রঙের ডিজাইন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামান্য ঝাড়ন, চাদর ও গামছাটির মধ্যেও আদিবাসীদের শিল্পরুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।



ভারতের নাগা পুরুষ ও নারী

বেশভূষা, সমাজ ও সৌন্দর্যবোধ

পৃথিবীর সকল দেশের মতো ভারতের পোশাক-পরিচ্ছদেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বা রাজপুতানার

মরুভূমি অঞ্চলের লোকের পোশাকের সহিত গঙ্গা-যমুনা বা কৃষ্ণা-কাবেরীর উপত্যকা অঞ্চলের পোশাকের পার্থক্য কিছুটা থাকিবেই। পোশাকের সমস্ত উপাদানও সর্বত্র পাওয়া যায় না এবং কতকটা তাহার জন্যও স্থানীয় লোকের পোশাকের পার্থক্য ঘটে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক প্রভাব প্রাথমিক প্রভাব মাত্র। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া প্রাকৃতিক কারণে পোশাকের বৈচিত্র্য এদেশে খুব বেশী দেখা যায় না। যে-বৈচিত্র্য দেখা যায় তাহা কতকটা উপাদানের জন্য এবং কতকটা সামাজিক আচারপ্রথা ও আঞ্চলিক শিল্পরুচিবোধের বিশেষত্বের জন্য। ভারতের আদিবাসীদের পোশাকের বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। নাগা খাসিয়া সাঁওতাল মুণ্ডা গণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন উপজাতিদের পোশাক দেখিলে তাহা আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

পোশাকের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে মতভেদ আছে সেকথা আগে বলিয়াছি। কিন্তু মতভেদ থাকিলেও সৌন্দর্যবোধ যে পোশাকের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ তাহা সকলেই প্রায় কমবেশী স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু যদি আত্মরক্ষা বা লজ্জানিবারণ পোশাক পরিধানের প্রধান কারণ হইত তাহা হইলে বল্কল, লতাগুল্ম, পশুর লোম ও চামড়া অথবা সাদামাটা সূতির ও পশমের বস্ত্র পরিয়া মানুষের প্রয়োজন মিটিয়া যাইত। ভারতবাসীরাও তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে শুধু ধুতি, চাদর ও শাড়ি এবং শীতকালে উলের কম্বল ও চাদর ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করিত না। কিন্তু পোশাক যদি আদিকালে নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উদ্‌ভাবিত হইয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার বিস্তার ও বৈচিত্র্য যে সৌন্দর্যবোধ ও সামাজিক প্রথার প্রভাবের ফলেই সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৌন্দর্য্যবোধের জন্য পোশাকের ফ্যাশান বদলায়

প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে যুগে যুগে পোশাকের পরিবর্তন হইয়াছে। কেন হইয়াছে? যুগে যুগে কি প্রাকৃতিক আবহাওয়া বদলাইয়াছে? রোমান যুগে ইউরোপের যে আবহাওয়া ছিল, এখন কি তাহা নাই? ভিক্টোরিয়ার আমলের ইংলণ্ড ও আধুনিক ইংলণ্ডের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের তফাৎ কোথায়? বহু যুগ অন্তর হয়ত আবহাওয়ার কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তন হইতে পারে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে সিন্ধুপ্রদেশে হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক

সিন্ধুসভ্যতার যুগে সিন্ধু অঞ্চলের আবহাওয়া এখানকার মতো শুকনো মরুভূমির মতো ছিল না, জলাজঙ্গল ছিল এবং বৃষ্টিপাতও বেশ হইত। ক্রমে এই আবহাওয়ার পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত আমাদের প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। যুগে যুগে কোন দেশের আবহাওয়া বদলায় না, বদলাইতে পারে না, অথচ পোশাকের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। কেন হয়? যুগে যুগে পোশাকের স্টাইল ও ফ্যাশানের পরিবর্তন হয়, কারণ যুগে যুগে মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, এমন কি সম্ভ্রমবোধ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবোধ পর্যন্ত বদলাইয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য পোশাকের স্টাইলের পরিবর্তন হয় না। পোশাকের উপর রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের প্রভাব যে কত গভীর তাহা পোশাকের পরিবর্তনশীল স্টাইল ও ফ্যাশান হইতে বোঝা যায়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহা আরও পরিষ্কার বোঝা যাইবে। ইংরেজদের পোশাকের কথাই ধরা যাক। ইংরেজদের পোশাকের দৃষ্টান্ত দিবার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে ও এসিয়ার অন্যান্য দেশে এবং আফ্রিকায় আধুনিক যুগে ইউরোপীয় পোশাকের প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে, বিশেষ করিয়া পুরুষদের মধ্যে। ইহার প্রধান কারণ, ইউরোপীয় পোশাকের কর্মোপযোগিতা। অথচ এই ইউরোপীয় পোশাকই অতীতে এত স্মার্ট ছিল না। যুগে যুগে ইহার পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিবার মতো :

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে প্রাচীন গ্রীকরা বিশাল চওড়া একটি পশমের চাদর সর্বাঙ্গের আবরণরূপে ব্যবহার করিত, কেহ কেহ ইহার নিচে চোঙ্গের মতো লিনেনের অন্তর্বাস পরিত। মেয়েরাও এই পোশাক ব্যবহার করিত, কেবল তাহা গায়ে ভাঁজ করিয়া জড়াইয়া রাখার রীতি ছিল অন্যরকম।

রোমানযুগে একরকম সার্টের ব্যবহার দেখা যায় এবং তাহার সহিত আস্তিনওয়ালা গাউনের। এই গাউন নানা আকারের ছিল। প্রাবরণ বা ক্লোক, জ্যাকেট ও ব্রীচ বা জানুর নিচে বাঁধা একরকমের পাজামাও এইসময় ব্যবহার করা হইত।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে মানুষের দেহের মাপ ও গড়ন অনুযায়ী তৈরী পোশাকের ধীরে ধীরে প্রচলন হইতে থাকে। তাহার আগেকার কালের পোশাক অধিকাংশই ছিল ঢিলেঢালা, দেহের উপরে তো বটেই, কাঁধ ও হাতের উপরেও আলগা আস্তিনে তাহা ঢাকা থাকিত। আস্তিন-

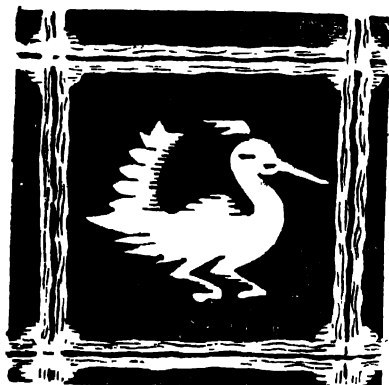
হীন ঢিলা আবরণও নানারকমের ছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপজোক করিয়া পোশাকের ছাঁটকাটের তখন প্রয়োজন হইত না। মাত্র ৭০০-৮০০ বছর আগে ইহার প্রয়োজন ইউরোপীয় পোশাকে প্রথম দেখা দিতে থাকে। সার্ট ও অন্যান্য পোশাকের চেহারা ক্রমে বদলাইতে আরম্ভ করে, দেহের সহিত পোশাকের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা চলিতে থাকে।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে দেখা যায় যে, দেহের সহিত পোশাকের এই সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে নানারকমের ফিটফাট সুসমঞ্জস পোশাকের বিকাশ হইয়াছে—যেমন আঁটসাঁট জ্যাকেট, হুড্‌বিশিষ্ট খর্বাকৃতি ক্লোক, বোতামআঁটা সার্ট ও জামা, কোমরবন্ধ, টাইট্‌ ব্রীচ ইত্যাদি। পোশাকের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য এইসময় হইতে সূক্ষ্ম সূচীশিল্পেরও প্রচলন হইতে থাকে।

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পোশাকেরই বিচিত্র হেরফের দেখিতে পাওয়া যায়। লম্বা বুকখোলা কোট বা ফ্রক-কোট, তাহার ভিতরে ছোট ওয়েস্টকোট, পরনে ব্রীচের মতো টাইট ট্রাউজার, নাতিদীর্ঘ পরচুলা, মেয়েদের নানাবিধ স্টাইলের গাউন, ফ্রক ইত্যাদি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পোশাকের বৈশিষ্ট্য।

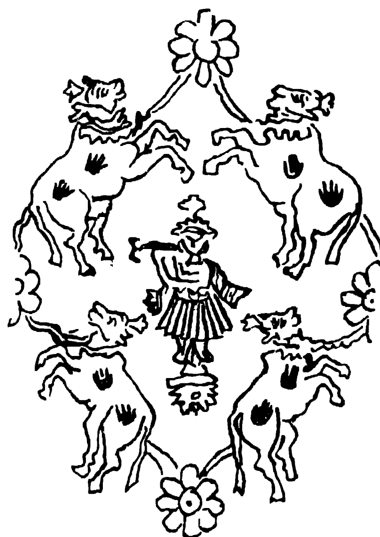
বিংশ শতাব্দীতে এই পোশাকের আমূল পরিবর্তন হইতে থাকে। আজ আমরা ইউরোপীযদের যে পোষাক দেখিতে পাই, খুব বেশী হইলে তাহার বিকাশ হইযাছে গত ৬০-৭০ বছরের মধ্যে। এই বিকাশের মধ্যে কয়েকটি পোশাকের বিলুপ্তি বিশেষভাবে চোখে পড়ে—যেমন ওয়েস্টকোট, লম্বা কোট বা ফ্রক-কোট, পরচুলা, মেয়েদের ফোলানো-ফাঁপানো বিপুলাকার গাউন ইত্যাদি। অনেকটা অনাবশ্যক বাহুল্যের জন্য, কর্মোপযোগিতার অভাবের জন্য এবং রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তনের জন্য এই ইউরোপীয় পোশাকগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে।

ভারতীয় পোশাকের ইতিহাসেও যুগে যুগে এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পোশাকের কোন পরিবর্তন হয় নাই ভারতবর্ষে, ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গৃহীর পোশাকের বেশ পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্তন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে যতখানি চোখে পড়ে, ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে ততখানি চোখে পড়ে না। তাহার কারণ দুইটি।









শাড়ির নক্‌শা

উপরে : পৈঠান (মহারাষ্ট্র), পাটোলা (গুজরাট)

নিচে : চান্দেরী (মধ্যপ্রদেশ), বাণারসী ব্রকেড

প্রথম ও প্রধান কারণ, ভারতের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান খুবই অনুন্নত এবং তাহাদের মধ্যে দারিদ্র্যও অত্যন্ত প্রকট। দরিদ্র লোকের পোশাকের বাহুল্য বা বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না। তাই সাধারণ ভারতবাসীর পোশাকের খুব যে একটা বড় পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু ভদ্রলোকশ্রেণীর পোশাকের পরিবর্তন যুগে যুগে লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দুযুগে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা চাদর ও কামিজ-জাতীয় কোন ঢিলা আবরণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া মনে হয়। ইহা রেশমের আবরণ বা স্বর্ণখচিত আবরণ হইলেও কামিজ বা বেনিয়ান-ফতুয়া ধরনের পোশাক ছাড়া আর অন্য কোন ধরনের পোশাকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানযুগে কামিজের কাটছাঁট ও চেহারার পরিবর্তন হইল, সূচীশিল্পের কারুকার্যও তাহার সহিত যুক্ত হইল। হিন্দুদের কামিজ আর মুসলমানদের কামিজ এক বস্তু নহে। ধুতির বদলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ক্রমে নানারকমের পাজামা ও চাপকান ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পাজামা ও চাপকানের প্রচলন উত্তরভারতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে এত বেশীমাত্রায় হইযাছিল যে, ষোড়শ শতাব্দীতে গুরু নানক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, পোশাকের দিক হইতে হিন্দুদের হিন্দুত্ব বজায় রাখা আর বোধ হয় সম্ভব হইল না। বার্লিন মিউজিয়ামে সম্রাট জাহাঙ্গীরের যে অ্যালবাম রক্ষিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, কচ্ছ ও নবনগরের হিন্দু শাসকরা পর্যন্ত মোগলদের পোশাক ব্যবহার করিতেন। মানসিংহের সময় হইতে রাজপুত শাসকদের পোশাকেও মুসলমানী পোশাকের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পোশাকের মধ্যে প্রধান হইতেছে পাজামা ও চাপকান।

ব্রিটিশ আমলে এই পাজামা-চাপকানের প্রচলন সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশ্য সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন হিন্দুদের বাহিরে ইহার বিশেষ প্রচলন হয় নাই। যেখানে পাজামার প্রচলন বেশী হয় নাই, সেখানে চাপকানের ব্যবহার করা হইয়াছে ধুতির সহিত। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের পোশাক প্রধানত ছিল পাজামা-চাপকান-পাগড়ি, অথবা ধুতি-চাপকান-পাগড়ি। যাঁহারা চাপকান ব্যবহার করিতেন না, হিন্দুত্বের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিলেন, তাঁহারা বেনিয়ান-ফতুয়া ও চাদর ব্যবহার করিতেন, পায়ে এদেশী চটি থাকিত। উনবিংশ শতাব্দীতে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বাঙালীর এই দুই-

রকম পোশাকের নমুনা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি পাশাপাশি দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। রামমোহনের পোশাকে মোগল পোশাকের প্রভাব সুস্পষ্ট, বিদ্যাসাগরের পোশাকে দেশীয় হিন্দু ঐতিহ্য পরিস্ফুট। রামমোহন ও তাঁহার পরিবার এদেশের নবাব-দরবারের সহিত কাজকর্মের সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহার পোশাকে ও আদবকায়দায় মুসলমানী নীতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিদ্যাসাগর মানুষ হইয়াছিলেন স্বল্পবিত্ত গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে, তাই তাঁহার পোশাকে অথবা আচারে নবাবী আমলের কোন ছাপ পড়ে নাই।

ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসিবার পরেও দীর্ঘদিন বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের একশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানী পোশাকের প্রভাব স্থায়ী হইয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য ইউরোপীয় পোশাকের প্রভাব তাহার উপর বিশেষ পড়ে নাই। শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ভারতীয়দের পোশাকে ইউরোপের পোশাকের প্রভাব স্পষ্টরূপে বিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছে। ইহার ইতিহাস পঞ্চাশ বছরের খুব বেশী নহে।

পোশাকের এই স্টাইল ও ফ্যাশানের পরিবর্তনের ধারা হইতে তাহা হইলে আমরা কি সিদ্ধান্ত করিতে পারি? প্রত্যেক দেশে যুগে যুগে পোশাকের যে ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব খুব সামান্যই আছে, প্রায় নাই বলিলেই হয়। পরিবর্তনের কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথম কারণ, যুগে যুগে মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও প্রয়োজনবোধের পরিবর্তন হয় বলিয়া পোশাকেরও পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয় কারণ, বিদেশী জাতির সংস্পর্শে আসিবার ফলেও অনেক সময় তাহাদের পোশাকের প্রভাব দেশীয় বা স্থানীয় পোশাকের উপর পড়ে। মানবসংস্কৃতির একটি বড় উপাদান পোশাক। অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের মতো পোশাকও একদেশ হইতে অন্যদেশে ছড়াইয়া পড়ে। এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় পোশাকের বিস্তার হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

মরুবাসীর পোশাক

পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ মরুবাসী বলা যায় বেদুইনদের। আসল বেদুইনদের জীবনযাত্রা এখনও দেখা যায় সাহারার অভ্যন্তরে দক্ষিণ-আরবে রাব-অল-খলি মরুভূমিতে। মরুর জীবনের সহিত বেদুইনদের জীবনও যেন একতারে

একসুরে বাঁধা। মরুভূমির বুকের উপর বীরদর্পে তাহারা যাযাবরের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, মরুদ্যানের আশেপাশে ছাগল-ভেড়া-উটের চামড়ার তাঁবু খাটাইয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষণিকের বসতি স্থাপন করে। তারপর আবার তাঁবু গুটাইয়া মরুভূমির দিগন্তবিস্তৃত বালুকা-সমুদ্রে 'মরুপোত' উটের পিঠে চড়িয়া পাড়ি দেয়।

বেদুইনদের পোশাক অতি সুন্দর। জাতীয় পোশাক হইল 'আব্বা', উটের লোম দিয়া তৈরী ঢিলাঢালা একরকমের আলখাল্লা বিশেষ। তাহার



বেদুইন পুরুষ ও মেয়ে

উপর নানারঙের 'স্ট্রাইপ' বা দাগ টানা থাকে, রঙ না থাকিলে সাদা-কালো ডোরা থাকে। আব্বার তলায় থাকে গা-সাঁটা ছোট কোর্তা, রেশম বা তুলার তৈরী। ঢিলা আব্বা কোমরে বেল্ট বা কোমরবন্ধ দিয়া বাঁধা থাকে। মাথার পোশাকটি আরও সুন্দর। আমাদের দেশে ভারতবর্ষে যেভাবে মাথায় পাগড়ি বাঁধা হয়, সেইভাবে বেদুইনরা পাগড়ি বাঁধে না। রঙিন ডোরা-কাটা রেশম বা সুতির কাপড় মাথায় ডবল-ভাঁজ করিয়া এমনভাবে জড়ানো হয় যাহাতে মাথার দুইপাশে কানের উপর দিয়া তাহা ঝুলিয়া পড়ে। এই শিরস্ত্রাণের বৈশিষ্ট্য হইল, একগোছা পাকানো উটের লোম মাথার উপর

হইতে চারিদিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ঝালরের মতো চোখের সামনে এই লোমগুচ্ছ ঝুলিতে থাকে বলিয়া রৌদ্রতাপদগ্ধ বালির হল্‌কা চোখে লাগে না, চকচকে বালির দিকে চাহিলে চোখ ধাঁধায় না, ছায়ায় চোখ ঢাকা থাকে।

বেদুইন মেয়েদের পোশাকে রঙের বৈচিত্র্য হয়ত একটু বেশী থাকে, আর গা আগাগোড়া চমৎকার রঙিন ঢলঢলে আব্বা দিয়া ঢাকা থাকে। মাথার বসন পুরুষদের মতো নহে, লাল নীল বা হলুদ রঙের বড় একটি রুমাল মাথায় বাঁধা থাকে। কখন ফেটির মতো করিয়া কপালের উপর দিয়া বাঁধা হয়, কখন বা পুরা মাথা ঢাকিয়া জড়ানো হয়। মধ্যে মধ্যে বড় রঙিন কাপড় পাগড়ির মতো করিয়া যখন বেদুইন মেয়েরা মাথায় বাঁধে তখন তাহার খানিকটা অংশ পিঠের উপর বেণীর মতো ঝুলিতে থাকে, পুরুষদের মতো কানের দুইপাশে ঝোলে না। বেদুইন শিশুদের মাথাতেও রঙিন কাপড় বাঁধা থাকে।

সাহারা অঞ্চলে বেদুইনরা ছাড়াও আরএকশ্রেণীর মরুবাসী আছে তাহাদের 'তুয়ারেগ' বলে। স্থানীয় ভাষায় 'তুয়ারেগ' কথায় অর্থ হইল 'অবগুণ্ঠনে আবৃত'। মুসলমান মেয়েদের 'বোরখার' মতো দেখিতে। মরু অঞ্চলের উড়ন্ত ধুলাবালি হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই অবগুণ্ঠন মরুবাসীদের একান্ত আবশ্যক।

বেদুইন ও তুয়ারেগদের এই বেশভূষায় পরিবেশের প্রভাব প্রত্যক্ষ। যেমন পুরুষদের মাথায় পাগড়ির চারিদিকে উটের লোমের চোখ-ঢাকা ঝালরটি মনে হয় মরু-পরিবেশের প্রয়োজনে অভিনব উদ্‌ভাবন। কিন্তু অন্য উপায়েও চোখ ঢাকার বা ঠাণ্ডা রাখার কাজ চলিতে পারিত, এত সুন্দর করিয়া শিল্পীর মতো শিরস্ত্রাণটিকে রূপ দিবার প্রয়োজন হইত না। আর আব্বা বা মাথার কাপড়ের এত রঙের ও নকশার বৈচিত্র্যই বা কেন? মরুভূমির সহিত তাহার সম্পর্ক কি? চারিদিকের ধূ ধূ সাদা বালির দিকে চাহিয়া চোখ যখন জ্বলিতে থাকে তখন পোশাকের রঙের এই বিচিত্র্যের দিকে চাহিলে হয়ত চোখ ও মন দুইয়েরই তৃপ্তি হয়। মনের ক্ষুধা মেটে, সৌন্দর্যবোধ চরিতার্থ হয়।

নিগ্রোদের পোশাক

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সাধারণ-ভাবে আমরা 'নিগ্রো' বলিয়া থাকি, যদিও জাতিগত বা ভাষাগতভাবে সকলকেই ঠিক 'নিগ্রো' নামে কোন

একজাতির মধ্যে গণ্য করা যায় না। পর্তুগাল, স্পেন, ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে আফ্রিকা এতদিন, কৃষ্ণকায়দের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ ও শ্রম শোষণ করিয়া শ্বেতকায়রা সমৃদ্ধ হইয়াছে। আজ আর আফ্রিকার সেদিন নাই আফ্রিকা মহাদেশ জুড়িয়া আজ সর্বত্র আফ্রিকানদের মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। 'অনুন্নত' আফ্রিকা আর বলিবার উপায় নাই।



আফ্রিকান পুরুষ ও নারী এস্কিমো

তাহা সত্ত্বেও বিরাট মহাদেশ আফ্রিকার সর্বত্র বিভিন্ন নিগ্রোদের মধ্যে সামাজিক আচারপ্রথার, বেশভূষার, বসবাসের, ধ্যানধারণার সংস্কারগত বন্ধন আজও শিথিল হয় নাই। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের একশ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও জীবনযাত্রার প্রভাব পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ নিগ্রোদের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের মোহ আজও প্রবল রহিয়াছে। বিচ্ছিন্ন অনুন্নত নিগ্রোদের সংখ্যাও আফ্রিকাতে অল্প নহে।

জুলু, মাসাই, বুশম্যান, পিগ্‌মি প্রভৃতি বিভিন্ন নিগ্রোরা এখনও ঠিক বর্তমান সভ্যতার আলোকস্পর্শ পায় নাই।

আফ্রিকা মহাদেশের আবহাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো। তাপমাত্রা খুব বেশী বলা চলে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নহে। খানিকটা আবহাওয়ার জন্য, খানিকটা আদিম সরল জীবনযাত্রার জন্য, জুলু বুশম্যান পিগ্‌মি প্রভৃতি উপজাতিদের পোশাক-পরিচ্ছদের কোন বাহুল্য বা বাহ্য আড়ম্বর একেবারে নাই। লজ্জানিবারণের জন্য দেহের যতটুকু অংশে কিছু আচ্ছাদন না দিলে নহে, তাহাই তাহারা দিয়া থাকে। দেহের অধিকাংশ অঙ্গই অনাবৃত নাকে, কোমরে একফালি নেংটি ও মেয়েদের বুকে বাঁধা এক টুকরা কাপড় ছাড়া বিশেষ কিছু থাকে না। কাপড় খুব বেশী থাকিলেও হাঁটুর নিচে নামে না এবং মেয়েরা পরনের কাপড়ের একদিক খালি গায়ের উপর জড়াইরা রাখে, কেহ বা বুকের উপর হইতে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেয়। গাছের ছাল, লতাপাতা, পশুর লোম ইত্যাদি বাঁধিয়া কোমরে ও গলায় ঝুলাইয়া দিলেও অনেকের পরিধানের সমস্যা মিটিয়া যায়। মনে হয় গৈন প্রকৃতির নিষ্ঠুর উত্তাপ ও অপ্রীতিকর গুমোট আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া আফ্রিকার সাধারণ অধিবাসীরা অধিকাংশ অঙ্গ অনাবৃত রাখিতে চাহে।

কিন্তু বস্ত্র বা কাপড়চোপড়ের বাহুল্য না থাকিলেও, নিগ্রোদের বেশভূষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উন্মুক্ত অঙ্গের সজ্জা। বস্ত্র দিয়া রূপচর্চার বাসনা তৃপ্ত হয় না বলিয়া তাহারা অনাবৃত অঙ্গের প্রসাধনে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছে। পুরুষ ও নারী উভয়ের মাথায় কেশের বাহার, বিনুনি ও খোঁপার বৈচিত্র্য যে কত তাহার ঠিক নাই। বস্ত্রের বদলে দেহের উপরে নকশার শোভা (tattoo), মুখে-হাতে-পিঠে-বুকে কোথাও বাদ নাই। প্রসাধনের জিনিসপত্রেরও অভাব নাই। আধুনিক প্রসাধনপটু সভ্য মানুষও তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ডাকিনী-যোগিনী, জাদুকর, ওঝা প্রভৃতিদের বিচিত্র সব মুখোশ, মাথার মুকুট ও ভূষণ, মুখের মেক্‌-আপ, অথবা উৎসব-অনুষ্ঠানের পোশাক দেখিলে মনে হয় না যে, নিগ্রোরা দৈনন্দিন বেশভূষায় এত সরল হইতে পারে। যাহা বস্ত্রে সম্ভব হয় নাই, তাহা অঙ্গে সম্ভব হইয়াছে। মুক্ত অঙ্গের উপর আফ্রিকার অধিবাসীরা তাহাদের বেশভূষার অতৃপ্ত বাসনা ও সৌন্দর্যের পিপাসা মিটাইয়াছে।

ইউরোপীয়দের পোশাক

ইউরোপবাসীদের পোশাকের যে সাদৃশ্য বর্তমানে দেখা যায় পূর্বে তাহা ছিল না। পূর্বে ইউরোপীয়দের মধ্যে নানারকমের বিচিত্র পোশাকের প্রচলন ছিল। পুরুষেরা টাইট বা গা-সাঁটা ব্রিচেস ও ট্রাউজার, টাইট কোর্তার উপর বুকখোলা লম্বা কোট বা ক্লোক পরিত, মাথায় টুপি বা 'হুড' থাকিত, কোমরে থাকিত বেল্ট। রবার্ট ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ও আঠার-উনিশ শতকের অন্যান্য ইংরেজদের ছবি দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। মেয়েদের ফ্রক ও গাউনের ফ্রিল-দেওয়া ফোলানো-ফাঁপানো ঢিলাঢালা ছাঁট ছিল অনেক রকমের, মাথার পোশাকেরও বৈচিত্র্য ছিল। বর্তমানে এই পোশাকের পরিবর্তন হইয়াছে। পুরুষদের ট্রাউজার ও কোট বা ওভারকোট এবং মেয়েদের নাতিদীর্ঘ গাউন ইউরোপের প্রায় সর্বত্র চালু হইয়াছে। সার্ট, বুশ-সার্ট প্রভৃতির ছাঁটও বদলাইয়া গিয়াছে। কর্মমুখর সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে ইউরোপবাসীর পোশাক এখন অনেক স্মার্ট হইয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য নহে। শীতপ্রধান অঞ্চলে ইউরোপে সুতীর পোশাক অপেক্ষা পশমী পোশাকের প্রচলন বেশী। কিন্তু ইউরোপীয় পোশাকের কর্মযোগিতা বেশী বলিয়া ইউরোপের বাহিরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও (ভারতবর্ষেরও) ক্রমে ট্রাউজার-সার্ট ইত্যাদি পুরুষের পোশাকের দ্রুত বিস্তার হইয়াছে।

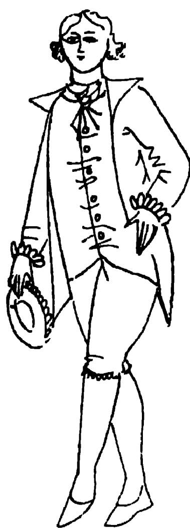
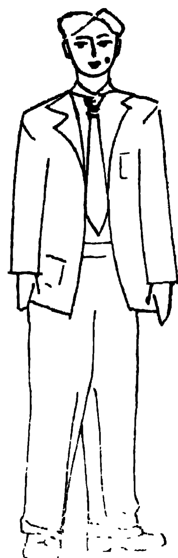
শীতপ্রবল মেরুদেশের পোশাক

মেরুপ্রদেশ বা তুন্দ্রা অঞ্চলে হিমশীতল, মৃদুউষ্ণ গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। মরুদেশে যেমন বেদুইনদের, মেরুদেশে তেমনি এস্কিমোদের প্রকৃত অধিবাসী বলা যায়। বিস্তৃত মেরু অঞ্চল জুড়িয়া বিচ্ছিন্ন-ভাবে এস্কিমোদের বাস, এবং সর্বত্র তাহারা এখন একই অবস্থায় বাস করে না। কিন্তু তবু বেদুইনদের জীবনের সহিত যেমন তপ্ত মরুর জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তেমনি হিমশীতল তুষারাবৃত মেরুর সহিত এস্কিমোদের জীবনও একসুরে বাঁধা রহিয়াছে। পোশাকের উপর প্রকৃতির প্রভাব এখানে খুব বেশী থাকাই স্বাভাবিক, কারণ আবহাওয়া হইতে আত্মরক্ষা করা এখানে জীবনধারণের প্রাথমিক সমস্যা বলা চলে। মেরুপ্রদেশের ভল্লুক, বল্‌গাহরিণ প্রভৃতি পশুর লোম ও চামড়ার পোশাক পরিয়া এস্কিমোদের হিমেল হাওয়ার দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। আপাদমস্তক কোট ও ওভারকোটে

আবৃত, পায়েও তুষারসহিষ্ণু গামবুটের মতো জুতা। পোশাক ও জুতার ভিতরে-বাহিরে দুইদিকেই পশুর লোম থাকে. তাহা না হইলে শীতের প্রকোপ সহ্য করা যায় না।

কিন্তু এই পোশাকেও এস্কিমোরা তাহাদের সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মিটাইবার চেষ্টা করে, কেবল প্রকৃতির প্রয়োজন মিটাইয়া ক্ষান্ত হয় না। সাধারণভাবে পশুর চামড়া ও লোম দিয়া একটি কোট বা ওভারকোট বুনিতে হয়ত দুইদিন সময় লাগে, কিন্তু তাহা করা হয় না। নানারকমের পশুর চামড়া শত শত ছোট টুকরা করিয়া, সেই টুকরাগুলিকে ডিজাইনের মতো সাজাইয়া দুইতিন দিনের বদলে দুইতিন মাস ধরিয়া তাহারা কোট বুনিয়া থাকে। নিজেদের শিল্পরুচিবোধ চরিতার্থ করিবার জন্য জীবিকার কঠোর সংগ্রামের পরেও এই পরিশ্রম করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। চামড়ার উপর নকশা তোলার কাজেও তাহারা খুব দক্ষ। টুকরা সাজাইয়া ডিজাইন করা ছাড়াও দরকার হইলে চামড়া-লোমের জামার উপর নকশা তুলিয়াও তাহারা চোখ ও মনের ক্ষুধা মিটাইয়া থাকে।

উপসংহার। ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের বেশভূষার বিবরণ হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিভিন্ন জাতি-উপজাতির পোশাক-পরিচ্ছদে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাথমিক প্রভাব থাকিলেও, তাহার উপর সামাজিক প্রথার প্রভাব ও মানুষের সৌন্দর্যবোধের প্রভাব অল্প নহে। বরং বেশভূষার বৈচিত্র্যের ক্রমবিকাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ অপেক্ষা মানুষের মনের সৌন্দর্য-পিপাসা বেশী কার্যকর হইয়াছে বলিলে অনেকটা ঠিক বলা হয়। পোশাকের উপাদান কি হইবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কিন্তু পোশাকের ধরন, প্যাটার্ন ও ডিজাইন, স্টাইল ও ফ্যাশান কি হইবে তাহা যুগে যুগে মানুষের রুচিবোধ ও প্রয়োজনবোধের উপর নির্ভর করে। মরুভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের পোশাক এবং সুমেরু অঞ্চলে বা পার্বত্য প্রদেশে যাহারা বাস করে তাহাদের পোশাক যে একরকম হইবে না তাহার প্রধান কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য। কিন্তু এস্কিমোরা যদি ইউরোপীয় ছাঁটের ফারকোট ব্যবহার করে, প্রাকৃতিক কারণে তাহা করিবে না, রুচির পরিবর্তনের জন্য করিবে। অথচ প্রাকৃতিক কারণেই আবার এস্কিমোরা কোনমতেই সূক্ষ্ম কর্পাস সুতার ঢিলা চাপকান বা আব্বা ব্যবহার

ইউরোপীয় পোশাকের পরিবর্তন

ষোড়শ—অষ্টাদশ—বিংশ শতাব্দী





ইউরোপীয় মহিলার পোশাকের পরিবর্তন

ষোড়শ—উনবিংশ—বিংশ শতাব্দী

করিতে পারিবে না, কারণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এই পোশাক পরিয়া জীবনধারণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে পোশাকের ভিন্নতার মূলে রহিয়াছে প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য, কিন্তু যুগে যুগে তাহার যে বিচিত্র পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে মানুষের পরিবর্তনশীল রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ। একদেশের সহিত অন্য-দেশের সান্নিধ্যের ফলেও পোশাক-পরিচ্ছদের এই পরিবর্তন অনেক স্থানে ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে।

QUESTIONS

Group A

1. Give a brief description of clothing worn by people in different parts of India.

2. Is there any influence of natural environment on the clothing of Indian people? Answer with examples.

3. How far social customs and aesthetic factor have influenced the clothing of Indian people? Discuss the question with examples.

4. Estimate the influence of natural environment and aesthetic factors on the clothing of the Desert Lands and the Polar Regions.

5. Why the backward African 'primitives' wear scanty dress? How do they satisfy their aesthetic desire of good dress?

6. Is there any foreign element in the dress of Indian middle-class people? What is that element? Why it is becoming popular?

7. What should be, in your opinion, the national dress of an Indian? Develop your points in the form of a short essay.

8. What factors, environmental or aesthetic, are more important in the changing fashions of dress?

9. The spirit of a country is reflected in the dress of her people. How far it is true in the case of India ?

10. Is there any relation between **Orna** and **Sari ?** How the Indian **Sari** has evolved ?

11. Write a short essay on the evolution of an Indian gentleman's dress through the ages.

12. What are the characteristics of European dress ? What are the causes of the changing fashions in European dress ? Answer with examples.

Group B

Write the name of country and region in the space provided after each dress below :

Abba—
Payjama-chapkan—
Lungi—
Ghagrá-choli—
Furcoat—

I. Correct, where necessary, the following statements:

1. The **Orna** worn by south Indian women developed into **payjama.**
2. **Chapkan** is an important contribution of the Muslims to Indian dress.
3. **Borkha** used by the Muslim women of Western India is also used by women in the Polar regions.
4. **Korta** is a kind of long-coat used by north Indian Muslims.



চতুর্থ প্রকরণ

আমাদের গৃহ

প্রতিপাদ্য। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই এবং তাহার সহিত একটি আশ্রয় বা গৃহও চাই। আশ্রয় না হইলে শুধু মানুষের নহে, কোন জীবেরই জীবন চলে না। মানুষের মতো আর কোন জীব জীবনসংগ্রামের জন্য বাহিরের কোন বস্তু দিয়া হাতিয়ার গড়িতে পারে নাই, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া সংগ্রাম করিয়াছে। একমাত্র মানুষই তাহা পারিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে এবং এত বড় সুসমৃদ্ধ মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে এই বুদ্ধিবলে। কিন্তু পশুপক্ষীর মধ্যেও, মানুষের মতো, গৃহনির্মাণের প্রবৃত্তি আছে দেখা যায়। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকারও বাসা আছে। মৌমাছির মৌচাক আছে, উইপোকার ঢিবি আছে, পাখির নীড় আছে। পাখি যে কত যত্ন করিয়া, সুন্দর করিয়া নীড় বাঁধে তাহা কে না দেখিয়াছে! সারাদিন বাহিরে থাকিয়া খাবার সন্ধান করিয়া পাখি যখন তাহার নীড়ে ফিরিয়া আসে তখন মনে হয় যে নিভৃত একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন প্রাণীমাত্রেরই আছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'There's no place like home'—গৃহের মতো আর কোন স্থান কোথাও নাই। কথাটি সত্য। নিতান্ত নগণ্য কীটেরও আত্মরক্ষার জন্য একটি গর্ত বা আশ্রয় চাই। মানুষের এই আশ্রয়

Unit 4. Shelter—Types of our houses in different parts of India influence of environment (natural and social) on housing—modern developments and problems of housing in India.

A comparative study of housing in India and a few typical countries, e g. Desert Lands, Polar Regions, European counrties and U. S. A., African jungles.

না হইলে একেবারেই চলে না। বাহিরের আবহাওয়া হইতে আত্মরক্ষার জন্য তো বটেই, নিশ্চিন্ত নিরাপদ অবসর ও বিরামের জন্যও মানুষেও নিজের একটি গৃহ থাকার প্রয়োজন।

আদিম মানুষ অসহায়ের মতো প্রকৃতির বুকে একদা যেমন খাদ্যের সন্ধান করিয়াছে, তেমনি প্রচণ্ড ঝড়-জল, বজ্র-বিদ্যুৎ ও ঠাণ্ডা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়ও খুঁজিয়াছে। সভ্যতার আদিমতমকাল হইতেই মানুষ খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রয়োজন যতখানি অনুভব করিয়াছে, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রযোজন ততখানি করে নাই। অবশ্য প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দেহের যে-কোন একটি আচ্ছাদনে অভাব নিশ্চয় তাহারা বোধ করিয়াছে, কিন্তু সেই অভাব প্রথমে আশ্রয়ই অনেকটা মিটাইয়া দিযাছে। খাদ্যের মতো এই আশ্রয় প্রকৃতির বুকেই তাহাদের খুঁজিতে হইয়াছে। পর্বতের গুহা অথবা অরণ্যের কোন স্বাভাবিক ঝোপঝাড় আদিম মানুষের গৃহের প্রয়োজন মিটাইয়াছে। তারপর মানুষ যেখানে যেরকম প্রাকৃতিক উপাদান পাইয়াছ, তাই দিয়া নিজের ঘর বাঁধিতে শিখিয়াছে। এই উপাদান সর্বত্র এক নহে বলিয়া, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী আশ্রয়ের প্রয়োজনও সর্বত্র একরকম হইতে পারে না বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের গৃহও একরকমের হয় নাই।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও গৃহ

প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে নিতান্ত আত্মরক্ষা জন্য গৃহের প্রয়োজন। প্রচণ্ড শীত ও তুষার হইতে, গ্রীষ্মের উত্তাপ, ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাত হইতে মানুষ আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে বাঁচিত না। এই রূঢ় বাস্তব কারণেও গৃহ অবশ্যক। গৃহের মধ্যে যে কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তাহাতে মানুষ স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে। যেখানে ঠাণ্ডা সেখানে গৃহের মধ্যে আগুন জ্বালিয়া তাপসঞ্চার করা হয় এবং বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশের পথ যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ দরজা-জানালা অত্যন্ত কম থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘর এমনভাবে তৈরী করা হয় যাহাতে তাহার ভিতরটি বেশ ঠাণ্ডা থাকে, প্রচুর আলো-হাওয়া ঢুকিতে পারে, ঘরের ছাদ ও দেয়াল উত্তপ্ত না হয়। যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেখানে আর কিছু না হইলেও ঘরের ছাদ সম্বন্ধে খুবই সচেতন থাকা দরকার। ছাদ ঢালু ও খাড়াই না হইলে সেখানে চলিবে না। এইভাবে গৃহে কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করিয়া

মানুষ বাহিরের প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও উপভোগ করিলে পারে।

গৃহনির্মাণের উপাদানকেও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গণ্য করিতে হয়, কারণ প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী নানাস্থানে নানারকম উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদান অনুযায়ী গৃহের গড়নের পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর সর্বত্র গৃহের গডনের উপর উপাদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। গৃহের ছাদ ঢালু ও খাড়াই হইবে, বৃত্তাকার হইবে, না কোণাকার হইবে মাটির হইবে না ইট-পাথরের হইবে, তাহা শুধু আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে না, স্থানীয় উপাদানের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। বনের কাঠ যেখানে প্রচুর পাওয়া যায় সেখানে লোকে কাঠের ঘরবাড়ী তৈরী করিয়া থাকে, যেখানে কাঠের বদলে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায় সেখানে গৃহের যাবতীয় সরঞ্জামে বাঁশই ব্যবহার করা হয় বেশী। দৃষ্টান্ত হিসাবে আসাম ও আমাদের বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আসামের অধিকাংশ ঘরবাড়ী কাঠের, সেখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ ঘরবাড়ী বাঁশের, কারণ বাঁশ পর্যাপ্ত পারমাণে বাংলাদেশে পাওয়া যায়। বাঁশের যে নমনীয়তা আছে, কাঠের তাহা নাই। এইজন্য বাংলাদেশের ঘরবাড়ীর মধ্যে যে নমনীয় সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে, আসামের ঘরবাড়ী দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহার মধ্যে সেই নমনীয় শ্রী থাকে না আসামের গৃহ দেখিতে ঠিক পটের ছবির মতো, কিন্তু তাহা সরলরেখার নানাবিধ বিন্যাসে তৈরী। বাংলাদেশের গৃহ বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার, ও বঙ্কিম রেখান্বিত হইয়া যে অপূর্ব শ্রী ধারণ করে তাহা প্রধানত উপাদানের বৈশিষ্ট্যের জন্য। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহনির্মাণের উপাদানের পার্থক্যের জন্য গৃহের বাহিরের শ্রীর পরিবর্তন হইয়া থাকে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গৃহ ও গৃহনির্মাণের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য যে প্রত্যেক প্রদেশে আছে এবং তাহার বৈচিত্র্য যে খুব বেশী তাহা নহে। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ভারতবর্ষকে ভাগ করিলে সেই অঞ্চলের ঘরবাড়ীর গড়নের একটি বৈশিষ্ট্য আছে দেখা যায়। ইহাকে ঠিক বর্তমান প্রাদেশিক সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ করা

যায় না। কারণ ভারতের প্রদেশবিভাগ প্রশাসনিক বিভাগ, প্রাকৃতিক বিভাগ নহে। প্রাকৃতিক অঞ্চলভেদে কি কারণে ভারতের বাসগৃহের বৈসাদৃশ্য দেখা দিয়াছে তাহা আমরা পরে বুঝিতে পারিব। প্রথমে যথাসম্ভব প্রদেশ অনুযায়ী গৃহের বিবরণ দেওয়া হইবে। বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে পূর্ব-উপকূল ধরিয়া, উড়িষ্যা, অন্ধ্রদেশ ও দ্রাবিড়দেশ পর্যন্ত গিয়া, পশ্চিম-উপকূল ধরিয়া মহারাষ্ট্র গুজরাট হইয়া মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ভিতর দিয়া একেবারে পাঞ্জাবে থামিব। ইহাতে মোটামুটি ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকাংশ অঞ্চলের কথা জানা যাইবে।

বাংলাদেশ। বাংলাদেশে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গৃহের গড়নের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দেখা যায় তাহা প্রথমত উপাদানগত, দ্বিতীয়ত কিছুটা

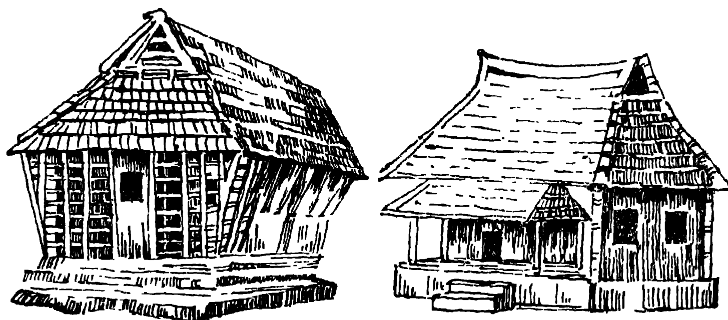


বাংলার ঘর

পরিবেশানুগত এবং তৃতীয়ত আঞ্চলিক কলাকৌশলগত। পূর্ববঙ্গে প্রচুর বাঁশ, ধানের খড়, নারকোলের দড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। আগাগোড়া বাঁশের তৈরী জিনিস দিয়া গৃহনির্মাণ করা পূর্ববঙ্গে সহজসাধ্য, কারণ উপাদানের জন্য আদৌ চিন্তা করিতে হয় না। আরও একটি কারণে এই বাঁশের ঘর পূর্ববঙ্গের নদনদীবহুল অঞ্চলে বিশেষ উপযোগী। নদীর ধারা পরিবর্তন, তীরের ভাঙ্গাগড়া, বর্ষা ও বন্যা ইত্যাদি জন্য অনেক সময় গ্রাম ও বসতিকেন্দ্র দ্রুত স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। বাঁশের ঘর অন্যান্য ঘরের তুলনায় স্থানান্তরিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বাঁশের বেড়ার দেয়াল ও চাল একেবারে খুলিয়া

ফেলাও খুব কঠিন নহে এবং প্রয়োজন হইলে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়াও সম্ভব। পূর্ববঙ্গের যে-সমস্ত অঞ্চলে এই প্রাকৃতিক সমস্যা আছে সেখানে সম্পূর্ণ বাঁশের ঘর তৈরী করার দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী।

পূর্ববঙ্গে বাঁশের বাতা দিয়া বেড়া বুনিয়া ঘরের দেয়াল দেওয়া হয়। কোথাও বাতার সহিত খড় বোনা থাকে, কোথাও তাহার উপর গোবর-মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। ঘর একচালা, দোচালা, চৌচালা বা আটচালাও হইতে পারে। যত চালাই হোক, কাঠের খুঁটি, বাঁশ ও বাতা দিয়া চালের ফ্রেম করিয়া তাহার উপর খড় দিয়া ছাওয়া হয়। চাল কখনও সমতল করিয়া বাঁধা হয় না, খড়ের চাল তাহা হইতেও পারে না, বিশেষ করিয়া যেখানে যথেষ্ট বৃষ্টি হয় সেখানে সমতল খড়ের চাল কয়েকদিনেই বৃষ্টিতে পচিয়া নষ্ট

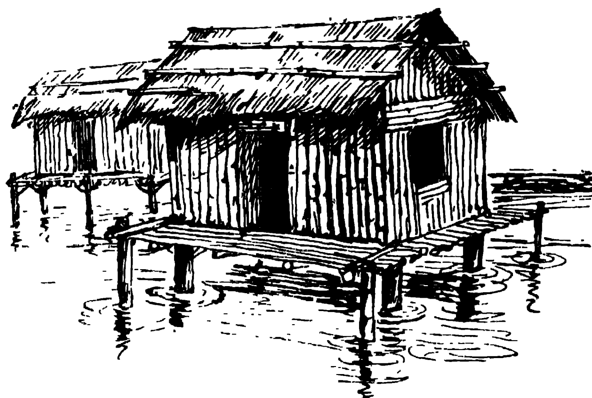


কেরলের গৃহের গড়ন

হইয়া যাইবে। চাল সেইজন্য ঢালু ও খাড়াই হয়, চারিদিকে তাহার দীর্ঘ কোণ থাকে। এই ধরনের চালের উপর জল দাঁড়াইতে পারে না, যত বৃষ্টিই হোক তাহা ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তারপর রৌদ্রে চালের খড় শুকাইতেও বেশী সময় লাগে না। ইহাতে চাল মজবুত থাকে, স্থায়ী হয়, কিছুদিন অন্তর নূতন খড় দিয়া একটু-আধটু সংস্কার করিলে অনেকদিন চলে। ঢালু খড়ের চালের জন্য ঘরের চেহারাও অন্যরকম হয়। চারকোণা ঘরের চারিদিকে চাল প্রসারিত থাকে, বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে ঘরের দেওয়ালগুলি রক্ষা করিবার জন্য। খুব সাধারণ গৃহেরও ঘরের সামনের দিকে একটি বারান্দা থাকে এবং সামনের চালটি খুঁটি দিয়া প্রসারিত করা হয়। প্রয়োজন হইলে ঘরের দুইপাশে ও পিছনেও বারান্দা থাকিতে পারে এবং সেই অনুপাতে চাল বাড়ানো যায়।

ভাঁটি অঞ্চলে, অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে অল্প বৃষ্টি হইলেই জল জমিয়া যায়, জমি অনেক নিচু, সেখানে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর মাচা করিয়া তাহার উপর ঘর তৈরী হয়। এই মাচা-ঘর কেবল বাংলাদেশের ভাঁটি বা জলো অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নহে, পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলের জলাভূমির ঘরের বিশেষত্ব। পূর্ববঙ্গের ভাঁটি অঞ্চলের লোক এই মাচাঘর বাঁধিয়া বাস করিতে এত অভ্যস্ত যে, কলিকাতা শহরের আশেপাশে শহরতলীতে পর্যন্ত বড় বড় নালানর্দমা ও জলাভূমির উপর বাস্তুহারাদের এই ধরনের মাচাঘর অনেক দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গেও সর্বত্র পূর্ববঙ্গের মতো ঢালু ও খাড়াই-চালের ঘর বেশী দেখা যায় এবং একচালা হইতে আটচালা পর্যন্ত নানা আকারের ঘর আছে।



মাচাঘর। জলা ও ভাঁটি অঞ্চলে দেখা যায়

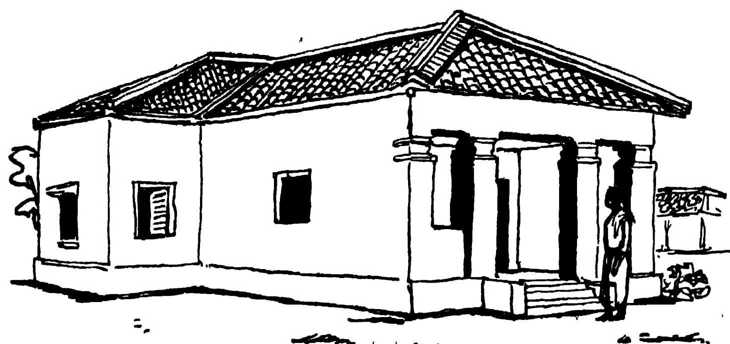
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ঘরের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল—দেয়ালগুলি অধিকাংশই মাটির তৈরী। যত পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তত দেখা যায় যে, এই মাটির দেয়াল ক্রমশ মোটা ও উঁচু হইতেছে। তাহার কারণ; বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সহিত উত্তর-রাঢ়ের (বীরভূম, বাঁকুড়া, উত্তর-মেদিনীপুর, উত্তর-বর্ধমান) প্রাকৃতিক আবহাওয়ার বেশ পার্থক্য আছে। বাংলাদেশ অপেক্ষা বিহার-ছোটনাগপুরের আবহাওয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশী। শুকনো খটখটে আবহাওয়া, আর্দ্রতা অনেক কম, বৃষ্টিপাতও কম এবং তাপ ও শীত বেশী। এইজন্য মাটির দেয়াল বেশ পুরু ও উচু করিয়া গাঁথিবার প্রয়োজন হয়, কারণ তাহাতে তাপনিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বৃষ্টিপাত কম হইলেও

একেবারে নগণ্য নহে। চাল সেইজন্য খাড়াই ও ঢালু। কিন্তু ঢালু হইলেও পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়-অঞ্চলের খড়ের চালের একটি বিশেষত্ব আছে। খাড়াই চাল, খুব পুরু করিয়া খড়-ছাওয়া, চালের প্রত্যেকটি দিক এককোণ হইতে অন্যকোণ পর্যন্ত ধনুকের মতো বাঁকানো। ঘরের চারিদিকে চালগুলি এইভাবে বাঁকানো থাকার ফলে ঘরের ছাঁদ ও শ্রী অন্যপ্রকার হইয়া যায়। তাহার উপর পুরু করিয়া খড় ছাইয়া চালের ধার সুন্দর করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। দেখিতে এত সুন্দর লাগে যে, চোখে না দেখিলে বুঝাইয়া বলা যায় না। বাংলার রাঢ়-অঞ্চলের সুদক্ষ সূত্রধর ও ঘরামিরা একসময় এই ঘরের বাঁকানো চাল তৈরী করিত, বংশানুক্রমে ইহাই তাহাদের পেশা ছিল। এখন এই কারিগরের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে, বহুস্থানে একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাই নিটোল ধনুকের মতো বাঁকানো খড়ের চালের ঘর ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে আর খুব বেশী তৈরী করা সম্ভব হইতেছে না। বাংলার এই বাঁকানো চালাঘরের অনুকরণেই বাংলার দেবালয় ও মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। ইটের তৈরী বাংলা মন্দির দেখিলে মনে হয় যেন এই মাটির ও খড়ের ঘরটিকেই ইটে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

উড়িষ্যা। উড়িষ্যায় মাটির দেয়াল ও খড়ের চালের ঘর বেশী, চাল খাড়াই ও ঢালু, ঘরের আকার চারকোণা। বাংলাদেশের ঘরের সহিত সাদৃশ্য আছে। আবহাওয়া একরকমের বলিয়া ঘরও প্রায় একরকমের। যে-সব অঞ্চলে বাঁশের বদলে কাঠ সহজলভ্য সেখানে গৃহনির্মাণে কাঠই বেশী ব্যবহার করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের কাছাকাছি অঞ্চলে, যেমন গঞ্জাম জেলায়, খোলার চালের ঘরও অনেক দেখা যায়।

অন্ধ্রপ্রদেশ। অন্ধ্রপ্রদেশে বনের দিকে কাঠের খুঁটি ও বাঁশ দিয়া ঘর তৈরী করা হয়। অর্থাৎ যেখানে যে উপাদান বেশী পাওয়া যায় সেখানে গৃহনির্মাণে তাহাই বেশী ব্যবহার করা হয়। ঘরের দেয়াল যে সব সময় কাদা দিয়া লেপা হয় তাহা নহে। কাঠ বা বাঁশের খুঁটির গায়ে বেড়া বাঁধিয়া অথবা ডালপাতা দিয়াও দেয়াল তৈরী করা হয়। তালপাতা, খড় অথবা কাঠের ফ্রেমের উপর পোড়ামাটির খোলা দিয়া ঘরের চাল ছাওয়া হয়। অন্ধ্রের উপকূল অঞ্চলে বৃত্তাকার চালের ঘরও দেখা যায়, বিশেষ

করিয়া আদিবাসীদের মধ্যে। সমভূমি অঞ্চলে বেশীর ভাগ ঘরের দেয়াল মাটির তৈরী।

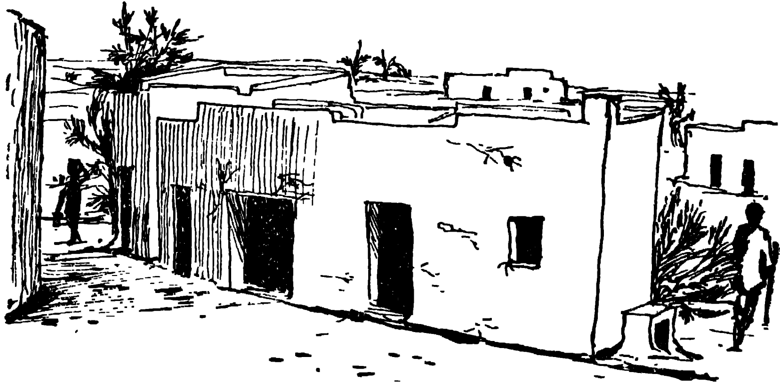


অন্ধ্রের খোলার ঘর

দ্রাবিড়দেশ। দ্রাবিড়দেশে তামিলপ্রধান অঞ্চলে গৃহের গড়ন অনেকটা উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের মতো, আকার চারকোণা, চাল ঢালু। কিন্তু ঘরের চাল বেশীর ভাগ খোলা দিয়া ছাওয়া। দুই-তিন থাক্ করিয়া খোলা সাজাইয়া সিমেণ্ট বা চুন-সুরকি দিয়া গাঁথিয়া চাল ছাওয়া হয়। চালের মধ্যে মধ্যে আগাগোড়া সিমেণ্টের নালা টানা থাকে। আশপাশের কোন বড় বাড়ীর ছাদের উপর হইতে দেখিলে ঠিক শিরদাঁড়ার মতো মনে হয়। বৃষ্টির সময় যাহাতে খোলার কোন ফাঁকে জল জমিতে না পারে অথবা খোলা সরিয়া গিয়া জল না পড়ে এবং দ্রুতবেগে চালের উপর দিয়া বৃষ্টির ধারা গড়াইয়া পড়িতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এইভাবে খোলা সাজানো ও নালা তৈরী করা। ঢালু খোলার চালের জল নিষ্কাশনের ইহা অতি উত্তম কৌশল।

পশ্চিমভারত। পশ্চিমভারতে বেলগাঁও, বিজাপুর, ধারওয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম বলিয়া বেশীর ভাগ ঘরের চাল সমতল বা ফ্ল্যাট। এই সমতল চালে এখানে কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। ঘরের দেয়াল কোথাও পাথর দিয়া তৈরী। স্থানীয় উপাদানের মধ্যে যেখানে

পাথর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে পাথর দিয়াই ঘরের দেয়াল গাঁথা হয়। গুজরাট অঞ্চলে আবহাওয়া অন্যরকম বলিয়া, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ভালই হয় বলিয়া চারকোণা ঢালু খোলার চালের ঘর বেশী দেখা যায়।



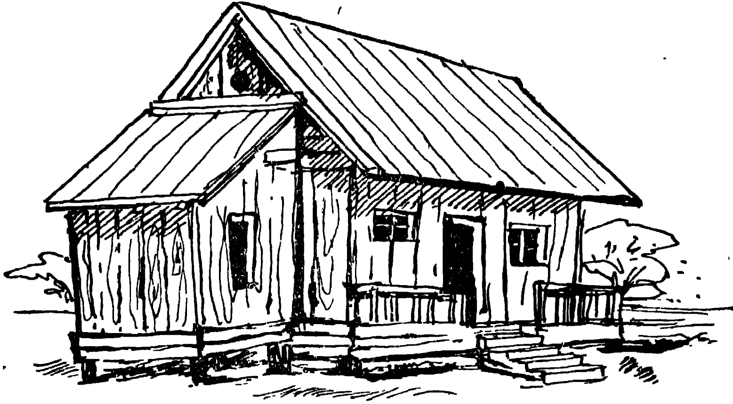
মরুভূমি ও খরা অঞ্চলের সমতল-ছাদের ঘর

বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল। বিহারে, মধ্যপ্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ঢালু চালের ঘরই বেশী দেখা যায়। দেয়াল কাদার তৈরী, তবে চাল বেশীর ভাগই খোলা দিয়া ছাওয়া। খোলা এমনভাবে থরে-থরে সাজানো হয় যাহাতে জল দ্রুত নামিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্ধ্র ও তামিল দেশের মতো চালের উপর পরিষ্কার নালি কাটা থাকে না। এই অঞ্চল প্রধানত মধ্য ও কিছুটা নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এখানে মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত হয় এবং আবহাওয়াও উত্তাপ বা ঠাণ্ডার দিক দিয়া খুব অসহনীয় নহে। সেইজন্য নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চলের গৃহের সহিত এখানকার গৃহের গড়নের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য সাদৃশ্যও প্রধানত ঢালু-চালের, অন্য কিছুর নহে। বিহার ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের ঢালু-চালের খোলার ঘর এবং বাংলাদেশ ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ঢালু-চালের খড়ের ঘর দেখিতে একরকম নহে। বাঁশ, খড় ও মাটির নমনীয়তা ইঁট-কাঠ ও খোলায় থাকিতে পারে না। উপাদানের পার্থক্যের জন্য সাধারণ গৃহের শ্রীও যে কত বদলাইয়া যায় তাহা বাংলা-উড়িষ্যা অঞ্চলের গৃহের পাশে মধ্যভারতের গৃহ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক কম, আবহাওয়া অত্যন্ত শুকনো ও খটখটে, গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে তাপমাত্রার ওঠানামাও খুব বেশী। গ্রীষ্মকালে আগুনের হল্‌কার মতো হাওয়া বহিতে থাকে, শীতকালের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে ফলে এখানকার বসবাসের গৃহের গড়নের সহিত অন্যান্য অঞ্চলের গৃহের গড়নের বিশেষ সাদৃশ্য নাই দেখা যায়। এই অঞ্চলে সাধারণ লোকের গৃহের ছাদ সমতল (flat)। কাঠের তক্তা পাতিয়া তাহার উপর মাটির প্রলেপ দিয়া ঘরের ছাদ তৈরী করা হয় ও ছাদের চারিদিকে মাটির পাড় থাকে, তাহার মধ্যে মধ্যে গর্ত করা থাকে, হঠাৎ জলবৃষ্টি হইলে যাহাতে জল না জমিতে পারে সেই কারণে। ঘরের দেয়াল মাটির, জানালা-দরজাও সংখ্যায় অল্প ও ছোট ছোট। দূর হইতে দেখিলে ঘরগুলিকে ঠিক চারকোণা সিন্দুক বা বাক্সের মতো মনে হয়। এই ধরনের গৃহের গড়ন তাপনিয়ন্ত্রণের পক্ষে খুব ভাল, কারণ গ্রীষ্মকালে ইহা বেশ ঠাণ্ডা থাকে, বাহিরের গরম হাওয়া ভিতরে ঢুকিতে পারে না, এবং শীতকালে ইহা বেশ গরম থাকে, ঠাণ্ডা বসে না অথবা ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে ঢুকিতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও, শুধু ভারতবর্ষে নহে, যেখানে তাপমাত্রা খুব বেশী এবং আবহাওয়া এইরকম শুকনো ও খটখটে, সেখানে এই একই রকমের চারকোণা বাক্সের মতো সমতল-ছাদের গৃহ দেখা যায়। উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্থান, সিন্ধু, বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়া একেবারে ইরান, ইরাক ও আরবদেশ পর্যন্ত এই ধরনের গৃহের বিস্তার দেখা যায়। কিন্তু এদিকে পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয় বলিয়া সেখানে আবার ঢালু-চালের চারকোণা ঘরই বেশী দেখা যায়।

উত্তরপূর্ব ভারত ও আসাম। উত্তরপূর্ব ভারতে ও আসাম অঞ্চলে ঝড়জল খুব বেশী হয়, ঘন ঘন ভূমিকম্পও হয়, বনজ সম্পদ কাঠও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অতএব স্থানীয় উপাদান ও আবহাওয়া দুইদিক হইতেই এই অঞ্চলে কাঠের গৃহ অত্যন্ত উপযোগী ও নিরাপদ আশ্রয়। সেইজন্য কাঠের গৃহই এই অঞ্চলের বড় বৈশিষ্ট্য। মোটা মোটা কাঠের খুঁটি দিয়া অনুচ্চ মাচা করিয়া তাহার উপর ঘর তৈরী করা হয়। চাল অবশ্যই

চালু এবং কোথাও টালি, টিন ও অ্যাসবেস্টস দিয়া, কোথাও বা সম্পূর্ণ কাঠ দিয়াও ছাওয়া হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে গৃহনির্মাণে পাথরও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।



আসামের কাঠের ঘর

ভারতীয় গৃহের গড়ন-বৈচিত্র্য

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহের গড়ন সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে ভারতের কুটীরগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। আয়ত বা চতুরস্র আসনের উপর সমতল ছাদবিশিষ্ট ঘর;

২। আয়ত আসনের উপর চালু ছাদবিশিষ্ট ঘর;

৩। বৃত্তাকার আসনের উপর গোলাকার ছাদবিশিষ্ট ঘর।

এই গৃহের মধ্যে ইট-সিমেণ্টের তৈরী পাকাবাড়ীর বিচার করা হয় নাই। এমনিতেও অঞ্চলভেদে পাকাবাড়ীর গড়নের বৈশিষ্ট্য কিছু দেখা যায় না, সর্বত্রই তাহার গড়ন প্রায় একধরনের। গৃহের গড়নের এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের বসবাসের কুটীরেই দেখা যায়।

সমতল ছাদবিশিষ্ট গৃহ

প্রধানত অনাবৃষ্টি ও অল্পবৃষ্টি অঞ্চলে সমতল ছাদের গৃহ দেখা যায়। উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলেই এই গৃহের প্রধান কেন্দ্র। এইসব প্রদেশের সর্বত্রই যে সমতল ছাদের ঘর দেখা যায় তাহা নহে। যে-সব

অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয়, সেখানেই আবার ঢালু ছাদের ঘর দেখা যায়। উত্তরভারত ছাড়া মহারাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম খান্দেশ, ঔরঙ্গাবাদ, আহম্মদনগর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দক্ষিণভারতে মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশের দুই-একটি অল্পবৃষ্টি অঞ্চলে এইধরনের ঘর দেখা যায়। ঘরের কাঁথ বা দেয়াল সাধারণত মাটি দিয়া, যেখানে পাথর পাওয়া যায় পাথর দিয়া, তৈরী করা হয়। ঘরের কাঁথ বা দেয়াল গড়া হইলে তাহার উপর কাঠের তক্তা বসাইয়া, পুরু করিয়া মাটি পিটাইয়া বসানো হয়। ইহাই সমতল ছাদ গড়িবার অধিক প্রচলিত রীতি। কোথাও কোথাও কাঠের তক্তার বদলে চাটাই বা মাদুরের উপর পাতা বিছাইয়া মাটি লেপিয়া দেওয়া হয়।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই বাক্সের মতো দেখিতে সমতল ছাদের ঘর ভারতের উত্তরপ্রদেশ হইতে ভারতের বাহিরে মিশর, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, কারণ এই সমগ্র অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়া প্রায় একরকম, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। পৃথিবীর আরও অন্যান্য দেশে যেখানে বৃষ্টি খুব অল্প হয়, সেখানেই এই ধরনের গৃহনির্মাণ প্রচলিত আছে।

ঢালু চালবিশিষ্ট গৃহ

ভারতে ঢালু চালবিশিষ্ট গৃহের সংখ্যাই বেশী। তাহার প্রধান কারণ, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য বিশেষ করিয়া বৃষ্টিপাতের দিক দিয়া অধিক দেখা যায়। তাই শীত-প্রধান পার্বত্য অঞ্চলে হোক, অথবা গ্রীষ্মপ্রধান সমতল ভূমিতে হোক, ছাদের বৃষ্টি নিষ্কাশনের জন্য চালের গড়ন ঢালু না হইলে চলে না।

ঢালু-চাল গৃহের উপাদান সর্বত্র একরকমের পাওয়া যায় না। উপাদানের পার্থক্যের জন্য চাল ঢালু হইলেও তাহা দেখিতে নানারকমের হয়। বাংলা-দেশে খড় অথবা ছনের ছাওয়া চাল বেশী দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী প্রভৃতি জেলার কিছু কিছু খোলারও ব্যবহার আছে, তবে বিহার অঞ্চলেই খোলার' চালের চলন বেশী। বিহারে এই খোলাকে বলা হয় 'খাপরা'। পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে পলিমাটি পাওয়া যায় সেখানে কুমোরের চাকে খাপরা গড়া হয়। যেখানে তাহা পাওয়া যায় না সেখানে খাপরা ছাঁচে ফেলিয়া হাতে গড়া হয়।

খাপরা দুই রকমের। একরকম ডোঙ্গার মতো অর্ধবৃত্তাকার ও লম্বা, তাহাকে 'নারি' বলে। আর একরকম টালির মতো চেপ্‌টা, তাহাকে 'পটরি' বলে। উত্তরপ্রদেশের বারাণসী অঞ্চলে নারি ও পটরি দুই রকমেরই খাপরার ব্যবহার আছে। বারাণসী হইতে যত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া যায় তত দেখা যায় যে পটরি-খাপরার চলন বেশী। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশ চাল এই পটরি খাপরা দিয়া তৈরী। হিমালয়ের যে-সব অঞ্চলে স্লেটপাথর পাওয়া যায়, সেখানে স্লেটের টালি ব্যবহার করা হয়।

দক্ষিণভারতে তালপাতা নারিকেলপাতা ঘাস ইত্যাদির ছাওয়া চাল থাকিলেও, খাপরার ব্যবহারও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল—উত্তরভারতের সর্বত্র একপ্রস্থ টালি বা খাপরার ছাউনি করার রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু দক্ষিণভারতে অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে একেবারে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দুই-তিন বা চারপ্রস্থ পর্যন্ত টালি বা খাপরার ছাউনির রীতি আছে। টালিগুলিকে আঁটসাঁট করিয়া রাখিবার জন্য চুনবালির পলেস্তরা দেওয়া হয় এবং তাহার মুখে ও উপরে বাঁধনও দেওয়া হইয়া থাকে।

দক্ষিণভারতের মধ্যে কেরলপ্রদেশের চালের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কেরলে দো-চালা ও চৌ-চালা ঘর পাতা বা টালি দিয়া ছাওয়া হয়। কিন্তু আড়ের চালগুলি মুদনী পর্যন্ত পৌঁছায় না, তাহার মাথা মুদনীর কিছু নিচে থাকে। আড়ের চাল ও মুদনীর এই ফাঁকের মধ্যে কারুকার্যবিশিষ্ট ত্রিকোণ দুইখানি কাঠ বসানো থাকে। জাভা, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি অঞ্চলের গৃহের চাল দেখিতে কতকটা এইরকম।

গৃহের দেয়াল। উত্তরভারতের অধিকাংশ স্থানে মাটির দেয়াল গড়ার রীতি প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও দেওয়ালকে 'কাঁথ' বলা হয়। বাংলাদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মাটির দেয়ালই অধিক দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে বাঁশের বেড়া করিয়া তাহার উপরে মাটি লেপিয়া দেয়াল দেওয়া হয়, আবার তল্‌তা বাঁশ চিরিয়া সুন্দর টাটি বুনিয়া তাহার বেড়াও দেওয়া হয়। বিহার উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মাটির দেওয়াল বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যভারতের ও রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে পাথর সহজলভ্য, সেখানে পাথর দিয়া দেয়াল গাঁথা হয়। কাঙ্গড়া কুমায়ুন আসাম

প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে দেবদারু শাল প্রভৃতি সরলকাণ্ড গাছ প্রচুর পাওয়া যায়, সেখানের কাঠের দেওয়াল, এমনকি কাঠের মেঝে পর্যন্ত তৈরী করা হয়।

ভারতের গৃহে আঞ্চলিক আবহাওয়া ও উপাদানের প্রভাব

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহের এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গৃহের গড়ন ও বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক উপাদান ও আবহাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে। পূর্বের আঞ্চলিক বিবরণের মধ্যে এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়:

ক। বাঁশ, কাঠ, খড়, পাতা, মাটি, পাথর—গৃহনির্মাণের যে-উপাদান যে-অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে তাহাই প্রধানত ব্যবহার করা হইয়া থাকে। গৃহের ছাদ ও গড়নের উপর উপাদানের বেশ কিছুটা প্রভাব আছে দেখা যায়। বাঁশ ও মাটির মতো নমনীয় উপাদান দিয়া যে-ধরণের গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব, ইট ও পাথর দিয়া তাহা সম্ভব নহে।

খ। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর গৃহের গড়ন অনেকটা নির্ভর করে। যে-সব অঞ্চলে অধিক বা মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত হয় সেখানে ঘরের চাল খড়ের বা টালি খোলার যাহারই হোক না কেন তাহা ঢালু-চাল হইয়া থাকে। যেখানে বৃষ্টিপাত খুব সামান্য হয়, আবহাওয়া শুকনো ও তাপমাত্রা বেশী, সেখানে সমতল-চালের ঘর কতকটা চারকোণা বন্ধ বাক্সের মতো করিয়া গড়া হয়।

গ। ভাঁটি, জলাভূমি ও নিম্নভূমি অঞ্চলে কাঠের খুঁটির উপর মাচা করিয়া গৃহ নির্মাণ করা হয়। এই ধরনের গৃহকে 'মাচা-ঘর' বলা যাইতে পারে।

ঘ। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের ঘর আকারে চারকোণা। বৃত্তাকার বা গোলাকার ঘর যে একেবারে নাই তাহা নহে। বাংলাদেশে শস্যাগার বা গোলাঘর একসময় গোলাকারই ছিল বেশী, এখন তাহা আর বেশী তৈরী হয় না, তৈরী করিবার মতো ওস্তাদ ঘরামিও খুব বেশী নাই। অন্ধ্রপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে, হায়দারাবাদের 'চেঞ্চু' নামে আদিবাসীদের মধ্যে গোলাকার ঘরের প্রচলন এখনও কিছু কিছু আছে। আসামের নাগাদের ঘরের সামনের দিক অর্ধ-গোলাকার। দক্ষিণভারতের নীলগিরি পাহাড়ে টোডা নামে

আদিবাসীরা থাকে, তাহারা ব্যারেল-আকারে (অর্থাৎ পিপা বা ড্রাম লম্বায় মাঝখান হইতে কাটিয়া উপুড় করিয়া দিলে যে-রকম হয়) গৃহে বাস করে। বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বা সামাজিক কারণে গোলাকার ঘরের উৎপত্তি হইয়াছিল কি না সঠিক বলা যায় না। মনে হয় তাহা নাই, ইহা একটি বিশিষ্ট গঠন কৌশল মাত্র।

গৃহ ও সমাজ

গৃহের উপর শুধু যে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আছে তাহা নহে, সামাজিক প্রথারও যথেষ্ট প্রভাব আছে। বাস্তুভিটা বাছাই করা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহপত্তন, গৃহপ্রবেশ পর্যন্ত পর্বে পর্বে বাস্তুদেবতা, গৃহদেবতা ও পিতৃপুরুষদের পূজা করিয়া এবং নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠান করিয়া তবে বসবাসের গৃহ নির্মাণ করা হয়। যে-ভিটার উপর গৃহ নির্মিত হইবে তাহা নির্বাচন করার বিধানও শাস্ত্রকাররা দিয়া গিয়াছেন। ভিটার উপর কোন্‌দিকে কিভাবে মুখ রাখিয়া গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে, এবং করিলে তাহা গৃহীর পক্ষে কল্যাণকর হইবে সে সম্বন্ধেও শাস্ত্রোক্ত বিধান ও ডাক-খনার বচনের মতো প্রবচনের অভাব নাই। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে গৃহনির্মাণের যে সমস্ত বিধিবিধান আছে তাহা এত বিশদ ও বিস্তৃত যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমাজকর্ম বলিয়া স্বীকৃত না হইলে এরকম বিপুল স্থাপত্যশাস্ত্রের বিকাশ হইত না।

মহাভারতে দেখা যায় যে দেবতার অর্চনা, মাঙ্গল্য উৎসব, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাদান প্রভৃতি গৃহপত্তন ও গৃহপ্রবেশের অঙ্গ ছিল। বহুলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া পায়সাদি উৎকৃষ্ট ভোজ্যে আপ্যায়িত করিতে হইত। ব্রাহ্মণরা স্বস্তি ও পুণ্যবচনে গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করিয়া আশীর্বাদ করিতেন। নূতন গৃহ নির্মাণ করিবার আগে বাস্তু মাপিবার নিয়ম ছিল। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বাস্তুভিটা মাপিবার ব্যবস্থা করা হইত এবং কোন বিশেষজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাস্তুর পরিমাপ করিতেন। নূতন গ্রাম ও নগর পত্তন করিতেও মাপের নিয়ম ছিল। প্রথমে শান্তিপাঠ করিয়া কাজ আরম্ভ করা হইত। রামায়ণ-মহাভারতে যে-সকল প্রাসাদ ও গৃহ নির্মাণের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই রাজা-মহারাজাদের। সেগুলির বিবরণ হইতে সেকালে গৃহপ্রস্তুত-প্রণালী যে কত উচ্চ ধরনের ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখানে

একটি দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিতেছি। শিল্পী ময়দানব শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে একটি সভামণ্ডপ নির্মাণ করেন। মণ্ডপখানির আকৃতি ঠিক বিমানের মতো, ইচ্ছা করিলে স্থানান্তরিত করা চলিত, যদিও তাহা করিতে প্রায় ৮,০০০ শক্তিশালী পুরুষের প্রয়োজন হইত। পুণ্যদিনে শুভলগ্নে হাজার ব্রাহ্মণকে পায়সান্নে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাঁহাদের নানাবিধ ধনরত্ন দান করিয়া ময়দানব সভার স্থান মাপিতে আরম্ভ করেন। চতুরস্র দশ হাজার হাত ভূমি জুড়িয়া, অর্থাৎ আধুনিক মাপের ১২৫ বিঘা জমির উপর এই বিশাল মণ্ডপটি নির্মাণ করা হয়।

এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় গৃহনির্মাণশিল্প বহুকাল হইতেই রীতিমত সুসমৃদ্ধ ছিল এবং প্রধানত ভারতের হিন্দু রাজা-মহারাজাদের ও মুসলমান সুলতান-বাদশাহদের পোষকতায় এই শিল্পের চরম বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। ইহার সহিত কেবল শিল্পনৈপুণ্য নহে, সামাজিক আচারপ্রথাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। আগে আমরা যে গৃহের বিবরণ দিয়াছি তাহা ভারতের জনসমাজের সাধারণ বসবাসের গৃহ। কিন্তু ভারতের রাজা-বাদশাহদের পোষকতায় যে-সব প্রাসাদ অট্টালিকা দুর্গ দেবালয় মন্দির মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছে তাহাও ভারতীয় গৃহনির্মাণশিল্পের গৌরবময় নিদর্শন। পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে (অষ্টম প্রকরণ—পঞ্চম অধ্যায়)।

ভারতীয় গৃহের গড়নে ও বিন্যাসে সামাজিক প্রথার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রামে বা নগরে যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে ঘর বাঁধিতে পারিত না। জাতিবর্ণভেদে আগে বাস্তকেন্দ্র ঠিক করা হইত, তারপর সেখানে গৃহনির্মাণ করা হইত। ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণগ্রামে, বৈদ্যরা বৈদ্য-গ্রামে. বৈশ্যরা বৈশ্যগ্রামে, কর্মকার কুম্ভকার তন্তুবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, অথবা একই গণ্ডগ্রাম ও নগরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে গৃহনির্মাণ করিয়া বসবাস করিত। কেবল বসতিবিন্যাসে নহে, গৃহ-বিন্যাসেও সামাজিক প্রথার প্রভাব দেখা যায়। গৃহের ভিতরের আঙ্গিনার দিকে মুখ করিয়া ঘর বাঁধা এবং তাহার চারিদিকে একটি বেড়া বা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখার যে রীতি তাহা অনেকটা পারিবারিক গোপনতা বজায় রাখি-বার জন্য এবং কিছুটা সামাজিক প্রথা মানিয়া চলিবার জন্য। ভারতীয় সমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন হইবার পর ভারতের গৃহনির্মাণে তাহার বেশ কিছুটা

প্রভাব পড়িয়াছে। অবশ্য পর্দাপ্রথা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এবং উচ্চস্তরের মুসলমান-সমাজে যতটা প্রবল, সমাজের নিম্নস্তরের দিকে ততটা প্রবল নহে। সেইজন্য সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের গৃহবিন্যাসে এতটা গোপনতার ভাব থাকে না। অবশ্য বেশী পরিপাটি করিয়া ঘর বাঁধিবার আর্থিক সামর্থ্যও তাহাদের নাই। সেইকারণেও তাহাদের গৃহ সাদাসিধা ও খোলামেলা।

গৃহ ও সৌন্দর্যবোধ

গৃহের সহিত মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সম্পর্ক যখন এত ঘনিষ্ঠ তখন সেই গৃহ যে মানুষ তাহার সাধ্য ও কল্পনা অনুযায়ী মনোরম ও সুন্দর করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে ও ভারতের বাহিরে সর্বত্র আজও আদিবাসীদের বাসগৃহের শিল্পকর্ম দেখিলে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাগাদের ও অন্যান্য উপজাতিদের গৃহ, মধ্যভারতে সাঁওতাল মুণ্ডা হো ওরাঁও গণ্ড শবর জুয়াঙ গদ্দ মারিয়া আগারিয়া প্রভৃতি আদিজাতির গৃহরূপচর্চা দেখিলে যে-কোন আধুনিক অতিসভ্য মানুষও অবাক হইয়া যাইবেন। তখন এই কথাই মনে হইবে যে বিজ্ঞানচর্চায়, শিক্ষাদীক্ষায়, লোহা-কংক্রিটের আকাশমুখী প্রাসাদ নির্মাণে আমরা যতই উন্নত ও সভ্য হই না কেন, বোধ হয় গৃহকে কি করিয়া সুন্দর করিতে হয় তাহা আজও আমাদের এই আদিবাসীদের কাছ হইতে শিখিতে হইবে। কাঠের দরজা জানলার খোদাই কারুকার্য, ঘরের দেয়ালে নানারকমের জাদুমন্ত্র ও তুকতাকের প্রতীকচিত্র ইত্যাদি আদিবাসীদের গৃহের অঙ্গসজ্জার প্রধান উপকরণ। প্রধানত গৃহকে সুন্দর করিয়া গড়িবার জন্য কাঠের খোদাইশিল্প, বাঁশ-বেতশিল্প এবং চিত্রকলার একটি দিকের (দেযালচিত্রের) অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। দেহে অলংকরণের দ্বারা সৌন্দর্যচর্চা করার প্রবৃত্তি যেমন মানুষের সহজাত, গৃহকে সুন্দর করিয়া নির্মাণ করার প্রবৃত্তিও ঠিক তেমনি সহজাত বলা যায়। সেইজন্য ভারতের শিল্পশাস্ত্রকাররা সমস্ত শিল্পের মধ্যে স্থাপত্যশিল্পকে খুবই উঁচু মর্যাদা দিয়াছেন। ইউরোপীয়রাও স্থাপত্যশিল্পকে অন্যান্য সমস্ত শিল্পের জনক বা উৎস বলিয়া থাকেন। কারণ গৃহনির্মাণ কেন্দ্র করিয়া তক্ষণশিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিকাশ হইয়াছে। মানুষের গৃহ ও দেবতার গৃহ—এই

দুইরকমের গৃহকেই কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য শিল্পের বিকাশ হইয়াছে। এইজন্যই গৃহনির্মাণশিল্পকে সমস্ত শিল্পের জনক বলা হইয়াছে। গৃহের সহিত মানুষের সৌন্দর্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকিলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না।

আধুনিক ভারতের গৃহ

ভারতের যে বিভিন্ন প্রকারের গৃহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হয়ত আর পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর পরে আধুনিক শহরনগর হইতে নির্বাসিত বহুদূর কোন গ্রামে চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ গৃহনির্মাণের রীতি-পদ্ধতি, উপাদান-উপকরণ, ছাঁদ ও গড়ন, সবই আধুনিক যুগে দ্রুত বদলাইয়া যাইতেছে। ভারতের বড় বড় মহানগরে যে-সব বড় বড় আট-দশতলা ইমারত তৈরী হইতেছে তাহার সহিত নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য বা স্টাইলের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকিতেছে না। কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের বিশাল বিশাল আকাশচুম্বী অট্টালিকার সহিত নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মস্কো প্রভৃতি শহরের স্কাইস্ক্রেপারের কোন পার্থক্য নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিকতা-বোধের প্রসারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মনে হয় যেন স্থাপত্যশিল্পে একটি আন্তর্জাতিক রীতি বা স্টাইলের বিকাশ হইতেছে। এত দ্রুত এই বিকাশ হইতেছে যে, ইহার সামনে জাতীয়তাবোধ সংকীর্ণ গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আধুনিক যুগে ভারতের মহানগরে যে সমস্ত স্কাইস্ক্রেপার নির্মিত হইতেছে, কোথাও কোথাও তাহার সামনের দিকের কোন অংশে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমানযুগের কোন শিল্পনিদর্শন অলংকরণরূপে ব্যবহার করিয়া স্থপতিরা ভারতীয়তার স্পর্শ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে এই ধরনের আধুনিক অট্টালিকা দেখা যায়, কলিকাতাতেও কয়েকটি আছে। কিন্তু অনাবশ্যক অলংকরণের ভিতর দিয়া ভারতীয়তা বজায় রাখিবার এই ক্ষীণ অসহায় প্রচেষ্টা টিকিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক যুগের চাঁচাছোলা যান্ত্রিক উপযোগিতা ক্রমেই আধুনিক গৃহের মূর্তিতে প্রকট হইয়া উঠিবে। এই যান্ত্রিক আধুনিকতা প্রথম দিকে বড় বড় সমাজগৃহ (public buildings) নির্মাণে প্রকাশ পাইবে, তারপর ক্রমে পারিবারিক বাসগৃহেও তাহার বিস্তার হইবে।

গৃহনির্মাণের জাতীয় রীতি বা স্টাইল বিকাশলাভ করে দুইটি কারণে—প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য এবং আঞ্চলিক উপাদান ও শিল্পরীতির জন্য। এই দুইটি কারণই বৈজ্ঞানিক যুগে অপসারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে জয় করাই বিজ্ঞানের অন্যতম কীর্তি। তাপনিয়ন্ত্রণের (air-conditioning) বৈজ্ঞানিক কৌশল যখন আয়ত্ত হইয়াছে তখন গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশে যে-কোন স্টাইলের গৃহনির্মাণের কোন বাধা নাই। মেরু অঞ্চলেই হোক আর মরুভূমি অঞ্চলেই হোক, পাহাড়-পর্বতে হোক আর সমভূমিতেই হোক, সর্বত্র একধরনের গৃহনির্মাণ করা সম্ভব, কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যবস্থাদি ঠিক রাখিলে হইল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আধুনিক যুগের গৃহের পরিবেশ অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর, বসবাসের উপযোগী ও আরামপ্রদ করিয়া নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত যদি নিজেদের জাতীয় স্টাইলের কিছু বজায় রাখা সম্ভব হয় তাহা হইলে এই অগ্রগতি সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে। যানবাহন ও চলাচলব্যবস্থার উন্নতির ফলে আঞ্চলিক উপাদানের গুরুত্ব গৃহনির্মাণে দ্রুত কমিয়া যাইবে, শহরের স্থাপত্য গ্রামে বিস্তারলাভ করিবে এবং কোন স্থানে কোন উপাদানের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণেও গৃহের উপাদানগত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমে লোপ পাইবে। গৃহনির্মাণে একটি রীতি বা স্টাইল সর্বত্র প্রচলিত হইবে—তাহাকে বৈজ্ঞানিক রীতি বা স্টাইল বলা যায়।

ভারতের গৃহসমস্যা

ভারতের গৃহসমস্যা যে কত ব্যাপক ও জটিল তাহা গৃহসংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। ১৯৫১ সালের সেন্সাসের সময় দেখা গিয়াছিল যে ভারতবর্ষে মোট ৬,৪৩,৬১,৬৭৬ বাসগৃহ আছে। ইহার মধ্যে ৫,৪০,৫৬,৩৮৮ গৃহ গ্রামাঞ্চলে এবং ১০,৩০,৫২৮ গৃহ শহরাঞ্চলে। ১৯৬১ সালের সেন্সাসের খবর এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে গত দশ বছরে ইহা বাড়িয়া প্রায় ৭ কোটি হইয়াছে অনুমান করা যায়। এই হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে গড়ে প্রায় ৬ জন করিয়া লোক প্রতিগৃহে বাস করে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী গৃহনির্মাণের যাবতীয় পরিকল্পনা ঠিকমত কার্যকর হইলে ১৯৬১ সালের শেষে কেবল শহর এলাকায় ৭৮ লক্ষ গৃহ ঘাটতি পড়িবার কথা। এই

হিসাবের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ বস্তি ধরা হয় নাই। ভারতে যে কি নিদারু গৃহসংকট দেখা দিয়াছে তাহা এই সরকারী স্বীকারোক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

সংকটের সমাধান করা সহজ নহে। সমাধানের জন্য ভারত-সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা ছয়টি বিভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি এই :

ক। সরকারী অর্থসাহায্যে শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্মাণ।

খ। স্বল্পবিত্ত অল্প আয়ের লোকদের জন্য গৃহনির্মাণ।

গ। বস্তি সংস্কার ও উন্নয়ন।

ঘ। বসবাসের জন্য জমি দখল ও তাহার উন্নয়ন।

ঙ। গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ।

চ। চা-কফি প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্মাণ।

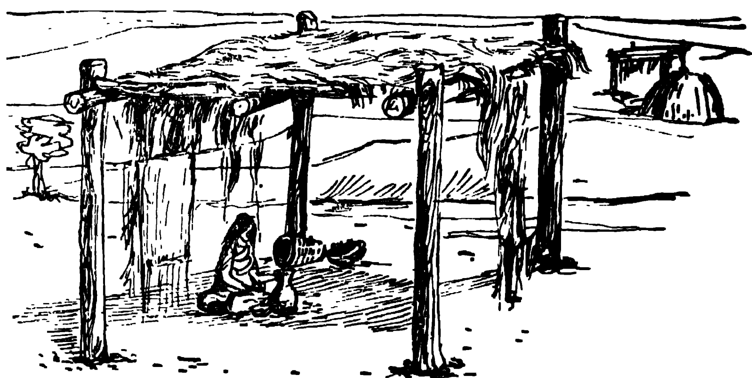
গৃহনির্মাণের ঝোঁক অবশ্য বেশী দেখা দিয়াছে শহরে ও শহরতলীতে। দেখিতে দেখিতে খালি জমি ঘরবাড়ীতে ভরিয়া যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার মধ্যে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা শহরকেন্দ্রে গৃহনির্মাণের জন্য ব্যয় হয় এবং দ্বিতীয় যোজনার মধ্যে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় যোজনায় গৃহনির্মাণ খাতে সরকারী বরাদ্দ ছিল ১২০ কোটি টাকা, ইহা কমাইয়া ১৯৫৮-৫৯ সালে ৮৪ কোটি টাকা করা হয়। তৃতীয় যোজনাতেও সরকারী বরাদ্দ ১২০ কোটি টাকা। গৃহসমস্যার দিক হইতে বিচার করিলে এই বরাদ্দ যে আদৌ পর্যাপ্ত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। ভারত-সরকার অবশ্য সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং ভারতের লোকসংখ্যা যে-হারে বাড়িতেছে তাহাতে ক্রমেই যে এই সমস্যা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিবে তাহাও তাঁহারা অস্বীকার করেন না। সমাধানের জন্য তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্য-সরকার, পৌর-প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করিতেছেন।

গৃহসমস্যা সমাধানের যে ছয়টি সরকারী উপায়ের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—যেমন রেলওয়ে ডাক-তার, পুনর্বাসন, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি—সরকারী কর্মচারীদের জন্য গৃহ-নির্মাণের নানাবিধ পরিকল্পনা করিয়াছেন। লোহা-ইস্পাত ও অন্যান্য বড় বড় শিল্পাঞ্চলেও নূতন নূতন শিল্পনগর নির্মাণ করা হইতেছে। বড় বড় কোম্পানি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাও তাঁহাদের কর্মচারীদের গৃহসমস্যা

সমাধানে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। এইসব স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে যদি কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও পরিকল্পনার অধীনে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে হয়ত গৃহসমস্যা সমাধানের উদ্যম আরও বেশী সার্থক হইতে পারে।

মরুভূমি অঞ্চলের ঘরবাড়ী

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মরুভূমি অঞ্চলের ঘরবাড়ী সমতল ছাদবিশিষ্ট ও চারকোণা বাক্সের মতো। অদূর-প্রাচ্যে প্রত্নবিদরা প্রাচীন উর নগরে মাটি খুঁড়িয়া যে-সব লোকবসতি বাহির করিয়াছেন তাহার ঘরগুলির ছাদ সমতল এবং এখনও ইরাক আরব প্রভৃতি দেশে সাধারণ লোকের বসবাসের ঘর এই ধরনের দেখা যায়। প্রখর রৌদ্র ও উত্তাপ, শুকনো খরখরে বাতাস ও অল্প বৃষ্টিপাত হইলে এই ধরনের সমতল-ছাদের ঘরে বাস করিতে কোন অসুবিধা



আরিজোনার 'ইণ্ডিয়ান'-দের লতাপাতার 'ফ্ল্যাট' ঘর

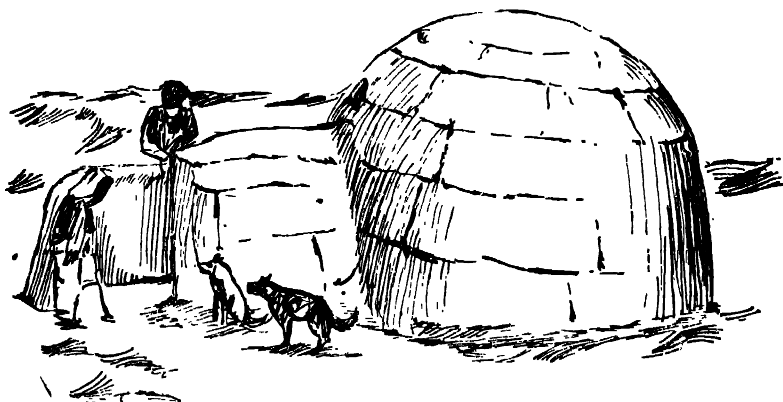
হয় না। বরং এই ধরনের ঘর তাপসহিষ্ণু হয় এবং ঘরের ভিতর খুব ঠাণ্ডা থাকে। সেইজন্য দেখা যায় যে একেবারে অদূরপ্রাচ্য হইতে উত্তরভারতের উত্তরাংশ পর্যন্ত জনসাধারণের বসবাসের ঘর একরকমের—চারকোণা লম্বা বাক্সের মতো, মাটির দেয়াল ও সমতল ছাদবিশিষ্ট। চারিদিকে মাটির

দেয়াল দিয়া, উপরে কাঠের পাটাতনের উপর মাটির প্রলেপ দিয়া ছাদ করিয়া ঘর বাঁধিবার যাহাদের ক্ষমতা নাই বা সময় নাই, অথবা একস্থানে স্থায়ী বসবাসেরও আবশ্যক নাই (যেমন বেদুইনরা, অথবা আরিজোনার আপাচে ইণ্ডিয়ানরা), তাহারা হয় তাঁবুতে, না হয় লতাপাতার ঘরে বাস করে। লতাপাতার ঘরেরও ছাদ সমতল।

আফ্রিকার মরুদ্যানের (oasis) যে-সব অঞ্চলে চুনাপাথর বা এইজাতীয় উপাদান পাওয়া যায় (যেমন লিবিয়ার জালো মরুদ্যানে), সেখানে চুন-বালি-সিমেন্ট দিয়া পাথরখণ্ড গাঁথিয়া দেয়াল দেওয়া হয়, তাহার উপর সমতল ছাদ থাকে। দরজা-জানালা ছোট ছোট এবং অধিকাংশই খেজুরকাঠের তৈরী। দরজা-জানালা ছোট এইজন্য যে, ঝড়ের সময় বাহিরের বালি ঘরে ঢুকিতে পারে না এবং শীতকালে ঠাণ্ডা ঘর গরম রাখা যায়।

শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলের ঘরবাড়ী

মেরু অঞ্চলের অধিবাসীরাও নির্মম হিমবায়ু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গৃহনির্মাণের অভিনব কৌশল উদ্‌ভাবন করিয়াছে। যেমন পূর্ব-সাইবে-



এস্কিমোদের তুষারগৃহ

রিয়ার কোরিয়াকরা অর্ধেক মাটির নিচ হইতে কাঠের ঘর তৈরী করে, ইহাকে অর্ধ-ভূগর্ভস্থ গৃহ (half-underground) বলা যাইতে পারে।

লম্বা একটি সরু সুড়ঙ্গের মতো পথ দিয়া ঘরে যাওয়া যায়, শীতকালে এই পথও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তুষারপ্রবাহ হইতে বাঁচাইয়া ঘরের ছাদে ফানেলের মতো প্ল্যাটফর্ম করিয়া ধোঁয়া নির্গমনের যে বড় ছিদ্র রাখা হয়, তাহার ভিতর দিয়া শীতকালে ঘরে যাতায়াত করা হয়। এস্কিমোদের গৃহ-নির্মাণের কৌশল যেমন সহজ সরল তেমনি প্রকৃতির উপযোগী ও অভিনব। সাধারণত এস্কিমোরাও কোরিয়াকদের মতো অর্ধ-ভূগর্ভস্থ গৃহে বাস করে, তৃণমাটির চাপড়া বা পাথরের টুকরা দিয়া তৈরী। কিন্তু শীতকালে যাহাদের জমাটবাঁধা বরফ-সমুদ্রের উপর দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় জীবিকার ধান্ধায়, তাহাদের এইভাবে ঘর বাঁধিবার উপকরণ বা অবসর কিছুই থাকে না। আশেপাশে বিস্তৃত বরফ চক্‌চক্‌ করিতে থাকে। কাজেই বরফের খণ্ড দিয়া তাহাদের ঘর বাঁধিতে হয়। সঙ্গে একটি বরফ-কাটা ধারালো চাকু বা ছুরি থাকে, তাই দিয়া বরফের চাঁই খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘর বাঁধিয়া ফেলে। ঘরগুলি গোলাকার ('ইগ্‌লু' বলে), সামনে আচ্ছাদিত যে সুড়ঙ্গপথ থাকে তাহা কুকুরের আশ্রয়ের কাজ করে। এই পথের আচ্ছাদনের উপর একটি ছোট্ট ফাঁক থাকে স্বচ্ছ বরফ দিয়া ঢাকা। ইহাই আলো ঢুকিবার জানালা, বরফের স্বচ্ছতায় আলো ভিতরে প্রতিফলিত হয়। ভিতরে শীলমাছের তেলের প্রদীপ জ্বলিতে থাকে এবং ঘরটিকে গরম করিবার জন্য ভিতরের তুষার-দেয়ালের গায়ে ভাল্লুক-হরিণ ইত্যাদি চামড়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলিতে থাকে তখন চামড়ার তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতে হয়।

আফ্রিকার ঘরবাড়ী

'সাহেব' বলিলে যেমন ইউরোপের সকল জাতিকে সঠিক জানা যায় না, তেমনি 'নিগ্রো' বলিলেও আফ্রিকার সকল জাতিকে বুঝিতে পারা যায় না। ইউরোপে যেমন জার্মান, ফরাসী, ডাচ, বেলজিয়ান, ইটালিয়ান, চেক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্বেতাঙ্গ লোকের বাস, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও তেমনি বহুভাষাভাষী কৃষ্ণাঙ্গ 'নিগ্রোর' বাস। সকলের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও আধুনিক জীবনযাত্রার সমান প্রসার হয় নাই।

কেহ হয়ত আদিম স্তরে আছে, কেহ আধুনিক ভাবাপন্ন হইয়াছে। বাণ্টুরাই নিগ্রোদের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠী এবং তাহারা বহু উপজাতিতে বিভক্ত—যেমন বাগাণ্ডা, বাসুটো, জুলু, ইয়াও, কিকুউ ইত্যাদি। দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য-আফ্রিকায় থাকে আরও আদিম বুশম্যান ও হোটেনটট্‌রা (এখন আর নাই)। কঙ্গোর অরণ্যের গহন গহ্বরে থাকে পিগ্‌মিরা, এইরকম আরও অনেক জাতি-উপজাতি আফ্রিকায় বাস করে।

বহু জাতি-উপজাতি আফ্রিকায় বাস করিলেও, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া জলবায়ুতে খুব বেশী পার্থক্য নাই বলিয়া আফ্রিকার ঘরবাড়ীর ধাঁচের বৈচিত্র্য খুব বেশী নহে। অধিকাংশ আফ্রিকায় গরম বেশী, কিন্তু আবহাওয়া



আফ্রিকার আদিবাসীর গোলাকার পাতাঘর

শুকনো নহে। প্রবল বৃষ্টিপাতের অঞ্চল অল্প হইলেও, মাঝারি বৃষ্টিপাত উত্তরাংশ বাদ দিয়া অধিকাংশ অঞ্চলেই হয়। দক্ষিণের কালাহারী ও উত্তরের সাহারা অঞ্চল মরু অঞ্চল। মৌচাকের মতো অর্ধডিম্বাকার ঘর আফ্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অরণ্যব্যাপী পিগ্‌মিরা তাহা স্থানীয় লতাপাতা দিয়া তৈরী করে, কঙ্গোর অন্যান্য নিগ্রোরা স্থানীয় ঘাস দিয়া চূড়ার মতো করিয়া বৃত্তাকার ঘরের উপর ছাউনি দেয়, জুলুরা আরও সুন্দর করিয়া গড়নটি

গোলাকার করে। বাসুটোরা গোলাকার ও চারকোণা ঢালু চালের ঘর তৈরী করে, কিন্তু দেয়াল সুন্দর ঝকঝকে পাথর দিয়া গাঁথা, কারণ বাসুটোল্যাণ্ড (দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার) পার্বত্য অঞ্চল, পাথর সহজলভ্য। কালাহারী মরুভূমির বুশম্যানরা বালির মধ্যে গর্ত করিয়া উপরটা ডালপালা দিয়া ছাইয়া দেয়, কিন্তু তাহাও মৌচাকের মতো দেখিতে। দক্ষিণ-নয়সাল্যাণ্ড, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা প্রভৃতি অঞ্চলের ঘরবাড়ী আমাদের বাংলাদেশের ঘরবাড়ীর মতো, ঢালু চালাঘর, কাঠের বেড়ার উপর মাটি-লেপা দেয়াল, অথবা শুধু মাটির দেয়াল।

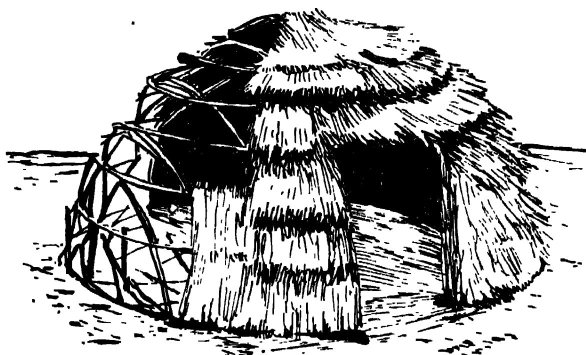
আফ্রিকার গৃহের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল তাহার বৃত্তাকার মৌচাকের মতো গড়ন। স্থানীয় ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি গৃহনির্মাণের উপাদানের



আফ্রিকার গোল চূড়াকার ঘর

নমনীয়তা এবং নিগ্রোদের সরল জীবনযাত্রা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা হয়ত গৃহের গড়নকে এত সুন্দর করিয়াছে। আফ্রিকাবাসী নিগ্রোরা যে কতদূর সৌন্দর্যপ্রিয় তাহা তাহাদের বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনপটুতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। আফ্রিকার প্রায় তিনভাগের দুইভাগ অঞ্চলে মাঝারি (২০" হইতে ৬০") ও প্রবল বৃষ্টিপাত (৬০" ইঞ্চির বেশী) হয়। এই কারণে মরু-অঞ্চল বাদ দিয়া আফ্রিকার বেশীর ভাগ অঞ্চলে ঢালু-চালের ঘরই বেশী এবং ভারতীয় গৃহের আকার ও উপাদানের সহিত তাহার অদ্ভুত

সাদৃশ্য আছে। মরুভূমি অঞ্চলে অবশ্য ঘর সমতল-ছাদের লম্বা চারকোণা বাক্সের মতো। আবহাওয়া কতকটা একরকমের বলিয়া এই ধরনের সমতল-



আফ্রিকার বৃত্তাকার ঘরের ছাউনি

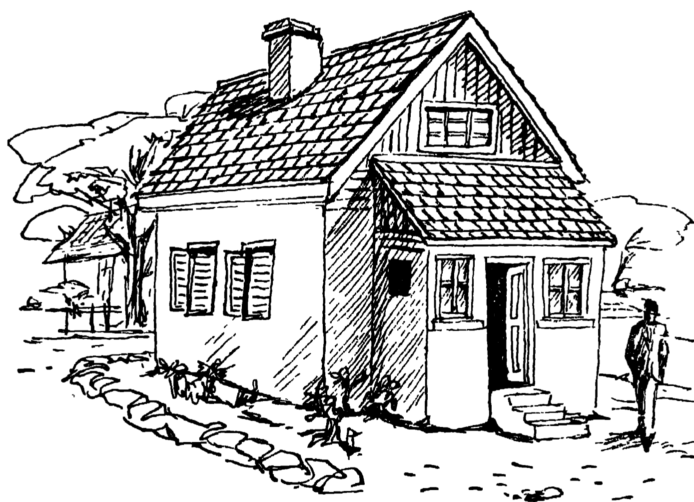
ছাদের চৌকা গৃহের বিস্তার হইয়াছে অদূরপ্রাচ্য হইতে একেবারে ভারতের উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত।

ইউরোপ ও আমেরিকার গৃহ

ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র প্রাকৃতিক আবহাওয়া একরকম নহে। ইউরোপকে প্রধানত চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। উত্তর-ইউরোপ মেরু-অঞ্চলভুক্ত, শীতপ্রধান, বৃষ্টিপাত কম। মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ গ্রীষ্মকালে খুব গরম, শীতকালে খুব ঠাণ্ডা, বৃষ্টিপাত মাঝারি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে শীত ও গ্রীষ্ম দুই-ই সহনীয়, বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত। দক্ষিণ-ইউরোপ ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলভুক্ত, শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং আবহাওয়া সাধারণত উষ্ণ। আমেরিকাকেও এইভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। গৃহের বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক অঞ্চলভেদে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহা আছে তাহা প্রধানত স্থানীয় উপাদানগত। পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ ঘরবাড়ী 'কটেজ' বা কুটির ধরনের, স্থানীয় উপাদান অনুযায়ী দেয়াল কোথাও কাঠের, কোথাও পাথরের, কোথাও বা ইঁটের। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পোন্নতি, পথঘাট ও যানবাহনের দ্রুত অগ্রগতির ফলে ইউরোপ-আমেরিকার ঘরবাড়ীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আর বিশেষ বজায় থাকিতেছে না। শহর-নগরে বিশাল আকাশমুখী অট্টালিকা এবং গ্রামাঞ্চলে কাঠ ও

ইট-পাথরের পাকা 'কটেজ' গৃহের দ্রুত বিস্তার হইতেছে। ভবিষ্যতে শহর-নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কোন ব্যবধান আদৌ থাকিবে কি না সন্দেহ। 'গ্রাম্য-গৃহের' যে বিলাসিতার আকর্ষণ এখনও ইউরোপ-আমেরিকায় আছে, তাহাও তখন আর থাকিবে না। স্থানাভাবের জন্য শহরের স্কাইক্রেপার গ্রামেও মাথা ঠেলিয়া উঠিবে। উদ্যান ও ফার্মের মধ্যে গ্রাম্য 'কটেজ' তখন আর বিরামকেন্দ্র থাকিবে না।

উপসংহার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও পৃথিবীর নানাদেশে গৃহের গড়ন ও উপাদান সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক জলবায়ু ও স্থানীয় গৃহনির্মাণের উপাদান তাহার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক প্রভাব ছাড়াও



ইউরোপের 'কটেজ' ঘর

বিভিন্ন দেশের সামাজিক প্রথা ও সংস্কার গৃহের রূপায়ণে পরোক্ষে কার্যকর হইয়াছে। ভারতীয় গৃহে এই প্রথার প্রভাব বেশ স্পষ্ট। গৃহের ভিত্তি স্থাপন, গৃহপ্রবেশ ও বসতি অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবারের গৃহবিন্যাসের রীতি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা যে কেবল গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, শহর-নগরেও গৃহনির্মাণ একটি অন্যতম সামাজিক সংস্কারবিশেষ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, পথঘাট ও যানবাহনের দ্রুত বিস্তার ও উন্নতির ফলে

ক্রমেই গৃহের উপর আঞ্চলিক উপাদানের প্রভাব কমিয়া যাইতেছে। উপাদানগত বৈশিষ্ট্যর জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহের গড়ন ও আকারে যে বৈচিত্র্য দেখা যাইত তাহাও এই কারণে লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। তবু মনে হয় যে, প্রাকৃতিক জলবায়ুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গৃহনির্মাণের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে তাহা কোন দেশের মানুষের পক্ষে একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব হইবে না।

QUESTIONS

Group A

1. 'A house provides protection from weather'. Discuss the statement with a few examples from India and abroad.

2. 'The type or form of a house is largely determined by the building-materials locally available'. Discuss the statement with examples from India and Africa.

3. Describe briefly the principal house-types of northern India.

4. Give a brief description of some important house-types in southern and western India.

5. Where the flat-roofed houses are largely found. and why ?

6. What types of houses are commonly found in regions with heavy rainfall ?

7. Where do you find round-type of houses outside India ? Is there any such type in India ?

8. Briefly describe the snow-houses of the Eskimos.

9. Write a short critical essay on the modern developments of housing in India.

10. How far the aesthetic desires of a man are satisried in his house ? Discuss with examples.

আফ্রিকা ও ভারতের আদিবাসীদের গৃহসজ্জার দৃষ্টান্ত দিয়া উত্তর দিতে হইবে।

11. Is India provided with sufficient number of houses today? How the various agencies are trying to solve the housing problem in India?

12. Is there any influence of social custom on house-building? Do you find it in India?

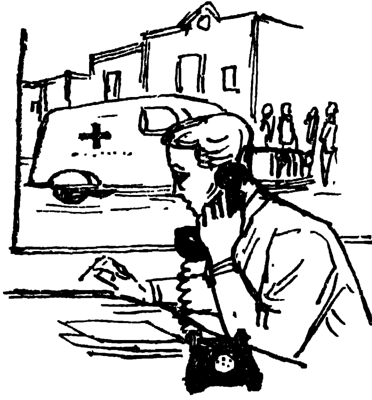
Group B

1. Where do you find the following house-types in India and outside India? Write the name of country and also region (in the case of India) in the space after each house-type:

1. Beehive-type round house in—
2. Flat-roofed house in—
3. Snow-house in—
4. House with pitched roof in—

II. Correct, where necessary, the following statements:

1. Flat-roofed houses are mostly found in the wet regions of western U. P. in India and also in Africa.
2. Houses with pitched roofs are found in the dry regions of Rajasthan, East Bengal and Arabia
3. Polar regions have snow houses which are rectangular in shape.
4. There are 4 crores of houses in India to-day. Each house has 11 occupants according to this estimate.



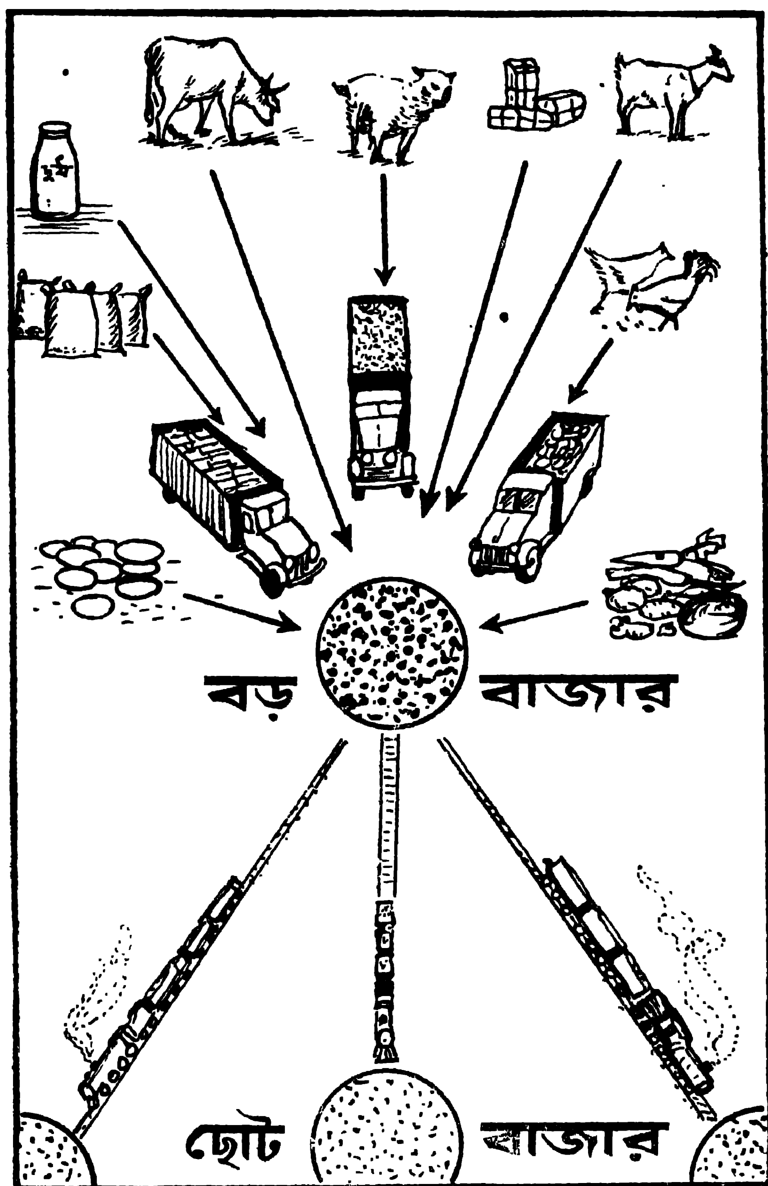
পঞ্চম প্রকরণ

উপভোগ্য বস্তু ও সমাজকর্ম

প্রতিপাদ্য। খাদ্য বস্ত্র ও গৃহ—জীবনের এই তিনটি প্রাথমিক প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি আমরা ব্যবহার করি, ভোগ করি। যেমন খাদ্য খাই, বস্ত্র পরি, গৃহে বাস করি। এইভাবে কোন জিনিস ভোগ করা বা ব্যবহার করাকে অর্থনীতিবিদ্‌রা Consumption বলেন। ভোগ-ব্যবহারের জন্য জিনিস উৎপাদন করিতে হয়, না হইলে কোথায় তাহা পাওয়া যাইবে? এই উৎপাদন করাকে Production বলা হয়। সমাজে সর্বদা কতকগুলি ভোগ্য ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র উৎপাদন করা হইতেছে এবং সমাজের লোকজন তাহা ভোগ-ব্যবহার করিতেছে। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা 'প্রডিউসার' বা উৎপাদক, যাহারা ভোগ করে তাহারা 'কনজিউমার' বা উপভোগকারী, ভোক্তা।

একই ব্যক্তি উৎপাদক ও উপভোগকারী দুই-ই হইতে পারে। কেহ যদি চরকায় সুতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বুনিয়া পরে, তাহা হইলে তাহাকে সেই কাপড়ের উৎপাদক ও উপভোগকারী দুই-ই বলা যায়। কেহ যদি বাগানে ফল ও সবজি ফলাইয়া খায়, তাহাকেও তাই বলা যায়। কিন্তু বহু মানুষের বৃহৎ সমাজে নানারকমের ভোগ্য ও ব্যবহার্য জিনিসের চাহিদা এত সহজে মিটানো সম্ভব হয় না। উৎপাদন ও উপভোগের মধ্যে আর একটি প্রক্রিয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় Exchange বা বিনিময়। এই বিনিময় একদা ছোট ছোট সমাজে, অল্প জিনিস ও চাহিদার জন্য, জিনিসের বদলে জিনিস দিয়া

Unit 5 Other Needs – Consumers' goods and services.



নানাস্থান হইতে জিনিস যানবাহনে বড় বড় বাজারে আসে,
সেখান হইতে অন্যান্য বাজারে চালান যায়।

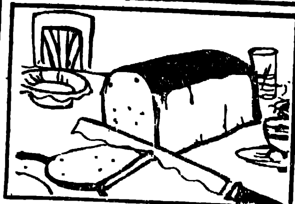
সম্ভব হইত। আমার ধান আছে, আর একজনের কাপড় আছে। আমার কাপড় দরকার, যাহার কাপড় আছে তাহার ধান দরকার। কাজেই ধানের বিনিময়ে আমি কাপড় পাইলাম। বর্তমান সমাজে যেমন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, তেমনি ভোগ্য জিনিসের বৈচিত্র্য ও চাহিদাও বাড়িয়াছে। তাই টাকার বিনিময়ে দোকানে-বাজারে ভোগ্য জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। টাকা হইল বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange)। নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র যানবাহনে করিয়া বড় বড় বাজারে আসে, আবার সেখান হইতে অন্যান্য অসংখ্য বাজারে যায়। আমরা টাকার বিনিময়ে বাজার হইতে সেইসব জিনিস কিনিয়া থাকি।

বস্তু ও সমাজকর্ম

এখন প্রশ্ন হইল, আমরা যাহা উৎপাদন ও উপভোগ করি তাহা কি সবই খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, আসবাব ইত্যাদির মতো নিরেট বস্তু? গায়ক যখন গান গায় তখন যে বাদ্যযন্ত্র বাজে তাহা নিরেট বস্তু, কিন্তু আমরা যাহা উপভোগ করি তাহা ঐ যন্ত্র বা কোন নিরেট পদার্থ নহে, তাহা গায়কের গান ও সুর। সুর কোন বস্তু নহে। নার্স যখন রোগীর সেবা করে তখন সে এমন কোন বস্তু উৎপাদন করে না যাহা রোগী ভোগ করে। ডাক্তার যখন চিকিৎসা করে, ভৃত্য যখন ঘরের কাজকর্ম করে, তখন তাহারা কোন কিছু পদার্থ উৎপাদন করে না যাহা ভোগ করা যায়। দোকানে যাহারা পণ্যদ্রব্য বেচে, যাহারা ট্রাম-বাস-ট্রেন চালায়, ডাক-তার-ব্যাঙ্ক-আফিস-আদালতে কাজ করে তাহারা কেহই কোন নিরেট দ্রব্য বা বস্তু উৎপাদন করে না, অথচ তাহাদের কাজকর্ম আমরা উপভোগ করি। শিক্ষকদের শিক্ষাদান একটি মহৎ কাজ, তাহাও সমাজ ভোগ করে। কাজেই আমরা যাহা উৎপাদন করি ও উপভোগ করি তাহা হইল—

নানারকম বস্তু ও পণ্যদ্রব্য + সমাজকর্ম বা 'সার্ভিস'

বস্তুর ওজন আছে, আকার আছে, তাহা ধরিয়া ছুঁইয়া ভোগ করা যায়, অর্থাৎ তাহা 'material,' কিন্তু সামাজিক কাজকর্মের বা 'সার্ভিসে'র ভার নাই, আকার নাই, ধরা-ছোঁয়া যায় না, অর্থাৎ তাহা 'non-material'। আকার-



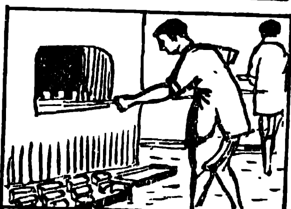
রুটির কাহিনী

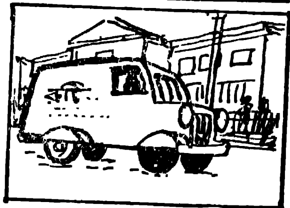
















কোথা হইতে কত স্থান ঘুরিয়া রুটি আমাদের হাতে আসে

বিশিষ্ট বস্তু ও নিরাকার 'সার্ভিস' দুইই আমরা উৎপাদন করি এবং উপভোগ করিয়া থাকি।

সমাজে যে-সমস্ত বস্তু আমরা প্রত্যহ ভোগ করি বা ব্যবহার করি তাহা ক্ষেত-খামার বা কারখানা হইতে উৎপন্ন হইয়া সোজা আমাদের গৃহে আসিয়া পৌঁছায় না। উৎপাদনের অনেক স্তর এবং বহুলোকের নানারকম 'সার্ভিসে'র ভিতর দিয়া তাহা ভোগ্য বস্তুরূপে আমাদের কাছে আসে। চায়ের সহিত আমরা যে পাউরুটির টোস্ট খাই, সেই পাউরুটির কথাই ধরা যাক :

পাউরুটি



আমরা দোকান হইতে কিনি, দোকানদার আমাদের 'সার্ভিস' দেয়।



দোকানদার বেকারি হইতে আনিয়া বিক্রয় করে।



বেকারির যন্ত্রে পাউরুটি তৈরী হয়। পাউরুটি তৈরী করিতে প্রধানত আটা-ময়দা লাগে।



আটাকলে আটা-ময়দা উৎপন্ন হয় যন্ত্রে। গম পিষিয়া ইহা তৈরী করা হয়।



জমি চাষ করিয়া গম উৎপাদন করে চাষী।

গমের উৎপাদক চাষী। এই গম নানারকমের যানবাহনে করিয়া কল-কারখানায় ও বাজারে চালান যায়।



গরুর গাড়ি, ট্রেন, নৌকা ইত্যাদিতে করিয়া ক্ষেতের গম বিভিন্ন স্থানে আড়তদারদের কাছে যায়। সেখান হইতে গাড়িতে বা লরিতে যায় আটাকলে—আটাকল হইতে লরিতে আটা-ময়দা যায় বেকারিতে—বেকারি হইতে রুটি ভ্যানে করিয়া যায় দোকানে—দোকান হইতে আমরা কিনিয়া খাই।

এইসব যানবাহন ও কল-কারখানা চালাইতে কয়লা, বাষ্প-বিদ্যুৎ প্রভৃতি যাহা দরকার হয় তাহাও উৎপাদন করিতে হয়।

একখণ্ড পাউরুটির জন্য এত কাণ্ড করিতে হয়। এইরকম প্রত্যেকটি জিনিসের ইতিহাস রচনা করা যায়। এককাপ চা, একমুঠো ভাত, একখানি

কাপড়, একটি বই, একটি টেবিল এবং আরও অনেক জিনিস এইভাবে আমরা ভোগ-ব্যবহার করি। কেবল যে বস্তুটি ব্যবহার করি তাহা নহে, তাহার সহিত বহুলোকের 'সার্ভিস'ও ভোগ করি।

সেকালের গ্রাম্যসমাজ

সেকালে ভারতের অধিকাংশ মানুষ, প্রাচীনকালের অন্যান্য দেশের মানুষের মতো, গ্রাম্যসমাজে বাস করিত। ভারতের মতো বিরাট মহাদেশতুল্য দেশে গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহিত যোগাযোগের অথবা জিনিসপত্র আদান-প্রদানের কোন সুবিধা ছিল না। স্বভাবতঃই গ্রাম্যসমাজকে মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতে আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী হইতে হইত। চাষী ক্ষেতে ফসল ফলাইত, কারিগররা থালা-বাসন কাপড়-চোপড় ছুরি-কাঁচি-বঁটি ইত্যাদি তৈরী করিত, এবং 'সার্ভিস' বা সমাজকর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা গ্রামের লোকেরা পাইত পুরোহিত ধোপা নাপিত প্রভৃতির কাছ হইতে। এই সার্ভিসের বদলে তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইত। দ্রব্যের বদলে দ্রব্যের বিনিময় হইত, টাকাপয়সার মাধ্যমে বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না; কারণ দ্রব্যও বেশী উৎপন্ন হইত না, তাহার চাহিদাও বেশী ছিল না, অভাবেরও বৈচিত্র্য ছিল না, গ্রাম্যসমাজের পরিধিও সংকীর্ণ ছিল, লোকসংখ্যাও অল্প ছিল। কাজেই গ্রাম্যসমাজকে বাহিরের জগতের উপর কোন প্রয়োজনের জন্য বিশেষ নির্ভর করিতে হইত না।

একালের সমাজে ভোগ্যবস্তু ও কর্ম

একালের সমাজ অনেক বেশী জটিল, লোকসংখ্যা অনেক বেশী, তাহাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাবও প্রত্যহ বাড়িতেছে, ভোগ্যবস্তু ও সার্ভিসেরও সেই অনুপাতে বিস্তার হইতেছে। বর্তমান সমাজে এই ভোগ্যবস্তু ও সার্ভিসের যেন অন্ত নাই মনে হয়। খাদ্য বস্ত্র ও গৃহ ছাড়া যে-সব বস্তু ও সার্ভিস আমরা দৈনন্দিন জীবনে উপভোগ করিয়া থাকি তাহা মোটামুটি এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

১। জলকল, ড্রেন, পথঘাট।

২। খাদ্যের মতো অন্যান্য ভোগ্যবস্তু—পান, সিগারেট ইত্যাদি।

৩। কয়লা, গ্যাস, আলো, বিদ্যুৎ।

৪। গৃহের আসবাব—ফার্নিচার, বাসন ইত্যাদি।

৫। গৃহস্থালীর জিনিস—সাবান, তেল, দেশলাই ইত্যাদি।

৬। বই, সংবাদপত্র।

৭। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, জলসা, প্রদর্শনী।

৮। যানবাহন—বিমান, ট্রেন, জাহাজ, স্টীমার, নৌকা, ট্রাম-বাস, ট্যাক্সি, রিক্শা।

৯। নিজেদের গাড়ি—মোটর, স্কুটার, সাইকেল ইত্যাদি।

১০। যোগাযোগ—ডাক, তার, টেলিফোন।

১১। দাসদাসী।

১২। অন্যান্য সার্ভিস—ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ হোটেল, দোকান-বাজার ইত্যাদি।

এই তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ করা যাইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি বিভিন্ন শ্রেণীর ভোগ্যবস্তু ও সার্ভিসের কথা এখানে প্রায় সব বলা হইয়াছে।

মোটরবাস একটি নিরেট বস্তু, তাহাতে চড়িয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া আমরা চলাচল করি। এই বাসটিকে আমরা সকলে ব্যবহার করি। কিন্তু শুধুই কি বাস বা ট্রাম নামে বস্তুটিকে আমরা ব্যবহার করি? না, তাহার সহিত আরও কিছু ব্যবহার ও উপভোগ করি? ট্রাম-বাসের ড্রাইভার ও কনডাক্টারদের যে কাজ তাহা কি কোন বস্তু? অথচ তাহারা কাজ না করিলে ট্রাম-বাস চলিবে না। তাহাদের কাজটি তাহা হইলে কি? সার্ভিস বা সমাজকর্ম। ট্রাম-বাসে চলিবার সময় এই সার্ভিসও ভোগ করি। রেলগাড়ি একটি বিরাটকায় বস্তু, তাহার কোচ, ইঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন কারখানায় উৎপন্ন হয়, বাষ্প ও বিদ্যুতের জন্য খনি হইতে কয়লা এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসকেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, কুলি, গার্ড, টিকিট-কলেক্টার, স্টেশনমাস্টার, সিগনালার, ওয়ার্কশপের শ্রমিক, কেরানী প্রভৃতি হাজার হাজার রেলকর্মচারীর কাজের জন্য এই বিরাটকায় বস্তুটি সচল রহিয়াছে এবং

তাহা সচল থাকিবার জন্য দেশ-দেশান্তরে চলাচল করা সম্ভব হইতেছে। হাজার হাজার রেলকর্মীর এই কাজকর্ম 'বস্তু' হিসাবে আমরা ভোগ করি না, 'সার্ভিস' হিসাবে ভোগ করি। এইরকম ডাক-তার বিভাগের, কর্পোরেশন ও মিউনিসিপালিটির হাজার হাজার কর্মীর কাজও 'সার্ভিস' বা সমাজকর্ম। এইধরনের নানাবিধ বস্তু ও নানাবিধ সার্ভিস আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত ভোগ করিয়া থাকি।

জীবনযাত্রার মান

ভোগ্যবস্তু ও সার্ভিসের ব্যবহারের সহিত জীবনযাত্রার মানের বা স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পর্ক আছে। কোন লোক বা পরিবার কি রকম গৃহে বাস করে, কি ধরনের খাদ্য খায় ও পোশাক ব্যবহার করে, গৃহের আসবাবপত্তর কি রকম, অন্যান্য ভোগ্যবস্তু কোন্ শ্রেণীর ও কত প্রকারের—এইসব বিচার করিয়া আমরা সেই লোকের বা পরিবারের জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করি। আমরা যে ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা খুব সহজ ও সরল বলিয়া জানি তাহার কারণ কিন্তু আধ্যাত্মিক নহে, অর্থনীতিক। যে-কোন দেশের অর্থনীতিক অবস্থার উপর সেই দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। কৃষি, খনিজ ও শিল্পবাণিজ্যে দেশ যদি সমৃদ্ধ ও উন্নত না হয় তাহা হইলে দেশের লোকের জীবনযাত্রাও উন্নত হইতে পারে না। ভোগ্যবস্তু ও সার্ভিস যদি দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে লোকে তাহা ভোগ করিবার জন্য কোথা হইতে পাইবে? বিদেশ হইতে সমস্ত জিনিস আমদানি করা সম্ভব নহে, যদি সম্ভব হয়ও তাহার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। এই অর্থ কোন দরিদ্র দেশের পক্ষে যোগান দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভোগ্য-বস্তু দেশে উৎপন্ন না হইলে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে না। তাহা করিতে হইলে কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদন-উপযোগী বস্তুও (capital goods) তৈরী করা প্রয়োজন। কেবল তাহা করিলেই যে দেশের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা উন্নত হইবে তাহা নহে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হইবে তাহার বণ্টনও (distribution) যতদূর সম্ভব সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়সংগতভাবে হওয়া

দরকার। তাহা না হইলে সমাজের উপরের একটি স্তরের লোকজনই দেশীয় সম্পদের অধিকাংশ ভোগ করিবে, সাধারণ লোক বঞ্চিত হইবে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে না। সুতরাং দেশের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে তিনটি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১। নানারকমের ভোগ্যবস্তু ও সার্ভিস প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। তাহা করিতে হইলে সেই অনুপাতে উৎপাদন-উপযোগী বস্তু, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও তৈরী করিতে হইবে।

৩। দেশের সম্পদ সর্বস্তরের লোকের মধ্যে প্রয়োজন, যোগ্যতা ও মেহনত অনুযায়ী সংগতভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ বলিয়া সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা এত সহজ ও সরল। 'যাহাদের ভোগ করিবার কোন আর্থিক ক্ষমতা ছিল না, নির্মম দারিদ্র্যের মধ্যে যে-দেশের অধিকাংশ লোক ভূমিষ্ঠ হইত, তাহাদের ভোগের লালসা বা বাসনা কিছুই থাকিত না। সুতরাং ভারতের জনসাধারণ চিরদিন বাধ্য হইয়া ভোগ না করিয়াই ত্যাগের আদর্শকে মহান বলিয়া মনে করিয়াছে এবং বাস্তব জীবনের বা ইহলোকের উন্নতির কথা না ভাবিয়া আধ্যাত্মিক আদর্শ ও পরলোকের চিন্তায় জীবনের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। সেই উদ্দেশ্যে পূর্বের তিনটি ব্যবস্থাই ভারত-সরকার যথাসম্ভব বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভোগ্যবস্তুর ব্যবহারের দিক দিয়া বিচার করিলে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের সাধারণ জীবনযাত্রার মান এখনও যে কত নিম্নস্তরে রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভোগ্যবস্তুর হিসাবে কয়েকটি বড় বড় দেশের সহিত তুলনা করিয়া এখানে এই মান নির্দেশ করা হইতেছে :

জীবনযাত্রার মান। ১৯৫৯-৬০

	গড় বাৎসরিক আয় (টাকা)	ব্যয় বা ভোগ (কিলোগ্রাম) শক্তি (কয়লা) ষ্টীল	গাড়ি, প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে	রেডিও, প্রতি ১,০০০ লোকের মধ্যে
ভারতবর্ষ	৩০২	১৪৫ + ৯	৬	৪
অস্ট্রেলিয়া	৫,৬৯১	৩,৬৮৪ + ৩০৭	১,৭৭২	২২
কানাডা	৭,৬২১	৫,৬০৬ + ৩৫৫	২,১৬৪	৫৫৪
জাপান	১,৪২৫	৯৬৫ + ১৬৩	৩৪	১৫৮
ইংলণ্ড	৪,৯০৭	৪,৫৯৪ + ৩৩২	৯৫৮	২৮৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০,৭০৮	৭,৮৩৪ + ৪৯১	৩,৩৫২	৯৪৮

ভারতবর্ষের লোকের বাৎসরিক আয় মাত্র ৩২০৲ টাকা, অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ৮৫ নয়া-পয়সা। এই আয় হইতে কতদূর কি ভোগ করা সম্ভব তাহা যে-কোন বালকও বুঝিতে পারে। কাজেই মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতেই ভারতের অধিকাংশ লোকের তহবিল শূন্য হইয়া যায়, তাহার পর অন্য কোন বস্তু ভোগ করিবার কথা চিন্তা করাও সম্ভব হয় না।

জাপানে প্রতি লোকের আয় ভারতের প্রায় পাঁচগুণ। সেইজন্য ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারও সেখানে বেশী। অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের আয় ভারত অপেক্ষা প্রায় ষোল হইতে আঠারগুণ বেশী এবং সেই অনুপাতে ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারও যে সেখানে কত বেশী তাহা উপরের তালিকার দিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লোকের আয় ভারতের প্রায় তেত্রিশগুণ বেশী। সাধারণ লোকের মধ্যে ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার সেখানে কোন্ স্তরে উঠিয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেখানে প্রত্যেক তিনজন লোকের মধ্যে একজন গাড়ি চড়ে। আর ভারতবর্ষে চড়ে (মালিক নহে) প্রত্যেক ১,৬০০ লোকের মধ্যে একজন। ভারতবর্ষে প্রত্যেক হাজার লোকের মধ্যে ৪ জনের রেডিও আছে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৯৪৮ জনের।

ভোগ্যবস্তু ও সার্ভিসের ব্যবহার না বাড়িলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে না। ইহা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভোগ্য-বস্তুর ব্যবহার বাড়াইতে হইলে প্রচুর পরিমাণে তাহা দেশে উৎপন্ন হওয়া

প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে দেশের লোকের আর্থিক আয়বৃদ্ধিও হওয়া দরকার। ইহার জন্য ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। এক-একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা যোজনার ভিতর দিয়া স্বাধীন ভারতে এই অর্থনীতিক উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে।

QUESTIONS

Group A

1. What are consumers' goods and services? Why certain things we enjoy are called 'services', and not 'goods'?

2. Write a short story to illustrate the production-exchange-consumption process on any one of the following goods we consume:

Bread, Tea, Rice

3. The standard of living of a people depends on their pattern of consumption. Discuss the statement with reference to India.

4. What are 'capital goods' or 'producers' goods'? How they are related to consumers' goods?

Group B

I. Travelling by public bus; Eating a cake; Reading a newspaper; Seeing a cinema; Wearing a trouser; Drinking a cup of tea; Using public roads; Using a private car.

What are you consuming here—'goods' or 'services'? Mark 'G' for goods and 'S' for services after each item.

II. Good songs are good consumers' goods.—

Bad pen is a bad consumers' service—

A domestic servant gives us service—

A public bus-driver does not give us service—

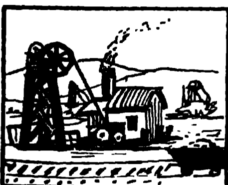
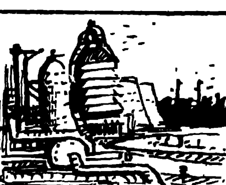
Write 'yes' if correct, and 'no' if incorrect in the space provided after each statement.

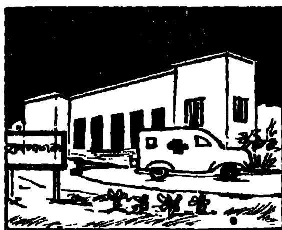


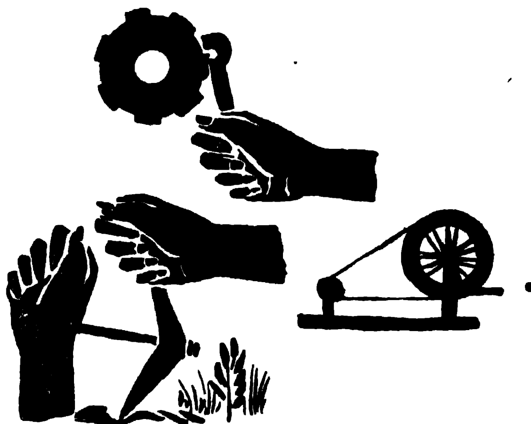


আমাদের জীবিকা







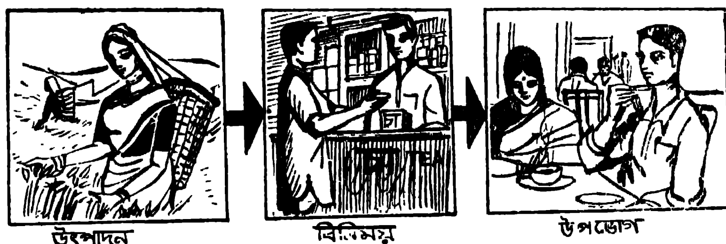
ষষ্ঠ প্রকরণ

বৃত্তি ও কর্ম

প্রতিপাদ্য। আমাদের প্রয়োজনের কথা আলোচনা করা হইয়াছে এবং সেই প্রয়োজন মিটাইবার উপায় কি তাহাও বলা হইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু যাহা আমরা জীবনধারণের জন্য ব্যবহার করি তাহা নিশ্চয় আগে উৎপাদন করা দরকার। কেবল উৎপাদন করিলেই যে কোন জিনিস ভোগের উপযুক্ত হইয়া ওঠে তাহা নহে। আগে আমরা একখণ্ড রুটির বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। রুটির সহিত এককাপ চায়ের কাহিনী বলিলেও তাহা বোঝা যাইবে। চা-ক্ষেতে চা-গাছ হইতে চা-পাতা সংগ্রহ করিলেই তাহা পানীয় হয় না। তাহা শুকাইয়া কারখানায় পানীয় চা-পাতায় পরিণত করিতে হয়। তারপর চা-বাগান হইতে সেই চা নানারকম যানবাহনে করিয়া শহর-বাজারের নিলামঘরে আসে এবং সেখান হইতে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের কাছে যায়। এককাপ পানীয় চা করিতে হইলে শুধু চা-পাতাতেও হয় না। তাহার সহিত চিনি লাগে, দুধ লাগে, জল গরম করিবার জন্য কয়লার আগুন বা বিদ্যুৎ লাগে, একটি কেটলি লাগে, চামচ লাগে, কাপ-প্লেটও লাগে। চা-বাগানে চা-পাতা হয়, চিনি হয় চিনির কারখানায়, দুধ হয় ডেয়ারী হইতে অথবা গোয়ালাদের কাছ হইতে পাওয়া

Unit 9. Our principal occpuation for meeting the basic needs : agriculture and supplementary occupations, forestry, mining, fishing and pastoral occupations, industries, transport, social services, e.g., education, health, entertainments, administration, law and order,

যায়, কয়লাখনি হইতে কয়লা আসে, কেটলি-চামচ কাপ-প্লেট তৈরি হয় বিভিন্ন কারখানায়। এতগুলি জিনিস উৎপন্ন হইলে এবং গৃহকোণে তাহাদের সমাবেশ ও সরবরাহ ঠিক থাকিলে তবেই আমরা এককাপ চা পান করিতে পারি। সামান্য এককাপ চায়ের জন্য যদি নানা জিনিস উৎপাদনের এই বিচিত্র কাহিনী



উৎপাদন বিনিময় উপভোগ

শুনিতে হয় তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের কাহিনী বলিতে গেলে তাহা কয়েকখণ্ড মহাভারতে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল চা ও রুটির কাহিনীই যথেষ্ট।

উৎপাদন (Production) ও উপভোগ (Consumption)—এই দুই দিক হইতে বিচার করিলে মানুষের এই বিরাট সমাজটিকে আমরা একটি বৃহৎ মার্কেট বা বাজারের সহিত তুলনা করিতে পারি। সমাজের এই বাজারে অসংখ্য মানুষ অসংখ্য প্রয়োজনে সর্বদা অসংখ্য জিনিস চাহিতেছে। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য সমস্ত জিনিস সমাজে সর্বদা উৎপন্ন হইতেছে এবং বাজারেও সর্বদা সরবরাহ হইতেছে। উৎপাদন যদি চাহিদা অনুপাতে পর্যাপ্ত না হয়, অর্থাৎ অল্প হয়, তাহা হইলে সেই জিনিসের দাম তখন বাড়িয়া যায়, আর যদি বেশী হয় তাহা হইলে দাম কমিয়া যায়। ইহা অর্থনীতির সরল সূত্র। ইহা আপাতত আমাদের আলোচ্য নহে। এখানে আমরা শুধু সমাজের বিশাল উৎপাদন-ব্যবস্থা ও বিনিময়-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিব। কতরকমের লোক যে এই উৎপাদন ও বিনিময়ের কাজকর্মে নিযুক্ত আছে তাহা কল্পনা করা যায় না। কতরকমের বৃত্তি ও পেশা যে মানুষের তাহাও চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। হাজার হাজার মানুষ যদি পরিশ্রম করিয়া এতরকমের জিনিস উৎপাদন না করিত এবং সমাজে তাহার চলাচল ও লেনদেনের ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে আমাদের কোন প্রয়োজন বা চাহিদা মিটিত না।

বৃত্তির বৈচিত্র্য

মানুষের বৃত্তির বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বিশেষ করিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের কথা চিন্তা করিলে তাহা আরও বেশী করিয়া মনে পড়ে। নানারকমের বৃত্তি ও পেশা হিন্দুসমাজে বংশানুক্রমে স্থায়ী হইয়া ক্রমে বিভিন্ন জাতিবর্ণের রূপধারণ করিয়াছে। হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণভেদ অনেকটা বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বভাবতঃই সেইজন্য প্রত্যেক বৃত্তি ও পেশা সমাজে বংশানুক্রমে পালিত হইত। যাহারা কৃষিকাজ করিত তাহারা কৃষক, যাহারা মাছ ধরিত তাহারা ধীবর বা জেলে, যাহারা পশুপালন বা গোপালন করিত তাহারা গোপ বা গোয়ালা, যাহারা লোহার কাজ করিত তাহারা কর্মকার লোহার বা কামার, যাহারা সোনারূপার কাজ করিত তাহারা স্বর্ণকার, যাহারা মণিরত্নের কাজ করিত তাহারা মণিকার, যাহারা তাঁত বুনিত তাহারা তন্তুবায় বা তাঁতি, যাহারা কাঠের কাজ করিত তাহারা সূত্রধর বা ছুতার, যাহারা মাটির পাত্র তৈরি করিত তাহারা কুম্ভকার বা কুমোর ইত্যাদি। এইরকম বিভিন্ন বৃত্তিজীবী বহু জাতি ও বর্ণ ছিল ভারতবর্ষে এবং এখনও আছে।

হাতের কাজকর্ম ছাড়া যাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য বৃত্তি ছিল তাহারাও সেইবৃত্তি বংশানুক্রমে পালন করিয়া এক-একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। যেমন যাহারা সোনার ব্যবসা করিত (হাতের কাজ নহে) তাহারা সুবর্ণবণিক, যাহারা পণ্যদ্রব্য ও মশলাপাতির ব্যবসা করিত তাহারা গন্ধবণিক ও তাম্বুলিবণিক, যাহারা তেলের ব্যবসা করিত তাহারা তেলি বা কলু—এরকম নানাজাতির বণিকরাও সমাজে ছিল। কায়স্থদের পেশা ছিল লেখাপড়ার ও কেরানীর কাজ করা। বৈদ্যদের পেশা ছিল চিকিৎসা করা (সেইজন্য আজও আমরা 'ডাক্তারবদ্যি' বলি) এবং ব্রাহ্মণদের বৃত্তি ছিল শাস্ত্রবিদ্যা চর্চা করা ও পূজার্চনা করা। এই বৃত্তিগত জাতিবর্ণের উপর হিন্দুসমাজের ভিত্ এত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে বহুযুগের বহু সামাজিক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই এবং আধুনিক যুগেও তাহা লোপ পায় নাই। ভারতীয় সমাজের এই জাতিবর্ণবিন্যাসের দীর্ঘস্থায়িতা সকল দেশের সমাজতত্ত্ববিদ্দের কৌতূহলের বিষয়।

বৃত্তির বৈচিত্র্য মানুষের সমাজে ক্রমে বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই। সমাজ

যত বড় ও জটিল হইয়াছে মানুষের অভাব প্রয়োজন ও চাহিদা তত বাড়িয়াছে এবং সেই অনুপাতে বৃত্তি ও পেশার বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজে বৃত্তি আর জাতিবর্ণগত নহে এবং কোন বিশেষ বর্ণমুখী গতি বা ঝোঁকও তাহার নাই, থাকা সম্ভবও নহে। যেমন বিদ্যাচর্চা করার অধিকার আজ আর কেবল ব্রাহ্মণের বা উচ্চবর্ণের একচেটিয়া নহে, সকল বর্ণের সমান অধিকার। তেমনি আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদেরও কোন জাতি নাই। আধুনিক সমাজে মানুষ তাহার গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তি গ্রহণ করে এবং তাহা বংশানুক্রমিক বৃত্তি হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। ইঞ্জিনিয়ারের পুত্র শিল্পী হইতে পারে, আবার শিল্পীর পুত্রেরও ইঞ্জিনিয়ার হইতে বাধা নাই। সেইজন্য আধুনিক সমাজে জাতিবর্ণভেদে বৃত্তিভেদ করা হয় না, বৃত্তিরূপেই বৃত্তিকে বিচার করা হয়।

আধুনিক ভারতীয় সমাজে বৃত্তিবৈচিত্র্য

আধুনিক সমাজে বৃত্তিবৈচিত্র্য সমস্ত দেশেই প্রায় একরকম, কেবল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর সংখ্যার পার্থক্য আছে। এসিয়ার দেশগুলিতে ও আফ্রিকায় কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও পশুপালকদের সংখ্যা যত বেশী, ইউরোপে ও আমেরিকায় তাহা নহে। আবার ইউরোপ-আমেরিকায় কলকারখানার শ্রমজীবীর সংখ্যা এসিয়ার তুলনায় অনেক বেশী। যেদেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের তুলনায় বেশী, সেদেশের সমাজকে আমরা 'কৃষিপ্রধান' সমাজ বলি। তেমনি যেদেশে শ্রমজীবীদের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় বেশী, সেদেশের সমাজকে আমরা বলি 'শিল্পপ্রধান' সমাজ। এইভাবে বিচার করিলে আমাদের ভারতবর্ষের সমাজকে কি ধরনের সমাজ বলা যায়? ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭০ জন, তাই ভারতীয় সমাজকে কৃষিপ্রধান সমাজ বলা হয়। আগে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশী ছিল, প্রায় শতকরা ৮০-৯০ জন হইবে। এখন শ্রমশিল্প ও কলকারখানার বিস্তারের ফলে এবং অন্যান্য সামাজিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে কৃষিজীবীর সংখ্যাও কিছু কমিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আজও ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী এবং ভারতীয় সমাজ নিঃসন্দেহে কৃষিপ্রধান সমাজ। কৃষিকর্মই ভারতের অধিকাংশ লোকের বৃত্তি।

মৎস্যচাষ, পশুপালন ইত্যাদি। কৃষিকর্মের আনুষঙ্গিক কতকগুলি কর্ম আছে, যেমন পশুপালন, হাঁসমুরগি পালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি। কৃষকেরা প্রধানত কৃষিকাজ করিলেও তাহাদের ঘরে কয়েকটি গরু, কিছু হাঁসমুরগি, কাহারও বা একটি ছোট পুকুরে কিছু মাছ এবং ঘরের সংলগ্ন জমিতে কিছু শাকসবজি থাকে। অধিকাংশ কৃষকেরই ইহাতে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজন না মিটাইয়া বাহিরেরও কিছু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষিকাজের সহিত একত্রে এই কাজগুলি করা যায় তাহা হইলে তাহাতে চাষীর সুবিধা হয় অনেক। এই ধরনের আনুষঙ্গিক কাজগুলি কৃষিকাজের সহিত একত্রে করিলে তাহাকে 'মিশ্র-চাষ' বা 'mixed farming' বলা হয়। আমাদের দেশের কৃষকরা, প্রধানত আর্থিক অভাবের জন্য, এই ধরনের মিশ্র-চাষ করিতে সাধারণত অভ্যস্ত নহে। সম্প্রতি আমাদের দেশে কৃষকদের মধ্যে এই মিশ্র-চাষের কিছু কিছু প্রচলন হইতেছে। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে এই মিশ্র-চাষের প্রচলন বেশী।

বন ও খনির কাজ। ভারতে বনজ ও খনিজ সম্পদ প্রচুর আছে। খনি হইতে অথবা বন হইতে এই সব সম্পদ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। তাহার জন্য বহুলোককে বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ খনিজের উৎসকেন্দ্রে এবং বন-উপবনে কাজে নিযুক্ত থাকিতে হয়। এই সব বনজ ও খনিজ সম্পদ হইতে পরে কল-কারখানায় নানারকমের জিনিস তৈরি করা হয়। কয়লার মতো কোন কোন খনিজ পদার্থ এবং জ্বালানী কাঠের মতো কোন কোন বনজ পদার্থও সোজাসুজি আমাদের ব্যবহারে লাগে।

শিল্পকর্ম। সমাজের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপভোগের পণ্যদ্রব্য ছোটবড় বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও কল-কারখানায় তৈরী হয়। শিল্প-প্রধান সমাজে এই সব প্রতিষ্ঠান ও কারখানার সংখ্যা এত বেশী যে দেশের অধিকাংশ কর্মক্ষম লোককে সেখানেই কাজ করিতে হয়। সেইজন্য শিল্প-প্রধান সমাজে শ্রমজীবীদের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী। সম্প্রতি ভারতবর্ষে নানারকম শিল্প-কারখানার দ্রুত বিস্তার হইতেছে এবং শিল্পকর্মী ও শ্রমজীবীদের সংখ্যাও বাড়িতেছে। কৃষিজীবীদের

তুলনায় কম হইলেও আধুনিক ভারতে শিল্পজীবীদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে।

ব্যবসা-বাণিজ্য। ক্ষেতখামারে ও কল-কারখানায় যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমাদের ঘরে ভোগের জন্য সোজা চলিয়া আসিতেছে না, অথবা বাহিরেও চালান যাইতেছে না। এই বিপুল পণ্যদ্রব্যের আনাগোনা ও লেনদেনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে ব্যবসায়ীদের। এই ব্যবসায়ীরা নিজেরা কোন পণ্য উৎপাদন না করিলেও সমাজের লোকদের 'সার্ভিস' দিয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অগণিত ভোগ-দ্রব্যের আদানপ্রদানের পথ সুগম করিয়া দেয়। প্রত্যক্ষ উৎপাদকের মতো সমাজে তাই ব্যবসায়ীদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

যানবাহন ও যোগাযোগ। বিমান ট্রেন স্টীমার ট্রাম বাস ট্যাক্সি ইত্যাদি যানবাহন, এবং টেলিফোন ডাক-তার প্রভৃতি যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকিলে মানুষের জীবন অচল হইয়া যাইত। বাঁচার জন্য যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের প্রয়োজন, তেমনি চলারও প্রয়োজন। এই চলাচলের ব্যবস্থাকে সচল রাখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক বিমান, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন, স্টীমার, নৌকা, সাধারণ যানবাহন ইত্যাদি পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছে। এই সব বিভাগের কর্মীরাও কেহ নীরেট কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে না, 'সার্ভিস' উৎপাদন করে এবং আমরা তাহা উপভোগ করি। একথা আগে বলা হইয়াছে (পঞ্চম প্রকরণ)।

সমাজকর্ম। ব্যবসাবাণিজ্য ও যানবাহনাদি পরিচালনার কাজও সামাজিক কাজ। কিন্তু তবু কতকগুলি বিশিষ্ট কাজকর্মকে আমরা 'সোশ্যাল সার্ভিস' বা সমাজকর্ম বলিয়া থাকি। এই সব সমাজকর্মের মধ্যে প্রধান হইল— শিক্ষা স্বাস্থ্য আমোদপ্রমোদ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা। শিক্ষকরা যে শিক্ষাদান করেন তাহা কোন বস্তু নহে, 'সার্ভিস'। যে-কোন জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের এই সমাজকর্মের উপর নির্ভর করে। শিশু, বালক ও তরুণদের মধ্যে ভবিষ্যৎ মানুষের যে বীজ থাকে শিক্ষকদের শিক্ষার ফলে সেই বীজ গাছ ও ফলফুলে পরিণত হয়। তাঁহাদের উপরেই ভবিষ্যতের দেশকর্মী গড়িয়া

তোলার ভার থাকে। এতবড় মহৎ সমাজকর্ম যাঁহারা করেন তাঁহারা শ্রমের জন্য যে পারিশ্রমিক পান তাহা কাজের গুরুত্বের তুলনায় কিছুই নহে। সমাজ-সেবা বা সমাজকর্ম শিক্ষাব্রতীদের জীবনের প্রধান আদর্শ বলিয়া তাঁহারা এই কাজ নিষ্ঠার সহিত করিতে পারেন।

দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর তাঁহারাও কোন বস্তু উৎপাদন করেন না, সমাজকে 'সার্ভিস' দেন। আমোদপ্রমোদের নানারকম ব্যবস্থার সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট তাঁহারাও কি কোন বস্তু উৎপাদন করেন? একেবারেই না। যাঁহারা নৃত্যশিল্পী, সুরশিল্পী, অভিনয়শিল্পী, চিত্রশিল্পী তাঁহারা যদি কোন জিনিস উৎপাদন করেন তবে তাহাকে 'সৌন্দর্য' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। 'সৌন্দর্য' ভাত-কাপড়ের মতো নীরেট কোন পদার্থ নহে। তাহা হইলে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা সমাজের কি কাজ করেন? গোঁড়া অর্থনীতিবিদ্‌রা হয়ত বলিবেন যে কিছুই করেন না, বসিয়া বসিয়া অবসর বিনোদনের জন্য কতকগুলি বাজে কাজ করেন এবং অন্যদের মেহনতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ভোগ করিয়া জীবন কাটান। কথাটি সত্য নহে। যাহারা মেহনত করিতেছে তাহারাও গান শুনিতে চায়, নাচ ও অভিনয় দেখিতে চায়, ছবি দেখিতে চায়, সিনেমা ও থিয়েটার দেখিতে চায়, রেডিও শুনিতে চায়, কারণ মেহনত করিলে আরাম ও বিরাম প্রয়োজন এবং মেহনত করিতে যে প্রেরণা প্রয়োজন তাহা এই শিল্পীদের নানাবিধ কাজের ভিতর দিয়া পাওয়া যায়। দেহের মতো মনেরও খাদ্যের প্রয়োজন হয়, শিল্পীরা আনন্দ পরিবেশন করিয়া সেই খাদ্য সরবরাহ করেন। আনন্দের কোন বাস্তব রূপ নাই, কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমাজকর্ম।

দেশের বিরাট প্রশাসন-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাদির সহিত যাঁহারা সংযুক্ত তাঁহারাও সমাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করেন না। কিন্তু তাহা না করিলেও সকলেই জানেন যে তাঁহাদের কাজকর্মের সামাজিক গুরুত্ব কতখানি। সেইজন্য ইহাদের সকলের কাজকেই 'সোশ্যাল সার্ভিস' বা সমাজকর্ম বলা হয়। কৃষিকর্ম, শিল্পকর্ম ও বাণিজ্যকর্মের মতো সমাজকর্মও গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বের তারতম্য কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটি কর্মের গুরুত্ব যে যথেষ্ট আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর সংখ্যা

১৯৫১ সালের সেন্সাসের গণনায় ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ কোটি। ইহার মধ্যে প্রায় ২৪ কোটি লোক নানারকমের কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল এবং ১০ কোটির কিছু বেশী লোক শিল্পকর্ম, বাণিজ্য ও যানবাহনাদির কাজকর্ম করিত। শতকরা হিসাবে কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ জন এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবীর সংখ্যা ৩০ জন। অর্থাৎ প্রত্যেক ১০ জন ভারতবাসীর মধ্যে ৭ জন কৃষক ও ৩ জন অন্যান্য বৃত্তিজীবী। ১৯৬১ সালের সেন্সাসের বৃত্তিগত হিসাব সবেমাত্র পাওয়া গিয়াছে। জানা গিয়াছে যে ১৯৫১-১৯৬০



ভারতের অধিকাংশ লোকের বৃত্তি কৃষিকর্ম

সালের মধ্যে, গত ১০ বছরে, ভারতের লোকসংখ্যা আরও প্রায় ৭ কোটি ৭০ লক্ষ বাড়িয়া বর্তমানে ৪৩ কোটির মতো হইয়াছে। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আগেকার বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সংখ্যাও কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু বৃত্তির শ্রেণীভেদে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। অর্থাৎ কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীর আনুপাতিক হারে সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে মাত্র, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। যদি শ্রমশিল্পের অতিদ্রুত অগ্রগতি হইত এবং যান্ত্রিক ও

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ বেশী পরিমাণে প্রচলিত হইত তাহা হইলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিজীবীর পূর্বেকার অনুপাতিক হারে আরও বেশী তারতম্য ঘটিত। কিন্তু শিল্পায়নক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি হইলেও তাহা খুব দ্রুত হয় নাই, মাত্র দশ বছরের মধ্যে তাহা হইতেও পারে না। আরও বড় কথা হইতেছে এই যে কৃষিক্ষেত্রে ভারতে আজও যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তেমন প্রচলন হয় নাই। যদি তাহা হইত এবং শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিত তাহা হইলে কৃষিকাজের জন্য বর্তমানের তুলনায় আরও অনেক কম লোক লাগিত। কৃষিকার্য হইতে মুক্ত লোকেরা তখন শিল্পকারখানার শ্রমিক হইতে পারিত এবং তাহার ফলে কৃষিজীবীর সংখ্যা কমিত ও শ্রমজীবীর সংখ্যা বাড়িত। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এখনও তাহা হয় নাই, হয়ত ভবিষ্যতে হইতে পারে। সেইজন্য গত দশ বছরে (১৯৫১-৬১) ভারতে যে ৮ কোটি লোক বাড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় কৃষিজীবীর সংখ্যা শতকরা চারজন মাত্র কমিয়াছে, ৬৬·৮৮% হইতে ৬৪·৮৮% হইয়াছে। তাহা হইলে বর্তমানে ভারতে মোট কৃষিজীবীর সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ২৭ কোটি এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবীর সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। কৃষি ও তাহার অনুরূপ কাজকর্মের উপর আজও ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতি যে কতখানি নির্ভরশীল তাহা বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর এই পরিচয় হইতে বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর দান

ভারতের জাতীয় আয়ে কোন্ শ্রেণীর বৃত্তিজীবীর কতখানি দান তাহাও জানা আবশ্যক। দেশের লোক সকলে মিলিয়া মেহনত ও কাজকর্ম করিয়া দেশের জন্য যে সম্পদ উৎপাদন করে তাহাকে 'জাতীয় আয়' বা 'National Income' বলে। ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষিজীদের দান। বাকি অর্ধেককে তিনভাগ করিলে একভাগ খনি ও কলকারখানার কর্মীদের, একভাগ ব্যাঙ্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহনাদি বিভাগের কর্মীদের এবং আর একভাগ অন্যান্য সমাজকর্মে নিযুক্ত কর্মীদের দান। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করিবার আছে। ভারতের জাতীয় আয়ে খনি ও কলকারখানার শ্রমিকদের দান যে পরিমাণে, তাহার দ্বিগুণ দান বিভিন্ন সমাজকর্মে নিযুক্ত কর্মীদের। এই সমাজকর্মে নিযুক্ত কর্মীরা ভোগ্য 'বস্তু' উৎপাদন করে না, ভোগ্য 'সার্ভিস' উৎপাদন করে।

ভারতের জাতীয় আয়ে দান

কৃষিজীবী	: $\frac{১}{২}=৫০\%$
খনি ও কলকারখানার কর্মীরা	: $\frac{১}{৬}=১৬\frac{২}{৩}\%$
ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহনাদির কর্মীরা	: $\frac{১}{৬}=১৬\frac{২}{৩}\%$
অন্যান্য সামাজিক বৃত্তিজীবীরা	: $\frac{১}{৬}=১৬\frac{২}{৩}\%$

ভারতের জাতীয় আয়ের অর্ধেক যে কৃষিজীবীরা দান করে তাহারা গ্রামে বাস করে, শহরে বাস করে না, কারণ কৃষিকাজ শহরে করা যায় না। ভারতে শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে, তাহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। এই গ্রামবাসীদের আয় (কৃষিজীবীদেরও) গড়ে বছরে ৩১৫৲ টাকা, অর্থাৎ দৈনিক ৮০ নয়া-পয়সা মাত্র। শহরবাসীরা গড়ে ইহার প্রায় দ্বিগুণ আয় করে, অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১৲ টাকা ৬০ নয়া-পয়সা। দেশের জাতীয় আয়ে যাহাদের দান প্রায় অর্ধেক তাহাদের নিজেদের আয় আরও অনেক বৃদ্ধি হওয়া দরকার, তাহা না হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে পারে না।

QUESTIONS

Group A

1. What are your principal occupations for meeting the basic needs ?

বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিতে হইবে।

2. What is the main occupation of the majority of Indian people ?

কৃষিকাজ সম্বন্ধে লিখিতে হইবে।

3. Do you think 'social services' and the 'production' of crops and commodities are equally important in society?

ফসল-উৎপাদন বা পণ্য-উৎপাদনের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও সমাজকর্মেরও যে বর্তমান সমাজে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। সমাজকর্ম বা 'সোশ্যাল সার্ভিস' যাঁহারা করেন তাঁহারাও

'সার্ভিস' উৎপাদন করেন, ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে (পঞ্চম প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

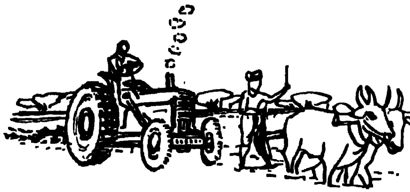
Group B

I. (a) Agriculture and allied occupations account for nearly—per cent of our national income.

(b) About——persons in 100 are dependent on land for living in India.

(c) About——persons in 100 in India are non-agriculturists.

Fill in the space with figures.



সপ্তম প্রকরণ । প্রথম অধ্যায়

কৃষিকাজ

প্রতিপাদ্য। ভারতের অধিকাংশ লোকের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। প্রত্যেক দশজন ভারতবাসীর মধ্যে অন্তত সাতজন কৃষিকাজ করিয়া জীবন-ধারণ করে। ভারতের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিক ভিত্তির আজও বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, সম্প্রতি শ্রমশিল্পের প্রসারের ফলে ইহার পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। কিন্তু কেবল শ্রমশিল্পের প্রসার হইলেই যে ভারতের কৃষিপ্রাধান্য কমিয়া যাইবে তাহা নহে। যতদিন না কৃষিকাজে প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প লোকবল লইয়া বেশী পরিমাণে ফসল ফলানো যাইবে, ততদিন কৃষির বন্ধন হইতে কৃষিজীবীরা মুক্ত হইবে না।

ভারতের কৃষিকাজের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হইল দুইটি—কৃষকদের দারিদ্র্য এবং তাহাদের অশিক্ষা ও কুসংস্কার। আমরা জানি যে ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষিজীবীদের দান সর্বাপেক্ষা বেশী, অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের দান তাহা অপেক্ষা অনেক কম। অথচ কৃষিজীবীদের দৈনিক আয় গড়ে ৮০ নয়া-পয়সার বেশী নহে। এই আয় হইতে একজন মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যাহারা নিজেরা বাঁচিবার সংস্থান করিতে পারে না, তাহারা কৃষির উন্নতি করিবে কি করিয়া? সেই চিন্তা করিবারই বা তাহাদের সুযোগ কোথায়? ঋতুর

Unit 7. Detailed studies of the important occupations and services.

(i) Agriculture—Principal Crops—types of agriculture—geographical factors and methods of cultivation. Need for irrigation—the role of River Valley Projects in India's economic progress. The problem of self-sufficienoy in Food.

A comparative study between India and a few other countries, e.g., Japan; Egypt, U.S.A., U.S.S.R.; regarding crops, methods of cultivation and yield.

চক্রবৎ পরিবর্তনের মতো তাহাদের নিজেদের জীবন ও কর্ম যান্ত্রিক চক্রবৎ আবর্তিত হইতে থাকে। খড়িফশস্যের পর রবিশস্য, তাহার পর আবার খড়িফশস্য, এইভাবে শস্যের চক্রও ঘুরিতে থাকে। কৃষকের নিজের জীবনের যেমন উন্নতি নাই, ভবিষ্যতের আশা-ভরসা নাই, তেমনি তাহার ফসলেরও উন্নতি নাই বা ভবিষ্যতের ভরসা নাই। এককোঁটা বৃষ্টির জন্য আজও ভারতের অধিকাংশ কৃষককে আকাশে মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। সেচব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইলেও কৃষকদের চাহিদা ও জলাভাবের তুলনায় তাহা পর্যাপ্ত নহে। তাহা ছাড়া মাটির মানুষ বলিয়া ভারতের কৃষকদের সামাজিক সংস্কার ও প্রথার প্রতি মমতা অত্যন্ত গভীর। দেনায় মাথা পর্যন্ত ডুবিয়া থাকিলেও ভারতের কৃষকদের বারমাসে তের পার্বণ লাগিয়াই আছে এবং খরচ-খরচাও কম হয় না। যাহারা নিজেরা দুইবেলা দুইমুঠা খাইতে পায় না, তাহারা পুত্রকন্যার বিবাহে নির্বিবাদে দেনা করিয়া গ্রাম্যসমাজকে ভোজ দিয়া খুশী হয়। দেনা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদে-আসলে বাড়িতে থাকে এবং বংশানুক্রমে দুঃসহ বোঝার মতো স্কন্ধে ভর করিয়া থাকে। তাহা হইতে মুক্তির আর কোন উপায় থাকে না। সারাজীবন ক্ষেতে ফসল ফলাইয়া তাহা মহাজনের ঘরে তুলিয়া দিতে হয়। কৃষকের জীবনের চারিদিকে যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনাইয়া ওঠে, তাহার ভিতরে আলোর ক্ষীণ রশ্মিটুকুও দেখা যায় না। এই নৈরাশ্যের মধ্যে তাহারা কৃষিকাজের উন্নতির কথা, অথবা অধিক পরিমাণে ফসল ফলানোর কথা ভাবিতেই পারে না।

এই কৃষকরা আমাদের দেশে কতকরকমের ফসল ফলায়, কি উপায়ে তাহা ফলায়, তাহার জন্য কতখানি তাহাদের আঞ্চলিক আবহাওয়ার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, বর্তমানের নদ-নদী পরিকল্পনায় কতটুকু সেচের প্রয়োজন মিটিতে পারে এবং মোট উৎপন্ন ফসলে, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যে, ভারতের জনসাধারণের চাহিদাই বা কতখানি মিটিতে পারে—এই সকল বিষয় লইয়া এইবার আমরা আলোচনা করিব।

ভারতীয় কৃষির প্রধান বিশেষত্ব

ভারতে শতকরা ৮৩ জন লোক গ্রামবাসী, অর্থাৎ প্রত্যেক ১০ জন লোকের মধ্যে ৮ জনের কিছু বেশী লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এই ৮ জনের মধ্যে ৭ জন লোক চাষ বা চাষের অনুরূপ কোন কাজকর্ম (যেমন পশুপালন)

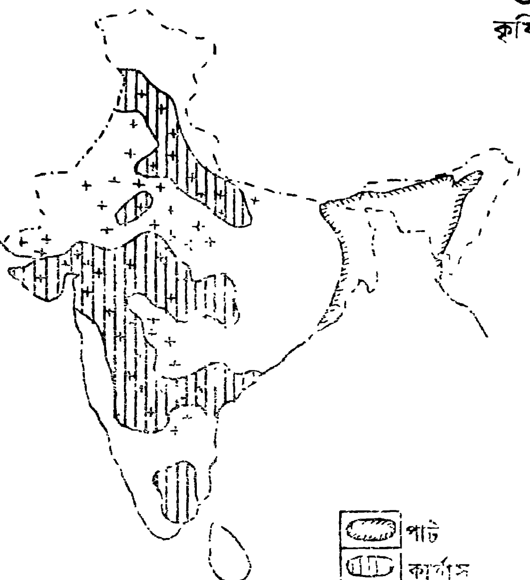
করিয়া জীবনধারণ করে। চাষের জমি প্রত্যেক চাষীর গড়ে এক একরের কিছু কম।

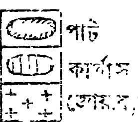
চাষ করিবার প্রধান ঋতু দুইটি। বর্ষার সময় জমি চষিয়া বীজ বপন করিয়া কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে যে ফসল তোলা হয় তাহাকে বলে 'খড়িফ শস্য', বর্ষার শেষে বীজ বপন করিয়া মাঘ-ফাল্গুন মাসে যে ফসল তোলা হয় তাহাকে বলে 'রবিশস্য'। একই জমিতে এই দুইরকমের ফসল ফলানো হয় একটির পর একটি করিয়া। যেমন উত্তরভারতে আষাঢ় মাসে ধান বপন করিয়া কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা হয়। তারপর সেই জমি পরবর্তী কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত পড়িয়া থাকে এবং তাহাতে ঐ সময় গম চাষ করিয়া মাঘ-ফাল্গুন মাসে ফসল তোলা হয়। আবার সেই জমি আষাঢ় মাসে ধানচাষের জন্য তৈরী করা হয়। একই জমিতে ধান (খড়িফশস্য) ও গম (রবিশস্য) ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া চাষ করিবার ফলে জমি বছরে কিছুকাল অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহা ভারতীয় কৃষির চিরন্তন সমস্যা। একই জমিতে ঘুরাইয়া দুইরকম ফসল চাষ করিবার জন্য এইভাবে কিছুকাল জমি যে বিনা চাষে পড়িয়া থাকে তাহাকে 'আবাদী পতিত' বা 'চলতি অনাবাদী' (current fallow) জমি বলা হয়। কৃষিযোগ্য জমির প্রায় পাঁচভাগের একভাগ এইভাবে বিনা চাষে পড়িয়া থাকে।

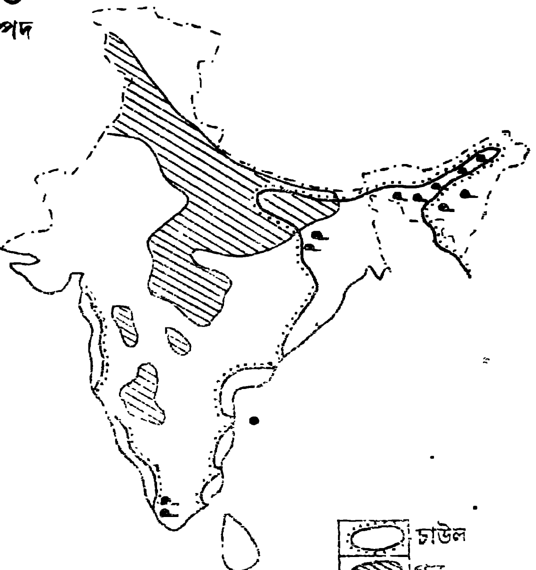
ভারতীয় কৃষিজ ফসল প্রধানত দুইরকমের—খাদ্যফসল (food crops) ও পণ্যফসল (cash crops)। যে সমস্ত ফসল খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয় তাহাকে খাদ্যফসল বলে—যেমন ধান গম বাজরা ইত্যাদি। যে সমস্ত ফসল বাণিজ্যের পণ্যরূপে বা কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহাকে বলে পণ্যফসল—যেমন তুলা পাট ইত্যাদি। ভারতের মোট আবাদী জমির প্রায় চারভাগের তিনভাগে খাদ্যফসল এবং বাকি একভাগে পণ্যফসল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু লক্ষণীয় হইল যে মোট উৎপন্ন খাদ্যফসলের মূল্য ও পণ্যফসলের মূল্য প্রায় এক, তাহাদের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নাই। খাদ্যফসলের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল ধান, ফসলী জমির পাঁচ-ভাগের একভাগ কি তাহার কিছু বেশী জমিতে (২২%) ধানচাষ করা হয়, আর দশভাগের একভাগ কি তাহার কিছু কম জমিতে (৯%) গমচাষ করা হয়। ধানের পর ভারতের প্রধান খাদ্যফসল হইল বাজরা জোয়ার ইত্যাদি মিলেট-জাতীয় শস্য। পণ্যফসলের মধ্যে অন্যতম হইল লা পাট আখতু

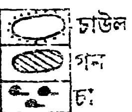
৬

ভারত
কৃষি সম্পদ









ভারতে খাদ্যফসল ও পণ্যফসল চাষের প্রধান অঞ্চল

তৈলবীজ (সরিষা তিল তিসি চীনাবাদাম রেড়ী রাই) ইত্যাদি। পণ্যফসলের চাষ খাদ্যফসলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প জমিতে হইলেও তাহার মূল্য খাদ্যফসলের প্রায় সমান। একথা মনে রাখা দরকার।

আবাদী জমির পাঁচভাগের একভাগ জমিতে মাত্র জলসেচের ব্যবস্থা আছে। সেচব্যবস্থাযুক্ত এই একভাগ জমিকে পাঁচভাগ করিলে চারভাগ হইবে খাদ্য-ফসলের জমি এবং একভাগ পণ্যফসলের জমি। অর্থাৎ সেচের ব্যবস্থা খাদ্য-ফসলের জমিতে যতটুকু আছে, পণ্যফসলের জমিতে তাহাও নাই। খাদ্য ফসলের মধ্যে আবার প্রায় অর্ধেক ধানজমিতে (৪৫%) সেচব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি পণ্যফসলের জমিতেও সেচের উন্নতির জন্য দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সেচব্যবস্থা আছে এইরকম চাষের জমিকে যদি 'পাঁচ একর' করিয়া এক-একটি প্লটে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে গড়ে দুইটি প্লটে ক্যানাল বা খাল হইতে, একটি প্লটে ট্যাঙ্ক হইতে এবং বাকি দুইটি প্লটে পাতকুয়া বা ইঁদারা হইতে অথবা অন্য কোন উপায়ে সেচের ব্যবস্থা আছে।

যতরকম উপায়ে সম্ভব কৃষিজীবীদের মধ্যে রাসায়নিক সার (chemical fertilizer) ব্যবহারের উপযোগিতার কথা প্রচার করা হইতেছে এবং ধীরে ধীরে কৃষকদের মধ্যে এই সারের প্রচলনও হইতেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কতকটা আর্থিক অভাবের জন্য এবং কতকটা চিরদিনের অভ্যাসের জন্য কৃষকদের মধ্যে রাসায়নিক সারের আশানুরূপ প্রচলন হয় নাই। বর্তমানে প্রতি একর ফসলী জমিতে গড়ে ৬ পাউণ্ডের কিছু কম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হইতেছে।

সেচ ও সারের অবস্থা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশে চাষের জমিতে খুব ভাল ফসল ফলিতে পারে না এবং তাহা ফলেও না। ভাল ফসল ফলাইতে হইলে আরও অনেক উন্নত সেচব্যবস্থা প্রয়োজন এবং চাষের জমিতে আরও অনেক বেশী পরিমাণে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশে এক একর জমিতে গড়ে প্রায় ৮০০ পাউণ্ড চাল, ৭০০ পাউণ্ড গম এবং সবরকমের খাদ্যশস্য মিলাইয়া প্রায় ৬০০ পাউণ্ড শস্য উৎপন্ন হয়। চীনাবাদাম হয় গড়ে প্রতি একরে ৭৫০ পাউণ্ড, তুলা ৯০ পাউণ্ড ও আখের গুড় ৩৩০০ পাউণ্ড। সেচ ও সারের উন্নতি হইলে প্রত্যেকটি ফসল ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে।

ভারতের কৃষি ও কৃষিজ ফসলের এই চিত্র খুব উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ নহে।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের কথা মনে করিয়া এই অবস্থার বিচার করিলে আমাদের অভাব ও সংকটের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। কৃষিনির্ভর দেশ ভারতের সামাজিক ও অর্থনীতিক সমৃদ্ধি যে অনেকাংশে কৃষির উন্নতির উপর নির্ভর করে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতের কৃষিজ ফসলের বিবরণ*

ভারতের ফসলের কথা জানিবার আগে আবাদযোগ্য জমিজমার অবস্থা কি এবং কিভাবে তাহা ব্যবহার করা হয় তাহা জানা দরকার। ভারতের সার্ভেয়র-জেনারেলের ম্যাপ অনুযায়ী মোট জমির আয়তন বর্তমানে প্রায় ৮০ কোটি ৬০ লক্ষ একর, আর গ্রামের দলিলপত্রের হিসাবে (শতকরা ৯০ ভাগ জমির হিসাব পাওয়া যায়) প্রায় ৭২ কোটি ৩০ লক্ষ একর। এই জমি কি কাজে ব্যবহার করা হইতেছে তাহার হিসাব এই :

১৯৫৫-৫৬

(দশলক্ষ একরের হিসাব ও মোট জমির শতকরা অংশ)

ফসলী জমি	৩১৮·২	৪৪·২%	৩২৭·০	৪৫·৩%
পতিত জমি	৬০·৪	৮·৪%	৫৬·০	৭·৮%
বন, উপবন	১২৫·৬	১৭·৪%	১৩১·০	১৮·২%
আবাদের অযোগ্য জমি	৯৭·১	১৩·৫%	৯৩·০	১২·৯%
আবাদযোগ্য পতিত	১১৮·৭	১৬·৫%	১১৪·০	১৫·৮%

বন (Forest) ও আবাদের অযোগ্য জমি প্রায় তিনভাগের একভাগ (৩০%), 'পতিত' রহিয়াছে ও আবাদ করা হয় না এরকম জমি প্রায় চারভাগের একভাগ (২৪%)। মোট জমির অর্ধেকের কিছু কম জমিতে মাত্র চাষ-আবাদ করা হয় (৪৫%)। অরণ্য ও আবাদের অযোগ্য প্রায় ৩০% জমি

* পরিমাণ ও সংখ্যার হিসাব সবিস্তারে মনে রাখা সম্ভব নহে, তাহার দরকারও নাই। হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেই চলিবে। প্রত্যেক বিষয়বস্তুর সংখ্যাসূচী হইতে যাহাতে ছাত্ররা এই ধারণা করিতে পারে, সেইদিকে নজর রাখিতে হইবে।

—লেখক

ছাড়িয়া দিলে বাকি ৭০% জমির অধিকাংশতেই আবাদ করা উচিত, কিন্তু তাহা করা হয় না। তাহা আবাদ করিতে হইলে যে সংগতি ও উদ্যম থাকা দরকার তাহা এদেশের কৃষকদের নাই। সেইজন্য ভারত-সরকার ও প্রত্যেক রাজ্য-সরকারের উচিত এই পতিত জমি পুনরুদ্ধার ও চাষের যোগ্য করিয়া তুলিয়া কৃষকদের আবাদ করিতে উৎসাহ দেওয়া। তাহা না করিতে পারিলে ভারতের কৃষিসংকটের সমাধান করা কঠিন।

চাষের জমিতে খাদ্যফসল ও পণ্যফসল দুই-ই উৎপাদন করা হয়। খাদ্য-ফসলের মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি :

চাল	ভুট্টা	ছোলা
গম	রাগী	ডাল
জোয়ার	বার্লি	
বাজরা	অন্যান্য মিলেট	

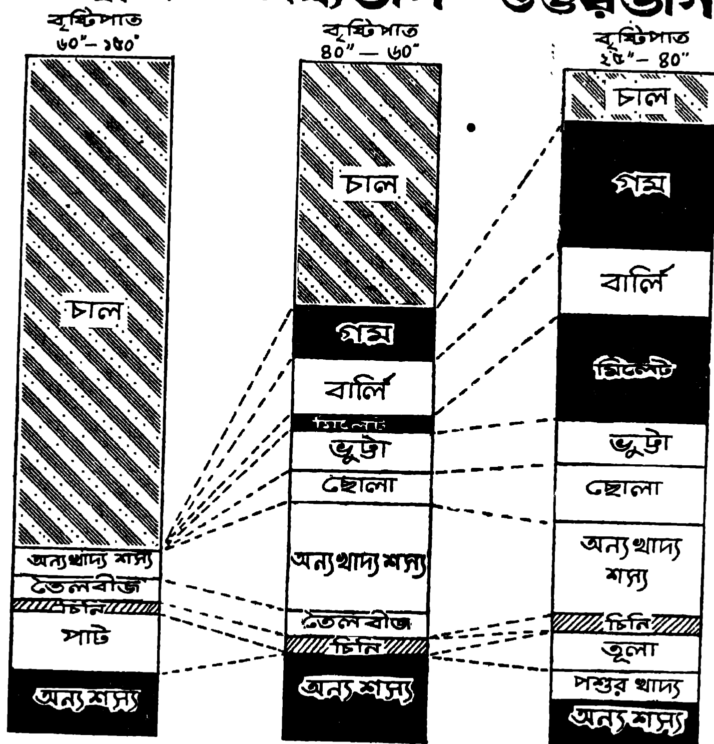
পণ্যফসলের মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি :

চীনাবাদাম	তুলা
তিল	পাট
সরিষা ও রাই-সরিষা	তামাক
তিসি	চা
রেড়ী	কফি
আখ	রবার

প্রাকৃতিক অবস্থা, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও মাটির গুণের তারতম্য অনুযায়ী কৃষিজাত ফসলের তো বটেই, কৃষিপ্রণালীরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। কৃষির যন্ত্রপাতির গড়নের পর্যন্ত তফাত হইয়া যায়। গঙ্গা ও সিন্ধুর ব-দ্বীপ ও উপকূল অঞ্চলে তাপমাত্রা মধ্যম, বারিপাত অধিক—ইহা ধানচাষের পক্ষে উত্তম পরিবেশ, পাট আখ ও তামাকও ভাল হয়। গঙ্গার মধ্যভাগে ও উত্তরভাগে তাপমাত্রা অধিক, বারিপাত মধ্যম (৪০-৬০″)—ইহা গম ও তুলার চাষের পক্ষে উত্তম পরিবেশ। দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ ও মালভূমি অঞ্চলের মাটি কালো, শুকনো অথচ মধ্যম তাপমাত্রা, বারিপাতেও মধ্যম—ইহা তুলা, তৈল-বীজ, ছোলা, ডাল ইত্যাদি চাষের অনুকূল পরিবেশ। রাজস্থান অঞ্চলে

গাঙ্গেয় উপত্যকার শস্য

ব-দ্বীপ মধ্যভাগ উত্তরভাগ



তাপমাত্রা অত্যধিক, বৃষ্টিপাত অত্যল্প—ইহা মিলেট, ভুট্টা ইত্যাদি চাষের পক্ষে ভাল। হিমালয়, আসাম, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক, তাপমাত্রা অল্প—ইহা চা, কফি ইত্যাদি চাষের পক্ষে ভাল পরিবেশ, ধান গম ও ভুট্টারও চাষ হয়।

চাষের ঋতু অনুযায়ী শস্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—খড়িফশস্য ও রবিশস্য। সেকথা আগে বলা হইয়াছে। এই দুইরকম শস্যের মধ্যে কোন্ শস্য কতদিনে উৎপন্ন হয় তাহার একটি কালসূচী নিচে দেওয়া হইল। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন।

খরিফশস্য [মে-জুন হইতে অক্টোবর-নভেম্বর]	সময় (মাস)	রবিশস্য [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হইতে মার্চ-এপ্রিল]	সময় (মাস)
ধান :	শীতে ৫-৬, শরতে ৪-৫, গ্রীষ্মে ২-৩	গম	: ৫—৫½
জোয়ার	: ৪—৫½	জোয়ার	: ৪—৫
বাজরা	: ৪—৪½	বার্লি	: ৫—৫½
পাট	: ৬—৭	ছোলা	: ৬
চীনাবাদাম	: ৪—৫	সরিষা	: ৪—৫
তুলা	: ৬—৭—৮	তিসি	: ৫—৫½
রেড়ী	: ৬—৭—৮	রাই	: ৪—৫

বীজ বপনের সময় হইতে ফসল উৎপাদন পর্যন্ত দুইরকম শস্যেরই গড়ে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস সময় লাগে, কেবল পাট ও তুলার আরও দুই-এক মাস বেশী সময় লাগে। এইবার দেখা যাক ভারতের কোন্ অঞ্চলে কি কি ফসল ফলে এবং সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সহিত তাহার সম্পর্ক কি।

আঞ্চলিক পরিবেশ ও ফসল

ধান। পলিমাটি, উষ্ণ জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত বেশী হইলে ধান খুব ভাল উৎপন্ন হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর-প্রদেশ, আসাম, মহারাষ্ট্র ও পার্বত্য অঞ্চলেও ধান হইয়া থাকে। ধান হইতে চাল হয় বর্তমানে এই পরিমাণ :

(দশলক্ষ টনের হিসাব)

১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
২৭·১২	৩০·৩৫	২৯·৩৪

১৯৫৫-৫৬ সালে ২০ কোটি ৭০ লক্ষ টন চাল হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন পর্যন্ত চালের উৎপাদন বাড়িয়াছে। প্রাকৃতিক অবস্থা ভাল থাকিলে ভারতে এখন প্রায় বছরে ৩ কোটি, কি ৩½ কোটি টন চাল উৎপন্ন হইতে পারে।

গম। গমচাষ ভাল হয় উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে। উৎপন্ন গমের পরিমাণ এই :

(দশলক্ষ টনের হিসাব)

১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
৮·৬২	৯·৭৭	৯·৭৩

১৯৫৫ হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৮০ লক্ষ টন হইতে ১০ লক্ষ টন বাড়িয়া বর্তমানে প্রায় ৯০ লক্ষ টন গম ভারতে উৎপন্ন হয়।

জোয়ার, বাজরা, রাগী। শুকনো ও কাঁকর মাটিতে উৎপন্ন হয়। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূরে জোয়ার বাজরা এবং মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূরে রাগী ফসলের চাষ হয়। এগুলিকে মিলেটশ্রেণীর খাদ্য বলা হয়। উৎপাদনের পরিমাণ এই :

(দশলক্ষ টনের হিসাব)

১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
১৯·১৮	২২·৫১	২১·৪৪

ভারতে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টনের মতো মিলেটশ্রেণীর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তুলা ও পাট। তুলাচাষের জন্য মধ্যম বৃষ্টির প্রয়োজন। প্রখর রৌদ্রও দরকার হয়, তাহাতে গাছ সতেজে বাড়ে, ফুল বেশী হয় এবং বেশী ফুল হইলে তুলার গুটি বেশী জন্মায়। গুটি পাকিলে ঠাণ্ডা অথচ ভিজা হাওয়া প্রয়োজন, বৃষ্টিতে অনিষ্ট হয়। তুলাচাষের প্রধান অঞ্চল দাক্ষিণাত্যে—বোম্বাই, অন্ধ্রপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে। মহীশূর ও মাদ্রাজেও তুলার চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে কিছু কিছু তুলার চাষ হইয়া থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে এই :

(দশলক্ষ গাঁইটের হিসাব। ১ গাঁইট = ৩৯২ পাউণ্ড)

১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
১·৭৭	২·৬৩	৪·০০	৪·৬৯	৩·৮৪

এই হিসাবে দেখা যায় যে ভারত-বিভাগের পর তুলার উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ১০ লক্ষ গাঁইট হইতে প্রায় ৪০ লক্ষ গাঁইট হইয়াছে।

পাটচাষের জন্য প্রয়োজন উচ্চ তাপ, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও পলিমাটি। খুব

যত্ন করিয়া পাটচাষ করিতে হয়। পাটক্ষেতের আগাছা উপড়াইয়া ফেলিয়া তাহা পরিষ্কার রাখিতে হয়। গাছ যত দীর্ঘ ও সোজা হয়, তাহার ভিতরের আঁশও তত দীর্ঘ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা থাকে। পাটগাছের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৯।১০ ফুট পর্যন্ত হয়। গাছ পাকিলে তাড়া বাঁধিয়া জলে অন্তত সপ্তাহ দুই ভিজাইয়া রাখিয়া, আছাড় দিয়া আঁশ টানিয়া বাহির করিতে হয়। তারপর সেই আঁশ রোদে শুকাইয়া গাঁইট বাঁধা হইয়া থাকে।

পাট উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এখন পূর্ব-পাকিস্তানে। ভারতের প্রধান পাটচাষের অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ আসাম বিহার উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ। উৎপাদনের পরিমাণ এই :

(দশলক্ষ গাঁইটের হিসাব। ১ গাঁইট = ৪০০ পাউণ্ড)

১৯৪৮-৪৯	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
৯·০৬	৪ ২০	৫·১৬	৪·৫৫

ভারত-বিভাগের পর পাটের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ আড়াইগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটচাষের ক্ষেত্র ও উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে।

চা কফি ও রবার। জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে না এমন জায়গায় চায়ের চাষ ভাল হয়। তাপ (৭৫ ফাঃ), বৃষ্টিপাত (৮০ ইঞ্চি) ও ঢালু জমিতে চায়ের চাস ভাল হয় পাহাড়ের গায়ে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, মহীশূর ও মাদ্রাজে নীলগিরি পাহাড়ে, কেরলে আনামালাই ও কার্ডামম পাহাড়ে, উত্তরপ্রদেশে আলমোড়া ও গাড়ওয়াল অঞ্চলে ও পাঞ্জাবে কাংড়া উপত্যকায় চা উৎপন্ন হয়। কফি হয় মহীশূর মাদ্রাজ ও কেরলের পাহাড়ের ঢালে। রবার উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভাল হয়। কেরল মহীশূর ও মাদ্রাজে রবার উৎপন্ন হয়। চা কফি ও রবারের উৎপাদনের পরিমাণ এই :

(দশলক্ষ কিলোগ্রামের হিসাব)

	১৯৫১-৫২	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
চা :	২৯১	৩১১	৬১৭	×
কফি :	২৫	৪০	৪২	×
রবার :	১৫	২১	২৪	২৪

চা কফি ও রবারের উৎপাদন গত ১০ বছরের মধ্যে বেশ কিছুটা বাড়িযাছে।

আখ ও তৈলবীজ। আখের জন্য প্রচুর তাপ ও বৃষ্টি প্রয়োজন, গাছ বড় হইলে বৃষ্টির দরকার হয় না। উত্তরপ্রদেশে আখের চাষ হয় সবচেয়ে বেশী এবং দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র ও মাদ্রাজে আখ বেশ ভাল হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা পাঞ্জাব মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরেও আখের চাষ হয়।

(দশলক্ষ টনের হিসাব)

	১৯৪৯-৫০	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
আখের গুড়ঃ	৪.৯৪	৫.৯৮	৭.১১	৭.৫৮

গত দশ বছরে আখ হইতে গুড়ের উৎপাদন প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়াছে।

তৈলবীজের মধ্যে প্রধান হইল সরিষা তিল তিসি চীনাবাদাম রেড়ী রাই প্রভৃতি। চাষের জন্য বেশী জলের প্রয়োজন হয় না, মাটি একটু বেশীদিন ভিজা থাকিলেই চলে। যেখানে গরম বেশী, শীত কড়া, মাটি দোঁয়াশ, সেখানে তৈলবীজের চাষ ভাল হয়। অন্ধ্র মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাই অঞ্চলে প্রধান তৈলবীজের চাষ হইয়া থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ এই :

(দশলক্ষ টনের হিসাব)

১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
৫.০৮	৫.৬৪	৭.৯১	৬.৩৫

গত দশ বছরে তৈলবীজের উৎপাদন খুব বেশী বাড়ে নাই।

কৃষিজাত ফসলের উৎপাদনের নির্দেশিকা (Index) দেখিলে খাদ্যফসল ও পণ্যফসলের বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হইবে :

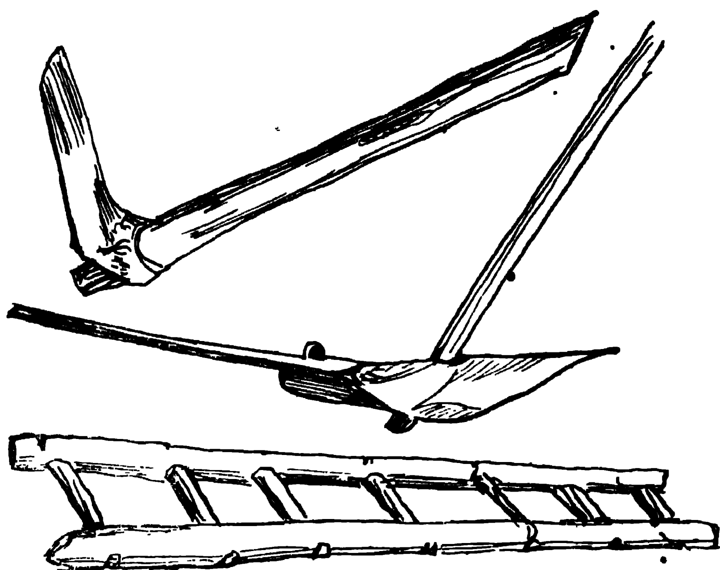
(জুন ১৯৫০=১০০)

খাদ্যফসল :	৯১	১৩০	১২৭	১৩৫
চাল :	৮৮	১২৮	১২৫	১৩৬
গম :	১০১	১৪৭	১৫২	১৬০
পণ্যফসল :	১০৬	১৩৬	১৩৩	১৪৭
তৈলবীজ :	৯৯	১৩৩	১২২	১৩৫
তুলা :	১১১	১৭৭	১৩১	২০৩
পাট :	১০৬	১৫৯	১৪১	১২৩
চা :	১০৪	১১৯	১২০	১১৭

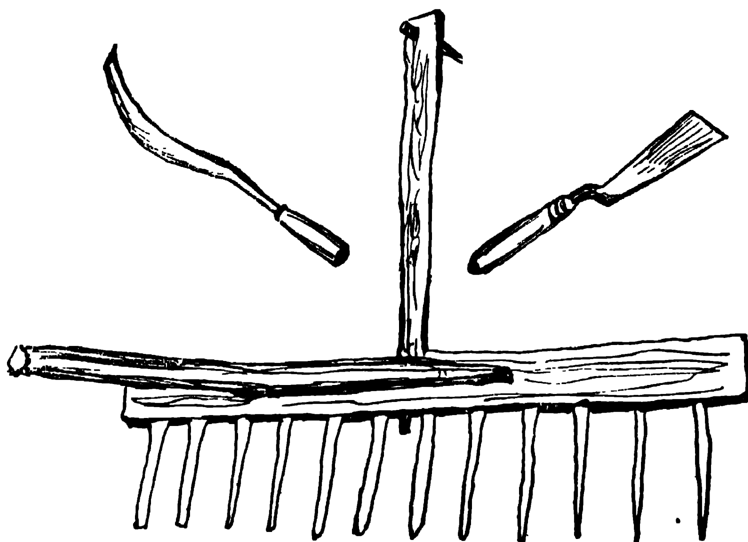
এই নির্দেশিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে গত ১০ বছরে খাদ্যফসলের উৎপাদন গড়ে প্রায় ৫০% ও পণ্যফসলের উৎপাদন গড়ে প্রায় ৪৫% বাড়িয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যা ও চাহিদা বৃদ্ধির অনুপাতে কোন ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধির হার বিশেষ আশাপ্রদ নহে। সেইজন্য চাষের প্রণালী এবং সেচ ও সারের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া নানাভাবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

কৃষির প্রণালী ও প্রকৃতি

কৃষিকাজ নানাভাবে করা হইয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কৃষিপ্রণালী অনেকখানি নির্ভর করে। যেখানে বেশী বৃষ্টিপাত হয়, জমি ভিজা থাকে অথবা জমির উপর জল জমিয়া থাকে, সেখানকার কৃষিপ্রণালী 'ভিজা-চাষ (wet farming) বলা হয়। এইসব অঞ্চলে বর্ষাকালে জমিতে হাল চষিয়া বীজ বপন ও রোপণ করা হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প হয়, আবহাওয়া শুকনো ও খটখটে থাকে, সেখানে জমিতে গভীর খাত করিয়া হাল দিয়া বীজ বপন করিতে হয়, পরে মই দিয়া বীজ মাটি-ঢাকা দেওয়া হয়। নিচে মাটি যাহাতে ভিজা থাকে সে ব্যবস্থাও এইসব অঞ্চলে করার প্রয়োজন হয়। এই কৃষিপ্রণালীকে বলা হয় 'শুকনাকৃষি' (dry farming) এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে জমি খুব উর্বর, কিন্তু বৃষ্টিপাত খুব অল্প। সেখানে জলসেচের সুব্যবস্থা না করিলে কৃষিকাজ ভাল করা যায় না। এই ধরনের সেচ-নির্ভর কৃষিপ্রণালীকে 'সেচ-চাষ' (irrigation farming) বলা যাইতে পারে। আর এক রকমের চাষ আছে যাহাকে 'রোপণ-চাষ' (plantation) বলা যায়। চা কফি রবার আখ তামাক ইত্যাদির চাষ এই রোপণ-প্রণালীতে করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে জমি সমতল নহে বলিয়া সাধারণ প্রণালীতে চাষ করার অসুবিধা আছে। সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা পাহাড়ের ঢালু জমিতে সিঁড়ির মতো থাক্ কাটিয়া চাষ করে। দূর হইতে পাহাড়ের গায়ে এই ফসলক্ষেত দেখিলে মনে হয় যেন নিচু হইতে উপর দিকে সোপানশ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরে স্তরে স্তরে ফসল ফলিয়াছে। এই ধরনের কৃষিপ্রণালীকে 'সোপান-বিন্যস্ত চাষ' বা 'সিঁড়ি-ভাঙা-চাষ' '(terraced cultivation) বলা হয়। মোটামুটি অঞ্চলভেদে এই কয়েকটি প্রণালীতেই এদেশে কৃষিকাজ করা হইয়া থাকে।



কৃষির যন্ত্রপাতি



লাঙল মই কাস্তে খুরপি বিদা

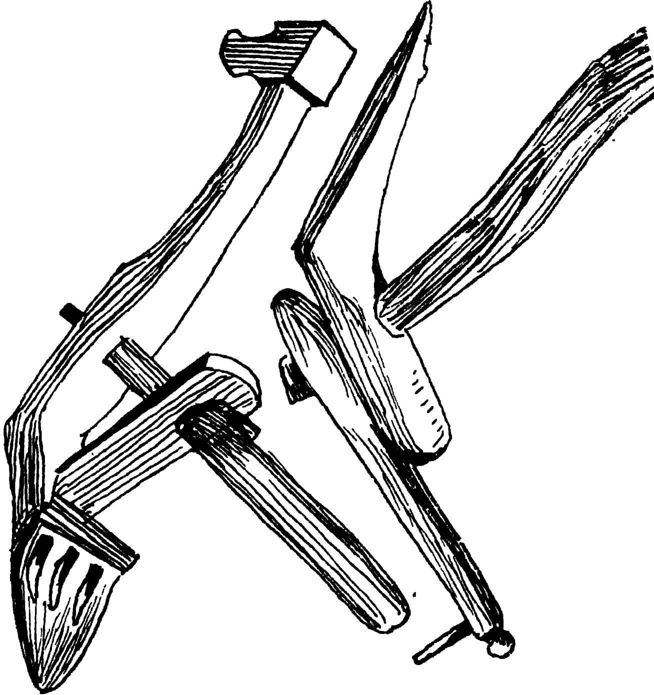
কৃষির যন্ত্রপাতি। কৃষির প্রণালী অনুযায়ী কৃষির যন্ত্রপাতিরও কিছুটা আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। মূল যন্ত্রপাতিগুলি সারা ভারতবর্ষে প্রায় একরকমের, কেবল তাহাদের আকারে ও গড়নে তফাত দেখা যায়। যেমন লাঙ্গল এক-ফলা হইতে দুই-ফলা, তিন-ফলা, চার-ফলা, পাঁচ-ফলা হইতে পারে এবং মাটির প্রকৃতির উপর (শক্ত, কঠিন অথবা নরম) তাহা হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। ভারতের কৃষকেরা চাষ করিবার জন্য যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে—লাঙ্গল বিদা কোদাল নিড়ানি খুরপি ইত্যাদি। সাধারণত একজোড়া বলদ দিয়া লাঙ্গল টানা হইয়া থাকে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে বলদের বদলে মহিষ দিয়া হালচাষ করা হয়। রাজস্থান ও পাঞ্জাবের কোন কোন অঞ্চলে উট দিয়াও হালচাষ করা হইয়া থাকে। যে সমস্ত অঞ্চলে মাটি খুব শক্ত কঠিন (যেমন উত্তর-দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি) সেখানে একজোড়া বলদের পক্ষে হালটানা সম্ভব হয় না, দুইজোড়া হইতে পাঁচজোড়া পর্যন্ত বলদ বা মহিষ হালচাষের জন্য ব্যবহার করা হয়।

কৃষির যন্ত্রপাতি মূলত সারা ভারতবর্ষে একরকম হইলেও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাদের গড়নে পার্থক্য আছে। শুধু লাঙ্গলের দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বোঝা যাইবে। লাঙ্গলের চারটি অংশ থাকে—ফলা কাণ্ড হাতল জোয়াল। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের চাষের মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী কিভাবে এই লাঙ্গলের গড়নের তারতম্য হয় তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।

বোম্বাই-দাক্ষিণাত্য, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ ও কুর্গ—এইসব অঞ্চলে লাঙ্গলের ফলা ও কাণ্ড অভিন্ন আকারে বা একখণ্ডে তৈরী হয়। পার্বত্য অঞ্চলে, পাথর ও কাঁকর মিশ্রিত জমিতে হালচাষের বিশেষ উপযোগী এই ধরনের লাঙ্গল। ফলা ও কাণ্ডের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র খিলের জোড়া না থাকার জন্য লাঙ্গলটি খুব মজবুত ও দৃঢ় হয়, এবং চাষের সময় যথেষ্ট জোর পড়িলেও বা ধাক্কা লাগিলেও খুলিবার বা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে লাঙ্গলের ফলা ও কাণ্ড দুইটি ভিন্ন অংশ বা খণ্ড আকারে তৈরী হয়। পলিমাটি ও তাহার সহিত বালির ভাগ বেশী থাকিলে এই ধরনের লাঙ্গলের সুবিধা হইবার কথা, কারণ মাটিতে বালির ভাগ বেশী থাকিলে লাঙ্গলের ফলা বালিতে ঘষা লাগিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইয়া যায়। তখন তাহা বদলাইবার প্রয়োজন হয়। ফলা ও কাণ্ড একখণ্ডে থাকিলে

গোটা লাঙ্গলটি বাতিল করিতে হয়, কিন্তু পৃথক থাকিলে তাহা করিতে হয় না, কেবল ফলাটি নূতন করিয়া লইলেই কাজ চলে। ইহাতে আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং কাজের ও কোন অসুবিধা হয় না।



ভারী লাঙ্গল। শুকনা-চাষের অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়

যে-সব অঞ্চলে ভারী ওজনের লাঙ্গল টানিবার জন্য একজোড়ার বেশী বলদ বা মহিষ জুড়িতে হয় সেইসব অঞ্চলে লাঙ্গলের জোয়াল সোজা না হইয়া বাঁকা হয়। ইহাতে কাজের সুবিধা হয় যথেষ্ট এবং ফলার দিকে নজর রাখিয়া হাল চালাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

কোন কোন লাঙ্গলের জোয়ালের জোড় থাকে ফলা ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে, কোন কোন লাঙ্গলে থাকে অনেক উপরে উপরে। থাকার সুবিধা হইল এই যে মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাহাতে বড় বড় মাটির চাপড়া বা ঢ্যালার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে হাল চলিতে পারে, তাহাতে বাধা পায় না এবং বলদগুলিও সম্পূর্ণ জোর দিয়া হাল টানিতে পারে।

যে সমস্ত অঞ্চলে মাটি অত্যন্ত কঠিন সেখানে তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত 'বিদা' ও খুব ভারী ওজনের লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়। 'শুকনা-চাষ' বা (dry farming) অঞ্চলে ইহা প্রয়োজন হয়। যেমন দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে ও মহীশূরের বেলারী জেলায়। সাধারণত লাঙ্গলের ওজন হয় আধমণ হইতে পঁচিশ সেরের মধ্যে। কিন্তু শুকনা-চাষের অঞ্চলে কোথাও কোথাও প্রায় দেড়মণ ওজনের লাঙ্গলও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিজা-চাষের (wet farming) অঞ্চলে অনেক সময় জলাবদ্ধ জমিতে হাল দিতে হয়। এইসব অঞ্চলে লাঙ্গলের ফলা খুব চওড়া থাকে, তাহাতে জল কাটিয়া হাল চালানোর সুবিধা হয়।

আসাম, হিমাচলপ্রদেশ ও দক্ষিণভারতের পার্বত্য অঞ্চলে খুব হাল্কা ওজনের লাঙ্গল চাষের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং একজোড়ার বদলে একটি বলদেও কাজ চলিয়া যায়। যেখানে পার্বত্যভূমি খুব বেশী ঢালু সেখানে লাঙ্গল দেওয়ার অসুবিধা হয় এবং স্থানীয় কৃষকরা লাঙ্গলের বদলে হাত-কোদাল ব্যবহার করে। আগেই বলিয়াছি যে পার্বত্য ঢালু জমিতে সোপানের মতো থাক কাটিয়া তাহার উপর চাষ করা হয়। এইরকম সোপান-চাষে (terraced cultivation) সাধারণত বলদ বা মহিষ-টানা লাঙ্গল ব্যবহার করা হয় না, করা সম্ভবও নহে। হাত-কোদাল দিয়াই জমি ভাল করিয়া কুপাইয়া আবাদযোগ্য করিতে হয়।

এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিকাজ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী কৃষির প্রণালীর পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য অনুযায়ী আবার কৃষির যন্ত্রপাতির গড়নেরও তফাত আছে। কৃষিপ্রণালী নির্ভর করে স্থানীয় প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও মাটির প্রকৃতির উপর, এবং কৃষির যন্ত্রপাতি স্থানীয় কৃষি-প্রণালীর উপযোগী করিয়া তৈরী করা হয়।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে আরও দুই-একরকমের নূতন কৃষিপ্রণালীর পরীক্ষা করা হইতেছে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, অল্প জমিতে বেশী পরিমাণে ফসল ফলানো। এই নূতন কৃষিপ্রণালীর মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য :

ক। জাপানী-প্রণালী

খ। গভীর চাষের প্রণালী (intensive cultivation)

জাপানী-প্রণালীর পরীক্ষা গত প্রায় দশ বছর ধরিয়া করা হইতেছে। কিছুদিন হইল ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গভীর চাষের পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছে। জাপানী-প্রণালীতে বাস্তব ক্ষেত্রে ফল ভালই হইতেছে দেখা যাইতেছে, কিন্তু এখনও তাহা পরীক্ষার স্তর উত্তীর্ণ হয় নাই। গভীর চাষের পরীক্ষা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে, আশা করা যায় ফল ভালই হইবে।

জাপানী প্রণালীতে চাষ

১৯৫৩ সাল হইতে আমাদের দেশে জাপানী প্রণালাতে ধানচাষের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার দেওয়া এবং চারাগাছগুলি সারবন্দী করিয়া রোপণ করা। রোপণ করিবার সময় গাছগুলির দূরত্ব সর্বদা সমান রাখিতে হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ৬৫ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে এই জাপানী প্রণালীতে ধানচাষ করা হয়। আমাদের চিরাচরিত দেশীয় প্রথায় চাষ করিয়া যেখানে একর-প্রতি প্রায় ১৭ মণ ধান হয়, সেখানে জাপানী প্রণালীতে চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রায় ২৭ মণ পর্যন্ত ধান হইতে পারে। দশ বছর পূর্ণ হইতে চলিল আমাদের দেশে জাপানী প্রণালীতে ধানচাষের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার ফলাফলও ভাল দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেন ইহার বিস্তার হইতেছে না তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। অর্থাৎ কেন আমাদের দেশের কৃষকেরা এই জাপানী কৃষিপ্রণালী উন্নত ও গ্রহণযোগ্য মনে করিতেছে না তাহা অনুসন্ধান করা কর্তব্য। জমিতে যে পরিমাণ সার দিতে হয় এবং চারাগাছ যেভাবে সারিবদ্ধ করিয়া রোপণ করিতে হয় তাহাতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হয় কি না তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, দেড়গুণ বেশী ধান জমিতে ফলিবে বলিয়া দ্বিগুণ পরিশ্রম ও ততোধিক অর্থব্যয় করিতে কৃষকেরা উৎসাহিত হইবে কি না সন্দেহ আছে। তবে সরকারী তত্ত্বাবধানে জাপানী প্রথায় চাষ করিলে তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে।

গভীর চাষের প্রণালী

সম্প্রতি ১৯৬০ সন হইতে আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে ভারত-সরকার কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলে গভীর চাষের ফলাফল পরীক্ষা

করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই 'গভীর চাষ' (intensive cultivation) বলিতে কি বুঝায়? যে-কোন একটি জমিতে উৎকৃষ্ট বীজ ও সার দিয়া, উৎকৃষ্ট ও উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করাকে 'গভীর চাষ' বলা হয়। আপাতত পাঁচ বছরের জন্য ভারত-সরকার কয়েকটি অঞ্চলে এই গভীর চাষের পরীক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের সাতটি জেলায় ১০০টি ব্লকে এই পরীক্ষা করা হইবে। অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম-গোদাবরী, বিহারের সাহাবাদ, মাদ্রাজের তাঞ্জোর, মধ্যপ্রদেশের রাইপুর, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, রাজস্থানের পলি; উত্তরপ্রদেশের আলিগড়—এই সাতটি জেলায় প্রায় ৫৮ লক্ষ একর জমিতে এই গভীর চাষ করিয়া দেখা হইবে কতটা পরিমাণে ফসল-উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

জাপানী চাষের মতো গভীর চাষ সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। এই চাষের জন্য সবই 'উৎকৃষ্ট' বস্তু প্রয়োজন—উৎকৃষ্ট বীজ, উৎকৃষ্ট সার, উৎকৃষ্ট ও উন্নত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এতরকমের 'উৎকৃষ্ট' বস্তুর সমাবেশ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে করা সম্ভব, কিন্তু কৃষকদের পক্ষে করা আদৌ সম্ভব নহে। সেই কারণে মনে হয় যে এই গভীর প্রথায় চাষের সার্থকতা কেবল সরকারী স্তরেই থাকিতে পারে, ব্যক্তিগত স্তরে থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে সমবায়-কৃষির (co-operative farming) কথাবার্তা চলিতেছে। যদি ইহা অন্তত খানিকটা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় এবং এদেশে কৃষকরা সমবায়-চাষে কিছুটা অভ্যস্ত হইয়া ওঠে, তাহা হইলে এই সমবায়গুলির ভিতর দিয়া গভীর চাষের বিস্তার সম্ভব হইতে পারে। একথা ঠিক যে গভীরভাবে চাষ করিতে পারিলে একই জমিতে কমপক্ষে দেড়গুণ হইতে দ্বিগুণ পর্যন্ত ফসল ফলানো অনায়াসে সম্ভব হইবে এবং তাহাতে দেশের খাদ্যফসলের ঘাটতির সমস্যা অনেকটা সমাধান হইবে।

সেচব্যবস্থা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, অথচ কৃষিকাজের জন্য এদেশের কৃষকদের আকাশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। জল না হইলে কৃষিকাজ হয় না এবং এই জল দান করে প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। এই বায়ু দেশের সর্বত্র সমান আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না এবং সেইজন্য সর্বত্র বৃষ্টিপাতও হয় না। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে উত্তম চাষের উপযোগী

পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় না, যেমন উত্তরপশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে। যেখানে বৃষ্টিপাত হয় সেখানেও যথাসময়ে বৃষ্টি হওয়ার সমস্যা আছে, ঠিক সময় যে প্রয়োজন মতো বৃষ্টিপাত হইবে এমন কোন কথা নাই। বৃষ্টির এই অনিশ্চয়তার জন্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশে জলসেচের উত্তম ব্যবস্থা (irrigation) থাকা একান্ত আবশ্যক। জলসেচের সহিত কৃষির এবং কৃষির সহিত ভারতের জনসাধারণের অর্থনীতিক অবস্থার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে অতীতকালে ভারতের রাজা-বাদশাহ, জায়গীরদার-জমিদার যাঁহারা দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে এতটুকু সজাগ থাকিতেন তাঁহারা সর্বাগ্রে কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের সুব্যবস্থা করিতেন। যাঁহারা সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন না তাঁহারা কৃষিসংকট, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সম্মুখীন হইতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের জলসেচের এই ঐতিহাসিক নিদর্শন (খাল, জলাশয় ইত্যাদির) আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণভারতের কাবেরী ব-দ্বীপের সেচব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাচীনকালে তাহা যেরকম ছিল এখনও যে সেইরকম আছে তাহা নহে। প্রাচীন সেচকেন্দ্রটিকে বজায় রাখিয়া পরবর্তীকালে ইহার অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। এইরকম প্রাচীন সেচকেন্দ্রের নিদর্শন উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভারতেও আছে।

ভারতবর্ষে জলসেচের নানারকমের পদ্ধতি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে পাঁচরকমের সেচপ্রণালী আজও বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়:

১। স্থায়ী খালের সেচব্যবস্থা।
২। প্লাবন-খালের সেচব্যবস্থা।
৩। ট্যাঙ্ক বা জলাশয়ের সেচব্যবস্থা।
৪। ইঁদারা ও টিউবওয়েলের সেচব্যবস্থা।
৫। অতিপ্রাচীন পদ্ধতিতে জল তুলিয়া বা ছেঁচিয়া সেচব্যবস্থা।

এই পাঁচ প্রকারের সেচপ্রণালী আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আধুনিক বহুমুখী নদীপরিকল্পনার বিস্তারের ফলে ইহার প্রয়োজন এখনও মিটিয়া যায় নাই।

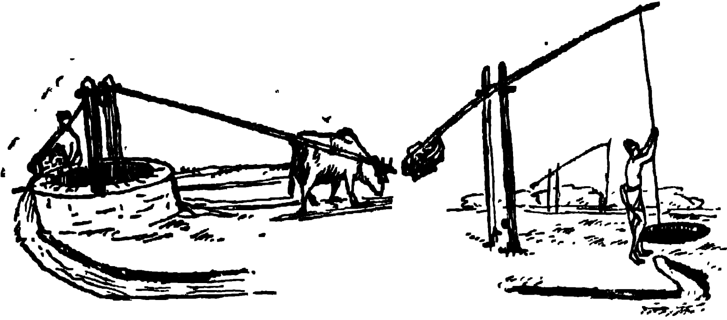
স্থায়ী খালের সেচব্যবস্থা। নদনদী হইতে খাল কাটিয়া জল বহুদূর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া যায়। নদী যেখানে পার্বত্যভূমি হইতে সমভূমিতে

নামিয়া আসে সেখানে নদী হইতে খাল কাটিলে তাহাতে বারমাস জল থাকে। নদীতে কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ করিয়া তাহাতে নদীর জল জমাইয়া জলাশয় সৃষ্টি করা যায়। সেই জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া জল বহুদূরে চাষের ক্ষেতে লইয়া যাওয়া যায়। এই ধরনের খালে যাহাতে বারমাস জল থাকে তাহাকে 'স্থায়ী খাল' বলা হয়। পাঞ্জাবের বারি-দোয়াব খাল, শতদ্রু খাল, সিরহিন্দ খাল, পশ্চিম-যমুনার খাল—উত্তরপ্রদেশের পূর্ব-যমুনা খাল, আগ্রা খাল, গঙ্গার উত্তরাংশ ও নিম্নাংশের খাল, সার্দা খাল, দক্ষিণ-যমুনার খাল—বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের শোণনদ ও ত্রিবেণীর খাল, দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর খাল—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী ও মহানদীর ব-দ্বীপের খাল—অন্ধ্রের কুর্নল—কুড্ডাপা খাল—মাদ্রাজের পেরিয়ার নদীর বাঁধ ও খাল—মহীশূরের শিবসমুদ্র ও কৃষ্ণরাজ-সাগরের বাঁধ ও খাল—ভারতের বিখ্যাত সেচখালের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব সেচখালের মধ্যে কতকগুলি খুব প্রাচীন।

প্লাবন-খালের সেচব্যবস্থা। বর্ষাকালে নদীর জল বাড়িলে যে সমস্ত নদী-নির্গত খাল জলে ভরিয়া যায় এবং নদীর জল কমিলে খালে আর জল থাকে না, সেই সমস্ত খালকে 'প্লাবন খাল' বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ নদীতে জলের প্লাবন আসিলে খাল জলে ভরিয়া যায় বলিয়া ইহার নাম প্লাবন-খাল। পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে এরকম প্লাবন-খাল অনেক আছে।

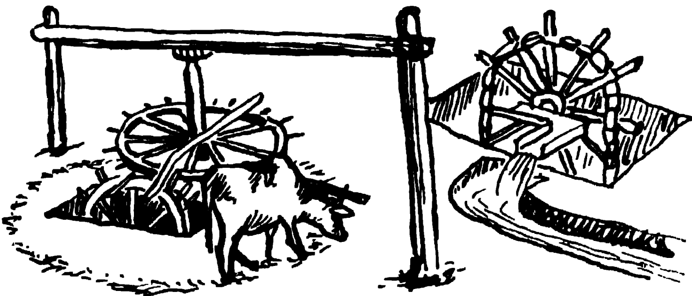
ট্যাঙ্ক বা কৃত্রিম জলাশয়ের সেচব্যবস্থা। শুকনো অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া উপদ্বীপ-ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ছোট ছোট নদীর উপত্যকায় মাটির বাঁধ দিয়া এক-একটি স্থান ঘিরিয়া রাখা হয়। এইসব বাঁধবেষ্টিত স্থানে বর্ষাকালে জল জমিয়া 'কৃত্রিম জলাশয়' তৈরী হয়। এই ধরনের কৃত্রিম জলাশয় ও হ্রদকে 'ট্যাঙ্ক' বলা হয়, যদিও ঠিক এই নামটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। বর্ষাকালের শেষে এই জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহাতে আর জল থাকে না। বৃষ্টি অল্প হইলে এইসব জলাশয়ে জল জমিতে পারে না, অথচ সেই সময় সেচের জন্য নিদারুণ জলাভাব হয়। হায়দারাবাদ, মহীশূর ও মাদ্রাজ অঞ্চলে জলসেচের জন্য এই ধরনের কৃত্রিম জলাশয়ের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়।

ইঁদারা ও নলকূপের সেচব্যবস্থা। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে মাটির উপরের দিকটা শুকনো হইলেও মাটির তলায় অনতিদূরেই



ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া সেচব্যবস্থা

জলের স্তর পাওয়া যায়। এইসব অঞ্চলে ইঁদারা তৈরী করিয়া মাটির তলা হইতে জল উপরে আনিবার ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলে গভীর টিউবওয়েল বা নলকূপ বসাইয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হাজার হাজার নলকূপ হইতে জলবিদ্যুতের সাহায্যে জল উপরে তুলিয়া খালের ভিতর দিয়া দূরে ফসলক্ষেতে প্রবাহিত করা হয়। যেখানে নদনদী হইতে খাল কাটিয়া সেচের ব্যবস্থা করার সুবিধা নাই, সেখানে এইরকম গভীর নলকূপ হইতে বিদ্যুতের সাহায্যে জল তুলিয়া সেচের ব্যবস্থা করা হয়।



'পারসী চাকার' সাহায্যে জল তুলিয়া সেচের ব্যবস্থা

জল তুলিয়া ও ছেঁচিয়া সেচব্যবস্থা। ছোট ছোট নদী, নালা ও জলা-ডোবা হইতে কোন পাত্রে করিয়া জল ছেঁচিয়া পাশের জমিতে দেওয়া হয়। পাত্রটি টিনের বা কাঠের খোল হইতে পারে, কোথাও তালগাছের

ডোঙ্গাও ব্যবহার করা হয়। লিভারের একপাশে এই পাত্র ঝুলাইয়া, অন্যপাশে ভার বাঁধিয়া জল তুলিলে বেশী পরিশ্রম হয় না, অল্পায়াসে অনেক জল তোলা যায়। বেশী জল তুলিতে হইলে এইভাবে বাঁশে ভারা বাঁধিয়া জল তোলার সুবিধা। অল্প জলের প্রয়োজন হইলে অনেক সময় দুইজন লোক পাত্রটির দুইদিকে দড়ি বাঁধিয়া জল ছেঁচিয়া উপরে তুলিয়া থাকে। দড়ির একদিকে কোন খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দরকার হইলে একজন লোকও এইভাবে জল তুলিতে পারে।

উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে একরকমের চাকার সাহায্যে বড় বড় ইঁদারা হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা আছে। এই চাকাকে 'পারসী চাকা' বলা হয় কারণ পারস্য বা ইরান অঞ্চলে ইহার প্রচলন বেশী। ইহার পারসী নাম 'শাদুফ'।

বহুমুখী নদীপরিকল্পনা

এতদিন পর্যন্ত নদনদীতে বাঁধ দিয়া জল আটকানো হইত এবং খাল কাটিয়া সেই জল ক্ষেতে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইত। নদীর জলে কেবল সেচের কাজ হইত, অন্য কোন কাজ বিশেষ হইত না। বর্তমানে নদীতে বাঁধ দিয়া বহুরকমের কাজ করা হইতেছে—যেমন জলসেচ, বিদ্যুৎ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, ভূমির ক্ষয়-নিবারণ, মাছের চাষ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, নৌবাহন ইত্যাদি। এই বহুমুখী উদ্দেশ্যের জন্য এইরকম নদীপরিকল্পনাকে "বহুমুখী নদী পরিকল্পনা" (multipurpose river-project) বলা হয়। বর্তমানে ভারতের অনেক প্রদেশে এই বহুমুখী নদীপরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। এইগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে :

পাঞ্জাব	॥	ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার	॥	দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা
		ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা
উড়িষ্যা	॥	হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা
মধ্যপ্রদেশ	॥	চম্বল পরিকল্পনা
মহীশূর ও অন্ধ্র	॥	নাগার্জুন পরিকল্পনা
উত্তরপ্রদেশ	॥	রিহান্দ পরিকল্পনা

বিহার ॥ কুশী পরিকল্পনা
বিহার ও উত্তরপ্রদেশ ॥ গণ্ডক পরিকল্পনা
গঙ্গা ও ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা

এই সমস্ত নদীপরিকল্পনা হইতে লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী পরিমাণে হইবে। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দেশের শিল্পায়নে (industrialisation) ও গ্রামোন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে যদি ভবিষ্যতে একদিন বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই আলোয় আমাদের সমাজের অনেক অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। জলসেচ প্রসঙ্গে বলা যায়, যেভাবে নদীপরিকল্পনার কাজকর্ম চলিতেছে তাহা যদি নির্বিঘ্নে চলে এবং কোন আর্থিক বা রাষ্ট্রিক বিপর্যয় কিছু না ঘটে, তাহা হইলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক যোজনার (Fifth Five-Year Plan) শেষে, ১৯৭৫-৭৬ সালে (অর্থাৎ আজ হইতে আরও ১৫ বছর পরে), অন্যান্য সেচব্যবস্থার সাহায্যে প্রায় ৯ কোটি একরের মতো জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে আবাদী জমির পাঁচভাগের একভাগে সেচের ব্যবস্থা আছে। বহুমুখী নদীপরিকল্পনাগুলি সার্থক হইলে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক যোজনার শেষে তিনভাগের একভাগ আন্দাজ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের জলসেচের বিরাট সমস্যার সমাধান করা তখনও সম্ভব হইবে না, সমস্যা থাকিয়াই যাইবে। এই ১৫ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িবে এবং তাহাদের খাদ্য যোগান দেওয়ার সমস্যাও দেখা দিবে। সেই সমস্যা আরও অনেক বেশী ভয়াবহ ও জটিল।

ভারতে খাদ্যের আত্মনির্ভরতার সমস্যা

ভারতবর্ষের মতো সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশেও যে আমরা খাদ্যের ব্যাপারে আত্মনির্ভর হইতে পারি নাই এবং কেন পারি নাই তাহা কৃষির এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের কৃষিকর্মের পদ্ধতি সনাতন, যন্ত্রপাতি অনুন্নত, জলসেচের অভাব, সার ও বীজের ব্যবহার গতানুগতিক। তাহার উপর যাহারা কৃষিকাজ করে সেই কৃষকরা আজও দুই বেলা দুই মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, কোন কাজে উৎসাহ পায় না, ঋণের দায়ে মহাজনের কাছে মাথা পর্যন্ত বিকাইয়া থাকে, মন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে

সামাজিক কুসংস্কারে। কৃষিকাজের পাত্র ও উপাদান দুইয়েরই যেখানে এই শোচনীয় অবস্থা সেখানে কৃষির উন্নতি হইবে কেমন করিয়া? মধ্যে মধ্যে আমরা 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের ধ্বনি শুনিতে পাই, কিন্তু ফসল যাহারা বাড়াইবে তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য ও উৎসাহ বাড়াইবার কথা বিশেষ কিছু শুনিতে পায় না। কিন্তু ফসল ইচ্ছা করিলেই বাড়ে না বলিয়া বাড়িতেছে না। ফসল বাড়াইতে হইলে মাটি, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ফসলচাষের সমস্ত উপাদান এবং কৃষকদের সাধারণ অবস্থা আরও অনেক বেশী উন্নত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে কায়ক্লেশে ফসল যেটুকু বাড়ানো সম্ভব হইবে তাহাতে ভারতের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্যসমস্যার সমাধান হইবে না। আজও আমরা খাদ্যের জন্য কিছুটা পরনির্ভর হইয়া আছি এবং মনে হয় ক্রমেই যেন সেই পরনির্ভরতা বাড়িতেছে। বিদেশ হইতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হইতেছে তাহার হিসাব দেখিলেই আমাদের এই পরমুখাপেক্ষিতা বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :

বিদেশ হইতে আমদানি খাদ্যশস্য

	চাল (টন)	গম (টন)	অন্যান্য খাদ্যশস্য (টন)
১৯৫৬ :	৩ লক্ষ ২৫ হাজার	১০ লক্ষ ৯৫ হাজার	×
১৯৫৭ :	৭ লক্ষ ৩৬ হাজার	২৮ লক্ষ ৪৬ হাজার	×
১৯৫৮ :	৩ লক্ষ ৯০ হাজার	২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার	১ লক্ষ ৯ হাজার
১৯৬০ :	৬ লক্ষ ৮৮ হাজার	৪৩ লক্ষ ১৬ হাজার	৫২ হাজার

খাদ্যশস্য আমদানির এই চিত্র আপাতত কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিতেছে না।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার খসড়াতে বলা হইয়াছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১৯৬০-৬১ সালে উহা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন হইবার সম্ভাবনা আছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইয়া ১০ কোটি টনের কিছু বেশী করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। তাহা হইলে বর্তমানে আমাদের খাদ্যের অবস্থা দাঁড়াইতেছে এই :

উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ

৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টন

৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন (+১৫ লক্ষ টন বৃদ্ধি)

১০ কোটি টন (+২ কোটি ৫০ লক্ষ টন বৃদ্ধি)

গত সাত-আট বছরের মধ্যে সবরকমের চেষ্টা করিয়া যে পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া ভারত-সরকার আশা করিতেছেন (তাহারও নিশ্চয়তা নাই), তাহা কোনদিক দিয়াই আশাপ্রদ নহে। যে-হারে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে এই পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি হইলে খাদ্যসংকট মিটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বর্তমানে (১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী) ভারতের লোকসংখ্যা কমবেশী ৪৩ কোটি। লোকসংখ্যাবিদ্ শ্রীচন্দ্রশেখর বলেন যে এই হারে ভারতের লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে ১৯৭১ সালের মধ্যে মোট লোকসংখ্যা হইবে ৫২ কোটি এবং ১৯৮১ সালে হইবে ৬৫ কোটি। এই জনসংখ্যাকে খাদ্য যোগান দেওয়া প্রায় অসম্ভব হইবে বলা চলে।

অনুসন্ধানীরা খাদ্য বিষয়ে গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমস্ত আবাদী জমিতে ফসল ফলাইলেও ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে ভারতের পক্ষে খাদ্যের ব্যাপারে আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ আগামী ১৫ বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইবার কোন আশা নাই। আমেরিকার বিখ্যাত খাদ্যবিশারদ বেকার সাহেব বলিয়াছেন যে কোনরকমে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে খাদ্য একজন ব্যক্তির দরকার হয় তাহা উৎপাদন করিতে অন্তত ০·৪৯ হেক্টেয়ার জমি (১ হেক্টেয়ার = ২·৪৭ একর) লাগে, আর ভালভাবে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অন্তত ১·২৫ হেক্টেয়ার জমি প্রয়োজন হয়। ভারতবাসীর জন্য মাথাপিছু জমি পাওয়া সম্ভব মাত্র ০·৩২ হেক্টেয়ার। অর্থাৎ কোনরকমে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একজন লোকের যে খাদ্য দরকার সেই খাদ্য উৎপাদনের জমিও আমাদের প্রায় তিনভাগে একভাগ কম রহিয়াছে। আমাদের খাদ্যসংকটের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা এইসব তথ্যের ভিতর দিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় এবং বাস্তবিকই তখন অসহায় মনে হয়।

কেন অসহায় মনে হয়? প্রাকৃতিক নিয়মে দেশের লোকজন বাড়ে, কিন্তু ফসল উৎপাদনের জমি বাড়ে না। যে-হারে লোক বাড়ে যদি ঠিক সেই অনুপাতে আমাদের জমিও বাড়িত, দেশের জায়গাজমিও প্রসারিত হইত তাহা হইলে চিন্তা-ভাবনার প্রশ্ন থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় না। হইতে যে পারে না তাহা নহে, অন্য দেশ আক্রমণ করিয়া জমি দখল করিয়া লইলে জমি বাড়িতে পারে। পৃথিবীতে এই কারণে পররাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ

একাধিকবার হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যুদ্ধবিগ্রহের পথে, অথবা পররাজ্য অধিকার করিয়া কোন ঘরোয়া সমস্যা সমাধান করিবার কথা চিন্তাই করিতে পারে না। সুতরাং এই পথে ফসলের জমি বাড়ানোর কথা উঠিতে পারে না। বাকি পথ রহিল বন-অরণ্য ইত্যাদি হাসিল করিয়া আবাদযোগ্য করিয়া তোলা। কিন্তু সে-পথেও বিপদ অনেক। বন-অরণ্য প্রত্যেক দেশের খুব বড় সম্পদ এবং বাঁচিবার জন্য ফসলের মতো এই বনসম্পদেরও প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করিব।

তাহা হইলে উপায় কি? পররাজ্য দখল করিয়া জমি বাড়ানো চলিবে না, বন কাটিয়া ফসল ফলানো চলিবে না, তাহা হইলে ফসলের জমি কোথায় পাওয়া যাইবে? বরং বর্তমানে যে ফসলের জমি আছে তাহা ক্রমেই আরও কমিয়া যাইবে। কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যত লোকবসতি বাড়িবে, নূতন নূতন শহর ও নগর গড়িয়া উঠিবে, শ্রমশিল্পের বিস্তারের ফলে যত কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তত চাষআবাদের জমি কমিয়া যাইবে। আজই যদি যে-কোন শহর-নগরের চারিদিকে চাহিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ১০-১৫-২০ বছর আগে ৩০-৪০-৫০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম ও চাষের জমি ছিল তাহা লোকবসতির দ্রুত বিস্তারের ফলে শহরতলী গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কলিকাতা শহরের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরের দিকে চাহিলেই ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং চাষের জমি ক্রমে কমিবে ছাড়া বাড়িবে না। অথচ লোকসংখ্যা বাড়িবে এবং দ্রুতহারে তাহা বাড়িতেছে। তাহাদের বসতির প্রয়োজন, খাদ্যেরও প্রয়োজন। কোথা হইতে খাদ্য আসিবে? এই রূঢ় বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করিলে অসহায় মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু অসহায় বোধ করিলে চলিবে না। সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে। করিবার অন্যতম উপায় হইল—কৃষির সনাতন প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকাজের ব্যবস্থা করা। ইহার সহিত কৃষকদের অবস্থারও অনেক উন্নতি করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং উন্নত সার ও বীজের সাহায্যে যথাসম্ভব রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ও স্বাধীনভাবে সমবায়-কৃষির প্রচলন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কৃষিসংকট ও খাদ্যসংকট সমাধানের আর কোন পথ নাই। খাদ্যে স্বাবলম্বী হইবারও ইহাই একমাত্র পথ।

এইবার বাহিরের কয়েকটি দেশের কৃষিকাজের কথা আলোচনা করা হইবে। এই আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে, আমাদের দেশের কৃষিকাজের ত্রুটিবিচ্যুতি কোথায় এবং কি উপায়ে তাহা পূরণ করিয়া কৃষির উন্নতি করা সম্ভব। এখানে আমরা কয়েকটি দেশের কথা বলিব—জাপান, মিশর, আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন।

জাপানের কৃষিকাজ

জাপানী প্রণালীতে আমাদের দেশে যখন ধানচাষের পরীক্ষা হইতেছে তখন জাপানের কৃষিকাজ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এসিয়ার মধ্যে তো বটেই, পৃথিবীর মধ্যে আজ জাপান অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু জাপানের শিল্পোন্নতির প্রসঙ্গ আপাতত আমাদের আলোচ্য নহে। জাপান ছোট দেশ হইলেও ভারতের মতো লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা তাহারও আছে। গত একশত বছরের মধ্যে জাপানের লোকসংখ্যা ৩ কোটি হইতে প্রায় ৯ কোটি হইয়াছে, অর্থাৎ তিনগুণ বাড়িয়াছে। একদা জাপান খাদ্যে স্বাবলম্বী ছিল, এখন আর তাহা নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা যেমন বাড়িয়াছে, দ্রুত শিল্পবিস্তারের ফলে কাঁচামালের চাহিদাও তেমনি বাড়িয়াছে। খাদ্যফসল ও পণ্যফসলের উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ আবাদের জমি জাপানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তাহা বাড়াইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ৯ কোটি লোকের খাদ্য যোগাইবার জন্য জাপানে ১ কোটি ২৬ লক্ষ একর আবাদী জমি আছে। প্রত্যেক লোকের জন্য জাপানে মাত্র ০·২ একর চাষের জমি পাওয়া সম্ভব। কৃষক-পরিবারের সংখ্যা জাপানে প্রায় ৬২ লক্ষ, কাজেই প্রত্যেক পরিবারের জন্য যোগ্য মাত্র ২½ একর জমি জাপানে পাওয়া যাইত পারে। জমির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলেও (এবং জাপানী কৃষকরা বাধ্য হইয়া তাহা করিয়া থাকে) খাদ্য ও কাঁচামালের চাহিদা ইহাতে মিটানো সম্ভব হয় না। বাহির হইতে অনেকটা পরিমাণে খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানি করিয়া এই অভাব মিটাইতে হয়। ইহা জাপানের একটি গুরুতর সমস্যা।

বহুকাল হইতে জাপানীরা ধানচাষ করিয়া আসিতেছে। ভারতের সহিত এই দিক দিয়া জাপানের মিল আছে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া

জাপানীরা কৃষিপ্রণালীর অনেক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। লক্ষ্য হইতেছে—জমি যখন অল্প তখন সেই অল্প জমিতেই যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণে ফসল ফলানো। যে উপায়ে ইহা করা হইতেছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল দুইটি :

ক। উৎকৃষ্ট সেচব্যবস্থা করা।

খ। পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট সার দেওয়া।

চাষের জমিতে জাপানে যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয় তাহা পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে হয় কি না সন্দেহ। গড়ে প্রতি একর জমিতে জাপানে প্রায় ৫ মেট্রিক টন (প্রায় ৪½ টন) সার ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার উত্তর-কেরোলিনায় জমিতে প্রচুর সার দেওয়া হয়, কিন্তু জাপানে সার দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা আরও চার-পাঁচগুণ বেশী।

ধানচাষের উপর জাপানে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে, পাহাড়ের গায়ে সোপান করিয়া ধানচাষ করা হয়। ছোট ছোট প্লট, সেচখাল দিয়া ঘেরা। গাছের চারা করিয়া সারিবদ্ধভাবে বাঁধ দিয়া লাগানো হয়। ধান কাটা হইয়া গেলে যেখানে আবহাওয়ার দিক হইতে সম্ভব সেখানে গম, বার্লি, রাই, সরিষা ইত্যাদি চাষ করা হয়। যেখানে ধানচাষ সম্ভব নয়, সেখানে একই জমিতে পাশাপাশি নানারকমের ফসল ও সবজি ফলানো হয়। একখণ্ড জমি হইতে যে-রকম ফসল যতদূর ফলানো সম্ভব তাহা জাপানী কৃষকরা প্রাণপণে ফলাইবার চেষ্টা করে।

মিশরের কৃষিকাজ

ঐতিহাসিক নীলনদ মিশরে প্রবেশ করে একটি সংকীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়া। উপত্যকাটি চুনাপাথরের এবং দুই মাইলের বেশী চওড়া নহে। কিছু দূর হইতে উপত্যকাটি ক্রমে আরও চওড়া হইয়া ১০-১৪ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রের বিস্তার প্রায় কায়রো পর্যন্ত। পূর্বদিক রূঢ় ও পার্বত্য, চুনাপাথরের শৃঙ্গ প্রায় নদীর ধার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমদিকে নিম্নভূমি এবং এইখানেই ফাইয়ুমের বিখ্যাত কৃষিক্ষেত্র। কায়রোর উত্তরদিকে নীলনদ দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ব-দ্বীপের অবিচ্ছিন্ন সমভূমি ক্রমে প্রায় ১৫০ মাইল বিস্তৃত গভীর উর্বর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলে শীতকালে যে সামান্য বৃষ্টিপাত হয় তাহা ছাড়া অন্য সময় আর প্রায় বৃষ্টিই হয় না। শীতকালে বেশ উপভোগ্য, কারণ ঠাণ্ডার প্রাবল্য নাই। কিন্তু মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মের তাপ অত্যধিক, কেবল সমুদ্রকূলে বাতাসের জন্য আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা থাকে।

আজ হইতে একশত বছর আগেও মিশরে প্রায় সমস্ত শস্যের চাষ নীলনদের ধারে ধারে গঠিত পরিবাহক্ষেত্রের সেচের উপর নির্ভর করিত। এই ক্ষেত্রগুলি (basins) নদীর ধারে ধারে ১০০০ হইতে ৪০,০০০ একর পর্যন্ত অঞ্চল জুড়িয়া উঁচু বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইত। বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিও ছোট ছোট মাটির আল দিয়া পৃথক করা থাকিত। নীলনদের প্রবাহ ফাঁপিয়া উঠিলে ছোট ছোট খালের ভিতর দিয়া জল আসিয়া ক্ষেত্রগুলি ৩ ফুট হইতে ৬ ফুট পর্যন্ত ভরিয়া যাইত। সেই জল দেড়মাস হইতে দুইমাস পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া পলিমাটির স্তরে ক্ষেত্রগুলিকে ভরাট করিয়া দিত। তারপর মিশরের ‘ফেল্লাহ’রা (মিশরের কৃষকদের ‘ফেল্লাহ’ বলে) এইসব ক্ষেত্র চাষ করিত। চাষ ও ফসল বেশ ভালই হইত। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইতেছে এই যে এইসব ক্ষেতে বছরে কেবল একটি ফসলের চাষ সম্ভব। যতদিন মিশরে লোকসংখ্যা বেশী ছিল না ততদিন ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হইত না। কিন্তু গত একশত বছরে মিশরে লোকসংখ্যা প্রায় আধকোটি হইতে আড়াইকোটি পর্যন্ত বাড়িয়াছে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে জলসেচ ও চাষ আজ আর সম্ভব নহে। আজ একই জমিতে বছরে অন্তত দুই-তিনবার ফসল ফলাইতে হয়। তাহা করিতে হইলে জলসেচের উন্নত ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহার জন্য নীলনদের বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলসেচের জন্য স্থায়ী খাল তৈরী করা হইয়াছে। নীলনদের উপর বড় বড় ব্যারাজের দ্বারা জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই সমস্ত খালে জলপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখা হয়। তাহাতে কৃষকদের চাষের আর কোন অসুবিধা হয় না। মিশরের এই আধুনিক সেচব্যবস্থার সহিত আমাদের দেশের বহুমুখী নদীপরিকল্পনার অন্তর্গত সেচব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে।

মিশরের প্রধান ফসল হইল তুলা, ভুট্টা, গম ইত্যাদি এবং চাষের জমির চারভাগের তিনভাগে এইসব ফসল ফলানো হয়। বাকি একভাগ জমিতে ধান, বীন, বার্লি, আখ ও সবজিও চাষ করা হয়। তুলা হইল মিশরের প্রধান পণ্যফসল, ইহাকে জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

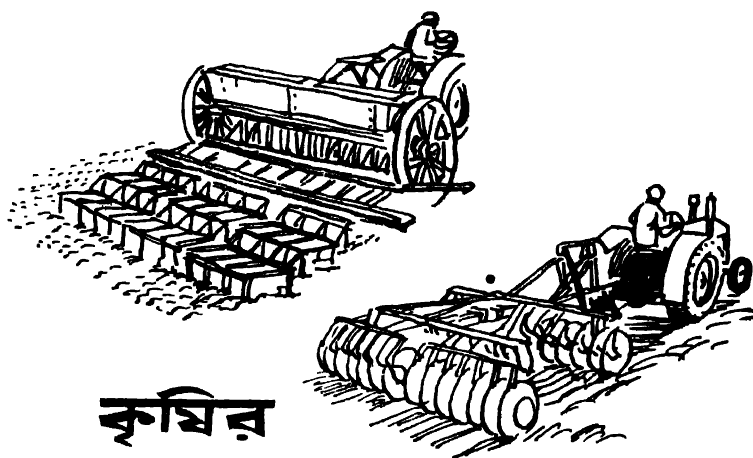
আমেরিকার কৃষিকাজ

প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কয়েকটি শস্যকেন্দ্রে (crop-zone) ভাগ করা যায়। যেমন—

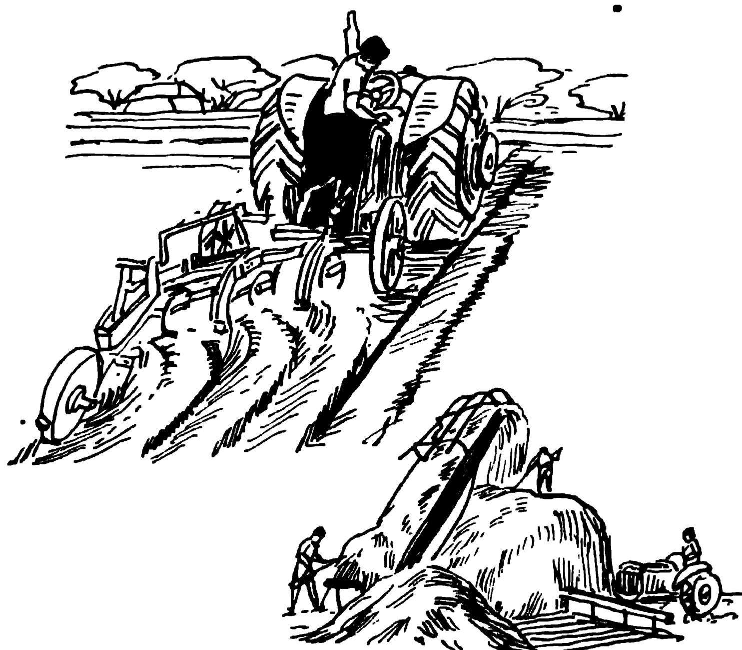
উত্তর-পশ্চিমের ভুট্টা উৎপাদনকেন্দ্র
দক্ষিণ-পশ্চিমের তুলা উৎপাদনকেন্দ্র
মধ্য-পশ্চিমের শীতকালীন গম উৎপাদনকেন্দ্র
উত্তরপ্রান্তের বসন্তকালীন গম উৎপাদনকেন্দ্র ইত্যাদি।

আমেরিকার কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালী। একদা শতকরা ৯০ জন আমেরিকান ফার্মে বা গ্রাম্য কৃষিকেন্দ্রে বাস করিত, এখন শতকরা ১২ জনের বেশী বাস করে না। শহর ও শিল্পকারখানা অঞ্চলে লোকের ভিড় হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত কৃষিকাজ করার জন্য আজ একজন মার্কিন কৃষক প্রায় ২৫ জনের মতো খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে। আমেরিকা হইতে বাহিরের বিভিন্ন দেশে আজ প্রায় বছরে ২২৫০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য ও পণ্যফসল রপ্তানি করা হয়। অর্থাৎ একজন মার্কিন কৃষক মোট যে ফসল ফলায় তাহাতে আমেরিকায় ১৮ জন ও বাহিরে অন্তত ৭ জন লোক প্রতিপালিত হয়। একটি আমেরিকান ফার্মের আয়তন এখন গড়ে প্রায় ২৪০ একর। কিন্তু চাষের লোকের অভাব খুব, কারণ সকলেই আজ সেখানে শহর ও কারখানামুখী। সেইজন্য লোকের মেহনত বাঁচাইবার জন্য এতরকমের কৃষির যন্ত্রপাতি আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে ১০০ জন লোকের কাজ একজন লোক করিতে পারে এবং ১০০ দিনের কাজ প্রায় একদিনে করা যায়।

আমেরিকায় আজ প্রায় ৫০ লক্ষ ট্র্যাক্টর (প্রত্যেক ফার্মে গড়ে একটির বেশী), ১০ লক্ষ কম্বাইন, ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার 'পিকার' বা শস্যতোলার যন্ত্র এবং অন্যান্য নানারকমের যন্ত্রপাতি আছে। চাষ, বীজবপন, রোপণ, শস্য কাটা, ঝাড়া, মজুত ইত্যাদি সমস্ত কাজ যন্ত্রের সাহায্যে হয়। বীজ ও সারেরও নিয়মিত গবেষণা করিয়া অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। কলম্বিয়া, কোলোরাডো, টেনেসি, সেণ্ট লরেন্স প্রভৃতি বড় বড় নদীপরিকল্পনার সাহায্যে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং জলসেচের উন্নতিসাধনও সম্ভব হইয়াছে। তাই চাষের লোকাভাব সত্ত্বেও কৃষিজাত সম্পদের অভাব নাই আমেরিকায়।



কৃষির বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি



হার্ভেস্টার-কম্বাইন-ট্র্যাক্টর-পিকার

সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষিকাজ

সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশাল দেশ হইলেও ভৌগোলিক কারণের জন্য সেখানে মোট জমির শতকরা মাত্র ৭ হইতে ১০ ভাগ অঞ্চলে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হয়। খাদ্যফসল ও পণ্যফসল, দুইরকমের ফসলই উৎপন্ন হয়, তবে পণ্যফসলের দিকে ঝোঁক বেশী। উক্রেইন অঞ্চল ভুট্টা ও গম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত, ইহাকে বলা হইত সোভিয়েটের শস্যভাণ্ডার। বর্তমানে মধ্য-ভল্‌গা অঞ্চলে, উত্তর কাজাকস্থানে, পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ও অল্‌টাই অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা হইতেছে। শরৎকালীন রাই ইউরোপীয় রাশিয়ায় এবং বসন্তকালীন গম মধ্য-রাশিয়া ও পূর্বাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ভুট্টার চাষ হয় প্রধানত উক্রেইনে ও উত্তর-ককেসাসে। বীটচিনি উৎপন্ন হয় উত্তর-উক্রেইনে, তিসি-জাতীয় শণ (flax) ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাংশে এবং তন্তু-শণ (hemp) দক্ষিণাংশে। তুলার চাষ সোভিয়েট দেশে অনেক বাড়ানো হইয়াছে এবং তাহার প্রধান উৎপাদনক্ষেত্র সোভিয়েট-এসিয়ার উজবেকিস্তান অঞ্চল। দক্ষিণ-ককেসাস ও মধ্য-এসিয়ার কোন কোন অঞ্চলে চা উৎপন্ন হয় (যেমন জর্জিয়ায়) এবং কুবান উপত্যকায় চালও উৎপন্ন হয়।

আমেরিকার মতো সোভিয়েট-ইউনিয়নেরও কৃষিকাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালী। উন্নত বীজ, সার ও সেচের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত পরিমাণে করা হয়। সোভিয়েট কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ-কৃষি (collective farming)। অনেক কৃষক-পরিবার মিলিত হইয়া, একত্রে সমস্ত সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করে। এই ধরনের যৌথ ফার্মগুলিকে 'কোলহোজ' বলে। রাষ্ট্রের অধীনেও বহু কৃষি-কার্ম পরিচালিত হয়।

ফসল উৎপাদনের হার। ভারত ও অন্যান্য দেশ

ভারত ও অন্যান্য দেশ। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে চাল, গম, তুলা, তামাক ইত্যাদি উৎপাদনের হার ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা কম। কয়েকটি বড় বড় দেশে প্রধান ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ এখানে নির্দেশ করা হইল :

(প্রতি হেক্‌টেয়ারে ১০০ কিলোগ্রামের হিসাব)

১৯৫৮-৫৯

	গম	ধান	তুলা (বীজ)	তামাক
ভারতবর্ষ :	৬·৬	১৩·৭	২·১	৬·৮
ইটালি :	২০·৩	৫২·৫	৩·৩	১৫·২
অস্ট্রেলিয়া :	১৪·১	৬০·৯	৪·৫	১০·৩
আর্জেন্টিনা :	১২·৮	৩১·৭	৩·৪	৯·১
সোভিয়েট রাশিয়া :	১১·৫	×	১৩·১	×
জাপান :	২১·২	৪৬·২	×	২০·৩
সংযুক্ত আরব রিপাবলিক :	×	১৫·৭	৬·৩	৯·৩
আমেরিকা :	১৮·৪	৩৫·১	৯·১	১৮·১
তুরস্ক :	১১·৫	৩৩·৬	৫·১	৬·৬
পাকিস্তান :	৭·৮	১৩·২	৪·১	১১·৬

এই নির্দেশিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের উৎপাদনের হার সকলের তুলনায় কম। ভারতের তিনগুণ বেশী গম ইটালি, জাপান ও আমেরিকায় উৎপন্ন হয়, দ্বিগুণ হয় সোভিয়েট রাশিয়ায়। ভারতে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় চারগুণ হয় ইটালিতে, সাড়ে-চারগুণ অস্ট্রেলিয়ায়, আড়াইগুণ আর্জেন্টিনায়, চারগুণের কিছু কম জাপানে এবং প্রায় আড়াইগুণ তুরস্ক ও আমেরিকায়। যে-সব দেশে উন্নত বীজ, সার, সেচ ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালীতে কৃষিকাজ করা হয়, সেইসব দেশে উৎপাদনের হার খুব বেশী দেখা যায়। কিন্তু ভারতের মতো পাকিস্তান ও সংযুক্ত-আরব রাজ্যগুলিতে কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত থাকার জন্য উৎপাদনের হারও সেখানে ভারতের মতো খুব কম।

ভবিষ্যতের পন্থা

ভবিষ্যতে কোন্ পথে চলিলে ভারতীয় কৃষির এই সংকটের সমাধান হইতে পারে? একটি কোন সহজ পথ নাই, অনেক পথে একসঙ্গে চলিতে হইবে। প্রথমত, আবাদ করা যাইতে পারে এইরকম সমস্ত অনাবাদী ও পতিত জমি উদ্ধার করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে হইলেও আবাদ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, নানারকমের বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহারের আবশ্যকতা কৃষকদের

বুঝাইতে হইবে এবং তাহা সরবরাহ করার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। জলসেচেরও আরও অনেক উন্নতি প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ট্র্যাকটর কম্বাইন পিকার প্রভৃতি কৃষির যন্ত্রপাতি দেশের কারখানায় নির্মাণ করিয়া কৃষিকাজের জন্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে আদর্শ রাষ্ট্রীয় ফার্ম (model State farms) স্থাপন করিয়া কৃষকদের যন্ত্রের উপযোগিতা কত বেশী তাহাও দেখাইতে হইবে। চতুর্থত, যৌথ-কৃষি ও সমবায়-কৃষি যেখানে যতদূর সম্ভব প্রচলন করিতে হইবে। পঞ্চমত, জমি-সংক্রান্ত আইন সংস্কার করিয়া কৃষকদের উৎসাহ দিতে হইবে। ষষ্ঠত, কৃষিজাত ফসলের বেচাকেনার বাজার অনেক ভালভাবে সংগঠন করিতে হইবে। সপ্তমত, কৃষকদের অশিক্ষা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি যতদূর সম্ভব দূর করিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানসিক প্রসারের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এই কাজগুলির কোনটি খুব সহজসাধ্য নহে। কিন্তু সহজ নহে বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ভারতের কৃষিসংকট ক্রমেই আরও গভীর হইবে। কৃষিজাত ফসলের উৎপাদনের হার যদি আশানুরূপ না বৃদ্ধি পায়, অথচ বর্তমান হারে লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে শুধু খাদ্যসমস্যাতেই ভারতবর্ষ এমন কাতর হইয়া পড়িবে যে অন্য কোন সমস্যার কথা তাহার চিন্তা করারও অবকাশ থাকিবে না।

QUESTIONS

Group A

1. "The two most important features of agricultural production in India are the wide variety of crops and the preponderance of food over cash crops." Discuss the statement.

2. How much land is available in India for cultivation? Do you think it is properly and fully utilised for agricultural purposes? What measures would you suggest for its full utilisation?

বিভিন্ন উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করিয়া কিভাবে জমির উৎপাদনহার বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে

3. What are the different natural crop-zones in India ?

এই অধ্যায়ে 'আঞ্চলিক পরিবেশ ও ফসল' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। উৎপাদনের হারবৃদ্ধি সম্বন্ধে 'সংখ্যা' মুখস্থ বা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, শুধু মোট কতটা গত ১০ বছরে বাড়িয়াছে তাহা উল্লেখ করিলেই হইবে—যেমন, গত দশ বছরে (১৯৫০-৬০) পাটের উৎপাদন দ্বিগুণ-আড়াইগুণ বাড়িয়াছে ইত্যাদি।

4. What are the different methods of cultivation and how are they related to local geographical factors in India ?

এই অধ্যায়ে 'কৃষির প্রণালী ও প্রকৃতি' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষির যন্ত্রপাতিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

5. What are the different methods of irrigation in India ? Do you think that the area under crops in India is adequately irrigated ?

6. What are the important Multi-purpose River Valley Projects in India ? Why are they called 'multi-purpose' ? Estimate their role in India's economic progess.

7. Is India self-sufficient in food ? How do we meet our food deficiency ? How can this food problem be tackled ?

8. What are the characteristics of Japanese agriculture ? How far do these differ from Indian agriculture ?

9. Is there any difference between the methods of agriculture in India, U.S.A. and U.S.S.R. ?

10. Give a comparative study of the methods of cultivation and irrigation in India and Egypt.

11. What is the average yield of Wheat, Paddy and Cotton in India, U.S.A., U.S.S.R., Pakistan, Japan, Australia and U.A.R. ? Why is it low in India, Pakistan and U.A.R. (United Arab Republic) ?

12. What is Japanese method of paddy cultivation ? What do you know about its experiment in India ?

13. Write a short essay on the problems of Indian agriculture.

কৃষির অনুন্নত যন্ত্রপাতি, সার ও সেচসমস্যা, আবাদী জমির সমস্যা, কৃষকদের আর্থিক সংগতি ও শিক্ষার অভাব ইত্যাদি বিষয়ে গুছাইয়া লিখিতে হইবে।

14. Write notes on :

(a) Canal irrigation; (b) Intensive cultivation; (c) Dry farming; (d) Tractor; (e) Collective farming.

Group B

I. The 'natural zones' in the 2nd Column are not correctly arranged in relation to the crops in the 1st Column. Arrange it in right order in the 3rd Column.

1st Column		2nd Column	3rd Column
Paddy	:	Rajasthan, Punjab	
Millets	:	Bihar, Orissa, Bengal	
Cotton	:	Upper India	
Wheat	:	Deccan	
Sugarcane	:	Assam, Darjeeling	
Tea	:	Uttar Pradesh	

II. *Dry farming* is prevalent in hilly regions of India.
Wet farming is practised in Deccan.
Terraced farming is practised in desert regions.
Correct the above statements, if necessary.

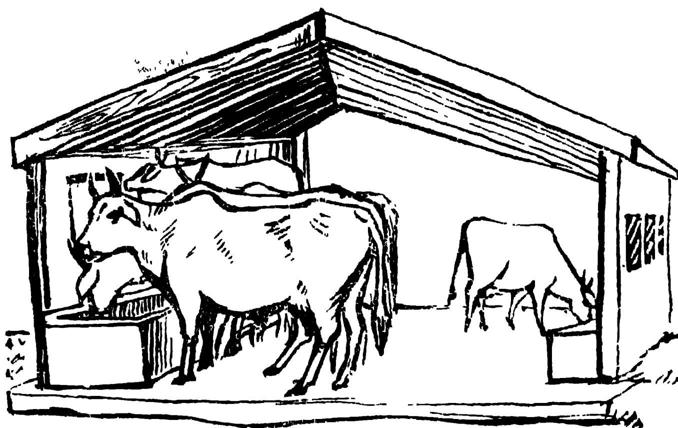
III. Jowar, Bajra, Jute, Cotton, Groundnuts, Oil-seeds, Wheat, Rice, Tobacco, Tea, Dal, Sugarcane.

Isolate the food-crops and cash-crops from the above list in two separate columns.

IV.

River Valley Projects	Regions
Hirakud Project	—
—	West Bengal and Bihar
Andhra	—
Mysore	—
—	Madhya Pradesh
—	Punjab

Put the names of 'regions' and 'projects' not mentioned in the above two columns.



সপ্তম প্রকরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষির আনুষঙ্গিক কর্ম

প্রতিপাদ্য। কৃষিকাজের আনুষঙ্গিক কাজকর্মের মধ্যে প্রধান হইতেছে পশুপালন, মৎস্যচাষ, হাঁসমুরগি পালন, দুধ-ঘি-মাখন উৎপাদন ও খাদ্যসংরক্ষণ। চাষবাসের সহিত এই কাজগুলিও একসঙ্গে করা যাইতে পারে এবং করিতে পারিলে অনেকদিক হইতে লাভবান হওয়া যায়। কোন জিনিসের অপচয় হয় না, একটির খরচে অন্যটির খরচ অনেকটা কুলাইয়া যায় এবং চাষের অবসর সময়টুকুও অর্থকরী কাজে নিয়োগ করা যায়। চাষ-আবাদের সহিত একসঙ্গে এই কাজগুলি করিলে তাহাকে 'মিশ্র-চাষ' বা 'mixed farming' বলা হয়। এই মিশ্র-চাষের রীতি এখনও ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় নাই এবং তাহার অর্থনীতিক উপযোগিতা সম্বন্ধে দেশের কৃষকরাও তেমন সচেতন নহে। সাধারণত পশুপালনাদি কৃষির আনুষঙ্গিক কর্ম স্বতন্ত্র ব্যবসা হিসাবেই এদেশের লোক করিয়া থাকে। কৃষিকাজ যাহাদের পেশা নহে এমন বহুলোক এইসব কাজকর্মের সহিত যুক্ত আছে। তাহার কারণ পশুপালন, মৎস্যচাষ, হাঁসমুরগি পালন ও ডেয়ারী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিরাট বাণিজ্যের আকারে

Unit 7. (ii) Occupations supplementary to agriculture – fishing, animal husbandry, poultry, dairy, preservation of food.

করা যায়। তাহা করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় এবং অর্থও যথেষ্ট লাগে। শিক্ষা বা অর্থ কোনটাই আমাদের [illegible] কৃষকদের নাই, কাজেই মিশ্র-চাষ তাহাদের পক্ষে করা সম্ভব নহে। যেভাবেই এই কাজগুলি করা হোক না কেন, জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, ইহাদের গুরুত্ব খুব বেশী।

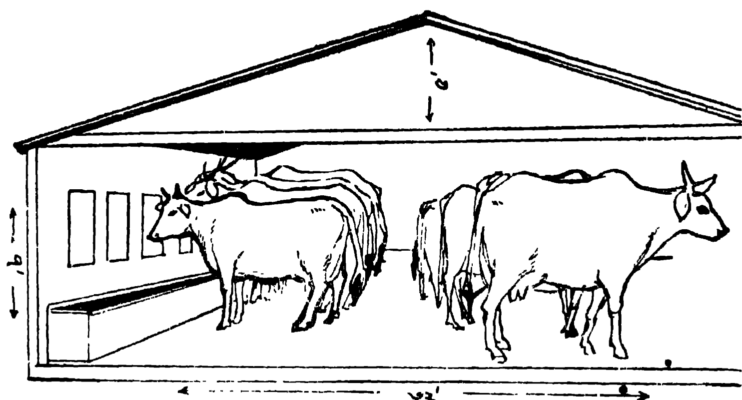
পশুপালন

আদিকাল হইতে মানুষ পশুপালন করিয়া আসিতেছে। হয়ত কৃষিকাজ ও পশুপালন একই সময়ে মানুষ শিখিয়াছে, অথবা কিছু আগে ও পরে। এই দুইটি কাজই মানুষের নিজের মেহনতে খাদ্য উৎপাদনের কাজ এবং আদিযুগে এই কাজ দুইটি আয়ত্ত করিবার ফলে মানুষ এক নূতন যুগ, নূতন সমাজ ও ও সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। তাহার আগে অসহায়ের মতো মানুষকে বাঁচিবার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হইত। বনজঙ্গলের ফলমূল সংগ্রহ করিয়া, স্থলে ও জলে জীবজন্তু, মাছ ইত্যাদি শিকার করিয়া মানুষ জীবনধারণ করিত। কোন খাদ্য মানুষ নিজে উৎপাদন করিতে পারিত না। কৃষিকাজ ও পশুপালন করিয়া মানুষ প্রকৃতিকে খানিকটা জয় করিল এবং নিজে খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখিল। চাষ করিয়া যেমন ফসল উৎপাদন করা যায়, পশুপালন করিয়াও তেমনি মাংস, দুধ ইত্যাদি খাদ্য উৎপাদন করা যায়। এইজন্য কৃষিকাজের মতো পশুপালন করাও হইল খাদ্য-উৎপাদন করা।

পশুপালন বর্তমানে আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা। ১৯৫৬ সালের পশুগণনায় দেখা গিয়াছে যে ভারতে প্রায় ১৬ কোটি গরু এবং ৪২ কোটি মহিষ আছে, অর্থাৎ গরুমহিষের মিলিত সংখ্যা প্রায় ২১ কোটি। অন্যান্য পশুর মধ্যে ভেড়ার সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি, ছাগলের সংখ্যা ৫২ কোটি, ঘোড়ার সংখ্যা ১৫ লক্ষ এবং উট, গাধা, শুয়োর প্রভৃতি জন্তুর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ। সকলরকমের পশুর মোট সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি ৬৫ লক্ষ। গত পাঁচ-ছয় বছরে এই সংখ্যা আরও কিছু বাড়িয়া ৩২-৩৩ কোটি হইতে পারে।

পশুর স্বাস্থ্যই হইল ভারতের প্রধান সমস্যা। ভারতের গবাদি পশুর স্বাস্থ্য আদৌ ভাল নহে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া অধিকাংশই ক্ষীণজীবী

ও দুর্বল। সেইজন্য ইহাদের দুধ ও মাংসের পরিমাণ অন্যান্য দেশের পশুর তুলনায় অনেক কম। সেই প্রাচীন আর্যযুগ হইতে ভারতের হিন্দুদের কাছে গরু দেবতার মতো পূজ্য ও পবিত্র এবং হিন্দুশাস্ত্রে গোসেবার নানারকম বিধানও আছে। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান গৃহস্থের পক্ষে কার্যক্ষেত্রে পালন করা



আধুনিক স্বাস্থ্যকর গোয়ালঘর

সম্ভব হয় না, অনেক সময় অবস্থাগতিকেও হইয়া ওঠে না। পশুপালন যে রীতিমত একটি শিক্ষণীয় বিষয় আজও আমাদের দেশে অনেকের সে ধারণা নাই। পশুকে নিতান্ত 'পশু' মনে করিয়া তাহার কাছ হইতে আমরা যতটা সম্ভব কাজ আদায় করিয়া থাকি—বোঝা বহন করাই, লাঙ্গল চষাই, দুধ দোহন করি—কিন্তু তাহাকে যত্ন করিয়া যেভাবে পালন করা উচিত তাহা করি না।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারত-সরকার আজ সচেতন হইয়াছেন। পশুপালনের উন্নতির জন্য যে-সব রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার লক্ষ্য হইতেছে—

১। ভাল ভাল সুস্থ পশু বাছিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করা।

২। গরু-মহিষের দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৩। মালবাহী পশুর বলবৃদ্ধি করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমানে তিনটি পরিকল্পনা কার্যকর করা হইতেছে:

গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনা। তিন-চারটি করিয়া গ্রাম লইয়া এক-একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রগুলিকে সুস্থ সবল গবাদি পশুর

প্রজননকেন্দ্র বলা যায়। প্রত্যেক কেন্দ্রে বাছাই-করা দুগ্ধবতী গাভী ও বলবান ষাঁড় রাখিয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় এই ধরনের কয়েকশত গ্রামকেন্দ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপন করা হইয়াছে। ভাল ভাল গোচারণভূমির ব্যবস্থা করাও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

গোশালা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই একই উদ্দেশ্যে নূতন নূতন গোশালা স্থাপন করা হইতেছে এবং পুরাতন গোশালাগুলিকে সংস্কার করিয়া নূতন রূপ দেওয়া হইতেছে। ১৯৬০-১৯৬১ সালের মধ্যে এই ধরনের ২৩৩ গোশালা ভারতবর্ষে স্থাপন করা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় ইহার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হইবে বলা হইয়াছে।

গোসদন। বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অকর্মণ্য গরু-মহিষ পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য গোসদন স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার মধ্যে এই-রকম ৩৫টি গোসদন স্থাপিত হইবার কথা। ইহার মধ্যে ১১টি গোসদনের সহিত একটি করিয়া 'চর্মালয়' সংযুক্ত হইয়াছে। এই চর্মালয়গুলিতে মৃত পশুর চামড়া ও হাড় হইতে নানাবিধ জিনিস তৈরী করার ব্যবস্থা আছে।

পরিকল্পনাগুলি প্রশংসনীয়, কিন্তু সমস্যার তুলনায় ব্যবস্থা অনেক কম বলিয়া মনে হয়। গ্রাম্য পশুপালনকেন্দ্র, গোশালা, গোসদন ও চর্মালয় আরও অনেক বেশী সংখ্যায় বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপন করা দরকার। কেবল তাহা করিলেই দায়িত্ব শেষ হইবে না, কৃষিজীবীদের পশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহ দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রাম-কেন্দ্রে গোশালা ও গোসদনের কাছে একটি করিয়া পশুপালন-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিলে ভাল হয়।

দুগ্ধশিল্প বা ডেয়ারী

খাদ্যবিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে দুধ ও দুধের খাদ্য প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে প্রায় ৯৩ গ্র্যাম করিয়া প্রত্যহ খাইয়া থাকে, অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্তত ২৮৩ গ্র্যাম করিয়া খাওয়া উচিত। অর্থাৎ দুধ ও দুধের তৈরী খাদ্য আরও প্রায় তিনগুণ আমাদের বাড়ানো প্রয়োজন।

কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে খাঁটি দুধ যদি দেশে না পাওয়া যায় এবং তাহা সাধারণ স্বল্পবিত্ত লোকের কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে দুধ খাওয়া

ডেয়ারিতে যাহা হয়

দুধ

গুঁড়া দুধ

ক্রীম

দুধ

ঘি

মাখন

ইচ্ছা করিলেই বাড়ানো সম্ভব হইবে না। দুধের মূল্য সম্প্রতি অনেক বাড়িয়াছে, এবং ন্যায্য মূল্য দিয়াও খাঁটি দুধ সংগ্রহ করা যে কত কঠিন তাহা

গৃহস্থ মাত্রই জানেন। দুধের অভাব হইবার অন্যতম কারণ হইল গো-মহিষাদি পশুর ক্রমিক অবনতি ও শক্তিক্ষয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালনের ব্যবস্থা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। পশুপালনের সহিত ডেয়ারীশিল্পেরও বিস্তার প্রয়োজন। দুধ ও দুধের তৈরী ঘি-মাখন ইত্যাদি খাদ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিলে যে পরিমাণ অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহাও উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের দেশে ডেয়ারীশিল্প এতদিন উপেক্ষিত হইয়াছে। অশিক্ষিত গোয়ালারাই প্রধানত দুধ-ঘি-মাখনের ব্যবসা করিয়াছে। তাহাতে দেশের গো-সম্পদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে এবং সেই সম্পদ বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করা হয় নাই। গবাদি পশুর উন্নতির জন্য, দুধ ও দুধের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডেয়ারীশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার প্রয়োজন। তাহাতে কেবল গরু-মহিষের ও দুধের সমস্যা নহে, বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হইবে। হাজার হাজার লোক ডেয়ারীশিল্পের কাজকর্মে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে।

ভারত-সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য-সরকার এই কারণে ডেয়ারীশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের দিকে সম্প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। ১৯৬০-৬১ সালে ডেয়ারীশিল্পের জন্য ভারত-সরকার প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। দিল্লী, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় 'ডেয়ারী ফার্ম' স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীর দুগ্ধকেন্দ্র হইতে প্রত্যহ প্রায় ১৮০০-২০০০ মণ দুধ বিক্রয় করা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে হরিণঘাটা ডেয়ারী প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০০০ গরু-মহিষ আছে এবং প্রত্যহ সেখান হইতে প্রায় ১৫০০-১৬০০ মণ দুধ উৎপন্ন হয়। হরিণঘাটায় ঘি-মাখন ইত্যাদিও তৈরী করা হইতেছে এবং তাহা বিভিন্ন দুগ্ধকেন্দ্র হইতে বাহিরে সরবরাহ করা হয়। বোম্বাই-এর কাছে আ্যারে ডেয়ারী প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫,০০০ গরু-মহিষ আছে এবং সেখান হইতে প্রায় ৫০০০ মণ দুধ উৎপন্ন হয়। দুধ ছাড়া ঘি মাখন ক্রীম জমাট-দুধ গুঁড়ো-দুধ চীজ ইত্যাদিও তৈরী করা হইতেছে।

ডেয়ারীশিল্পের উন্নতির জন্য ডেয়ারীবিদ্যার অনুশীলনও প্রয়োজন। আগে আমাদের দেশে ইহার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই সুযোগও ছিল না, কারণ কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই শিল্পানুশীলনের প্রয়োজনও দেখা দেয় না। ডেয়ারীশিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে সম্প্রতি এদেশে ডেয়ারীবিদ্যা শিক্ষারও প্রয়োজন হইয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা'র উদ্যোগে

ভারত ও ডেনমার্কের সরকারী সহযোগিতায় হরিণঘাটা, অ্যারে প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ডেয়ারীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আধুনিক 'শিল্প' হিসাবেও যে ডেয়ারীশিল্প কত উন্নত, সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হইতে পারে তাহা ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভারতের গো-সম্পদের উন্নতি হইলে এবং বিজ্ঞানসম্মত ডেয়ারীশিল্পের বিস্তার হইলে জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট দান থাকিতে পারে এবং চীজ মাখন গুঁড়া-দুধ ইত্যাদি রপ্তানি করিয়া ও আমদানি কমাইয়া আমরা বিদেশী অর্থও উপার্জন করিতে পারি।

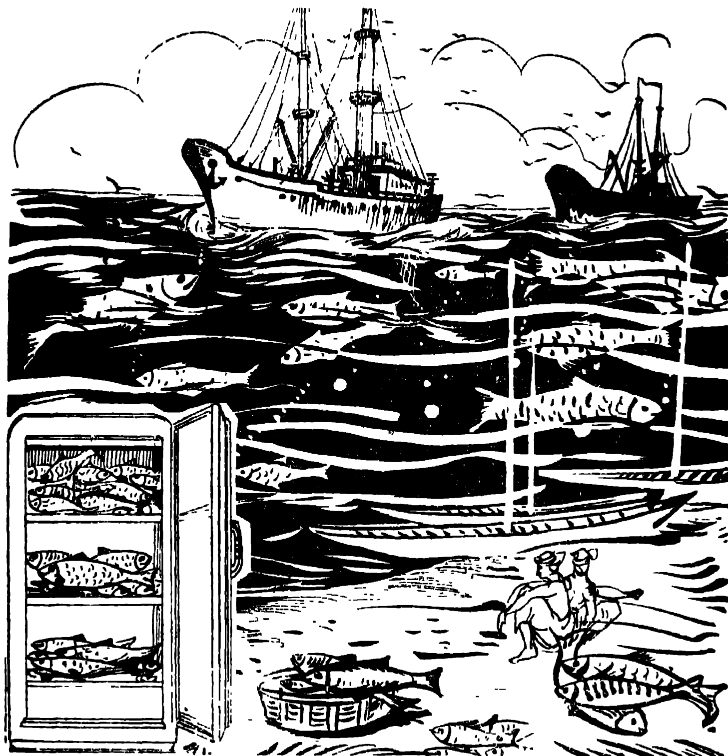
মৎস্যচাষ

খাদ্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে মাছ যে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। খাদ্যের গুণের দিক দিয়াও মাছ শ্রেষ্ঠ খাদ্য। মাছের প্রোটিনগুণ বেশী এবং আমাদের খাদ্যে এই গুণটিরই বেশী অভাব। প্রাণিজ প্রোটিন আমরা মাছ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতে পারি। সেইজন্য পশু-পালনের মতো মৎস্যচাষের উন্নতির দিকেও বিশেষ নজর দিবার প্রয়োজন আছে। মাছের সম্পদ বৃদ্ধি করারও আমাদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। ভারতের সমুদ্রোপকূল প্রায় ৩০০০ মাইল বিস্তৃত এবং তাহার মধ্যে প্রচুর উপ-সাগরাদি আছে। সমগ্র দেশ জুড়িয়া শত শত নদনদী প্রবাহিত হইয়াছে। আর খাল বিল জলাশয়াদি যে কত আছে তাহার হিসাব নাই। এই সুবিস্তৃত জলভাগ মাছের অফুরন্ত আকর-স্বরূপ। যথাযথ উপায়ে এই জলভাগে মাছের চাষ করিতে পারিলে আমরা একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন অনেক বাড়াইতে পারি। এই কারণে মৎস্যচাষের গুরুত্ব এত বেশী।

মাছ হইতে আমাদের আয়ও কম হয় না। ভারতের জাতীয় আয়ে শুধু মাছ হইতেই বছরে ২৮-২৯ কোটি টাকা পাওয়া যায়। বৈদেশিক রপ্তানিতে মাছ হইতে প্রায় ৯ কোটি টাকার মতো আমাদের আয় হয়। মাছের উৎপাদন বাড়িলে এই আয় আরও অনেক বাড়িতে পারে। ভারতের উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৭৪,০০০ মাছ ধরার নৌকা আছে এবং ইহাতে প্রায় ৮ লক্ষ ধীবর জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং মৎস্যচাষের অর্থনীতিক গুরুত্বও যথেষ্ট আছে।

১৯৪৭ সাল হইতে ভারত-সরকার মৎস্যচাষের উন্নতির জন্য কয়েকটি

পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় দক্ষিণভারতে মণ্ডপমে 'কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণাগার' (Central Marine Fisheries Research Station) এবং কলিকাতায় 'কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগার' স্থাপিত হয়। বোম্বাই-এ 'গভীর সমুদ্রের মৎস্য সংগ্রহাগার' (Deep Sea Fishing Station) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আমাদের দেশে মৎস্যচাষের সূত্রপাত হয় বলা চলে।



প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনায় মৎস্যচাষ বৃদ্ধির জন্য ভারত-সরকার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করেন। ইহা ছাড়া ঋণ হিসাবে আরও ৬১ লক্ষ টাকা এবং গ্র্যান্ট হিসাবে আরও প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা বিভিন্ন রাজ্য-সরকারকে দেওয়া হয়। ইন্দো-আমেরিকান চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে আমেরিকার কাছ হইতে ভারত-সরকার মৎস্যচাষের উন্নতির জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা

সাহায্য পান। ইহা ছাড়া 'ইন্দো-নরওয়েজীয়ান টেকনিক্যাল সহযোগিতার' প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আরও প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা এই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় মৎস্যচাষের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫৬ সালে মাছের উৎপাদন ১০ লক্ষ মেট্রিক টন হইতে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন হয়; অর্থাৎ ১০% বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় যোজনার শেষে ইহা ৩৩% বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত উৎপাদন করার কথা। এই হারে মৎস্যচাষের উন্নতি হইলে আশা করা যায় যে ১৯৬৬ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

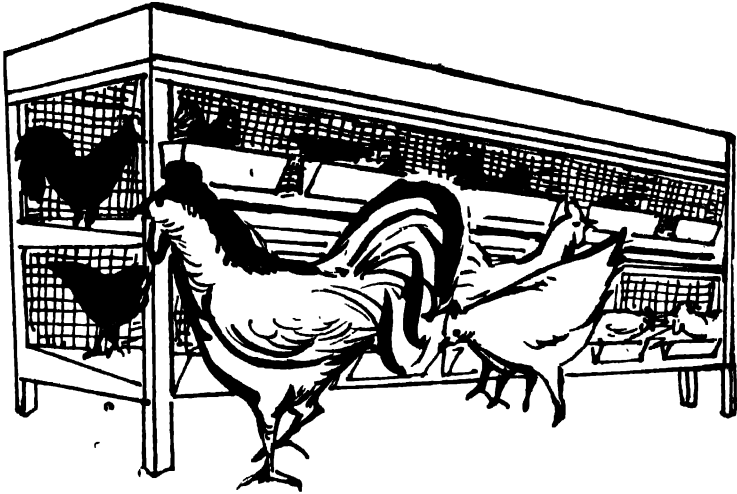
মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত-সরকার বোম্বাই, কেরল, মহীশূর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে সমুদ্রের মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রচালিত নৌকা তৈরী করিতে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার মধ্যে অন্তত ১৫০০ যন্ত্রচালিত নৌকা তৈরী হইবার কথা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় এই ধরনের ৪০০০ যন্ত্রচালিত নৌকা তৈরী করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। নদনদী ও অন্যান্য জলকরের মাছের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ একর জলকর মাপজোক করা হইয়াছে, ১৩,০০০ একর জলকর মৎস্যচাষের উপযোগী করিবার জন্য পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। তৃতীয় যোজনায় ইহা আরও অনেক বৃদ্ধি করা হইবে স্থির হইয়াছে।

হাঁস-মুরগি পালন

হাঁস-মুরগি পালনের উপকারিতা যে কত তাহা গৃহস্থমাত্রেরই জানা আছে। ইহাদের ডিম ও মাংস দুই-ই উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং প্রোটিন-গুণের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য। সেইজন্য হাঁস-মুরগি পালন করিলে এবং বাছাই করিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিতে পারিলে কেবল যে খাদ্যসমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে, একটি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদনও বাড়িবে।

১৯৫৬ সালের পশু-গণনায় দেখা যায়, ভারতে মোট মুরগির সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ এবং হাঁসের সংখ্যা প্রায় ৮৬ লক্ষ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় ভারত-সরকার মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, মহীশূর, হিমাচলপ্রদেশ ও দিল্লীতে পাঁচটি আঞ্চলিক হাঁস-মুরগি পালনকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৫৯-৬০ সালে এই পাঁচটি কেন্দ্র হইতে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ডিম পাওয়া যায় এবং ১৯৬০-৬১

সালে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার পাইবার সম্ভাবনা আছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় দুইটি আঞ্চলিক কেন্দ্রকে বাড়ানো হইবে, হাঁসের জন্য দুইটি নূতন প্রজননকেন্দ্র,



মুরগি-পালন



পোল্ট্রিতে ডিম রাখার ব্যবস্থা

১০টি সংগ্রহ ও লেনদেন-কেন্দ্র এবং ৬০টি উন্নয়ন-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকর হইলে প্রত্যেকটি মুরগির ডিম দিবার শক্তি বছরে গড়ে ৬০টি হইতে ৭০টি পর্যন্ত হইবে এবং দেশী মুরগির চারভাগের একভাগ উন্নত হইবে আশা করা যায়।

খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য সংরক্ষণও একটি বড় সমস্যা। মাছ, ডিম, ফল প্রভৃতি এমন অনেক খাদ্য আছে যাহা বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এইজন্য তাপ-নিয়ন্ত্রিত রক্ষণাগার সর্বত্র স্থাপন করা হইতেছে এবং করা প্রয়োজন। খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া 'স্ট্যাণ্ডার্ডাইজ' করারও দরকার আছে। তাহাতে খাদ্যের ভেজাল ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের প্রতারণার সুযোগ কমিবে। এমন অনেক খাদ্য আছে যাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল শুকাইয়া লইয়া কৌটাবন্দী করিয়া রাখিলে অনেকদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এইরকম জল-শুকানো কৌটাবন্দী খাদ্যের প্রচলন বেশী। আমাদের দেশের জল-বায়ুতে ঠিক ততটা সম্ভব না হইলেও, যে-সব খাদ্য যতটুকু এইভাবে সংরক্ষণ করা যায় তাহা করিলে ক্ষতি নাই। সম্প্রতি নানারকমের খাদ্য এই উপায়ে সংরক্ষণের ও প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে খাদ্যের অপচয় অনেকটা বন্ধ হইতে পারে। অবশ্য কৌটা বা টিনবন্দী খাদ্যের প্রচলন হইতে আমাদের দেশে সময় লাগিবে, কারণ খাদ্যের সহিত প্রত্যেক জাতির অভ্যাস, প্রথা ও রুচি জড়িত এবং সহজে খাদ্যের অভ্যাস কোন দেশের লোকই ছাড়িতে চায় না। তবু যদি এইরকম খাদ্যের কেনাবেচা বাজারে চলিতে থাকে তাহা হইলে ধীরে ধীরে লোকের আস্বাদ ও অভ্যাস বদলাইবে।

QUESTIONS

Group A

1. What are the occupations supplementary to agriculture?

2. Write what you know about fishing industry in India.

3. Write what you know about the need and developments of poultry in India.

4. Write briefly about Indian dairy industry.

5. Discuss critically the object of Government policy in regard to the development of animal husbandry in our country.

গোসদন, গোশালা, প্রজনন ও গবেষণাকেন্দ্র ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতে হইবে।

Group B

I. Name the industries and their locations in India, wherefrom the following foods are supplied:

Eggs, Meat, Milk, Fish, Butter, Milk Powder, Cream.

II. How many fishing boats are there in the coastal regions of India, and how many fishermen are employed to catch fish in these regions?

III. How many eggs were expected to be produced in India in 1960-61? What will be the average annual yield of eggs (expected) per hen in India at the end of the Third Plan?



সপ্তম প্রকরণ। তৃতীয় অধ্যায়

বন ও বনজ সম্পদ

প্রতিপাদ্য। যে-কোন দেশের স্থলভাগ যে বিশেষ জাতীয় সম্পদ সেকথা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। সভ্যতার সমস্ত বাস্তব নিদর্শন আমরা এই স্থলভাগের উপরেই গড়িয়া তুলি। এই মাটির বুকের উপরেই আমরা চাষ করিয়া ফসল ফলাই এবং সেই ফসল হইতে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকি। মাটি ছাড়াও দেশের কিছুটা অংশে জল থাকে, নদ-নদী সাগর-উপসাগরের জল। এই জলভাগও যে দেশের কত বড় সম্পদ তাহা মৎস্য-চাষের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। জলপথে চলাচলের সুবিধার প্রশ্নও আছে। স্থল ও জল ছাড়াও দেশের কিছুটা অংশ গভীর অরণ্যে আবৃত থাকিতে পারে। এই অরণ্য ও বন-উপবনও দেশের বড় সম্পদ। অরণ্য নির্মূল করিয়া স্বচ্ছন্দে আমরা সেখানে আধুনিক শহর নগর পত্তন করিতে পারি। কিন্তু তাহা যে করি না তাহার কারণ অরণ্য নির্মূল করিলে যে সম্পদ হারাইতে হইবে শহর-নগরে তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে না। আমরা শহর-নগরবাসী সভ্য মানুষ বলিয়া অরণ্যের কথা চিন্তা করি না এবং অরণ্য যে কতরকম সম্পদের আকর তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। নানারকম গাছপালার ফল-ফুল-মূল, বিচিত্র সব জীবজন্তু, পশুপক্ষী, নানাবিধ কাঠ এবং সেই কাঠ হইতে উৎপন্ন জিনিসপত্র—সবই বনজ সম্পদ।

এই বনজ সম্পদ অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিই হওয়া উচিত। কেন হওয়া উচিত? কারণ যে সমস্ত গাছপালা হইতে ভাল কাঠ হয় সেগুলি বড় হইতে প্রায় ১০০-২০০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। সামান্য আম-জাম-নারিকেলের বাগান লাগাইলে এক-পুরুষে তাহা ভোগ্য হয় না। সুতরাং বন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলে কবে কোন্ পুরুষে কে তাহা ভোগ করিবে তাহার ঠিকানা থাকিবে না, ভোগের লালসায়

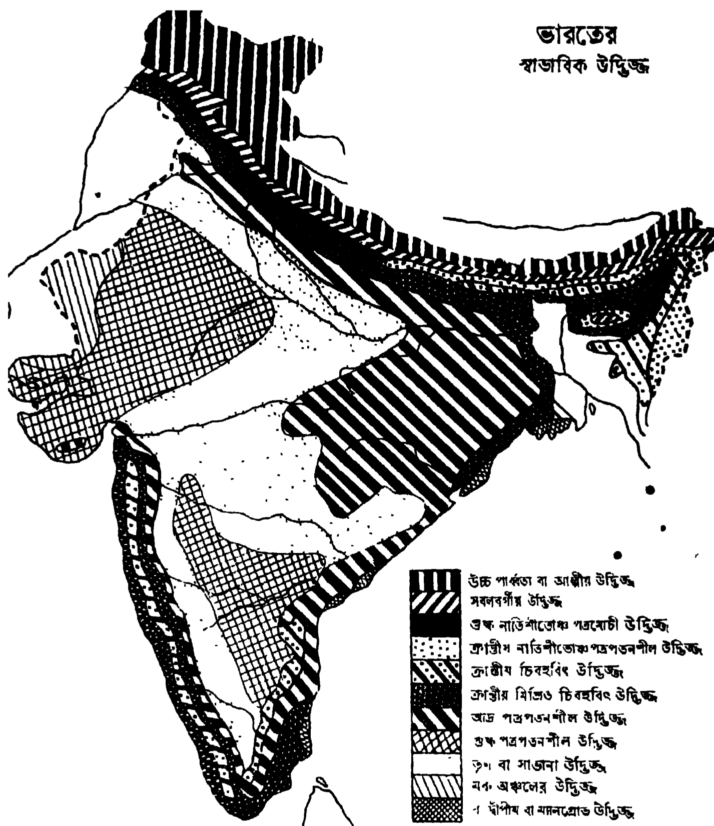
Unit 7. (iii) Forestry—important forest areas and products—utilisation, conservation and afforestation.

দুই-এক পুরুষে তাহা ভোগ করিতে গেলে অপরিণত গাছ কাটিয়া বনজ সম্পদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে বন ও বনজ সম্পদ সর্বসাধারণের জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হওয়া উচিত এবং তাহা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।

ভারতে বনজ সম্পদ ভারতের জাতীয় সম্পত্তি এবং তাহা ভারত-রাষ্ট্রের অধীন। ভারত-বিভাগের পর ভারতের বনভূমির বিস্তার বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গমাইল। ইহা ভারতের মোট ভূমির প্রায় শতকরা ২২ ভাগ, অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশের কিছু কম। এই বিশাল বনভূমি ভারতের মূল্যবান সম্পদের আকর। ইহার রক্ষণাবেক্ষণে ও সম্পদ আহরণে হাজার হাজার লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের জীবিকা অর্জন করিতেছে। সেইজন্য বনজ সম্পদের কথা আমাদের জানা উচিত।

প্রাকৃতিক জলবায়ু ও গাছপালা

প্রাকৃতিক জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের গাছপালার জন্ম হয়। মানুষের মতো গাছপালারও প্রাণ আছে। প্রকৃতির জলবায়ু, রৌদ্রছায়া ও মাটির খাদ্যগুণ হইতে গাছপালা প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে। যেখানে যেমন মাটির গুণ, মাটির গড়ন (পার্বত্য বা সমতল), হাওয়া-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি, সেখানে গাছপালার আকৃতি ও প্রকৃতিও ঠিক সেইরকম। যেমন বৃষ্টিপাত যেখানে খুব বেশী—৮০ ইঞ্চির উপরে—সেখানে গাছপালার রূপ চিরসবুজ। যেখানে বৃষ্টিপাত মাঝারি রকমের—৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে—সেখানকার মৌসুমী অঞ্চলে পর্ণমোচী বা পত্রত্যাগী গাছপালা জন্মায়। চিরদিন তাহাদের রূপ সবুজ থাকে না, বর্ষার পরে হেমন্তে ও শীতে গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। সেইজন্য ওই শ্রেণীর গাছপালাকে 'পর্ণমোচী' বলে, অর্থাৎ যাহারা পর্ণ বা পত্র মোচন করে। যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প হয়—২০ হইতে ৪০ ইঞ্চির মধ্যে—সেখানে ঝোপ ও ঘাসের মতো গাছপালা জন্মায়। মরুভূমি অঞ্চলে কাঁটাঢাকা গাছপালা বেশী দেখা যায়। এইসব গাছের পাতা হয় না। এগুলিকে 'ক্যাকটাস' বলে, দেখিতে আমাদের দেশের ফণিমনসার মতো। ইহাদের দেহের কাণ্ডের মধ্যে জল মজুত থাকে, নির্জলা পরিবেশে এই মজুত জল হইতে তাহারা প্রাণশক্তি আহরণ করে।



ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অরণ্যকে মোটামুটি ছয়ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন:

১। পশ্চিম-হিমালয়ের অরণ্য।

২। পূর্ব-হিমালয়ের অরণ্য।

৩। শাল অরণ্য।

৪। জল-জোয়ারের অরণ্য।

৫। পাঞ্জাব-রাজপুতানার অরণ্য।

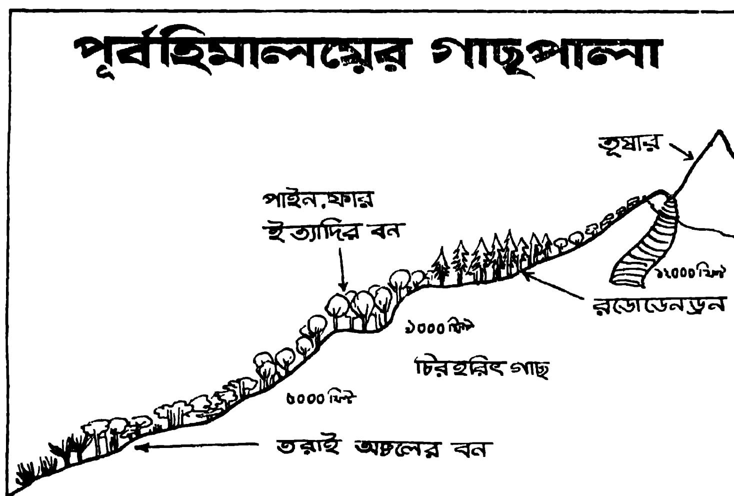
৬। গঙ্গার দক্ষিণে পত্রমোচী অরণ্য।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বন প্রধানত দুইটি প্রান্তে আছে—উত্তরপ্রান্তে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এবং দক্ষিণপ্রান্তে সুন্দরবন অঞ্চলে। উত্তরের বন

'পূর্ব-হিমালয়' ও 'সাল' বনের অন্তর্গত, দক্ষিণের সুন্দরবন জোয়ারের বনের মধ্যে গণ্য। ইহা ছাড়া পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মেদিনাপুর জেলায় কিছু কিছু বেসরকারী বন আছে। এগুলিও সালবন, তবে বড় আকারের সালগাছ এখন আর এই অঞ্চলে বিশেষ দেখা যায় না।

পশ্চিম-হিমালয়ের অরণ্য। এই অঞ্চলের অরণ্যে প্রধানত সরল-বর্গীয় গাছ জন্মায়। প্রধান গাছ হইল দেওদার বা দেবদারু। দেওদার-বনের নিচে একরকমের পাইনগাছের বন থাকে, তাহার নিচে থাকে শিরীষ, কাঞ্চন ইত্যাদির জঙ্গল। ইহা ছাড়া দুই-তিন রকমের ওকগাছ, রডোডেনড্রন ও অন্যান্য চেপটা-পাতার গাছও কিছু কিছু আছে।

পূর্ব-হিমালয়ের অরণ্য। নেপাল হইতে পূর্বদিকে দেওদারের বন নাই। দার্জিলিং জেলায় ১২ হাজার ফুটের উপরে কোন বন হয় না,



ঘাস হয়। ৯ হাজার হইতে ১২ হাজার ফুটের মধ্যে সরলবর্গীয় একরকমের ফার-গাছ হয়, তাহার ফাঁকে ফাঁকে রডোডেনড্রনের জঙ্গল থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এই রডোডেনড্রনের নানাবর্ণের গোলাপী-লাল-নীল ফুলে পাহাড় ভরিয়া যায়। ইহার নিচে বিশালকায় একরকমের স্প্রুস ও তিন-চার রকমের ওকগাছ আছে। আরও নিচে চেস্টনাট, লালিকাওলা ও অন্যান্য গাছ আছে।

৩৫০০ ফুটের নিচে টুন, শিরীষ, শিমুল, একরকমের বাঁশ ইত্যাদি পাওয়া যায়, কোথাও সালগাছও থাকে। সমতলভূমিতে নামিয়া আসিলে এই বন অনেক জায়গায় সালবনের সহিত মিশিয়া যায়।

সাল অরণ্য। ভারতের সালবন দুইটি সারিতে বিস্তৃত। একটি সারি দেরাদুন অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়ওয়াল, কুমায়ুন, অযোধ্যা, নেপাল, পশ্চিমবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স, গোয়ালপাড়া হইয়া গারো পাহাড় পর্যন্ত গিয়াছে। আর একটি সারি মধ্যপ্রদেশে বালাঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে পূর্বদিকে সিংভূম, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত গিয়াছে।

জল-জোয়ারের অরণ্য (tidal forest)। **সুন্দরবন।** সুন্দরবনে এক বিশেষ শ্রেণীর অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্যে প্রচুর কাদা জমিয়া থাকে, কারণ জোয়ারের সময় অরণ্যের মধ্যে জল দাঁড়ায়, আবার ভাটার সময় জল সরিয়া যায়। সাধারণ গাছপালা এই অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এখানকার নদীর ধারে ধারে একরকমের বড় গাছ হয়, নাম কেওড়া। সুন্দরবনের অন্যান্য গাছ আকারে ছোট। পূর্বদিকে প্রধান গাছ হইল সুঁদরী, পশ্চিমদিকে গরান ও তাহার সহিত হিন্তাল নামে খেজুরজাতীয় একরকমের গাছ, গেঁওয়া ইত্যাদি। সুন্দরবন আয়তনে যত বড়, গাছপালার বৈচিত্র্য সেই তুলনায় কম। এই কারণে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও কোন বৈচিত্র্য নাই।

পাঞ্জাব-রাজপুতানার অরণ্য। এখানকার শুকনো বৃষ্টিহীন অঞ্চলে গাছপালা সবই প্রায় ছোট ছোট বাবলাগাছ। ইহার সহিত কুলগাছের মতো গাছ ও অন্যান্য দুই-চার রকমের গাছও দেখা যায়।

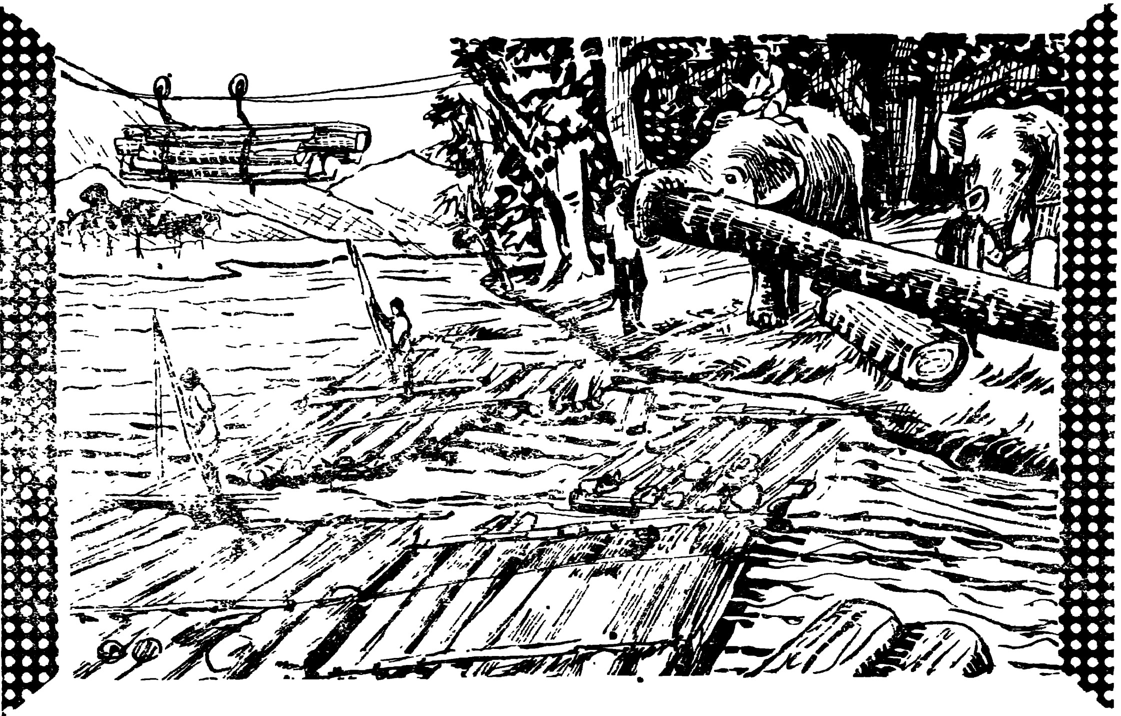
গঙ্গার দক্ষিণে পত্রমোচী অরণ্য। মধ্যভারত হইতে দক্ষিণভারতের সীমা পর্যন্ত অরণ্য অনেকটা একরকমের। এই অঞ্চলে পত্রমোচী গাছপালাই বেশী। সেগুনগাছ অল্পবিস্তর সব জায়গাতেই আছে। ইহার সহিত সাল, কেলিকদম্ব, একরকমের কাঁটাওয়ালা বাঁশ ও অন্যান্য গাছও দেখা যায়।

বনজ গাছের এই বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। লতাগুল্ম বাদ দিয়াও ভারতে বনজ বড় গাছ অন্তত ২৫০০ রকমের আছে। তাহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে অসম্ভব। এখানে শুধু পরিচিত গাছের কথা উল্লেখ করা হইল।

বন হইতে কাঠ পরিবহণ

গভীর বনের ভিতরে বড় বড় গাছ কাটাই হইল একটি সমস্যা। তাহা অপেক্ষা আরও গুরুতর সমস্যা—গাছ কাটা হইলে কাঠের বিশাল বিশাল খণ্ড বনের ভিতর হইতে বাহিরে কর্মস্থানে বহন করিয়া আনা। আসাম ও হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে হাতীকে কাঠ বহন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। গভীর বনের ভিতর হইতে তিন-চার টন ওজনের এক-একটি 'লগ' বা কাঠের খণ্ড নদীর তীর অথবা মোটরযানের পথ পর্যন্ত হাতীতে টানিয়া আনে। কোন কোন অরণ্যে উপরে 'রোপওযে' বা রজ্জুপথেরও ব্যবস্থা আছে। বড় বড় কাঠের খণ্ড মাথার উপরে এই 'রোপওয়ে' দিয়া নদীতীরে ও যানবাহনের স্টেশনে বহন করিয়া আনা হয়। বারো চাকার বড় বড় ভারী ওজনের ট্রাকে করিয়াও কাঠের লগ বহন করা হয়। স্থলপথে ট্রেনের খোলা মালগাড়িতে কাঠ একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। জলপথে এই কাঠ আনিবার ব্যবস্থাটি আরও অভিনব। সাধারণত নদীর ধারে গাছের বড় বড় লগগুলি বর্ষাকাল পর্যন্ত জমা হইয়া থাকে। বর্ষার সময় নদীর জল বাড়িলে লগগুলি নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে, তাহার সহিত লোকজনও যায়। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইলে সেগুলিকে তীরে ভিড়াইয়া ডাঙ্গায় তোলা হয়। তারপর আবার বড় বড় ট্রাকে করিয়া বিভিন্ন কাঠের আড়তে পাঠানো হয়। আড়তে আসিবার পর কাঠের খণ্ডগুলিকে চেরাই-ফাঁড়াই করিয়া নানা আকারের সরু-মোটা তক্তায় পরিণত করা হয়। সেইসব তক্তা হইতে বহুরকমের কাঠের জিনিস ও আসবাব তৈরী হয়।

বনজ গাছের এই বিচিত্র জীবন লইয়া সুন্দর কাহিনী রচনা করা যাইতে পারে। একটু কল্পনার রঙ মিশাইয়া রচনা করিলে এই কাহিনী রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর হইতে পারে। বহু বছর ধরিয়া বনের ছোট গাছটি বিশাল একটি গাছ হইল। সেই গাছ বনের মধ্যে কাটা হইল। বন হইতে শিকলে বাঁধিয়া হাতীতে বাহিরে টানিয়া আনিল। নদীর ধারে সেই গাছের খণ্ডিত



বন হইতে কাঠ পরিবহণ

দেহ বর্ষার প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিল। বর্ষা আসিতে নদীর জলে স্রোতের টানে ভাসিতে আরম্ভ করিল এবং দেশ-দেশান্তরে ভাসিয়া গেল। অবশেষে শহর-নগরের ঘাটে পৌঁছাইয়া আবার ডাঙ্গায় উঠিল এবং সেখান হইতে ট্রাকে করিয়া আড়ৎদারের গোলায় গেল। আড়ৎদার বিশাল করাত দিয়া তাহাকে চিরিয়া-ফাঁড়িয়া ফেলিল। তারপর সেই কাঠ মানুষের গৃহে দরজা-জানালা, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হইয়া গৃহীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিল। বনের কাঠ ঘরে আসিল।

কাঠের জিনিস

কাঠ হইতে এতরকমের ব্যবহার্য জিনিস তৈরী হয় যে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সবরকমের জিনিস একরকমের কাঠে তৈরী হয় না, নানারকমের কাঠ হইতে নানারকমের জিনিস তৈরী হয়। সংক্ষেপে শ্রেণীবদ্ধভাবে এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :

চেরাই-কাঠের জিনিস। যে-সমস্ত কাঠ চেরাই করিয়া ব্যবহার করা হয় (বড় বড় গাছের কাঠ) তাহা হইতে বহুরকমের জিনিস তৈরী হইয়া থাকে। যেমন—

১। বাড়ীর দরজা-জানলা, কড়িবরগা, দেয়াল-মেঝে, পুলের পাটাই, রেলিং ইত্যাদি।

২। নানারকম কাজের জন্য খুঁটি, রেলওয়ে স্লীপার।

৩। তেল ও আখের ঘানি, ঢেঁকি, চরকা, তাঁত।

৪। জাহাজ, নৌকা, মাস্তুল, দাঁড়, হাল, ডিঙ্গি।

৫। ফার্নিচার বা আসবাব।

৬। গরু-ঘোড়ার গাড়ি, রেলগাড়ির কিছু অংশ।

৭। খোদাই করার জিনিস, পাত্র, খেলনা, মূর্তি।

৮। কলম, পেন্সিল।

৯। দেশলাই বাক্স ও কাঠি।

১০। প্যাকিং-কেস।

১১। কৃষির যন্ত্রপাতি—লাঙ্গল, মই, ডোঙ্গা ইত্যাদি।

১২। বাদ্যযন্ত্র—খেলাধূলার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

এগুলি মোটামুটি জিনিসের বিবরণ, কাঠের বিবরণ নহে। কাঠের বিবরণ এই :

রূপালী ফার গাছ। হিমালয়ের ৭০০০ হইতে ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে এই গাছের বন আছে। সাদা রঙের নরম কাঠ হয়। প্যাকিং কেস, হালকা টেবিল, চেয়ার, দরজা-জানলা হয়। উত্তর-ইউরোপ ও আমেরিকায় এই-জাতীয় কাঠে কাগজ তৈরী হয়।

বাবলা গাছ। সিন্ধু, রাজপুতনা, পাঞ্জাব, গুজরাট অঞ্চলে বাবলার বন আছে। ঘরের খুঁটি, কড়ি, লাঙ্গল, হাতল, গাড়ি ও খুব ভাল জ্বালানি হয়। উত্তর-পশ্চিমের রেলওয়ে ইঞ্জিনে জ্বালানো হয়।

শিমুল গাছ। ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়, খুব বড় পত্রমোচী গাছ। লাল বড় বড় ফুল হয়। কাঠের রং প্রথমে সাদা থাকে, পরে ময়লা হইয়া যায়। টেকসই নহে। প্যাকিং কেস, দেশলাই, খেলনা ইত্যাদি হয়। এই কাঠের মণ্ড হইতে কাগজও তৈরী করা হয়।

ঝাউ গাছ। এই গাছের বড় বড় রোপিত বন বোম্বাই, মালাবার ও তাঞ্জোর অঞ্চলে আছে। দীর্ঘ সরল গাছ, শীঘ্র বাড়ে। প্রধানত জ্বালানি কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

দেওদার গাছ। সুদীর্ঘ সরল গাছ, পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চলে বন আছে। প্রধানত রেলওয়ে স্লীপার, পুলের কাঠ ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

সিসু গাছ। হিমালয়ের পাদদেশে সর্বত্র হয়। মাঝারি হইতে বড় আকারের পত্রমোচী সুন্দর গাছ। আসবাব, গাড়ির চাকা, তেলের ঘানি, আখ-মাড়াইয়ের কল, ক্রিকেটের স্টাম্প, নৌকা, জ্বালানি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

আবলুস গাছ। বেরার, খান্দেশ, কাডাপ, কারনুল প্রভৃতি অঞ্চলে হয়। রঙ কালো। খোদাই-কাজে, খেলনা, ছড়ি, পিয়ানোর চাবি, বুরুশের পিঠ ইত্যাদি শৌখিন কাজে ব্যবহার করা হয়।

জারুল গাছ। খুব বড় পত্রমোচী গাছ, আসামে পাওয়া যায়। শক্ত, টেকসই ভাল কাঠ। বাড়ীঘর, পুলের কাঠ, নৌকা, মাস্তুল, বৈঠা ও আসবাব তৈরীর কাজে লাগে।

সফেদ চাঁপ গাছ। পূর্ব-হিমালয়ে ৬০০০ হইতে ৮০০০ ফুট উঁচুতে দার্জিলিং ও খাসিয়া পাহাড়ে হয়। ১০০ ফুটের উপর উঁচু পত্রমোচী গাছ, বেশ ভাল কাঠ। দার্জিলিং অঞ্চলে এই কাঠের চাহিদা বেশী। দরজা-জানলা, আসবাব, দেয়াল, পাটকলের ববিন ইত্যাদি তৈরী করিতে লাগে।

সেগুন গাছ। তামিল ভাষায় 'টেক' বলে, ইংরেজীতে বলে 'teak'। তামিল নাম হইতে ইংরেজী নাম হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে নর্মদা ও গোদাবরীর দক্ষিণে পাওয়া যায়, অন্যত্রও রোপণ-করা বন আছে। বড় পত্রমোচী গাছ। এই কাঠকে পৃথিবীর সেরা কাঠ বলা হয়। যেমন টেঁকসই, তেমনি সুন্দর, মসৃণ, ভাল পালিশ ধরে। কীটে খায় না বলিয়া লোকে বলে চিরস্থায়ী কাঠ। জাহাজের কাজে এই কাঠ উৎকৃষ্ট। একদা বর্মার শ্রেষ্ঠ সেগুন ইংরেজদের নৌবিভাগের জন্য রিজার্ভ করা থাকিত। আগে রেলওয়ে স্লীপারেও যথেষ্ট ব্যবহার করা হইত। এখন মহার্ঘ বলিয়া বাড়ীঘরের দরজা-জানলা, আসবাব ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করা হয়।

এইগুলি ছাড়া আরও অনেক রকমের গাছ ওকাঠ আছে। এইগুলি বেশী কাজে পরিচিত ও বহুরকম লাগে বলিয়া এখানে এই কয়েকটির কথা বলা হইল।

অন্যান্য বনজ সম্পদ। কাঠের এইসব জিনিসপত্র ছাড়া আরও নানারকমের বনজ সম্পদ আমাদের ব্যবহারে লাগে। বাঁশ ও ঘাসের মণ্ড হইতে আমাদের দেশে অধিকাংশ কাগজ তৈরী করা হয়। বনজ লতাগুল্ম ও কাঠের নানারকম তেল হইতে যে কতরকমের ঔষধপত্র তৈরী হয় ও হইতে পারে, সে-বিষয়ে আজও গবেষণার শেষ হয় নাই। পাইন ও সেগুনের কাঠ জ্বাল দিয়া কিছু কিছু আলকাতরা বাহির করা হয়। অগুরু কাঠ হইতে আতর হয়, এই গাছ আসামে পাওয়া যায়। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় বড় বড় ঘাস ('সাভানা' বলে) থাকে, ভারতের সর্বত্র এই সাভানা-ঘাসের বন

আছে। ভাবর বা সাবাই-ঘাস হইতে কাগজের মণ্ড তৈরী হয় এবং রোশা ও লেমন-ঘাস হইতে আতর তৈরী হয়। কোসাম ও মহুয়ার তেল প্রদীপের ও রান্নার কাজে লাগে। গাছের ছাল হইতে 'ট্যান' ও 'রঞ্জক' তৈরী হয়। চামড়া শোধন করার জন্য "ট্যান" কাজে লাগে। বাবলা ও গরানের ছাল 'ট্যান' তৈরীর কাজে প্রচুর ব্যবহার করা হয়। পিয়াশাল, আখরোট, সাল ইত্যাদি গাছের ছাল ব্রাউন রঙ করিবার রঞ্জকের জন্য ব্যবহার হয়। দার্জিলিঙ-এর বনে 'মনজিট্' (সংস্কৃতে 'মঞ্জিষ্ঠা') নামে একরকম লতা পাওয়া যায়। এই লতার শিকড় ও অন্য অংশ হইতে পাকা লাল রঙের 'রঞ্জক' তৈরী হয়।

ভারতের বনজ সম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা

ভারতের মোট ভৌগোলিক ভূমির চতুর্থাংশের কিছু কম (২২%) বনময় হইলেও, মাথাপিছু বনকর ½ একরের বেশী নহে। ইহা পর্যাপ্ত নহে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের বনের উৎপাদিকা-শক্তিও অনেক কম। ১৯৫২ সালে ভারত-সরকার যে 'জাতীয় বন-নীতি' (National Forest Policy Resolution 1952) গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের বনভূমির আয়তন মোট ভূমির ২২% হইতে ৩৩·৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে স্থির হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতের তিনভাগের একভাগ ভূমি বনভূমি হইবে। ইহার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি ৬০% এবং সমতল অঞ্চলের বনভূমি ২০% বৃদ্ধি করা হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় প্রায় ৫০ হাজার একর জমিতে দেশলাইয়ের কাঠের উপযোগী গাছ রোপণ করিয়া বন বিস্তার করা হইবে (ইহাকে 'afforestation' বলে, আর বন কাটিয়া ফেলাকে বলে 'deforestation') ঠিক হইয়াছিল। এই কাজ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে বাণিজ্য-উপযোগী কাঠের জন্য (সাল, সেগুন ইত্যাদি) গাছ রোপণ করা হইবে স্থির হইয়াছিল। এমন অনেক পুরাতন বন আছে যাহা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নহে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জমিদারী। এগুলির অধিকাংশেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, নিয়মিত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। ভারত-সরকার এই ধরনের চার লক্ষ একর বিস্তৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় স্থির

হইয়াছে যে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ৫০ হাজার একর ব্যাপী শাল ও সমজাতীয় গাছ, মধ্যপ্রদেশ আসাম কেরল মহীশূর অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারে সেগুন ও অন্যান্য গাছ, এবং পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান মাদ্রাজ কেরল ও অন্যান্য রাজ্যে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার একর ব্যাপী দ্রুত-বাড়ন্ত গাছ রোপণ করিয়া বনভূমি বিস্তার করা হইবে। প্রায় ১০ লক্ষ একর বিস্তৃত অর্ধমৃত বনভূমি এই সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা হইবে। দ্বিতীয় যোজনায় ৫ হাজার মাইল বনপথ (forest roads) নির্মাণ করা হইবে স্থির হইয়াছিল, তৃতীয় যোজনায় আরও ১৫ হাজার মাইল বনপথ গঠন করা হইবে ঠিক হইয়াছে।

বন ও বন্য জীবজন্তু

বনের সম্পদ কেবল গাছ ও কাঠ নহে, বন্য জীবজন্তুও অমূল্য সম্পদ। বন উচ্ছেদ করার ফলে অনেক জীবজন্তু প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। বড় বড় বাঘ, সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুর সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। সেইজন্য ভারত-সরকার বিভিন্ন রাজ্যে জীবজন্তুর বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আসাম, ছোটনাগপুর, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যজন্তুর বাসোপযোগী বনভূমি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব সংরক্ষিত বনে শিকার করা নিষেধ।

বন ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা বনভূমি বিস্তারের ও সংরক্ষণের এই পরিকল্পনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। যে-দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বসবাসের ও খাদ্যের সমস্যা রহিয়াছে, সেখানেও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে বনভূমি বিস্তারের পরিকল্পনা অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হইবে। কিন্তু বন যে কতবড় জাতীয় সম্পদ সে সম্বন্ধে ধারণা থাকিলে তাহা মনে হইতে পারে না।

QUESTIONS

Group A

1. What are the important forest-zones in India and what are the characteristics of forests in those zones?

2. What are the means by which the bulk of timber is transported to different places from the Indian forests?

3. Briefly describe the forest products of India which are utilised in a variety of industries.

4. Write a short story on the life of your own 'writing table' from the forest stage to the carpenter's shop, where it has been shaped into your table.

5. Write notes on:

(a) Tidal forests of the Sunderbans; (b) *Sal* forest; (c) *Deodar* forest; (d) *Savanah;* (e) Afforestation; (f) *Simul;* (g) *Jarul;* (h) Teak.

Group B

I. Put the names of regions in the 2nd Column where the following forests are located in India:

1st Column		2nd Column
Simul	:	—
Sal	:	—
Deodar	:	—
Jarul	:	—
Segun (teak)	:	—

II. *Piano-Key* is made from *Segun*
Firewood is made from *Deodar*
Railway Slipper is made from *Simul*
Cricket stump is made from *Ablush*
Country boat is made from *Sisu*

Correct the names of 'forest products' in the above statements.



সপ্তম প্রকরণ। চতুর্থ অধ্যায়

খনি ও খনিজ সম্পদ

প্রতিপাদ্য। জল ও জলজ মৎস্য-সম্পদের কথা আগে বলা হইয়াছে। বন ও বনজ সম্পদেরও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বন বাদ দিয়া স্থলের সম্পদ কৃষিজ সম্পদ—নানারকমের ফসল, ফলফুল। কিন্তু এগুলি সবই মাটির উপরের সম্পদ, আমরা চোখে দেখিতে পাই, ইচ্ছামত উৎপাদন ও উপভোগ করি। কিন্তু মাটির নিচে আরও এক বিচিত্র রত্নের রাজ্য আছে, যাহা আমরা চোখে দেখিতে পাই না এবং কদাচিৎ দেখিতে পাইলেও রত্ন বলিয়া বুঝিতে বা চিনিতে পারি না। কথায় বলে যে ধরিত্রী রত্নগর্ভা। কতরকমের রত্ন ও মহামূল্য জিনিস যে মাটির গর্ভে লুকাইয়া আছে তাহা আজও সব মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই। ভূবিদ্ ও খনিজবিদ্‌রা অনেক রত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন, আজও করিতেছেন, ভবিষ্যতেও করিবেন। পাতালপুরীর রত্নভাণ্ডার আরও অনেককাল ধরিয়া বিজ্ঞানীদের বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রেক করিবে এবং সেই কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা নূতন নূতন রত্ন আবিষ্কারে উৎসাহিত হইবেন।

খনিজ কাহাকে বলে?

'খনি' হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে 'খনিজ' বলে। খনিকে ইংরেজিতে বলে 'mine' এবং খনিজকে তাই 'mineral' বলা হয়। খনিজ মাত্রই যে খনি হইতে খুঁড়িয়া পাওয়া যায় তাহা নহে। অনেক স্থানে মাটির উপরেই খনিজ পাওয়া যায়। মাটি এবং জলও খনিজ বলিয়া গণ্য হয়। পাথর বালি কয়লা লোহা অভ্র সোনা হীরা ইত্যাদি খনিজ। যাহা স্বভাবজাত অজৈব (inorganic) বস্তু তাহা খনিজ। কাঠ হাড় ইত্যাদি জৈব (organic) বস্তু, তাই এইসব বস্তু খনিজ নহে। ইট কাচ ইত্যাদি মানুষে তৈরী করে,

---

Unit 7. (iv) Mining—mineral wealth of India—important mining centres—utilisation and conservation.

তৈরীর উপাদান যথেষ্ট আছে। এককথায় বলা যায় যে খনিজ সম্পদে অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা বেশ ভাল।

বিভিন্ন খনিজের অবস্থান ও বর্ণনা

খনিজ সম্পদে ভারতের ভূস্বর্গ হইল বিহার। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-রাঢ় অঞ্চল ইহার সহিত যোগ করিলে যে বিস্তৃত কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে তাহাকে নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ খনিজপুরী বলা যাইতে পারে। তারপর মাদ্রাজ মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের স্থান। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ অঞ্চল কয়লার জন্য এবং আসাম পেট্রোলিয়মের জন্য খ্যাত। অবশ্য ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে কোথায় কি খনিজ ভূগর্ভে বা শিলাগাত্রে আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহার শেষ অনুসন্ধান এখনও করা হয় নাই।

লোহাপাথর বা 'হিমাটাইট' (haematite)। ভারতবর্ষে প্রধানত যাহা হইতে লোহা তৈরী হয় তাহার নাম 'হিমাটাইট' বা লোহাপাথর। এই লোহাপাথর প্রায় ২১০০ কোটি টনের মতো এদেশে মজুত আছে বলিয়া ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। ইহার প্রধান উপাদান 'ফেরিক অক্সাইড,' তাহার সহিত অন্য পদার্থও কিছু মিশ্রিত থাকে। এই পাথর খুব শক্ত, ভারী, রং আরক্ত কালো। বিহারে সিংহভূম ও মানভূম জেলায় এবং উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ, বোনাই ও কিওঞ্ঝর রাজ্যে লোহাপাথরের বিশাল ভাণ্ডার আছে। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায়, বিহারে ভাগলপুর লোহারডাঙা ও হাজারিবাগ জেলায় এবং মধ্যপ্রদেশ বোম্বাই পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও লোহাপাথর আছে। এইজন্য টাটানগর, কুলটি, দুর্গাপুর, রুরকেল্লা প্রভৃতি বড় বড় লোহা-ইস্পাতের শিল্প-কারখানা পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মহীশূরে কাদুর জেলায় বাবাবুদান পাহাড়েও প্রচুর লোহাপাথর আছে, তাহা হইতে ভদ্রাবতীর কারখানায় লোহা তৈরী হয়।

ম্যাংগানিজ (manganese)। ম্যাংগানিজ-যুক্ত খনিজ ভারতে অনেকরকম আছে। সমস্ত পৃথিবীতে যত ম্যাংগানিজ উদ্ধৃত হয় তাহার

তিনভাগের একভাগ হয় ভারতবর্ষে। ভারতের প্রধান সমকক্ষ সোভিয়েট রাশিয়া। ম্যাংগানিজ ভারতে মজুত আছে প্রায় ১১ কোটি ২০ লক্ষ টন, তাহার মধ্যে ১০ কোটি টন আছে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে। ম্যাংগানিজের প্রধান প্রয়োগ—বিশেষ প্রকাশ ইস্পাতের উপাদানরূপে। টাটার কারখানায় ফেরো-ম্যাংগানিজ তৈরী হয়। ইহা লোহার সহিত মিশাইয়া হয় ম্যাংগানিজ স্টীল। ম্যাংগানিজ-খনিজ হইতে পোটাসিয়াম পারম্যাংগানেট তৈরী হয়, দূষিত জল শোধনের জন্য ও ঔষধে ব্যবহার হয়। ইহা ছাড়া বৈদ্যুতিক ব্যাটারি নির্মাণে, দেশলাইয়ের উপকরণরূপে এবং কাচ বর্ণহীন করিবার জন্য ম্যাংগানিজ কাজে লাগে।

ক্রোমাইট (chromite)। ইহার প্রধান উপাদান ক্রোমিয়ম লোহা অক্সাইড। এই খনিজ খুব ভারী, কঠিন, রং ধূসর-কালো, পাথরের মতো জমাট আকার। বিহারে, উড়িষ্যায় ও মহীশূরে ইহার প্রধান আকর-ভূমি। ইহা প্রধানত ক্রোম-চামড়া ও সূতা রং করিতে লাগে। খুব তাপসহ বলিয়া ইহার ইট চুল্লীনির্মাণেও ব্যবহার হয়। ইউরোপ আমেরিকায় ইহার প্রধান প্রয়োগ ক্রোমিয়ম ধাতু নিষ্কাশনের জন্য। এই ধাতু চুল্লীতে লোহার সহিত মিলিত অবস্থায় ফেরো-ক্রোম নামক সংকরধাতুরূপে নিষ্কাশিত হয় এবং তাহার সহিত আরও লোহা মিশাইয়া ক্রোম-স্টীল নামক ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ভারতে প্রায় ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টন ক্রোমাইট মজুত আছে।

ম্যাগনেসাইট। ইহা দেখিতে খড়ির মতো, কিন্তু আরও শক্ত। অন্ধ্র মাদ্রাজ মহীশূর রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়, প্রায় ১০ কোটি ৩৪ লক্ষ টন খনিজ ভারতে মজুত আছে। ইহা হইতে ম্যাগনেসিয়ম সালফেট ও ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়। ইহা পোড়াইলে হয় ম্যাগনেসিয়া বা ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড। ম্যাগনেসিয়ার নানারকম প্রয়োগ আছে। ঢালা-লোহা হইতে ইস্পাত বা নরম-লোহা করিবার জন্য একরকম চুল্লীর ভিতর ম্যাগনেসিয়া-নির্মিত ইট দেওয়া হয়। এই ইট খুব তাপসহ।

সিলিম্যানাইট, কায়ানাইট, কুরুবিন্দ। সিলিম্যানাইট এক-রকমের অ্যালুমিনিয়ম সিলিকেট, রং ধূসর ব্রাউন বা সবুজ ব্রাউন, খনিতে

চাপবাঁধা সূক্ষ্ম দানার আকারে থাকে। খুব কঠোর, ইহার চূর্ণ শানের জন্য লাগে। ইহার প্রধান গুণ তাপসহতা, প্রচণ্ড তাপেও গলে না। ইহা জমাইয়া একরকমের ইট হয়, কাচ গলাইবার কুণ্ডের জন্য তাহা বিশেষ উপযোগী। আসাম কেরল মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে যথেষ্ট পাওয়া যায়। কায়ানাইট প্রায় এই জাতীয় খনিজ, ব্যবহারেও এক। বিহারে খারসাবান রাজ্যে, সিংহভূম ও মানভূমে প্রচুর পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোথাও এত পাওয়া যায় না। উড়িষ্যাতেও কিছু আছে। কুরুবিন্দ (corundum) চুনি ও নীলার স্বজাতি। ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন কাল হইতে অস্ত্রাদি শান দিবার জন্য এবং রত্ন পালিশ করিবার জন্য কুরুবিন্দচূর্ণের প্রয়োগ আছে।

ফায়ারক্লে (fire-clay)। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে কয়লাখনির নিম্নস্তরে, রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের কয়েক স্থানে 'ফায়ারক্লে' নামে একরকম মাটির মতো বস্তু পাওয়া যায়। ইহার রং ছাইয়ের মতো, কিন্তু পোড়াইলে প্রায় সাদা হয়। এই মাটি হইতে 'ফায়ারব্রিক' নামে তাপসহ ইট, ধাতু গলাইবার ছাঁচ বা মুচি ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত হয়।

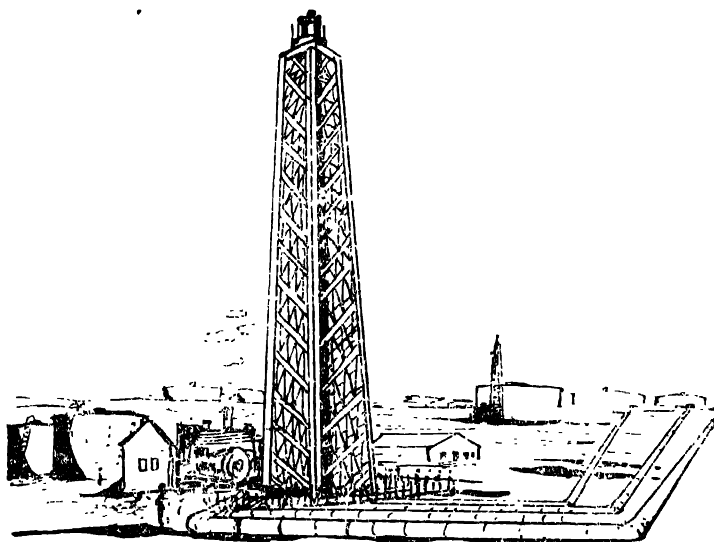
অভ্র (mica)। ভারতে যে অভ্র প্রচুর পাওয়া যায় তাহার বিশেষ নাম মস্কোভাইট (muscovite)। বিহারে প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল, রাজস্থানে ১২০০ বর্গমাইল ও অন্ধ্রে ৬০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া অভ্র মজুত আছে। বিহারের অভ্রই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অভ্র তাপসহ ও তড়িতের অপরিবাহী, অর্থাৎ ইহার ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ যাইতে পারে না।

তামা (copper)। তামার প্রধান ভাণ্ডার হইল বিহার। সিংহভূম, হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে প্রায় ৮০ মাইল ব্যাপী তামার খনিজ আছে। রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশে কিছু কিছু তামার খনিজ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় খনিজ হইতে আবর্জনা বাদ দিয়া তামার অংশ বৃদ্ধি করা হয়, তারপর চুল্লীতে পুড়াইয়া অন্যান্য উপাদান হইতে তামা পৃথক করা হয়।

সোনা। সোনা ধাতুরূপেই পাওয়া যায়, সেইজন্য অতিপ্রাচীনকালে অন্যান্য ধাতুর পূর্বেই সোনা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সাধারণত কোআর্টসের

(ছোটবড় নুড়ির মতো স্ফটিক) সহিত সোনা সংলগ্ন থাকে। এইরূপ স্বর্ণধর স্ফটিকখণ্ড যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণ হইয়া জলস্রোতে বহিয়া যায় তখন সোনার কণা বা দানা বালি ও নুড়ির সহিত নদীপথে বিকীর্ণ হয়। এককালে এইরকম বালি ও নুড়ি হইতে সোনা সংগ্রহ করা হইত। ভারতের সবচেয়ে বড় সোনার খনি মহীশূরের কোলার অঞ্চল। কোলারে প্রায় ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টন সোনার খনিজ মজুত আছে।

কয়লা। আদিম বর্নজঙ্গল ভূগর্ভে সমাধিস্থ হইয়া লক্ষ লক্ষ বছরে কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে কয়লার প্রধান কেন্দ্র হইতেছে পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ অঞ্চল এবং বিহারের ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি ও করনপুরা অঞ্চল। ইহা ছাড়া আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়। মাটির তলায় একহাজার ফুটের মধ্যে ভারতে প্রায় ৬০০০ কোটি টন কয়লা মজুত আছে।



পেট্রোলিয়ম নিষ্কাশন

পেট্রোলিয়ম। পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি উদ্ভিদ অথবা প্রাণী হইতে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন ইহা প্রাণিজ। কি উপায়ে কতকাল ধরিয়া

কোন্ জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে পেট্রোলিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সঠিক বলা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি অনুসন্ধান করিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গের অববাহিকা অঞ্চল, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, ক্যাম্বে-কচ্ছ, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মাদ্রাজ-অন্ধ্র-কেরলের উপকূল অঞ্চল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে প্রায় ৪ লক্ষ বর্গমাইল স্থানে পেট্রোলিয়ম মজুত আছে। ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়ম ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তুর চাহিদা ১৯৫৯ সালে ৬০ লক্ষ ২৮ হাজার টন ছিল, তৃতীয় যোজনার শেষে ইহা বাড়িয়া অন্তত এককোটি টন হইবার সম্ভাবনা। আসামের ডিগবয় অঞ্চল হইতে যে পেট্রোলিয়ম নিষ্কাশিত হয় তাহা চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য। আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলে যে তৈল নিষ্কাশন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বছরে ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন অপরিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ম পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। নুনমাটি ও বারাউনিতে তৈল পরিশোধনাগার (refinery) স্থাপন করা হইতেছে।

ব্যাসল্ট। 'ব্যাসল্ট' আগ্নেয় শিলা, ইহার উৎপত্তি ভূগর্ভের গলিত লাভা হইতে। শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যাওয়ায় এই শিলার কেলাস বা দানা বড হইতে পারে নাই। ইহার রং কালো, পোড়া ঝামার মতো। এই পাথর খুব শক্ত, সহজে ভাঙে না, সেইজন্য রাস্তাঘাট পাকা করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। রাজমহল পাহাড়ে, বোম্বাই-এর দক্ষিণভাগে, হায়দারাবাদে, মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতে এই পাথর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতা শহরের রাস্তা যে ব্যাসল্ট দিয়া বাঁধানো হয় তাহা সাঁওতাল পরগনার পাকুড় অঞ্চল হইতে আসে।

গ্র্যানাইট। গ্র্যানাইটও আগ্নেয় শিলা। তবে ইহার দানা সুস্পষ্ট এবং দানার জন্যই নাম গ্র্যানাইট। এই পাথর খুব দৃঢ় হইলেও ব্যাসল্ট অপেক্ষা কাটাকাটি করা সুসাধ্য। ধূসর গোলাপী লাল কালো প্রভৃতি নানা বর্ণের পাওয়া যায়। প্রাসাদ মন্দিরাদি নির্মাণের খুব উপযোগী। মাদ্রাজপ্রদেশে উত্তর-আর্কটে ও মহীশূরে উত্তম গ্র্যানাইট পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে ইলোরা, মাদুরা, চিদাম্বরম, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানের বহু মন্দির ও দেবমূর্তি এই পাথরে নির্মিত।

বেলেপাথর। ইহা পাললিক শিলা, প্রধান উপাদান বালি। লোহার অংশ বেশী থাকিলে পাথরের রং লাল হয়। আগ্রায় আকবরের কেল্লা এই-রকম লাল পাথরে তৈরী। বেলেপাথর সহজে কাটা যায় এবং ব্যাসল্ট ও গ্র্যানাইটের মতো দৃঢ় না হইলেও ইমারত নির্মাণের কাজে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। বিন্ধ্য গিরিশ্রেণীর কাছাকাছি অঞ্চলে—গয়া জেলা হইতে হোসঙ্গাবাদ, সেখান হইতে গোয়ালিয়র রাজ্য ও আগ্রা—এই বিস্তৃত অঞ্চলে উৎকৃষ্ট বেলেপাথর পাওয়া যায়। উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে চান্দায় ও গুজরাটেও বেলেপাথর আছে। সারনাথ ও অন্যান্য বহু স্থানের অশোকস্তম্ভ, বৌদ্ধস্তূপ, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা, জুম্মা মসজিদ, বহু প্রাসাদ, গোয়ালিয়র অম্বর ও উত্তরপ্রদেশের বহু প্রাসাদ ও দেবালয়, পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির বেলেপাথরে নির্মিত। প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি অধিকাংশই বেলেপাথরে গড়া।

মারবেল বা মর্মর। মারবেল রূপান্তরিত শিলা, চাপ ও তাপের প্রভাবে চুনাপাথর হইতে উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ মারবেলের রং সাদা। বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণের ফলে নানারকম রং, দাগ ও নকশা হয়। সাদা অপেক্ষা কালো বা রঙিন সুদৃশ্য মারবেলের দাম বেশী। মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতানায় উৎকৃষ্ট মারবেল পাওয়া যায়।

ল্যাটিরাইট ও স্লেট। ল্যাটিরাইটের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন জলবায়ুর প্রভাবে ব্যাসল্ট বিকৃত হইয়া এই পাথরে পরিণত হইয়াছে। ইহার রং সুরকির মতো, দেখিতে ফোঁপরা। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণভারতে অনেক স্থানে ল্যাটিরাইট দিয়া বাড়ী তৈরী হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অনেক স্টেশন এই পাথরে নির্মিত।

স্লেট রূপান্তরিত শিলা। ইহার উৎপত্তি কর্দমজাত শেল (shale) নামে পাললিক শিলা হইতে। রং কালো বা ধূসর। ইহার প্রধান গুণ—চাড় দিয়া অনায়াসে স্তরে স্তরে ভাগ করা যায়। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের কাংড়া, গাড়ওয়াল ও আলমোড়া অঞ্চলে এবং মুঙ্গেরের কাছে খরকপুর পাহাড়ে স্লেট পাওয়া যায়। ঘরের ছাদ ছাইবার জন্য এবং মেঝেতে দিবার জন্য কিছু কিছু স্লেটের চলন আছে। বড় ইলেকট্রিক সুইচবোর্ডও স্লেট দিয়া তৈরী করা হয়। লিখিবার জন্যও স্লেট-পেন্সিলের ব্যবহার আছে।

ভারতের কয়েকটি প্রধান খনিজ সম্পদের বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। এই বিবরণ হইতে বোঝা যায় খনিজের ঐশ্বর্য ভারতে যথেষ্ট আছে এবং তাহা বিভিন্ন শিল্পকর্মে ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের বহু জিনিসের অভাব মিটিতে পারে। লোহা, কয়লা, পেট্রোলিয়ম, তামা, ক্রোমাইট প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার পূর্বভারত—বিহার উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম অঞ্চল। সেইজন্য ভারতের লোহা-ইস্পাতের বড় বড় কারখানা, তামা ও অ্যালুমিনিয়মের কারখানা, পেট্রোলিয়মের কারখানা ইত্যাদি অধিকাংশই পূর্বভারতে প্রতিষ্ঠিত।

গত ১০-১২ বছরে প্রধান খনিজ পদার্থের উৎপাদনও অনেক বাড়িয়াছে। তাহার হিসাব এই :

	১৯৫০ [মেট্রিক টন]	১৯৬০
কয়লা	: ৩ কোটি ২৫ লক্ষ	॥ ৫ কোটি ২৬ লক্ষ
খনিজ লোহা	: ৩০ লক্ষ ১২ হাজার	॥ ১ কোটি ৬৫ হাজার
ম্যাংগানিজ	: ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার	॥ ১১ লক্ষ ৮২ হাজার
খনিজ তামা	: ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার	॥ ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার
ক্রোমাইট	: ১৭ হাজার	॥ ১ লক্ষ
পেট্রোলিয়ম (অশুদ্ধ)	: ২ লক্ষ ৬৪ হাজার (১৯৫১)	॥ ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার
পেট্রোলিয়মজাত পদার্থ (কেরোসিন, প্যারাফিন, লুব্রিকেটিং তেল, পিচ ইত্যাদি)	: ২ লক্ষ ৪৯ হাজার (১৯৫১)	॥ ৫৭ লক্ষ ৫৮ হাজার

কয়লার উৎপাদন বাড়িয়াছে দ্বিগুণের কিছু কম, খনিজ লোহার প্রায় তিনগুণ, অশুদ্ধ পেট্রোলিয়মের প্রায় দেড়গুণ এবং পেট্রোলিয়মজাত পদার্থের প্রায় ২৭ গুণ। খনিজ সম্পদের উৎপাদনবৃদ্ধি হইতেই বোঝা যায় আমাদের দেশ আধুনিক শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতেছে।

QUESTIONS

1. Describe briefly the variety of mineral wealth India has in different geographical regions.

2. Where do you find the 'coal-iron ore zone' in India? Show how it is related to regional industrial development?

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাকে এই কেন্দ্র বলা যায়। এখানকার কয়লা-লোহা ও শিল্পায়ন সম্বন্ধে (লোহা-ইস্পাতাদির কারখানা) আলোচনা করিতে হইবে।

3. "Bihar has the richest store of minerals in India." Discuss the statement with an account of minerals available in Bihar.

4. Where 'petroleum' has been found in India, and what steps have been taken to develop petroleum industry?

5. Where are the following minerals deposited in India? Write what you know about their use in different industries:

Iron ore, Coal, Manganese, Chromite

6. Write notes on:

(a) Magnesite; (b) Fireclay; (c) Mica; (d) Copper; (e) Granite; (f) Sandstone; (g) Laterite.

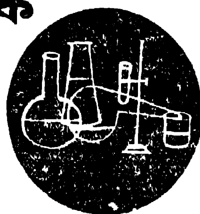
Group B

I. Put the names of regions (in the 2nd Column) where the following minerals are available in India:

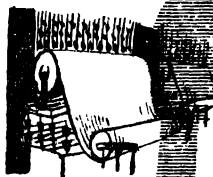
1st Column		2nd Column
Iron	:	—
Coal	:	—
Laterite	:	—..
Fireclay	:	—
Mica	:	—
Chromite	:	—
Copper	:	—
Manganese	:	—

II. Name the minerals for which the following places are important:

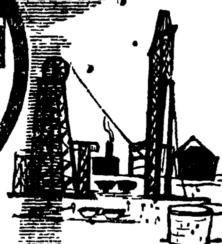
West Bengal, Assam, Manbhum and Singhbhum in Bihar, Northern Arcot in Madras, Kolar in Mysore.

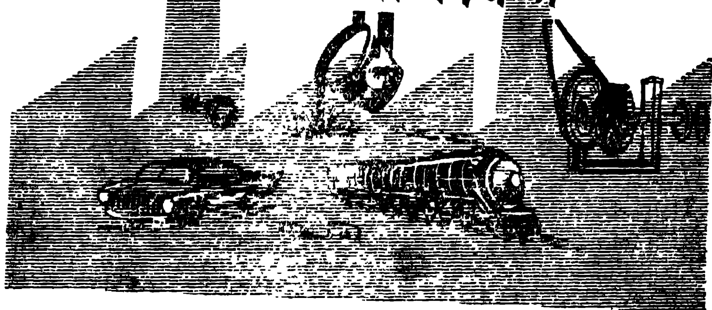












ক্ষেত্রে এই মূলধন নিয়োগের আনুপাতিক হার হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের শিল্পনীতি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে দেশের প্রকৃত শিল্পোন্নতি যে যন্ত্রনির্মাণশিল্প ও বড় বড় গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন কখনই সম্ভব নহে, এ সত্য তাঁহারা যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছেন।

লোহা-ইস্পাতের কারখানাশিল্প

আগেই বলা হইয়াছে যে শিল্পোন্নতির জন্য সকলের আগে চাই যন্ত্র। কিন্তু যন্ত্রের জন্য কি চাই? এক কথায় বলা যায়, লোহা ও ইস্পাত। ইহা এমন এক ধাতু যাহা ভিন্ন মানুষের একটি কাজও করিবার ক্ষমতা নাই। ঘরের বঁটি দা ছুরি ছুঁচ কাঁচি আলপিন হইতে আরম্ভ করিয়া কারখানার বড় বড় যন্ত্রপাতি, জাহাজ, রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রত্যেক ছোটবড় জিনিসের জন্য ইস্পাতের প্রয়োজন। ইস্পাত যন্ত্ররাজ্যের সম্রাট। সংকর ইস্পাত (alloy steel) ছাড়া যন্ত্রজগতে এক-পাও চলা যায় না। লোহার সহিত ম্যাংগানিজ, ক্রোমিয়ম প্রভৃতি ধাতু মিশাইয়া এই সংকর-ইস্পাত তৈরী হয়। ম্যাংগানিজ-ইস্পাত খুব শক্ত, নানা যন্ত্রনির্মাণে লাগে। নিকল-ইস্পাত অত্যন্ত ঘাতসহ, সহজে ফাটে না, সেইজন্য তাহা দিয়া জাহাজ প্রভৃতির বর্ম তৈরী হয়। লোহার সহিত নিকেল ও ক্রোমিয়ম মিশাইয়া স্টেনলেস-স্টীল তৈরী হয়, তাহাতে সহজে মরচে পড়ে না। ক্রোমস্টীল ও টংস্টেন-স্টীল খুব শক্ত, ব্যবহার-কালে তাতিয়া উঠিলে সাধারণ ইস্পাতের মতো নরম হয় না, সেইজন্য লেদ প্রভৃতি যন্ত্রে কাটিবার অস্ত্ররূপে চলে। বাস্তবিক ইস্পাতই যন্ত্রযুগের রাজা।

জামসেদপুর, বার্নপুর ও মহীশূরে তিনটি বড় বড় ইস্পাতের কারখানা ছিল। দ্বিতীয় যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, উড়িষ্যার রুরকেলায় ও মধ্য-প্রদেশের ভিলাই-এ তিনটি নূতন বিশাল ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৬-৬১ সালের মধ্যে এই তিনটি নূতন কারখানায় ৪৩৯ কোটি টাকা খাটানো হইয়াছে, আরও ১২০ কোটি টাকা কারখানাকেন্দ্রে নূতন নগর নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। এই তিনটি নূতন কারখানার যে শক্তি আছে তাহাতে ১০৬০-৬১ সালে ২৩ লক্ষ টন ইস্পাত এবং ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টন ঢালা-লোহা উৎপন্ন হইবার কথা। সমস্ত ইস্পাতের কারখানা মিলাইয়া ভারতবর্ষে ১৯৬১ সাল হইতে প্রতি বছরে ৪৫ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হইবে। কিন্তু এই পরিমাণ ইস্পাতও দেশের সর্বাঙ্গীণ শিল্পায়নের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমেরিকায় বছরে ১০ কোটি টন ইস্পাত তৈরী হয়, সোভিয়েট রাশিয়াতে ৪ কোটি টন। সুতরাং আমরা যে এখনও কতখানি পিছাইয়া আছি তাহা আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো শিল্পোন্নত দেশের ইস্পাত উৎপাদনের হারের

সহিত তুলনা করিলে বোঝা যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় এইজন্য বোকারোতে আর একটি নূতন ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করা হইবে স্থির হইয়াছে এবং অন্যান্য কারখানার যান্ত্রিক শক্তি বাড়াইয়া প্রতিবছরে যাহাতে অন্তত ৭০ লক্ষ টন ইস্পাত-তৈরী করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

জাহাজ রেলগাড়ি বিমান ও মোটরনির্মাণশিল্প

যে-কোন দেশের শিল্পোন্নতি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য জাহাজ, রেলগাড়ি ও বিমানের প্রয়োজন যে কতখানি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার দরকার হয় না। বিশাখাপত্তনে যে জাহাজ-নির্মাণশালা ছিল তাহা ১৯৫২ সাল হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এখন সেখানে বড় বড় আধুনিক জাহাজ নির্মাণ করা হয়। এই জাহাজঘাট আরও অনেক বড় করা হইতেছে এবং কোচিনে নূতন একটি জাহাজঘাট নির্মাণ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

ব্যাঙ্গালোরে যে হিন্দুস্থান 'এয়ারক্র্যাফ্ট ফ্যাক্টরি' স্থাপিত হইয়াছে সেখানে পাইলটদের শিক্ষার উপযুক্ত বিমান এত সুন্দর তৈরী হইতেছে যে বিদেশ হইতেও অনেকে তাহা কিনিতে চাহিতেছেন। এই বিমানের মার্কা হইল 'HT—2'। ইহা ছাড়া ভারতের বিমানবাহিনীর জন্য 'HF—20' জেটবিমান ও ভ্যাম্পায়ার জেট ফাইটার-বিমানও এই কারখানায় তৈরী হইতেছে। কানপুরের বিমানবাহিনীর কারখানা 'AVRO—784' পরিবহণ বিমান তৈরীর ভার লইয়াছে। ভবিষ্যতে ডেকোটা-বিমানের বদলে পরিবহণের জন্য এই বিমান বেশী ব্যবহার করা হইবে। 'পুষ্পক' নামে একরকমের ছোট হালকা বিমানও এই কারখানায় তৈরী হইতেছে।

হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্টে রেলের জন্য আধুনিক কোচ বা কামরাও তৈরী হয়, ইহা আগাগোড়া মেটালের তৈরী, কাঠের নহে। মাদ্রাজের পেরাম্বুরে আলাদা বিশাল একটি রেলকোচ তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। কোচ ছাড়াও রেলওয়ের জন্য আরও অনেক জিনিস প্রয়োজন, তাহা রেল-বিভাগের নিজস্ব বড় বড় ওয়ার্কশপে তৈরী করা হয়। কিন্তু কোচ বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম থাকিলেও রেলগাড়ি চলিবে না। চলিবার জন্য ইঞ্জিন প্রয়োজন। এই ইঞ্জিন এতকাল বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি করা হইত, আমাদের নিজেদের তৈরী কোন ইঞ্জিন ছিল না। ১৯৫০ সালে চিত্তরঞ্জনে

(মিহিজাম—পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে) 'লোকোমোটিভ' বা রেলের ইঞ্জিন তৈরী করার কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই কারখানায় ১২৫টি এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ১৭৩টি ইঞ্জিন তৈরী হইয়াছিল। এই কারখানার লক্ষ্য হইতেছে প্রতি বছরে ৩০০টি ইঞ্জিন তৈরী করা। চিত্তরঞ্জন ছাড়া টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ও লোকোমোটিভ কোম্পানিও রেলের ইঞ্জিন তৈরী করিতেছে। বর্তমানে ভারতে যে-পরিমাণ স্টীম-ইঞ্জিন, ওয়াগন ও কোচ তৈরী হইতেছে তাহাতে আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়া বাহিরে রপ্তানি করার মতো উদ্বৃত্ত থাকে।

অটোমোবাইল বা নানারকমের মোটরগাড়িও এখন ভারতবর্ষে তৈরী হইতেছে। ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ২০ হাজার মোটর, ২৮ হাজার লরী ট্রাক, ৫৫০০ জীপ ও স্টেশন ওয়াগন এবং ১৬ হাজার মোটর-সাইকেল, স্কুটার ইত্যাদি এদেশের কারখানায় তৈরী হইয়াছে। বিদেশ হইতে এখনও মোটরের কলকব্জা কিছু আমদানি করিতে হয় এবং এখানে তাহা একত্রে সমাবেশ করা হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে আমরা মোটর নির্মাণে আত্মনির্ভর হইতে পারি তাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

যন্ত্রনির্মাণশিল্প

যন্ত্রচালিত শিল্পের বিস্তারের জন্য কতরকমের যন্ত্রের যে প্রয়োজন তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ছোটবড় বহু যন্ত্রপাতি বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের কারখানার জন্য একান্ত আবশ্যক। এই যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য কয়েকটি বড় কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোরে 'হিন্দুস্থান মেশিনটুল ফ্যাক্টরি' ও হায়দারাবাদের 'প্রাগ-টুলস' ইহাদের মধ্যে প্রধান। হিন্দুস্থান ফ্যাক্টরিতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ৮৬৫টি লেদ, মিলিং ও ড্রিলিং মেশিন তৈরী হইবার কথা। ১৯৫১ সালে ভারতে মোট ১১ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী হইত, ১৯৫৮ সালের মধ্যে মোট প্রায় ৭৯ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। যন্ত্রপাতি নির্মাণ যে কত বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে তাহা এই হিসাবটুকু হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্তমানে (১৯৫৯-৬০) প্রতি বছরে যে যন্ত্রপাতি তৈরী হইতেছে তাহাতে কলকারখানার চাহিদা সম্পূর্ণ মিটিতেছে না। সেইজন্য তৃতীয় যোজনায় ব্যাঙ্গালোর ও



হায়দারাবাদের কারখানা যথেষ্ট বাড়ানো হইবে এবং নূতন একটি কারখানা ভারী যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য স্থাপন করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই কারখানাগুলি ছাড়া প্রতিরক্ষাবিভাগের যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য আলাদা একটি কারখানা আছে বোম্বাই-এর কাছে অম্বরনাথে। এই সমস্ত কারখানায় পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ হইলে প্রতি বছরে প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যের

যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তৃতীয় যোজনায় প্রতি বছরে ৩০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি নির্মাণের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সুতরাং যন্ত্রপাতির বেশ খানিকটা ঘাটতি পড়িবে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের বাহিরে দেশের শিল্পপতির নিজেদের প্রচেষ্টায় এই ঘাটতি কিছুটা পূরণ করিতে পারিবেন।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কথাও এই প্রসঙ্গে বলিতে হয়। ভূপালে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নির্মাণের জন্য একটি বড় কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। তৃতীয় যোজনায় এই ধরনের আরও দুইটি বড় কারখানা স্থাপন করা হইবে। এইসব কারখানায় টার্বাইন জেনারেটর সুইচগীয়ার ট্রানসফর্মার প্রভৃতি তৈরী হইবে। তার বা কেবৃল, বাতি, সুইচ ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যাহা এখন তৈরী হইতেছে তাহার মূল্য প্রায় ৭১ কোটি টাকা (১৯৫৮), সাত বছর আগে যাহা তৈরী হইত তাহার মূল্য ছিল ২০ কোটি টাকা। গত দুই-তিন বছরে মোট উৎপাদনের মূল্য আরও বাড়িয়াছে। রূপনারায়ণপুরের (বর্ধমান—পশ্চিমবঙ্গ) 'হিন্দুস্থান কেবৃল ফ্যাক্টরি'তে ১৯৫৪ সাল হইতে টেলিফোনের কেবৃল বা তার তৈরীর আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৬ ৫৭ সালে এই কারখানায় ৪৭০ মাইল দীর্ঘ তার হয়, ১৯৫৯-৬০ সালে ৬৯১ মাইল। বছরে ১০০০ মাইল দীর্ঘ তার তৈরীর উপযোগী করিয়া কারখানাটিকে বাড়ানো হইতেছে।

যন্ত্রপাতি নির্মাণে কলিকাতার (যাদবপুরে) 'ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্টস ফ্যাক্টরি'-ও উল্লেখযোগ্য। ১৮৩০ সালে এই যন্ত্র-নির্মাণের কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার বয়স এখন ১৩৩ বছর (১৯৬৩)। ১৯৫৭ সালে ইহা ভারত-সরকার গ্রহণ করেন। এখানে প্রায় ২৫০ রকমের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী হয়, যেমন হাইড্রোমিটার, পরিমাপ-সিলিণ্ডার, ব্যারোমিটার, মোনো-মিটার ইত্যাদি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই কারখানায় প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়।

কেমিক্যালশিল্প

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমাদের দেশে অধিকাংশ কেমিক্যালই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। স্বাধীন ভারতসরকার এই শিল্পের প্রসারে

বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। সিন্দ্রি (ধানবাদ—বিহার) ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি, রুরকেলার ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি, হিন্দুস্থান ইনসেকটিসাইড্স, অন্ধ্রপ্রদেশে সনৎনগরের সিন্থেটিক ড্রাগ প্রজেক্ট, উত্তরপ্রদেশে হৃষিকেশের অ্যান্টিবায়োটিক প্ল্যান্ট, কেরলের ফাইটো-কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, মাদ্রাজে গুইণ্ডির সার্জিক্যাল ইন্স্ট্রুমেন্ট প্ল্যান্ট প্রভৃতি বিখ্যাত কেমিক্যাল শিল্প-কারখানা। সোডা অ্যাশ, কস্টিক সোডা, লিকুইড ক্লোরিন, অ্যামোনিয়ম সালফেট, সুপারফসফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড, অক্সিজেন, কপার সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ডি-ডি-টি, পেনিসিলিন-স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি সর্ব-প্রকারের কেমিক্যাল এখন এদেশে তৈরী হইতেছে।

সূতা ও বস্ত্রশিল্প

তুলাশিল্প, পাটশিল্প, রেয়ন ও অন্যান্য তন্তুশিল্প, পশমশিল্প ইত্যাদি এই শিল্পগোষ্ঠীভুক্ত। এই শিল্পগুলি অধিকাংশই শিল্পপতিদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন, রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত নহে। পাটশিল্পের প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ, তুলাশিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চল। মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গেও কাপড়ের কল আছে। সারা ভারতে ১৯৬০ সালের গোড়ায় ৪৮৩টি কাপড়ের কলে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। পাটকল অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। বিহার, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশেও কয়েকটি পাটকল আছে। সারা ভারতে মোট পাটকলের সংখ্যা প্রায় ১১২টি, তাহার মধ্যে একশতেরও বেশী পশ্চিমবঙ্গে। রেশমশিল্প ভারতবর্ষে ঠিক যন্ত্রচালিত বড় শিল্প নহে, অনেকটা কুটিরশিল্প বলা যায়। রেশমের প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ জেলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশে বারাণসী ও মির্জাপুর, মহীশূরে ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজে তাঞ্জোর, সালেম প্রভৃতি অঞ্চল। ভারতে প্রায় ৯০টি রেশমশিল্পের কারখানা আছে। কাঠের বা তুলার মণ্ড হইতে কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে যে রেশমের মতো সূতা প্রস্তুত হয় তাহাকে রেয়ন বা সিনথেটিক বলে। ইহার জন্য যে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার হয়, এদেশে তাহার অভাব আছে। অথচ রেয়ন ও সিনথেটিক রেশমের চাহিদা যথেষ্ট আছে এবং ক্রমেই তাহা বাড়িতেছে। কেরল ও বোম্বাই-এ রেয়নশিল্পের দুইটি কারখানা আছে,

তাহার উৎপাদন বাজারের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। পশমশিল্পের প্রধান কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব।

গত দশ বছরে এইসব বিভিন্ন সূতা-বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে। নিচের হিসাব হইতে তাহা বোঝা যাইবে:

তুলার সূতা :	১১৭ কোটি ৯০ লক্ষ গজ :	২১০ কোটি গজ :	২২৫ কোটি গজ
মিলের কাপড় :	৩৭২ কোটি গজ :	৫০০ কোটি গজ :	৫৮০ কোটি গজ
পাট :	৮৯ কোটি ২০ লক্ষ টন :	১১০ কোটি টন :	১১০ কোটি টন
রেয়ন (তন্তু) :	১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৫৫-৫৬) :	৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড :	১৪ কোটি টন ১৪ কোটি পাউণ্ড
রেয়ন (আঁশ) :	১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৫৫-৫৬) :	৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড :	৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড
পশম (সূতা) :	২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৫৫-৫৬) :	৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড :	৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড
পশম (কাপড়) :	১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ (১৯৫৫-৫৬) :	২ কোটি ৩০ লক্ষ গজ :	৩ কোটি ৫০ লক্ষ গজ

বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে এদেশে তৈরী হইতেছে না বলিয়া শিল্পবিস্তারে বিঘ্ন ঘটিতেছে। সেইজন্য এই শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণের দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী হয়, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৯ কোটি টাকার হইবার কথা। তৃতীয় যোজনার লক্ষ্য হইতেছে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ২০ কোটি টাকার বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি এদেশে তৈরী করা।

বিবিধ শিল্প-কারখানা

চিনি, কাগজ, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পও বড় কারখানাশিল্প বলিয়া গণ্য করা যায়। গত দশ বছরের মধ্যে এইসব শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি হইয়াছে যথেষ্ট। চিনিশিল্পের কথা ধরা যাক। ১৯৩১-৩২ সালে অখণ্ড ভারতে চিনিকল ছিল মাত্র ৩২টি, ১৯৫৮-৫৭ সালে শুধু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে ১৬৬ চিনিকল স্থাপিত হয়। বর্তমানে চিনিকলের সংখ্যা ভারতে প্রায় ১৭৫-৮০টি। ইহার মধ্যে প্রায় ১৩০টি চিনিকল উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত, শুধু উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৭৫টি। ১৯৫৫-৫৬ সালে এইসব চিনিকলে ৭৮ লক্ষ টন গুড় ও ১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবার কথা। ইহাতে ভারতের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে চিনি রপ্তানি করাও সম্ভব হইবে। কিন্তু একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। ভারতে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার গড়ে বছরে ৩০ পাউণ্ডের মতো, ইহা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। ডেনমার্কে ইহা কমবেশী ১২৮ পাউণ্ড, নিউজিল্যাণ্ডে ১১৬ পাউণ্ড, অস্ট্রেলিয়ায় ১১৪ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ১১২ পাউণ্ড, আমেরিকায় ১০২ পাউণ্ড। ভারতে চিনির ব্যবহার বাড়াইতে হইলে চিনির দাম আরও অনেক কমানো দরকার। বর্তমানে চিনির যে দাম তাহাতে সাধারণ দরিদ্র লোকের পক্ষে চিনি ব্যবহার করা বিলাসিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিনির দাম কমাইতে হইলে আখের চাষ এবং চিনিকলের সংখ্যা আরও অনেক বাড়াইতে হইবে।

কাগজশিল্প এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত। আগে হাতে কাগজ তৈরী হইত, যাহারা কাগজ তৈরী করিত তাহাদের 'কাগজী' বলিত। প্রাচীন পুঁথিপত্র সব হাতে-তৈরী কাগজে লেখা হইত। এখনও কাগজের কুটিরশিল্প টিকিয়া আছে এবং হাতে-তৈরী কাগজ পাওয়া যায়। আধুনিক কালে সংবাদপত্র, বইপত্র ইত্যাদির যে চাহিদা এবং প্রত্যেক কাজকর্মে যে পরিমাণ কাগজ দরকার হয় তাহা হাতে-তৈরী কাগজ দিয়া মিটানো সম্ভব নহে। আধুনিক যুগকে কেহ কেহ ছাপাখানা ও কাগজের যুগ বা 'কাগজের সভ্যতা' বলিয়াছেন। কথাটা খুবই সত্য। ভাত-কাপড়ের মতো কাগজও যেন মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী হইয়াছে। কাগজ যন্ত্রে তৈরী হইতে আরম্ভ হয় এদেশে ১৮৭০ সাল হইতে, কলিকাতা শহরের কাছে বালিতে কাগজের কল স্থাপিত হওয়ার পর। ইহার পর টিটাগড়ের কাগজের কল স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে প্রয়োজনের চাপে ১৫টি কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কাগজ উৎপন্ন হয় একলক্ষ টনের কিছু বেশী। বর্তমানে কাগজকলের সংখ্যা ২০-২২টি হইবে, এবং দৈনিক সংবাদপত্র ছাপার উপযোগী 'নিউজপ্রিণ্ট' তৈরীর জন্য মধ্যপ্রদেশে নেপানগরে একটি নূতন কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। কারখানার নাম "ন্যাশনাল নিউজপ্রিণ্ট অ্যাণ্ড পেপার মিল্‌স।" এই কারখানায় ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ২২ হাজার টন নিউজপ্রিণ্ট তৈরী হয় এবং এখন যে যন্ত্রপাতি আছে তাহাতে বছরে ৩০ হাজার টন পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব হইতে পারে। ভারতে বর্তমানে নিউজপ্রিণ্ট কাগজের চাহিদা বছরে প্রায় ৮০ হাজার টন, ইহা ক্রমেই বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। সুতরাং নিউজপ্রিণ্ট কাগজের কারখানা আরও দুই-তিনটি অন্তত স্থাপন করা দরকার। অন্যান্য কাগজ বর্তমানে (১৯৫৫-৫৬) বছরে প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন তৈরী হইতেছে, তৃতীয় যোজনায় ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ইহা দ্বিগুণের বেশী বাড়াইয়া বছরে প্রায় ৭ লক্ষ টন করা হইবে স্থির হইয়াছে।

সিমেণ্ট তৈরী আরম্ভ হয় মাদ্রাজে ১৯০৪ সালে। তারপর ১৯১২-১৩ সালে তিনটি বড় সিমেণ্টের কারখানা স্থাপন করা হয়। বর্তমানে (১৯৫৯-৬০) ভারতে সিমেণ্টকলের সংখ্যা ৩২টি এবং সিমেণ্টের উৎপাদন বছরে ৮৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন। ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে আরও দুইটি সিমেণ্ট-কারখানা স্থাপন করিয়া মোট উৎপাদন ৯৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার কথা। নূতন নূতন নগর, আফিস, কলকারখানা ও বাসগৃহাদি নির্মাণ গত কয়েক বছরে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সিমেণ্টের চাহিদাও ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে এবং খোলা বাজারে ন্যায্য মূল্যে সবসময় সিমেণ্ট পাওয়া সম্ভব হইতেছে না।

শিল্পোন্নতির গতি নির্দেশ

ভারতের বড় বড় যন্ত্রচালিত কারখানাশিল্পের অগ্রগতির বিবরণ দেওয়া হইল। বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার ভিতর হইতে, লক্ষ্য করিলে, ভারতের শিল্পায়নের গতি কোন্‌দিকে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের হার-বৃদ্ধি একনজরে দেখিলে ধারণা আরও পরিষ্কার হইবে:

শিল্পোৎপাদনের গতিনির্দেশ

	১৯৫০-৫১	১৯৫৯-৬০
তুলাজাত শিল্প	১০০	১১১.৫
লোহা-ইস্পাত	১০০	১৬৩.১
যন্ত্রপাতি	১০০	৪২৪.৩
কেমিক্যাল	১০০	২১৪.০

এখানে দেখা যায় যে যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল ও লোহা-ইস্পাতের উপর যতখানি জোর দেওয়া হইয়াছে, তুলাজাত শিল্পের উপর তাহা দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ যে-সব জিনিসের উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যেমন যন্ত্রপাতি। কয়েকটি বাছাই জিনিসের উৎপাদন-বৃদ্ধি লক্ষ্য করিলে শিল্পায়নের চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে :

উৎপাদক বস্তু

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬ (প্রত্যাশিত)
ইস্পাত	১০ লক্ষ টন	২০ লক্ষ ৬০ হাজার টন
অ্যালুমিনিয়ম	৩৭০০ টন	১৭,০০০ টন
ডিজেল ইঞ্জিন	৫৫০০	৩৩,০০০
বৈদ্যুতিক তার	১৬৭৪ টন	১৮,০০০ টন
নাইট্রোজেন সার	৯০০০ টন	২১০,০০০ টন
সালফিউরিক অ্যাসিড	৯৯,০০০ টন	৪০০,০০০ টন
সিমেন্ট	২০ লক্ষ ৭০ হাজার টন	৮০ লক্ষ ৮০ হাজার টন
কয়লা	৩২০ লক্ষ টন	৫৩০ লক্ষ টন
খনিজ লোহা	৩০ লক্ষ টন	১২০ লক্ষ টন

ভোগ্য ও ব্যবহার্য বস্তু

মিলের সুতার কাপড়	৩৭২ কোটি গজ	৫০০ কোটি গজ
চিনি	১০ লক্ষ ১০ হাজার টন	২০ লক্ষ ২৫ হাজার টন
কাগজ ও বোর্ড	১১৪,০০০ টন	৩২০,০০০ টন
বাইসাইকেল	১০১,০০০	১,০৫০,০০০
অটোমোবাইল	১৬৫,০০০	৫৩৫,০০০

উৎপাদক-বস্তু ও ব্যবহার্য-বস্তু

যে-সব বস্তু বা জিনিস অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস উৎপাদনে কাজে লাগে, সেগুলিকে 'উৎপাদক-বস্তু' বা 'capital goods' বলা হয় এবং যাহা সোজাসুজি ভোগ ও ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাকে 'ভোগ্য-বস্তু' বা 'consumer goods' বলা হয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ভারতে যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, খনিজ লোহা ইত্যাদি উৎপাদক-বস্তু উৎপাদনে অনেক বেশী মূলধন ও উদ্যম নিয়োগ করা হইয়াছে। উৎপাদন বাড়িয়াছেও অনেক। উৎপাদক-বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলে ভোগ্য-বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না এবং দেশের শিল্প-প্রগতিও সম্ভব হয় না। কেবল উৎপাদক-বস্তু নহে, যে-সব ব্যবহার্য-বস্তু (কাগজ, সাইকেল, মোটর ইত্যাদি) না হইলে কর্মবহুল সমাজ-জীবনের সচলতা ব্যাহত হইতে পারে, সেগুলির উৎপাদনও অনেক বাড়িয়াছে। আরও অনেক বেশী কলকারখানা অবশ্য দরকার এবং উৎপাদনও অনেক বাড়ানো প্রয়োজন। বর্তমান অগ্রগতি বজায় থাকিলে, ভবিষ্যতে তাহা না হইবার কোন কারণ নাই। তবে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে নিশ্চিত বলা যায় যে স্বাধীন ভারত দৃঢ়পদে আধুনিক যুগোপযোগী শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।



কুটিরশিল্প

বড় বড় কারখানাশিল্পের কথা শুনিয়া সকলের মনে হইবে যে ইহাদের পাশে ছোট ছোট কুটিরশিল্প থাকিবার প্রয়োজন কি? কারখানাতেই যখন সমস্ত জিনিস তৈরী করা যায় তখন ঘরে বসিয়া অনেক বেশী মনোযোগ

দিয়া ও মেহনত করিয়া কোন-কোন জিনিস তৈরী করার সার্থকতাই বা কি?

এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর হইল, যাহাদের কাজ করিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের সকলকে কলকারখানায় কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব নহে। দেশের সমস্ত কর্মক্ষম মানুষকে যদি শুধু কারখানার কাজে নিযুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের মতো বিশাল জনবহুল দেশে যে কত কারখানা কত গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার ঠিক নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এদেশের বিভিন্ন কুটিরশিল্পে প্রায় দুই কোটির মতো লোক কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কেবল তাঁতশিল্পে নিযুক্ত আছে। বড় বড় কারখানা, খনি, চা-কফি-রবার বাগানে মোট যত লোক কাজ করে তাহা তাঁতশিল্পে নিযুক্ত এই ৫০ লক্ষ লোক অপেক্ষা খুব বেশী হইবে না। এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষে কুটিরশিল্পের প্রয়োজন কত বেশী। কুটিরশিল্প যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া যাইবে।

বেকার-সমস্যা ছাড়াও কুটিরশিল্প আরও অনেক সমস্যার সমাধান করিতেছে। কারখানায় যে-সব ব্যবহারের বস্তু তৈরী হয় তাহাতে সমস্ত দেশের লোকের চাহিদা মিটানো কঠিন। যেমন কাপড়। যদি তাঁতের কাপড় না থাকিত তাহা হইলে শুধু মিলের কাপড় দিয়া বস্ত্রসমস্যা সমাধান করা এদেশে সম্ভব হইত না। তেমনি বাসন-কোসন। অ্যালুমিনিয়ম বা স্টেনলেস স্টীলের বাসন দিয়া কি দেশের লোকের পাত্রের অভাব মিটিত? কয়জন লোক ইহা কিনিতে পারে বা কিনিয়া থাকে? শতকরা দুই-তিনজন লোকের বেশী নহে। পিতল-কাঁসার বাসন কুটিরশিল্পে তৈরী হয়, কিন্তু তাহাই বা দেশের কয়জন লোক ব্যবহার করিতে পারে? আজও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের বেশীর ভাগ ব্যবহারের পাত্র মাটির তৈরী; গ্রামে গ্রামে কুমোরের চাকে তাহা তৈরী হয়। দেশের মাটির সহিত যাহাদের যোগ আছে, মাটির কাছাকাছি যাহারা থাকে, সেইসব গ্রামের চাষী ও কারিগর আজও মাটির পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। মাটির নানারকম পাত্র গড়ার কাজ আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত কুটিরশিল্প। চীনামাটির পাত্র-পেয়ালা-প্লেট কারখানায় তৈরী হয়, কিন্তু মাটির বড় বড় জালা-হাঁড়ি-কুঁড়ি

কলসি-মালসা-গামলা হইতে ছোট ছোট খুরি পর্যন্ত (এই খুরিতেই চা-পান করা হয়, কাপে নয়) সব পাত্র তৈরী হয় কুমোরের কুটিরে। ইচ্ছা করিলে কুমোর বা কারিগর তাহার হাতে-গড়া জিনিসটিতে যে বিশিষ্ট রূপের স্পর্শ দিতে পারে, কারখানার মজুর তাহার যন্ত্রে-গড়া জিনিসে তাহা সহজে পারে না। এই কারণেও, যন্ত্রযুগে ব্যক্তিগত রুচির পরিতৃপ্তির জন্য অন্তত, কুটিরশিল্প রক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

ভারতের কুটিরশিল্প

সুপ্রাচীন কাল হইতে কুটিরশিল্পের জন্য ভারতের কারিগরদের খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

ধাতু শিল্প। রূপা, পিতল, তামার তৈজসপত্র, খোদাই চেতাই ও মিনার কাজ, লোহা-পিতল ঢালাই কাজ, সোনারূপার সেকরার কাজ ইত্যাদি কুটিরশিল্পভুক্ত ধাতুশিল্প। জয়পুর, মুলতান, রামপুর ও কাশ্মীরের মীনার কাজ প্রসিদ্ধ। সোনারূপার গহনা ভারতের সর্বত্র গড়া হইয়া থাকে। উত্তর ও দক্ষিণভারতের গহনার গড়নের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। ধাতু বা কাঠের উপর সোনা বা রূপার তার বসানোর কাজ ভারতের অতিপ্রাচীন কারুশিল্প। ইহার মধ্যে 'বিদ্‌রী' কাজ (হায়দারাবাদের বিদর প্রদেশের) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রূপার বাসন কাশ্মীর, লক্ষ্ণৌ, কচ্ছ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ, ইহাতে খোদাই মীনা ও জড়োয়া বসানোর কাজ করা হয়। মাদ্রাজী কাজের মধ্যে 'গোদাবরী-ধরন' নামে খ্যাত বাসনগুলিতে নানা দেবদেবীর মূর্তি চেতাই করিয়া গড়ার রীতি আছে। লক্ষ্ণৌ-এর কাজে তালগাছ ও শিকারের নকশা প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের কাজে কল্‌কার নকশা এবং কচ্ছ অঞ্চলের কাজে মণ্ডনলতা থাকে। বারাণসীর পিতলের কাজ খুব বিখ্যাত। মোরাদাবাদে পিতলের বাসনে সূক্ষ্ম মীনার কাজ করা থাকে। ইহা ছাড়া আরও বহু স্থানে পিতলকাঁসা সোনারূপার কাজ হয় এবং তাহার প্রত্যেকটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এমন কি একই প্রদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের কাজের রীতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

কুটিরশিল্প



ধাতুশিল্প



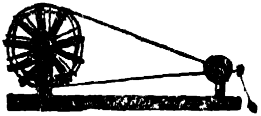
পাথরের কাজ



পোড়ামাটির কাজ



কাচশিল্প



তাঁতশিল্প

পাথরের কাজ। পাথরের দেবদেবীর মূর্তি গড়ার কাজ ভারতের সর্বত্র দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। জয়পুর, আগ্রা, জব্বলপুর, পুরী প্রভৃতি অঞ্চলে আজও নানারকমের পাথরের বাসন, মূর্তি, খেলনা ইত্যাদি তৈরী হয়।

কাচ ও পোড়ামাটির কাজ। মোটা কাচের কাজ এটাওয়ায়, শাহজাহানপুরের কাছে রামপুরে তৈরী হয়। এখানকার কাচের চুড়ি বিখ্যাত। লক্ষ্ণৌ-এ বাদশাহী আমলে কাচশিল্পের খুব উন্নতি হইয়াছিল। জয়পুরের নীল-সাদা নকশা করা চীনামাটির কাজ একদা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। মীরাট ও রামপুরের মাটির বাসনেরও সুনাম ছিল যথেষ্ট।

কাঠের কাজ। কাঠের কাজের জন্যও ভারতবর্ষের খ্যাতি প্রাচীনকাল হইতে আছে। কাথিয়াওয়াড, মহীশূর, ফারাক্কাবাদ, আলিগড়, আজমগড়, বেরিলী, গাজীপুর, মথুরা, শাহারানপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কাঠের কাজ বিখ্যাত। কাশ্মীরের কাঠের কাজও প্রসিদ্ধ, আঙুরপাতা তাহার বিশেষ নকশা।

তাঁত শিল্প। বহু প্রাচীনকাল হইতে তাঁতশিল্পের জন্য ভারতের বিশেষ খ্যাতি আছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা, আসাম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে নিজস্ব তাঁতশিল্পের বিশিষ্টতার জন্য বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। সূতা ও রেশমের কাপড় যে কতরকমের তৈরী হইত তাহার ঠিক নাই। প্রাচীন যুগ হইতেই বিদেশে এই সমস্ত রেশমী বস্ত্র বিলাসিতার জন্য চালান যাইত। সমস্ত কুটিরশিল্পের মধ্যে ভারতে তাঁতশিল্পের যে বিচিত্র সমৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা বোধহয় আর অন্য কোন শিল্পের হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্প

কুটিরশিল্পের জন্য বাংলাদেশ সারা ভারতবর্ষে ও বিদেশে চিরদিন খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ঢাকার (এখন পূর্বপাকিস্তানে) মসলিন একসময় সারা পৃথিবীর বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের রেশমী ও সূতার কাপড় মধ্যযুগ হইতেই বিশেষ সুখ্যাতি পাইয়া আসিয়াছে। শান্তিপুর, ধনেখালি প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁতিদের তাঁতশিল্পের বিশেষ মর্যাদা আছে। বীরভূম, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁত ও রেশমের কাপড়ও বিখ্যাত।

নানারকমের ধাতুশিল্পের জন্যও পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতি আছে। মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরের (খাগড়া) কাঁসার বাসন, মেদিনীপুর-ঘাটাল অঞ্চলের বাসন

ঢালাই-পেটাই-গড়নের জন্য সর্বত্র সমাদরলাভ করিয়াছে। বর্ধমানের কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচির খুব সুনাম আছে। কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে বহু স্থানে লোহা ও গ্যালভানাইজড্ তারের নানারকম জিনিস তৈরী হয়—যেমন ইঁদুর-ধরা কল, পাখির খাঁচা, ট্রে, কাগজের ঝুড়ি, ঢাকনা, শিকা ইত্যাদি। হাওড়া ও তাহার কাছাকাছি গ্রামে কুটিরশিল্পরূপে ঢালাই পিতলের অনেক রকমের জিনিস তৈরী হয়। ইহার উপাদান হইল পুরাতন পিতল বা গানমেটালের টুকরা ও ছাঁট। কারিগরেরা সপরিবারে কাজ করে। পিতলের কবজা, ছিটকিনি, হুক, জলের কল, ব্রাকেট, তালাচাবি ইত্যাদি বহুরকমের জিনিস এখানে তৈরী হয়। অনেকে শুধু ঢালাই করিয়া মাল অন্য কারখানায় যোগান দেয়।

মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্যের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত। বর্ধমানের কাটোয়া দাঁইহাট প্রভৃতি অঞ্চল পাথরের কাজের জন্য এবং নদীয়ার কৃষ্ণনগর মাটির কাজের জন্য বিখ্যাত। বীরভূম, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মৃৎশিল্পেরও চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে।

কাচের শিশি-বোতল তৈরী ঠিক কুটিরশিল্পের কাজ নহে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতায় ও শহরতলীতে ছোট ছোট কাচশিল্প আছে। খুব ছোট কারখানায় কাচের চুড়ি তৈরী হয়, তাহার উপাদান হইল—বিভিন্ন রঙের কাচের সরু ছড় বা রড। আগে বিদেশ হইতে এই কাচের ছড় আসিত, এখন কতকগুলি দেশী কাচের কারখানাতেও ইহা তৈরী করা হইতেছে। অনেক চুড়িকার কাচের মণ্ড হইতে নিজেরাই ছড় প্রস্তুত করে। সেই ছড় কাঠকয়লার হাপরের তাপে নরম হইলে নানারকম ছাঁচ বা চিমটা দিয়া চাপিয়া নকশা তোলা হয়। তারপর নরম ছড় বাঁকাইয়া, চুড়ির আকারে গোল করিয়া দুই প্রান্ত বাঁকানলের শিখায় জুড়িয়া দেওয়া হয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে কলিকাতায় ও শহরতলীতে অনেকগুলি ছোট কাচের কারখানা হইয়াছে। তাহাতে কাচের নল হইতে ছোট ছোট ওষুধের শিশি, ইনজেকশনের অ্যামপিউল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। এই কাজে খুব দক্ষতা প্রয়োজন, শিখিতে বহুদিন সময় লাগে। তবু বহু লোক এই কাজ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে।

কংক্রিটের জিনিস, প্রসাধন-দ্রব্য, খেলনা, বই-খাতা বাঁধাই, ঠোঙা ও

প্যাকেট তৈরী, সূচের কাজ প্রভৃতি বহুরকমের কুটিরশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের অনেক লোক প্রতিপালিত হয়। পূর্ববঙ্গের উদ্‌বাস্তুদের অর্থনীতিক পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় সমস্যা। কুটিরশিল্প এই সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। সেইজন্য বিভিন্ন কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া আজ খুবই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ও ভারত-সরকার এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়াছেন।

কুটিরশিল্পের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান

আগেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে প্রায় দুই কোটি লোক বিভিন্ন কুটিরশিল্পে কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। সেইজন্য ভারত-সরকার কারখানাশিল্পের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেও কুটিরশিল্পকে অবহেলা করিতে পারেন নাই। কুটিরশিল্পের তত্ত্বাবধানের ভার প্রধানত প্রত্যেক রাজ্য-সরকারের, কিন্তু তাই বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে আদৌ উদাসীন নহেন। নানাভাবে তাঁহারা প্রত্যেক রাজ্যকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকেন। কুটিরশিল্প পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিবার জন্য ভারত-সরকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তুলিযাছেন। যেমন—

১। নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম্যশিল্প (village industries) প্রতিষ্ঠান।

২। নিখিল ভারত কারুশিল্প (handicrafts) বোর্ড।

৩। নিখিল ভারত তাঁতশিল্প (handloom) বোর্ড।

৪। ক্ষুদ্র শিল্প (small-scale industries) বোর্ড।

৫। নারিকেল-কাতা বা দড়ি (coir) বোর্ড।

৬। কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড।

যে সমস্ত শিল্পে মূলধন ৫ লক্ষ টাকার বেশী নহে, তাহাতে যত লোকই কাজ করুক, সরকার সেগুলিকে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত শিল্পকে মূলধন দিয়া, যন্ত্রপাতি ও টেকনিক্যাল ব্যাপারে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবারও অনেকরকম ব্যবস্থা আছে। কুটিরশিল্পজাত অনেক জিনিস উপযুক্ত বাজারে যথার্থ মূল্যে বিক্রয়ের বন্দোবস্তও সরকার করিয়াছেন।

নারিকেল-দড়ি কেরল প্রদেশের অন্যতম কুটিরশিল্প ; ভারতে প্রতি বছরে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন নারিকেল দড়ি তৈরী হয়, তাহার শতকরা ৯০

ভাগ হয় কেরলে। ইহার অনেকটা অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিদেশের টাকা উপার্জনে এই শিল্পের গুরুত্ব আছে বলিয়া ভারত-সরকার ইহার উন্নতির জন্য কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারী গবেষণাগার ও মডেল কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

রেশমশিল্প ও গুটিপোকার চাষের জন্য যথাক্রমে মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, জম্মু-কাশ্মীর ও মাদ্রাজের প্রাধান্য আছে। 'কেন্দ্রীয় রেশমশিল্প বোর্ড' রেশম সংক্রান্ত সমস্ত কাজ তদারক করেন। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে 'কেন্দ্রীয় রেশমশিল্প গবেষণাগার' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার একটি শাখাকেন্দ্র আছে কালিমপঙ-এ। দ্বিতীয় যোজনায় এই গবেষণাগার অনেক বাড়ানো হইয়াছে। মহীশূরে একটি রেশমশিল্পের শিক্ষাসদনও স্থাপন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় যোজনায় তাঁতশিল্পের জন্য প্রায় ৫৯ কোটি টাকা, খাদির জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা, নানাবিধ গ্রাম্যশিল্পের জন্য প্রায় ৩৮·কোটি টাকা, কারুশিল্পের জন্য ৯ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ৫৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য ৫ কোটি টাকা—মোট প্রায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়। তৃতীয় যোজনায় আরও বেশী টাকা খরচ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

অম্বর চরকা। খাদিশিল্পের উন্নতির জন্য ভারত-সরকার বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ইহার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে চার-মাকুর এক বিশেষ উন্নত ধরনের চরকা ('অম্বর চরকা' বলে) প্রচলন করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে এই অম্বর চরকার সূতায় হস্তচালিত তাঁতে প্রায় ৩০ কোটি গজ কাপড় বোনা সম্ভব হইবে। ১৯৫৯-৬০ সালের শেষ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে ৩২০৫৬৫ অম্বর চরকা সূতা কাটার জন্য প্রচলন করা হইয়াছে।

ভারতের নানারকম কারুশিল্পের উন্নতিসাধন করা নিখিল ভারত কারুশিল্প-বোর্ডের উদ্দেশ্য। এই বোর্ডের অধীনে ১৯টি কেন্দ্র ('pilot-centre' বলে) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে—কারুশিল্প শিক্ষা দিবার জন্য চারটি, শিক্ষা ও কাজের জন্য তিনটি, গবেষণার জন্য তিনটি, প্রাচীন শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য পাঁচটি এবং চারটি পরীক্ষা ও কাজকর্মের জন্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পের অনুশীলন ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যেই

এই বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার কারুশিল্প ও লোকশিল্পের জিনিসপত্র বোর্ডের অধীনে তৈরী হইতেছে এবং তাহা হইতে বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইতেছে।

কুটিরশিল্প ও লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন যে এদেশে কেবল বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন তাহা নহে। এমন অনেক কুটিরশিল্প আছে এদেশের, যাহার চাহিদা বাহিরে যথেষ্ট। যদি সেগুলিকে পুনর্গঠিত করা যায় এবং তাহার উৎপাদন বাড়ানো যায়, তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাও বেশ কিছু উপার্জন করা সম্ভব হইতে পারে।

Questions

Group A

1. Give a short account of the Iron and Steel industry in India, with reference to recent developments.

2. Write briefly what you know of the progress of Textile industry in India.

3. What are the important Chemical industries in India ? How they are being developed ?

4. How far India has progressed in Shipbuilding, Locomotive, Automobile and Aircraft industries ?

5. What is the importance of Machine-tool and Machinery industry in the over-all industrial development of a country ? How far has it been realised in India ?

এই অধ্যায়ের "বিভিন্ন প্রকারের কারখানাশিল্প" ও "যন্ত্রনির্মাণশিল্প" বিষয় দুইটি দ্রষ্টব্য।

6. What are Cottage industries ?Do you think they have any useful purpose to serve in an industrialised India ?

7. Name some important Cottage industries in India, with reference to regions where they are chiefly found.

8. What are the chief centres of Cottage industries in West Bengal ?

9. What steps have been taken by our National Government for the promotion and development of Cottage industries in India ?

10. Write notes on :

(a) Ambar Charka ; (b) Coir industry ; (c) Tea and Coffee.

Group B

1. The places in the 1st Column are important for some industries. Write the names of those industries in the 2nd Column :

1st Column	2nd Column
Durgapur	—
Bhilai	—
Bangalore	—
Visakhapatnam	—
Sindri	—
Ambarnath	—
Chittaranjan	—
Rupnarainpur	—

II. Write the names of places where the following industries are located :

National Instruments Factory	—
Hindusthan Machine Tools	—
Hindusthan Cables Factory	—
Surgical Instruments Plant	—
Indian Iron and Steel Company	—
National Newsprint and Paper Mill	—

III. Write the names of industries in the 1st Column which produce the things in the 2nd Column :

1st Column	2nd Column
—	Superphosphate
—	Pig iron
—	Petroleum
—	Penicillin
—	Steam Engine
—	Hydrometer
—	Turbine



সপ্তম প্রকরণ। ষষ্ঠ অধ্যায়

যানবাহন ও যোগাযোগ

প্রতিপাদ্য। আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি। আমার প্রতিবেশী তাহার ঘরে বসিয়া আছে। আমার ঘর হইতে তাহার ঘর একটু দূরে, এপাড়া আর ও-পাড়া। কোন একটি বিষয় আমার প্রতিবেশীকে জানাইতে হইবে। আমি কি করিব? জানাইবার জন্য দুইটি কাজ আমাকে করিতে হইবে—

১। ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে তাহার কাছে যাইতে হইবে;

২। বিষয়টি কাছে গিয়া তাহাকে বলিতে হইবে বা জ্ঞাপন করিতে হইবে।

প্রথম কাজটি যাতায়াত করার কাজ, দ্বিতীয় কাজটি জ্ঞাপন করার কাজ। মানবসমাজে বাস করিতে হইলে মানুষের সহিত মানুষের, সমাজের সহিত সমাজের সম্পর্ক বা যোগসূত্র রাখিতে হয়। এই যোগসূত্র রাখিবার প্রধান দুইটি উপায় হইল যাতায়াত করা এবং ভাবের আদান-প্রদান করা। যেখানে দূরত্ব ও ব্যবধান বেশী সেখানে যাতায়াতের জন্য নানারকম যানবাহনের

Unit 7. (vi) Transport and Communication in India—forms of communication and transport in rural and urban areas.

A comparative study of different forms of transport in typical areas e. g. Desert lands, Polar regions, Mountains, etc.

A brief account of the development of transport through the ages—invention of wheel and mechanical power—use of steam, gas, electricity and atomic power—recent developments, e. g. space ship.

প্রয়োজন হয় এবং কোন বিষয় জানাইবার জন্য ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থার প্রথমটিকে যানবাহন (transport) ও দ্বিতীয়টিকে যোগাযোগ (communication) ব্যবস্থা বলা হয়। ইংরেজীতে 'communicate' কথার অর্থ হইল জ্ঞাপন করা, সেইজন্য চলাচল ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে 'transport and communication' বলে।

যানবাহনের ক্রমবিকাশ

আদিকাল হইতে প্রায় বর্তমান শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষের চলাচল করিবার দুইটি মাত্র পথ ছিল—জলপথ ও স্থলপথ। অনাদিকালের এই দুই অতিপ্রাচীন পথের উপর দিয়াই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত উপাদান দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একেবারে বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া পর্যন্ত মানুষের যানবাহনের ইতিহাস হইল এই জলপথে ও স্থলপথে চলার উপযোগী নানারকম যানবাহনের ইতিহাস। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আকাশপথে বিমানে চলিবার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইলেও বিংশ শতাব্দীর আগে আকাশগামী যানে মানুষের চলাচল ঠিকমতো শুরু হয় নাই। বর্তমান শতাব্দীর বড় বিস্ময় হইল এই আকাশগামী যানের বৈচিত্র্য। স্থলযানের ক্ষেত্রেও বর্তমান শতাব্দীর বড় বিস্ময় হইল অটোমোবাইলের বৈচিত্র্য। এই দুইটি যান—বিমান ও অটোমোবাইল—মানবসমাজের প্রকৃতি পর্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছে।

পথ চলিবার জন্য মানুষ যে কতরকমের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আদিযুগে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়ার সমস্যা প্রায়ই দেখা দিত। প্রধানত খাদ্যের সন্ধানেই বিভিন্ন আদিম জাতি-উপজাতিকে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইত। নিজেদের সামান্য জিনিসপত্র ফেলিয়া গেলেও শিশুসন্তানদের কাঁধেপিঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। এই বহন করার কাজ মেয়েদেরই বেশী করিতে হইত। সন্তান ও সংসারের টুকিটাকি জিনিস মেয়েদের পিঠে-পিঠে চলিত। এই বহন করার নানারকমের কৌশল আজও পৃথিবীর বহু অনুন্নত জাতির মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় আমাদের দেশেও তাহার অভাব নাই।

কেবল খাদ্যের জন্য নহে, জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের জন্য আদিকাল

হইতে মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে। তখন যাতায়াতের পথ মানুষের কাছে যে কত দুর্গম মনে হইত তাহা আজ কল্পনাও করা যায় না। কারণ পথ তো শুধু মাঠের মধ্য দিয়া ছিল না! পথ ছিল মরুভূমির উপর দিয়া, জলা-জঙ্গল ও গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া, নদনদী ও সমুদ্র পার হইয়া, পাহাড়-পর্বত ডিঙাইয়া। এই ধরনের প্রাচীন ঐতিহাসিক পথ ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়াতে অনেক রহিয়াছে। যেমন বাগদাদ হইতে বসরার পথ, উরাল পর্বতমালা ও ক্যাসপিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পথ, সমরকন্দ হইতে হিন্দুকুশ ও গোবি মরুভূমি হইতে পাইপিং পর্যন্ত পথ। এইসব পথের উপর দিয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে মানুষ পণ্যদ্রব্যের লেনদেনের জন্য চলাচল করিয়াছে। নিজে মানুষ ভার বহন করিয়াছে, নানারকমের জীবজন্তু মানুষের বোঝা বহন করিয়াছে, তারপর বহুরকমের যান ভারবহনের জন্য মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে—জলযান স্থলযান ও ব্যোমযান।

মানুষের ভারবহন

সকলের আগে মানুষ নিজেই নিজের বোঝার ভার বহন করিয়াছে। কারণ কে তাহার বোঝা বহন করিবে? পশু? বন্য পশুকে পোষ মানাইতে সময় লাগিয়াছে। তাহার আগে নিজের বোঝা নিজে বহন করা ছাড়া উপায় ছিল না। নিজের পিঠে ও কাঁধে মানুষ এই বোঝা বহন করিয়াছে। তাহার জন্যও অনেক কৌশল তাহাকে উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। ভারী বোঝা বড় বড় ঝুড়িতে কাঁধে ঝুলাইয়া, অথবা কাঁধের উপর বাঁকের দুইদিকে ঝুলাইয়া বহন করা সুবিধা হয়। কপালে মোটা পট্টি জড়াইয়া পিঠে বোঝা বাঁধিয়া লইলে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া অনেকটা বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজে বহন করা যায়। কাঁধে ও পিঠে এইভাবে বোঝা বহন করার রীতি এখনও পৃথিবীর বহু জাতি-উপজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে পাহাড়ীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কুলিদের মধ্যে এই ধরনের মাল-বহনের কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুর মালবহন

মানুষের পরে ভারবহনের কাজ পশুদের করিতে হয়। প্রথমে মানুষ পশুপালন করিয়াছিল দুধ মাংস ইত্যাদি খাদ্যের জন্য। খাদ্য যোগান

দেওয়া ছাড়াও পশুকে ভারবহনের কাজেও নিযুক্ত করা হয়। কুকুর বেশী বোঝা পিঠে বহন করিতে পারে না, কিন্তু অনেক বোঝা টানিতে পারে। সুমেরু অঞ্চলে বরফের উপরে কুকুরে স্লেজ টানে। উত্তর-ইউরোপে ও এসিয়ায় স্লেজ টানিবার জন্য বল্গাহরিণ ব্যবহার করা হয়। মনে হয় মধ্যএসিয়ার কোন অঞ্চলে মানুষ প্রথমে বন্য ঘোড়া পালন করিতে শিখিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক ব্রোঞ্জযুগে, খ্রীষ্টপূর্ব তিন-চার হাজার বছর আগে, মানুষ যে ঘোড়া পালন করিতে শিখিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘোড়ার জীন ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রেও এই নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকায় ঘোড়া ছিল না, স্প্যানিয়ার্ডরা সেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলন করে।

এসিয়ার প্রায় সর্বত্র পরিবহণের কাজে গরু-মহিষ ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ বলেন আফ্রিকাতে উটের আগে এই কাজে গরু ব্যবহার করা হইত। প্রাচীন মিশরে উটের ব্যবহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। মরুভূমি অঞ্চলে ক্রমে উটই প্রধান বাহন হইয়া ওঠে। তিব্বতে ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ছাগল, ভেড়া ও অশ্বতর ভারবহনের কাজে যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। গাধা দেখিতে খর্বাকৃতি হইলেও খুব ভারী বোঝা বহন করিতে পারে। পিঠে ছোট ছোট পুঁটলি করিয়া বাঁধিয়া দিলে ছাগল-ভেড়ার পাল অনেক জিনিসের বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

চক্রযানের উৎপত্তি

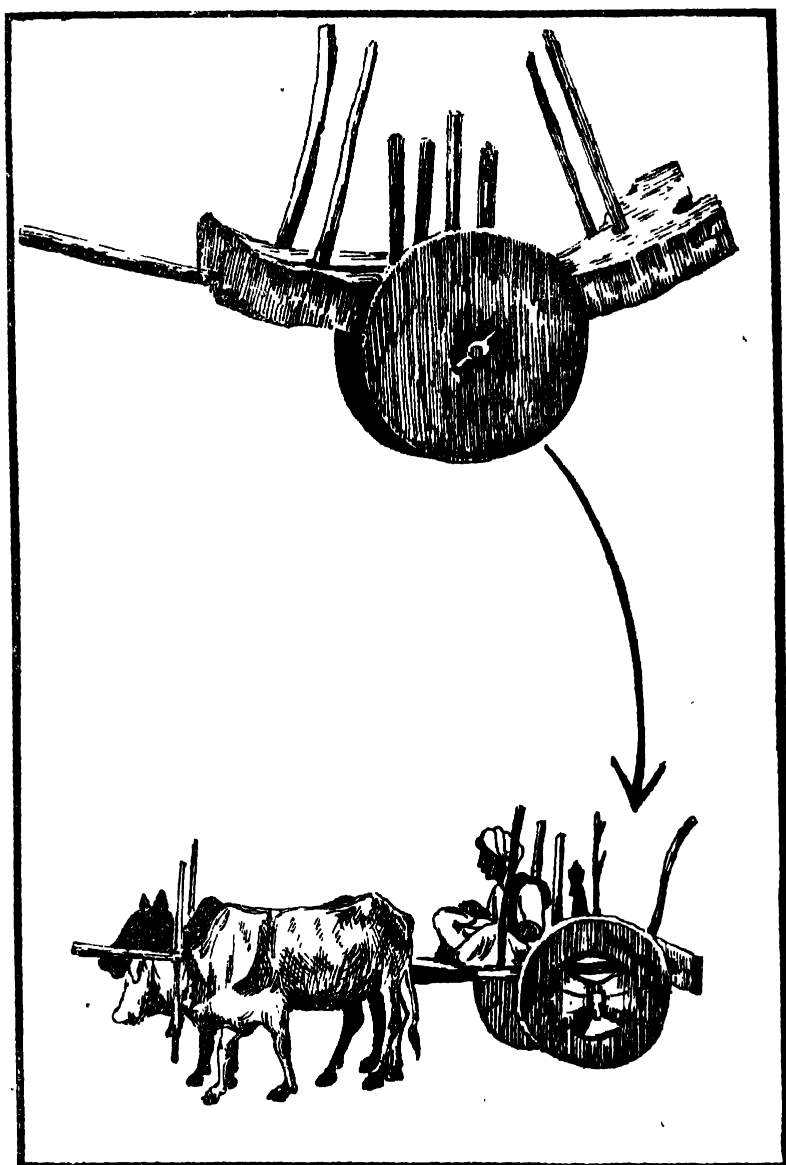
চক্রযান। চক্রহীন যানও যে একসময় ছিল তাহা এখনও সুমেরু অঞ্চলে 'স্লেজ' নামে তুষারশকট দেখিলে বোঝা যায়। স্লেজের কোন চাকা নাই। ইহা দেখিতে কতকটা চামচের মতো। উত্তর-ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণএসিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে Y-আকারের স্লেজ দেখিতে পাওয়া যায়। চক্রযানের আবিষ্কার মানুষ প্রথমে কিভাবে করে তাহা সঠিক জানা যায় না তবে তাম্রপ্রস্তর যুগে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-৪০০০ বছর আগে, পারস্য মেসোপোতামিয়া ও মিশর হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যে চক্রযানের (wheeled vehicle) ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহা এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভারতে সিন্ধু-উপত্যকায় এই

স্তরের নিদর্শনের মধ্যে যে পোড়ামাটির খেলনা-চক্রযান পাওয়া গিয়াছে তাহার বয়স প্রায় ৫০০০ বছর। প্রথমদিকের চাকায় কোন স্পোক বা 'পাখি' ছিল না, ইহা দেখিতে নীরেট ছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড (V. Gordon Childe) বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের মধ্যে সিন্ধু-উপত্যকা হইতে সিরিয়ার উপকূল পর্যন্ত অধিকাংশ স্থানে চক্রযানের রীতিমত প্রচলন ছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই-চাকার ও চারচাকার গাড়ির নিদর্শনও অনেক পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন আসিরিয়ার রথে এবং আমাদের ভারতীয় আর্যদের রথেও পাখিবিশিষ্ট চাকার ব্যবহার দেখা যায়। 'অ্যাকৃসেল' বা চক্রদণ্ড প্রথমে চাকায় ছিল না, পরে চাকার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে অ্যাকসেল (axle) ও 'স্পোক' উদ্‌ভাবিত হয়।

আমেরিকা অঞ্চলে চক্রযানের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল, ইউরোপ হইতে উহা আমেরিকায় প্রচলিত হয়। ষোড়শ শতকের আগে ইউরোপে অ্যাকৃসেল-বিশিষ্ট চারচাকার গাড়ির প্রচলন হয় নাই। বোঝা যায় যে চক্র ও চক্রযানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রথম কেন্দ্র ছিল সিরিয়ার উপকূল হইতে ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকা পর্যন্ত অঞ্চল। গর্ডন চাইল্ড বলিয়াছেন যে—"The ox was the first step to the steam engine and petrol motor" এবং প্রাচীন চক্রযান "the lineal ancestors of the automobile"—গরু-মহিষ হইল পরবর্তীকালের স্টীমইঞ্জিনের অগ্রদূত এবং প্রাচীন চক্রযান হইল আধুনিক অটোমোবাইলের পূর্বপুরুষ। বাষ্প, বিদ্যুৎ ও পেট্রল বর্তমান যুগে নানারকম যানবাহন চালনার শক্তি হিসাবে যে কাজ করিতেছে, প্রাচীনকালে প্রথমে বলদ এবং পরে ঘোড়া সেই কাজ করিয়াছে।

জলযানের ক্রমবিকাশ

জলযান। চলাচলের পথে জল বাধা হইলেও নদনদী ও সমুদ্রপথে আদিম মানুষের পথচলার সুবিধা হইয়াছে অনেক। জলের উপর দিয়া মানুষ নানারকম জিনিস অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া যাইতে পারে এবং স্রোতের মুখে তাহার চলার গতিও অনেক বাড়িতে পারে। সামান্য একটি কলাগাছের ভেলায় করিয়া বহুদূর ভাসিয়া যাওয়া যায়। বাঁশ ও কাঠের খণ্ড জলে ভাসিয়া থাকে। ভাসমান বাঁশ, কাঠ ও গাছের ডাল একত্রে বাঁধিয়া, তাহার উপর



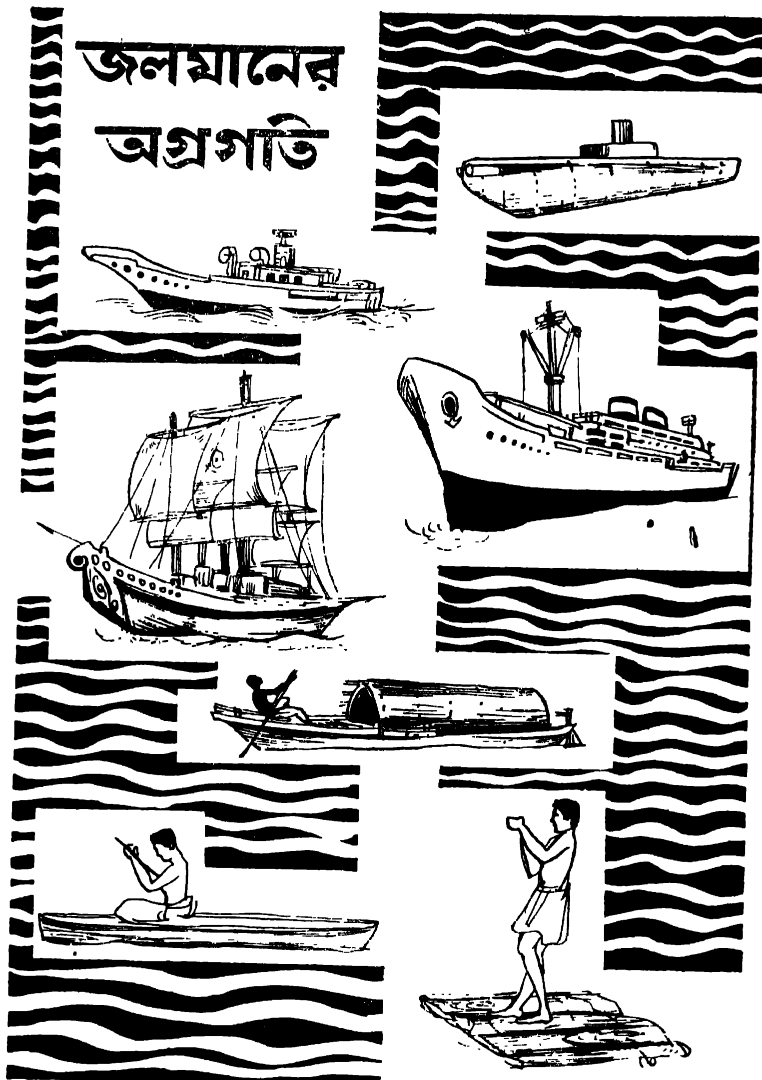
প্রায় ৫০০০ বছর আগেকার মাটির তৈরী চক্রযানের খেল্‌না ভারতের সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। উত্তরভারতে গোযানের চাকা এই আকারে আজও তৈরী হয়, কেবল তাহাতে 'পাখি' (স্পোক্) থাকে।

বসিয়া থাকিয়াও জলের উপর দিয়া যাওয়া যায়। মানুষের প্রাচীনতম জলযান হইল এইগুলি—ভেলা, কাঠ ও বাঁশের চালি, ফাঁপানো-ফুলানো পশুর চামড়া। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল তাহাদের অভিযানের পথে অনেক স্থানে এই ফাঁপানো চামড়ার ভেলায় করিয়া নদনদী পার হইয়াছিল। পূর্ব-ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ায় আজও জলপথে প্রাচীন ভেলা ও চালি দেখা যায়।

প্রাচীন নৌকা কয়েকটি কাঠের খণ্ডের সমাবেশ বলা চলে। ইহার চমৎকার নিদর্শন আজও আমাদের ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র-কূলে জেলেরা এই ধরনের কাঠের টুকরা জোড়া-দেওয়া নৌকায় করিয়া মাছ ধরে। পুরী, গঞ্জাম প্রভৃতি অঞ্চলে নুলিয়াদের মাছ ধরার নৌকা দেখিলে তাহা বোঝা যায়। তবে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন মনে হয় গাছের ডোঙ্গা বা ডিঙ্গি। যে-সব লম্বা গাছের খোল ফাঁপা, তাহা গুঁড়ি পর্যন্ত তুলিয়া মাঝখান হইতে চিরিয়া ফেলিলে ভাল ডোঙ্গা হইতে পারে। এই ধরনের তালগাছের ডোঙ্গা বাংলাদেশের জেলেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। ডোঙ্গা ছাড়া ছোট ছোট ডিঙ্গিও আছে, তৈরী করিতে কয়েকটি মাত্র কাঠের পাটা দরকার হয়। এই ডিঙ্গি খুব দ্রুতগতিতে জলের উপর দিয়া চলিতে পারে। ডোঙ্গা ও ডিঙ্গির পরে বহুরকমের নৌকা তৈরী হইয়াছে এবং শুধু ভারতবর্ষেই নদনদী ও সমুদ্রের উপযোগী এতরকমের নৌকা আছে যে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নৌকায় পাল ও দাঁড়ের ব্যবহারও বহু প্রাচীনকাল হইতে দেখা যায়। নৌকার পরে নানারকম সমুদ্রগামী পোতের বিকাশ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এইসব পোত আকারে খুব বড় ছিল না। কলম্বাস ১০০ টনের একটি পোতে করিয়া অতলান্তিক মহাসাগর পার হইয়াছিলেন ১০ সপ্তাহে। অষ্টাদশ শতাব্দাতে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারের ফলে পোত নির্মাণের অনেক উন্নতি হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে লোহার ব্যবহারের ফলে বড় বড় পোত নির্মাণেও কোন বাধা থাকে না। এই সময় হইতে বাষ্পীয় পোত (steam vessels) প্রধান জলযান হইয়া ওঠে।

স্থলযানের ক্রমবিকাশ

স্থলযান। চক্রযানের বিকাশের পর স্থলযানের বৈচিত্র্য বাড়িতে থাকে আসিরিয়া, মিশর ও প্রাচীন ভারতে এবং অশ্বচালিত নানারকম রথের

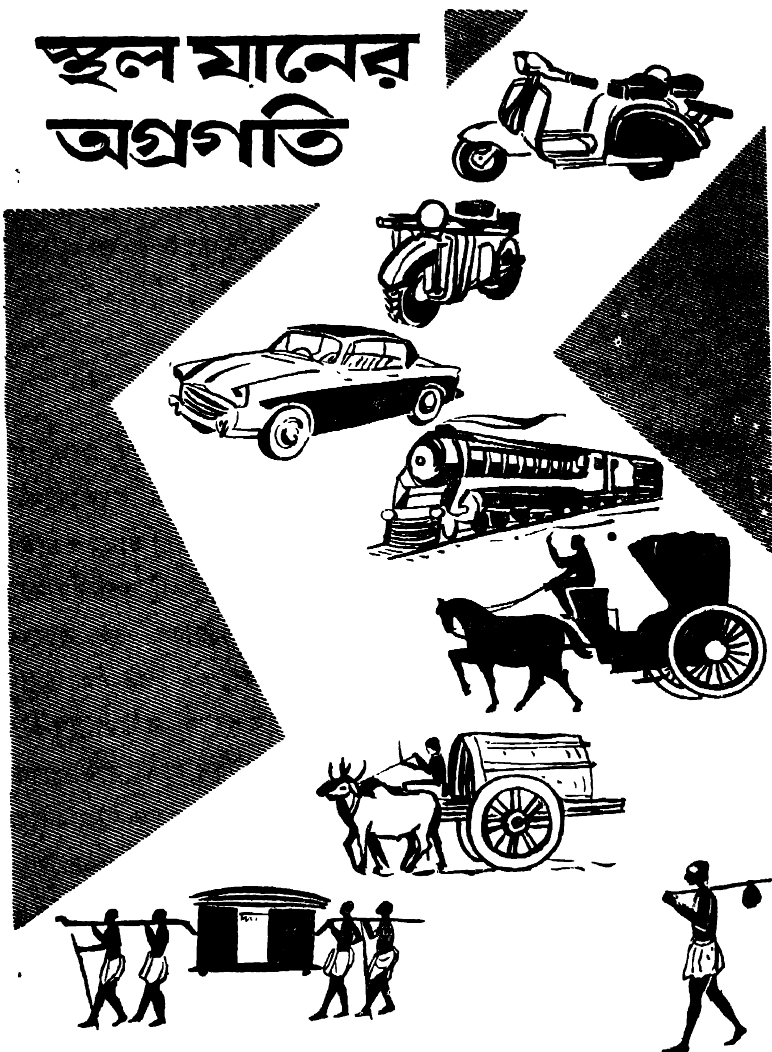


চালি বা ভেলা, ডিঙ্গি নৌকা পোত জাহাজ আধুনিক বাষ্পীয় জাহাজ

প্রচলন হয়। প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহে রথ ব্যবহার করা হইত। গরু, মহিষ ও উট-চালিত শকটের বিকাশ হইয়াছে প্রধানত এসিয়ায় ও আফ্রিকায়, কিন্তু অশ্বচালিত যানের বিকাশ হইয়াছে প্রধানত ইউরোপে। নানারকমের প্রাচীন ক্যারেজ, কার্ট ও ওয়াগনের মডেল ইউরোপের অনেক মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। প্রথমে চাকার উপরে ক্যারেজ পাটার উপরে মজবুত ও নীরেট করিয়া গড়া হইত, তাহাতে চলিবার সময় উপরের যাত্রীকে চাকার ওঠা-নামার প্রত্যেকটি আঘাত সহ্য করিতে হইত। পরে আণ্ডার-ক্যারেজের উপর ঝুলানো কোচ তৈরী করার কৌশল উদ্‌ভাবিত হইলে গাড়িতে পথ চলার কষ্ট যথেষ্ট কমিয়া যায়। প্রথম কোচগাড়ি তৈরী হয় হাঙ্গেরীতে, ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে। তারপর সমগ্র ইউরোপে তাহা ছড়াইয়া পড়ে এবং নানা আকারের গাড়ি তৈরী হইতে থাকে। লণ্ডনের রাস্তায় স্টেজ-কোচের প্রথম আবির্ভাব হয় ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহাতে করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াতেরও সুবিধা হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জন পামার (John Palmer) ইংলণ্ডে চিঠিপত্র বিলির জন্য ডাক-হরকরার বদলে সর্বপ্রথম অশ্ব-চালিত মেইল-কোচের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তারপর চলাচলের পথের উন্নতি হইতে থাকিলে এইসব অশ্বযানেরও দ্রুত উন্নতি হয়।

চলার পথের উন্নতি

চলার পথ। চলার পথ উন্নত না হইলে ভাল যানবাহন তাহার উপর দিয়া চলাচল করিতে পারে না। যেমন আজও গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে অনুন্নত পথের জন্য মোটর চলাচল করিতে পারে না। পথ নির্মাণের ইতিহাসে প্রাচীন যুগে প্রথমে রোমানদের কথা মনে পড়ে। রোমানরা বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বড় বড় পথ নির্মাণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহা হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত যানবাহনের দ্রুত চলাচলের উপযোগী পথঘাট নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। ইহা সম্ভব হয় জন লাউডন ম্যাকাডাম কর্তৃক (John Loudon Macadam, ১৭৫৬-১৮৩৬) পাথরকুচি-আলকাতরা দিয়া রাস্তার উপরাংশ বাঁধাইবার কৌশল উদ্‌ভাবিত হওয়ার পর। এই ম্যাকাডামের নামেই এই ধরনের রাস্তা বাঁধানোকে 'macadamising' বলে। এই বাঁধানো রাস্তাকে 'metalled road'-ও বলা হয়। বাঁধানো রাস্তা তৈরী হওয়ার পর মানুষের যানবাহনে করিয়া চলাচলের গতি ও



পায়ে হাঁটা, পালকি, গো-যান, অশ্ব-যান, লোকোমোটিভ
অটোমোবাইল, মোটর-সাইকেল, স্কুটার।

নিরাপত্তা অনেক বাড়িয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ইংলণ্ডে ও ইউরোপে এইভাবে বাঁধানো রাস্তা তৈরী হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে রাস্তার এই উন্নতির ফলে মানুষের চলার গতিও বাড়িয়া যায় এবং যানবাহনেরও দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। বাঁধানো পথের উপর নানারকম দ্রুতগতি অশ্বযানের আবির্ভাব হয়। পথের উপর লোহার রেল বসাইয়া অশ্বচালিত ট্রামগাড়িতে চলাচল আরম্ভ হয়। স্টীমইঞ্জিন আবিষ্কারের পরে রেলগাড়িতে চলাচল আরম্ভ হইলে মানুষের দূরত্বের সমস্যা অনেকটা সমাধান হইয়া যায়।

রেলগাড়ি ও ট্রামগাড়ি

রেলগাড়ি। রেলগাড়িও ট্রামগাড়ি চলিবার জন্য রেলপথের প্রয়োজন। লোহার রেলের উপর দিয়া ওয়াগন চালাইবার ব্যবস্থা প্রথমে কয়লাখনি ও পাথরখনিতে হয়। ওয়াগন ঠেলিয়া দিলেই রেলের উপর দিয়া চাকা গড়াইয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে করিয়া অনেকটা পরিমাণে কয়লা ও পাথর বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধরনের রেলপথের ব্যবহার ইউরোপের খনি-অঞ্চলে হইতে থাকে। এই সময় টমাস নিউকোমেন ও জেম্‌স ওয়াট স্টীমইঞ্জিনের নানারকম পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য হইতে থাকেন। রেলপথের উপর দিয়া প্রথম বাষ্পীয় যান চালানোর পরীক্ষা করেন রিচার্ড ট্রেভিথিক (Richard Trevithick—ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার, ১৭৭১-১৮৮৩) ১৮০৪ সালে। অশ্বচালিত ট্রামের জন্য নির্মিত রেলপথের উপর দিয়া এই পরীক্ষা করা হয়। ১৮১৪ সাল হইতে জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson—ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার, 'the father of the locomotive,' ১৭৮১-১৮৪৮) লোকোমোটিভ তৈরী করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারই প্রতিভাবলে বাষ্পীয় লোকোমোটিভের রেলপথে চলাচল সম্ভব হইয়া ওঠে। যানবাহনের ইতিহাসে লিভারপুল-ম্যাঞ্চেস্টার রেলপথকেই আধুনিক বাষ্পীয় লোকোমোটিভের প্রথম রেলপথ বলা হয়। এই রেলপথ খোলা হয় ১৮৩০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। তারপর উনিশ শতকের মধ্যে রেলপথ, রেলকোচ, লোকোমোটিভ ইত্যাদি নির্মাণের দ্রুত উন্নতি হয় এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে রেলগাড়িতে চড়িয়া মানুষ চলাচল করিতে থাকে।

ট্রামপথ ও ট্রামগাড়ি। ট্রামপথ ও ট্রামগাড়ি উদ্‌ভাবন করেন আমেরিকার একজন কোচ-কারিগর—নাম জন স্টিফেনসন (John Stephenson)। আমেরিকা হইতে ফ্রান্সে ১৮৫৫ সালে এবং ইংলণ্ডে ১৮৬০ সালে ট্রামের প্রচলন হয়। প্রথমে ট্রামগাড়ি রেলপথের উপর দিয়া ঘোড়ায় টানিত এবং সাধারণত একজোড়া ঘোড়া ব্যবহার করা হইত। ১৮৭০-৮০ সনের দিকে ট্রাম চালাইবার জন্য বাষ্পায় লোকোমোটিভের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে ট্রাম চলিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অনেক শহরে এই বৈদ্যুতিক ট্রামই ছিল মহানগরের অন্যতম যান। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ট্রামের ব্যবহার কমিতে থাকে এবং তাহার বদলে বৈদ্যুতিক 'ট্রলিবাসের' প্রচলন হয়। বর্তমানে এই ট্রলিবাসই ইউরোপ ও আমেরিকার শহর-নগরের সাধারণ যানবাহনের মধ্যে প্রধান।

অটোমোবাইল বা মোটরগাড়ি

মোটরগাড়ি। উনিশ শতকের শেষদিকে মোটরযানের নানারকম পরীক্ষা চলিত থাকে। প্রথমে তিনচাকার ও চারচাকার বাষ্প-নিয়ন্ত্রিত গাড়ি তৈরী করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহার কোনটাই বিশেষ সফল হয় না। স্পিরিট-চালিত মোটরগাড়ি প্রথম তৈরী করেন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ডেমলার (Gottlieb Daimler), ১৮৮৫ সালে। একই সময়ে আর একজন জার্মান কার্ল বেন্‌জ (Karl Benz) এই মোটরযান উদ্‌ভাবন করেন। এই গাড়ির মডেলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে মোটরযান নির্মাণ-শিল্পের দ্রুত বিকাশ হইতে থাকে। যদিও ইউরোপে মোটরগাড়ির উদ্ভব হয় তাহা হইলেও আমেরিকায় আধুনিক মোটরশিল্পের বিকাশ হইতে থাকে। আমেরিকায় মোটরশিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তি হইলেন হেনরী ফোর্ড। মোটরগাড়ি ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে তিনি প্রথম হইতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহার চেষ্টা সার্থক হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মোটরগাড়ির ব্যবহার মুষ্টিমেয় বিত্তবান লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং গাড়ির ইঞ্জিন ও ডিজাইনেরও খুব উন্নতি হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে মোটরশিল্পের ব্যাপক প্রসার হইতে থাকে এবং তাহার ব্যবহারও আগের তুলনায় বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মোটরশিল্পের

বিস্ময়কর উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছে এবং ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার শহরে-নগরে, এমন কি গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত মোটরের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে।

মোটরগাড়িকে বলা হয় auto-mobile, অর্থাৎ যাহা স্বতঃ (auto) গতিশীল (mobile)। স্বয়ংসম্পূর্ণ গতিশীল যান মোটরগাড়ি। বর্তমান যুগের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গতিশীলতার প্রতীক হইল এই অটোমোবাইল। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দগতি যদি কোন যান দান করিয়া থাকে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় মোটরগাড়িই সেই বিশিষ্ট যান। রেলগাড়িতে, ট্রামে-বাসে, জাহাজে, বিমানে মানুষের চলার গতি আছে, কিন্তু স্বাধীনতা নাই। যে-কোন ব্যক্তি তাহার মোটরে করিয়া যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, দুরন্ত গতিতে পথের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। অটোমোবাইলের প্রচলনের পরে মানুষের সামাজিক জীবনেও একটা বিপ্লব ঘটিযা গিয়াছে। শহর ও গ্রামের চিরন্তন ব্যবধান বাষ্পীয় রেলগাড়ি খানিকটা দূর করিয়াছিল, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে দূর করিতে পারে নাই। অটোমোবাইল তাহা করিয়াছে ও করিতেছে। মানুষের সমাজ-জীবনের ভিতরের সমস্ত ভৌগোলিক ব্যবধানের প্রাচীর অটোমোবাইল ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছে।

ব্যোমযান বা বিমান

বিমান। আকাশপথে উড়িবার কল্পনা মানুষ আদিকাল হইতে করিয়াছে। স্থলপথে চলিতে পারি, জলপথে ভাসিতে পারি, কিন্তু আকাশপথে পাখির মতো উড়িতে পারি না—ইহা চিরকালই মানুষের একটি বড় ক্ষোভের কারণ ছিল। সেইজন্য পৃথিবীর বহু রূপকথার কাহিনীতে রাজপুত্র ও রাজকন্যারা পাখির ডানায় ভর দিয়া আকাশে উড়িয়া গিয়াছে, এমন কি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া আকাশে উড়িতেও বাধে নাই। অবশ্য ইহা সাধারণ ঘোড়া নহে, পক্ষিরাজ ঘোড়া, পাখির মতো তাহার ডানা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন মহাকাব্যে যে পুষ্পকরথের বর্ণনা আছে তাহা প্রাচীন ব্যোমযান, তবে কবির কল্পনায় তাহার অস্তিত্ব ছিল, বাস্তবে কোন অস্তিত্ব ছিল না। সেই কল্পনার ব্যোমবান এতদিন পরে বিংশ শতাব্দীতে বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে।



পক্ষিরাজ ঘোড়া ও পুষ্পকরথের কল্পনা।
বেলুন—নানারকম বিমান-জেটবিমান ও স্পেস-শিপ।

ডানামেলা পাখির মতো দেখিতে শত শত বিমান আজ মানুষকে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষের চলার পথ ছিল দুইটি—স্থলপথ ও জলপথ। বিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় চলার পথ হইয়াছে—আকাশপথ।

বিমান কোন একজন ব্যক্তি একদিনে আবিষ্কার করে নাই। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া আকাশপথে চলিবার মতো ব্যোমযানের নানারকম পরীক্ষা চলিয়াছে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৩ সালে আকাশে উড়িয়া যাওয়ার ও নামিয়া আসার পরীক্ষা সফল হইয়াছে। ওহিওর বিখ্যাত রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (Wilbur Wright ও Orville Wright) প্রথমে চালক-নিয়ন্ত্রিত উড়িবার-নামিবার মতো বিমান নির্মাণে কৃতকার্য হন এবং ১৯০৩ সালে লোকের সামনে নিজেরা চালাইয়া তাহা প্রমাণ করেন। এই 'রাইট' ভাইদুইটির জন্য যে পরবর্তীকালে বিমানের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, অন্তত উন্নতির প্রেরণা পাওয়া গিয়াছে, বিমানের ইতিহাসের দিক হইতে তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিমানের ইঞ্জিনেরও গড়নের অনেক উন্নতি হয় এবং বৈমানিকেরা মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া আকাশপথে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সালে কুমারী অ্যামি জনসন একলা আকাশপথে বিমানে করিয়া ইংলণ্ড হইতে অস্ট্রেলিয়া উড়িয়া যান এবং ১৯৩২ সালে কুমারী আমেলিয়া নিউইয়র্ক হইতে একলা আয়ারল্যাণ্ড উড়িয়া যান নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ঘুরিয়া। ইনিই প্রথম মহিলা বৈমানিক যিনি একলা আকাশপথে অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করেন। ১৯৩৩ সালে উইলি পোস্ট নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া একলা আকাশপথে ৭ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসেন। বিমান যে সমস্ত পৃথিবীর দূরত্ব অতিদ্রুত কমাইয়া ফেলিবে তাহা উইলি পোস্টের সাতদিনে এই বিশ্বপর্যটন হইতে বোঝা গিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সকলরকম ব্যোমযানের আশ্চর্য অগ্রগতি হইয়াছে। জেট, কমেট প্রভৃতি বিমান সমগ্র বিশ্বপর্যটন ২৪-ঘণ্টার মধ্যে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। মহাসমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, মরুভূমি প্রভৃতি যাহা এতকাল পৃথিবীর একদেশের সহিত অন্যদেশের, একজাতির সহিত অন্যজাতির মিলন-মিশ্রণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছিল, আকাশযানে চলাচল আরম্ভ হইবার পর আজ তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে।

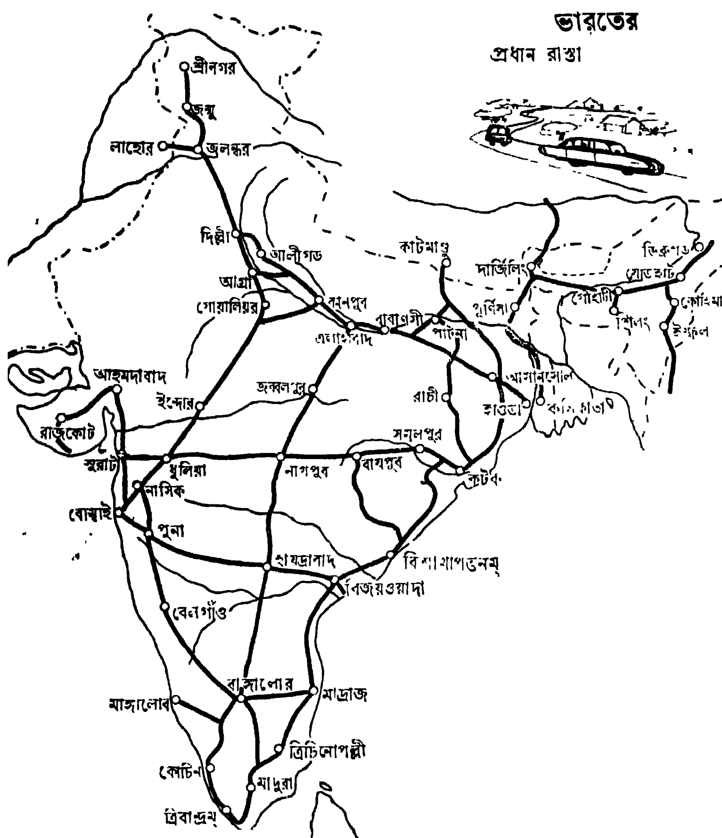
গ্রহান্তরে যাত্রা

পৃথিবী পর্যটন আজ মানুষ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে এবং মাত্র দুইতিন দিনের অবসরে তাহা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসাও অসম্ভব নহে। পৃথিবী একটি গ্রহ এবং সেই গ্রহের অধিবাসীরা আজ আকাশযানের কল্যাণে মানুষের কাছে একপাড়ার প্রতিবেশীর মতো কাছের মানুষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে মানুষের তৃপ্তি নাই। এই গ্রহের সমস্ত দূরত্ব জয় করিয়া এখন মানুষ নিঃসীম শূন্যতার ভিতর দিয়া গ্রহান্তরে যাত্রার চেষ্টা করিতেছে। ১৯৬০ সালের পরে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার চেষ্টায় এই গ্রহান্তরে যাত্রা প্রায় বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বৃত্তাকার ভূমণ্ডলের চতুর্দিক প্রদক্ষিণের কাজ শেষ হইয়াছে। বাকি আছে শুধু গ্রহান্তরে পদক্ষেপ করা এবং সম্ভব হইলে সেখানে লোকবসতি গড়িয়া তোলা। যে জটিল যন্ত্রযানে করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ ও গ্রহান্তরে যাত্রা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে. তাহাকে শুধু ব্যোমযান বা বিমান বলা যায় না, 'শূন্যযান' বলা যাইতে পারে। এই শূন্যযানে করিয়া অদূর ভবিষ্যতে মানুষ সমস্ত বায়ুস্তর ভেদ করিয়া অসীম শূন্যতার ভিতর দিয়া চন্দ্রলোক বা অন্য কোন গ্রহে যাত্রা করিবে। শূন্যযানের অগ্রগতি দেখিয়া আজ আর ইহা আকাশকুসুম বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের যানবাহন

অতীত ইতিহাস। ভারতের যানবাহনের মধ্যে সুদূর অতীতকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত সকলরকমের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের কাঁধে বহনের উপযোগী যান হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশপথে বিমান পর্যন্ত সবই আমাদের দেশে আছে। মানুষের কাঁধে বহনের যান হইল ডুলি ও পাল্‌কি। এই ডুলি ও পাল্‌কি ভারতের দীর্ঘকালের জনপ্রিয় লোক-যান। একশত বছর আগেও কলিকাতার মতো মহানগরে আজ যেখানে ট্রাম ট্যাক্সি ও বাস দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে শত শত পাল্‌কি ও পাল্‌কি-বেয়ারাদের দেখিতে পাওয়া যাইত। ইংরেজরাও এদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাল্‌কিতে চড়িয়া চলাফেরা করিয়াছেন। শহরে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ

ভারতের প্রধান পথঘাট



ভারতের বড় বড় পথগুলি বহু প্রাচীন
নূতন পথও অনেক তৈরী করা হইয়াছে
সমগ্র ভারতকে পথগুলি অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

লোকের চলাফেরা করিবার জন্য পাল্‌কিই ছিল প্রধান যান। পাল্‌কি ও তাহার বেয়ারাদের চেহারা দেখিলে বোঝা যাইত পাল্‌কির মালিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, না সাধারণ ব্যক্তি। ধনিকের পাল্‌কিতে বহু কারুকাজ করা থাকিত, ঝালর থাকিত, ভিতরে সাটিন ও ভেলভেটের গদি থাকিত এবং পাল্‌কির আকারও বেশ বড় হইত, দুইপাশের দাঁড়ও যথেষ্ট লম্বা থাকিত, চারজোড়া

ছয়জোড়া আটজোড়া বেয়ারার কাঁধ লাগাইবার জন্য। রাজা-মহারাজা ও বড় বড় বাবুরা এইসব বড় বড় বাহারে পাল্‌কিতে চড়িতেন, আটজন বারজন ষোলজন বেয়ারা তাহা হন্‌ হন্‌ করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইত, দুইপাশে মশালচিরা মশাল হাতে করিয়া দৌড়াইত, সঙ্গে হরকরাদেরও ছুটিতে হইত বাবুর বার্তা বহনের কাজের জন্য। পাল্‌কির ভিতরে বাবু বেশ আরামে হেলান দিয়া বসিতে পারিতেন, জায়গার অভাব হইত না। বাহির হইতে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারিত কোন বড়লোক বাবুর পাল্‌কি, সসম্ভ্রমে তাহারা পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইত।

সাধারণ দরিদ্র লোককেও পাল্‌কি চড়িতে হইত কিন্তু তাহার এত জাঁকজমক ছিল না। কাঠের পাটা দিয়া তৈরী একটি বাক্স, ভিতরে বসিবার স্থানেও তক্তা এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এত কম যে ভিতরে কোনরকমে হাঁটুর সহিত মাথা গুঁজিয়া বসা যায়। ডুলি আরও সাদাসিধা। একটি বড় ডাণ্ডার মাঝখানে ঝুড়িতে লোক বসাইয়া ঝুলাইয়া কাঁধে করিয়া বহন করিলে যাহা হয় তাহাই ডুলি, কেবল বাঁশের বা বেতের ঝুড়ির বদলে কাঠের একটি খোলা বাক্স থাকে মাত্র, কোথাও আবার খোলাও থাকে না। এইরকম ডুলি আজও পশ্চিমবঙ্গের সুদূর গ্রামের ভিতরে এক-আধটা হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যত্রও দেখা যায়। পাল্‌কির ব্যবহার কমিয়া গেলেও ভারতের গ্রামাঞ্চলে আজও তাহার ব্যবহার লোপ পায় নাই, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বরবধূর বাহন হিসাবে দেখা যায়। এই আদি অকৃত্রিম মনুষ্যবাহী যানটি বোধহয় ভারতীয় যানবাহনের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন।

পশুযানের মধ্যে গো-যান ভারতের অদ্বিতীয় লোকপ্রিয় যান এবং চক্রযানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার আমল হইতে, কি তাহারও আগে হইতে, ভারতজনের গো-যানে পথচলা আরম্ভ হইয়াছে, আজ আকাশযানের যুগেও তাহার শেষ হয় নাই। ভারতের গ্রামাঞ্চলে আজও এই গো-যানই পথচলার প্রধান যান। কোথাও গরুর বদলে মহিষ অথবা উট ইহা টানিয়া থাকে।

ভারতের নিজস্ব অশ্বযানও নানারকমের ছিল, এখনও আছে। সেকালের অশ্বচালিত রথ আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অশ্বযানের মধ্যে বেশী চলে 'একা' ও 'টঙ্গা'। মাথায় ঢাকনি আছে, কিন্তু চারিদিক খোলা

এবং সাধারণত একটি ঘোড়াতে টানিয়া থাকে। বাংলা-আসাম-উড়িষ্যা ছাড়া উত্তরভারতের অধিকাংশ শহর-নগরে ইহাই পথচলার অন্যতম যান। ঘোড়ার পাল্‌কিগাড়ি ও ফিটনের চল হইয়াছে পরে, ব্রিটিশ আমলে। এই ধরনের ঘোড়াগাড়ি প্রথমে ঠিক পাল্‌কির মতো করিয়া তৈরী করা হইত। বড় একটি পাল্‌কিকে মানুষের কাঁধ হইতে তুলিয়া, পিছনের দণ্ডটি কাটিয়া ফেলিয়া, ঘোড়ার সহিত জুতিয়া দিলে যাহা হয় তাহাই ব্রিটিশ আমলের এদেশীয় প্রথম ঘোড়াগাড়ি। পরে ইংলণ্ডে ও ইউরোপে প্রচলিত ডিজাইনের ল্যাণ্ডো, ফিটন প্রভৃতি নানারকমের ঘোড়াগাড়ি এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রধানত নূতন শহরের মধ্যেই এইসব ঘোড়াগাড়ির চলাচল সীমাবদ্ধ ছিল এবং পূর্বভারতে কলিকাতা শহরেই বেশী ছিল। উত্তরভারতে এক্কা ও টঙ্গাকে এই নূতন ঘোড়াগাড়ি স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

রেলপথ ও রেলগাড়ি। ভারতীয় রেলপথের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে ১৯৫৩ সালে। ১৮৪৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা সর্বপ্রথম ভারতে রেলওয়ে স্থাপনের কথা চিন্তা করিয়া এবিষয়ে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেলকে রিপোর্ট করিতে বলেন। গোড়াতে তাঁহাদের মনে নানারকমের সন্দেহ জাগিয়াছিল। ব্যবসা হিসাবে রেলওয়ে স্থাপন করিয়া মোটা মুনাফা করা সম্ভব হইবে কিনা, এইটাই ছিল বড় সন্দেহ। এইজন্য কয়েকটি কোম্পানি গঠন করিয়া তাঁহারা প্রথমে তিনটি ছোট ছোট রেলপথ স্থাপনের নির্দেশ দেন। সেই রেলপথগুলি এই—

কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ	।	১২০ মাইল
বোম্বাই হইতে কল্যাণ	।	৩৩ মাইল
মাদ্রাজ হইতে আর্কোনাম	।	৩৯ মাইল

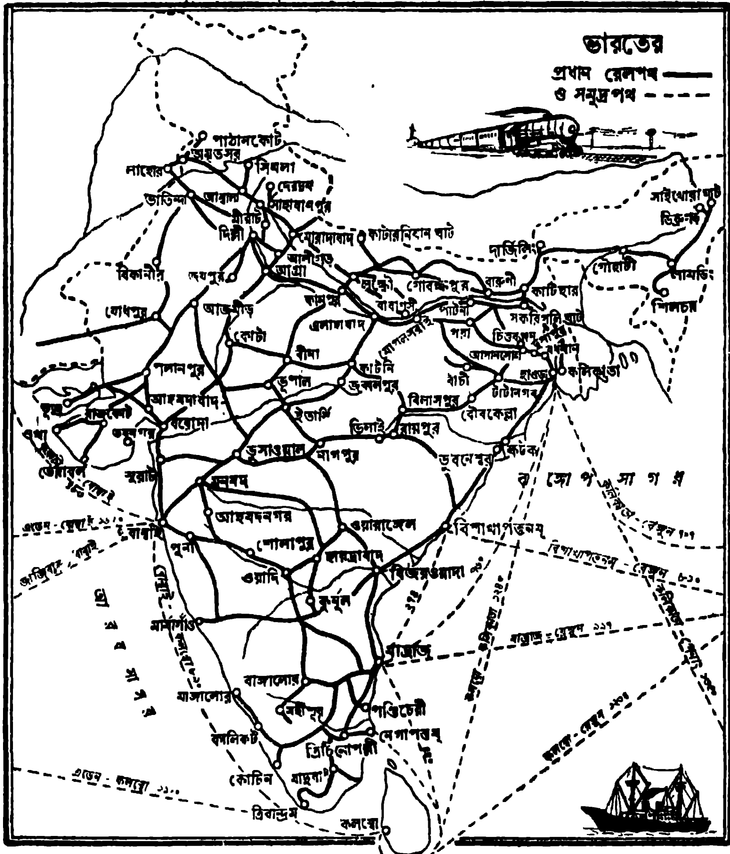
এই তিনটি রেলপথই ভারতের প্রথম রেলপথ। এই রেলপথ প্রথম চলাচলের জন্য খোলা হয় ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ডালহৌসি এই সময় (১৮৫৩) রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার উপকারিতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে পেশ করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৫৯ সালের মধ্যে ৮টি কোম্পানি গঠন করিয়া প্রায় ৫০০০ মাইল রেলপথ স্থাপনের আয়োজন করা হয়। ১৯০৫ সালের মধ্যে প্রায় ২৮,০৫৪ মাইল রেলপথ স্থাপন

করিয়া ভারতের প্রধান শহর-নগর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে (১৯৫৫-৫৬) ভারতের রেলপথ প্রায় ৩৬,০০০ মাইল। এসিয়ার মধ্যে ইহা দীর্ঘতম রেলপথ এবং পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান চতুর্থ। ১৯৬০ সালে ভারতের রেলপথে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০ লক্ষ যাত্রী এবং ৪ লক্ষ টন জিনিসপত্র বহন করা হইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ে ভারতের বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা মূলধন এই রেলওয়েতে খাটিতেছে এবং প্রায় ১২ লক্ষ লোক রেলওয়ের কাজকর্মে নিযুক্ত আছে, তাহাদের বেতন ও মজুরি বাবদ প্রায় ১৯০ কোটি টাকা খরচ হয়।

আগে প্রায় ৩৭টি বিভিন্ন রেলপথ ছিল ভারতবর্ষে। এই রেলপথগুলিকে ৮টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে—দক্ষিণভারত, মধ্যভারত, পশ্চিম-ভারত, উত্তরভারত, উত্তর-পূর্বভারত, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, পূর্বভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারত। ইহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র যথাক্রমে মাদ্রাজ, বোম্বাই (মধ্য ও পশ্চিমভারত), দিল্লী, গোরক্ষপুর, পাণ্ডু ও কলিকাতা (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারত)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় প্রায় ১১২১ কোটি টাকা রেলপথের বিস্তার ও উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে নূতন রেলপথ স্থাপন ও পুরাতন রেলপথ ডবল-লাইন করা ছাড়াও প্রায় ৮৮০ মাইল বৈদ্যুতিক রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় মোট ১২২০ কোটি টাকা (৮৯০ কোটি টাকা নূতন মূলধন+রেলওয়ের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিল হইতে ৩৩০ কোটি টাকা) রেলওয়ের উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭০ কোটি টাকা বৈদ্যুতিক রেলপথ বিস্তারের জন্য ব্যয় করা হইবে। ১৯৬০ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ৩৩০ মাইল বৈদ্যুতিক রেলপথ স্থাপন করা হইয়াছে।

ট্রামগাড়ি ও ট্রামপথ। কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান শহর ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও ট্রামগাড়ি নাই। ট্রামের কথা আগে বলা হইয়াছে। কলিকাতা শহরে প্রথমে গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় শিয়ালদহ হইতে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত প্রায় দেড়লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ট্রামলাইন স্থাপন করা হয়। ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এই লাইন ট্রামগাড়ি চলাচলের জন্য খোলা হয়, কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

ভারতের প্রধান রেলপথ ও সমুদ্রপথ—



ভারতের রেলপথ একশত বছরের কিছু বেশী

কিন্তু সমুদ্রপথ বহুকালের প্রাচীন পথ

সমুদ্রপথ বিশ্ববাণিজ্যের এবং রেলপথ জাতীয় অর্থনীতির সহায়।

তারপর ১৮৭৯ সালে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানি কর্পোরেশনের সহিত চুক্তি করিয়া নূতন ট্রামলাইন স্থাপন করেন এবং ১৮৮০ সাল হইতে তাহার উপর দিয়া ট্রামগাড়ি চলাচল করিতে থাকে।

প্রথমে ঘোড়াতেই ট্রাম টানিত। এদেশে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের জন্য ঘোড়া দিয়া ট্রাম টানানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিছুদিন বাষ্পীয় ইঞ্জিন

দিয়া চৌরঙ্গি অঞ্চলে ট্রাম টানার ব্যবস্থা হইল। দুর্গাপূজার সময় কালীঘাট পর্যন্ত স্টীম-ট্রামে যাত্রীদের বহন করা হইত। ১৯০২ সাল হইতে কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রচলন হয়। হাওড়া অঞ্চলেও ট্রাম আছে, কিন্তু তাহা একগাড়ির ট্রাম। কলিকাতার ট্রামে সাধারণত দুইটি করিয়া গাড়ি থাকে। শোনা যায় পৃথিবীর যে-সব শহরে ট্রাম আছে কলিকাতার ট্রাম তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

অন্যান্য যানবাহন। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব হইতে বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত শহরের যান্ত্রিক যানবাহনের মধ্যে এই ট্রামই ছিল অন্যতম। ট্রাম ছাড়া যাতায়াতের জন্য লোকে ঘোড়াগাড়ি ব্যবহার করিত বেশী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ধীরে ধীরে মোটর বাসের চল হইতে থাকে। বর্তমানে এই মোটরবাসই কেবল শহরে নহে, শহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলেও চলাচলের প্রধান যান। ইহা ছাড়া শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সাইকেলেও বহুলোক যাতায়াত করে। বর্তমানে মোটর-সাইকেল ও স্কুটারের সংখ্যা শহর অঞ্চলে বাড়িতেছে এবং বাই-সাইকেল গ্রামের দিকে অনেক বেশী কাজে লাগিতেছে। অটোমোবাইলের মধ্যে মোটরবাস ছাড়া ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়িতেও অনেক লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। মোটরযানের প্রাধান্য বর্তমান ভারতে যে কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা গত ১০ বছরে ইহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে বুঝিতে পারা যায়। ১৯৫১ সালে ভারতে মোটরযানের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ, ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৬ লক্ষ হইয়াছে।

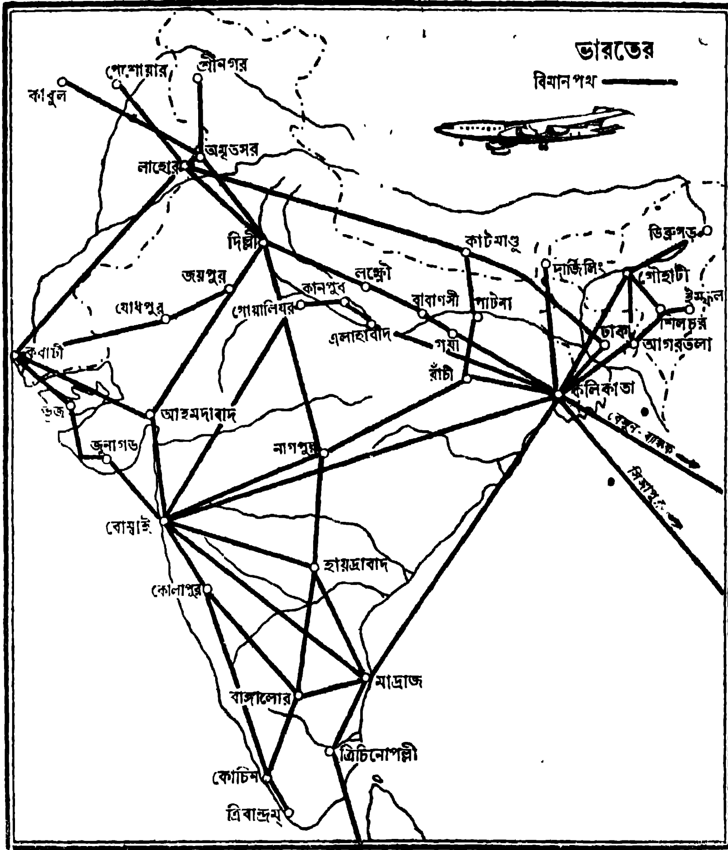
পথঘাট। মোটরযানের প্রসারের জন্য পথঘাটও যথেষ্ট উন্নত ও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। গত ১০ বছরে ভারতের পথঘাটেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতে পাকা বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ৯৮,০০০ মাইল, ১৯৫৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ইহা প্রসারিত করিয়া ১৪৪,০০০ মাইল করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য বড় বড় জাতীয় সড়ক বা সরণি (national highway) নির্মাণ করা হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে মোটরযানে চলাচল আরও অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে শহরের সহিত গ্রামের এবং দূর অঞ্চলের সহিত সুদূর অঞ্চলের ব্যবধান যথেষ্ট পরিমাণে দূর হইয়া যাইবে।

ভারতের জলযান। ভারতের প্রাচীন জলযানের মধ্যে ডিঙ্গি, পানসি, কাটামারান, নৌকা ও বজরার বৈচিত্র্য অন্তহীন বলা চলে। এইসব জলযানে আজও ভারতের অধিকাংশ লোক দেশের ভিতরে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করে এবং বহু পণ্যদ্রব্য ইহাতে বাণিজ্যের জন্য বহন করা হয়। নৌকা ছাড়া স্টীমার-সার্ভিসও অনেক জায়গায় আছে। বড় বড় নদীপথে যাত্রী ও পণ্য বহনের জন্য স্টীমার ও মোটরলঞ্চ চলাচল করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ নদনদীবহুল দেশ বলিয়া দেশের ভিতরে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য জলপথের এবং এই সমস্ত জলযানের আজও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।

বড় বড় জাহাজ নির্মাণে ভারতের নৈপুণ্য বিদেশীদেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। বিশাখাপত্তনে 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডে' বড় বড় জাহাজ তৈরী হইতেছে। সমুদ্রপথে বাহিরের রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য এইসব জাহাজে চলাচল করা হয়। 'ইস্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন' ভারত-অস্ট্রেলিয়া, ভারত-সিঙ্গাপুর ও ভারত-পূর্বআফ্রিকার মধ্যে জলপথে জাহাজে যোগাযোগ ও যাতায়াত পরিচালনা করে। 'ওয়েস্টার্ন শিপিং কর্পোরেশন' ভারত-পারস্য উপসাগর, ভারত-লোহিত সাগর, ভারত-পোল্যাণ্ড ও ভারত-সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। জলপথে ভারতের সহিত সারা পৃথিবীর যোগাযোগ আছে এবং এই যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিদেশী জলযানের সহিত ভারতীয় জলযানও সমুদ্রপথে চলাচল করিয়া থাকে।

ভারতের ব্যোমযান বা বিমান। গত ২০-২৫ বছরের মধ্যে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে ভারতের আকাশপথে বিমান চলাচলের দ্রুত বিকাশ হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান বিমান-নির্মাণ কারখানায় সেনাবাহিনীর ও যাত্রীদের উপযোগী নানারকমের বিমান তৈরী হইতেছে। ১৯৪৭ সালে প্রায় ৯৩ লক্ষ মাইল ভারতীয় আকাশপথে বিমান চলাচল করে এবং তাহাতে প্রায় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার যাত্রী যাতায়াত করে। মালপত্র বহন করা হয় প্রায় ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড এবং চিঠিপত্র প্রায় ১৪ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৬০ সালে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল ভারতের আকাশপথে বিমান চলাচল করে এবং যাত্রীর সংখ্যা হয় প্রায় ৮ লক্ষ ২৪ হাজার।

ভারতের বিমানপথ—ঘরে ও বাহিরে



ভারতের বিমানপথগুলি ঘরে-বাহিরে
বিশাল জালের মতো বিস্তারলাভ করিতেছে
কিন্তু আকাশের এই পথগুলি চোখে দেখা যায় না।

মালপত্র বহন করা হয় প্রায় ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ পাউণ্ড এবং চিঠিপত্র ১ কোটি ৪৬ লক্ষ পাউণ্ড। গত ১২-১৩ বছরে বিমানপথে যাত্রীর সংখ্যা ভারতের ভিতরে প্রায় চারগুণ বাড়িয়াছে. মালপত্র বহন বাড়িয়াছে প্রায় তেরগুণ এবং চিঠিপত্র প্রায় দশগুণ। ভারতের যানবাহনের মধ্যে বিমানের প্রাধান্য যে ক্রমেই বাড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশন' ভারতের ভিতরে এবং 'এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল' ভারতের

বাহিরে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় বিমান ও বৈমানিকের সুনাম আজ পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতে বিমান চলাচল-ব্যবস্থার যে ক্রমোন্নতি হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভারতের যোগাযোগ-ব্যবস্থা

যোগাযোগ-ব্যবস্থার (communication) মধ্যে প্রধান হইতেছে ডাক ও তার (post and telegraph)। ১৮৩৭ সালের আগে ভারতবর্ষে ডাকযোগে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের সুপরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে ডাক-হরকরারা রাজার সংবাদ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইত। দৌড়াইয়া অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া তাহাদের যাইতে হইত। পথের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে হরকরাদের



হাজার হাজার ডাকঘর ভারতের যোগাযোগ-ব্যবস্থা রক্ষা করিতেছে

অপেক্ষা করিতে হইত এবং একজনের কাছ হইতে চিঠিপত্র লইয়া আর-একজন ছুটিতে আরম্ভ করিত। ২০০ মাইল পথের মধ্যে হয়ত ২০ মাইল অন্তর ৯ জন হরকরা থাকিত এবং একজন তাহার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইলে দ্বিতীয়জন

সেখান হইতে দৌড়াইতে আরম্ভ করিত। এখনও গ্রামাঞ্চলে চিঠিপত্র লইয়া পিয়নদের নির্দিষ্ট সময়ে ডাকগাড়ি ধরাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। সেকালের এই হরকরারা রাজা-রাজড়াদের বার্তা বহন করিত, সাধারণ লোকের তাহাতে কোন সুবিধা হইত না। ব্রিটিশ আমলেও বেশ কিছুদিন সেকালের এই ব্যবস্থানুযায়ী ডাক-হরকরারা সরকারী সংবাদ ও চিঠিপত্র স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিত।

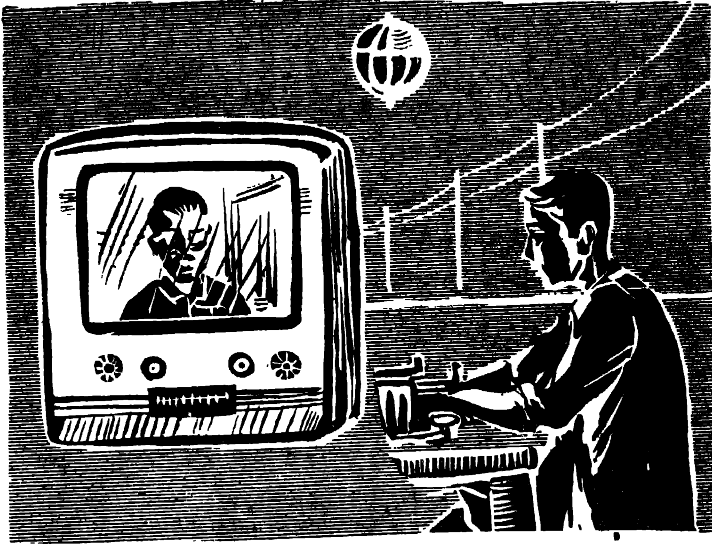
১৮৩৭ সালে নূতন একটি অ্যাক্ট পাস করিয়া 'পাবলিক পোস্ট' বা সাধারণ ডাকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত রাজ্যে ডাকখরচ দিলে সাধারণের জন্য চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়। বড় বড় শহরের পোস্টমাস্টাররা প্রাদেশিক ডাকঘরগুলি তদারক করিতেন এবং দূরের যোগাযোগ-ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করিতেন। জেলার কলেক্টররা বিভিন্ন জেলার ডাকঘর ও স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। তখন চিঠিপত্রের খরচ ছিল যথেষ্ট, কাজেই সাধারণ লোক এই ব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত হয় নাই। কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত একতোলা ওজনের একটি চিঠি পাঠাইতে একটাকা খরচ হইত এবং কলিকাতা হইতে আগ্রা পর্যন্ত এই চিঠি পাঠাইবার খরচ ছিল বারো আনা।

১৮৫৪ সালে নূতন অ্যাক্ট পাস করিয়া (Indian Postal Act, 1854) আধুনিক ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। একজন ডিরেক্টর-জেনারেল ও কয়েকজন পোস্টমাস্টার-জেনারেলের অধীনে ডাকবিভাগের কার্যকলাপ চলিতে থাকে। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয় এবং দূরত্ব অনুযায়ী বেশী ডাকখরচও আর দিতে হয় না। দেশের মধ্যে যে-কোন স্থানে নির্দিষ্ট ডাকখরচে চিঠিপত্র পাঠাইবার সুবিধা হয়। ১৮৫৪ সালের পর ১৮৬৬ সালে ও ১৮৯৮ সালে পোস্টাল অ্যাক্ট সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। ১৮৯৮ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী পোস্টাল ইনসিওরেন্স, ভি. পি., মনিঅর্ডার ইত্যাদির ব্যবস্থার ফলে সাধারণের অনেক সুবিধা হয়।

বর্তমানে রেলওয়ের পরে পোস্ট-টেলিগ্রাফ বিভাগ ভারতের প্রধান রাষ্ট্রীয় বিভাগ। ১৯৬০ সালে প্রায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার লোক এই বিভাগের নানারকম কাজকর্মে নিযুক্ত ছিল। ১৯৫০-৫১ সালে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ হাজার, ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা হইয়াছে প্রায় ৭১ হাজার। গত ১০ বছরের মধ্যে ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী

ডাকঘর মিলাইয়া ১৯৫১ সালে শহরাঞ্চলে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ৫ হাজারের কিছু বেশী, গ্রামাঞ্চলে ছিল প্রায় ৩১ হাজার। ১৯৬০ সালে (৩১ মার্চ পর্যন্ত) ডাকঘরের সংখ্যা বাড়িয়া শহরাঞ্চলে হয় ৭ হাজারের কিছু বেশী, গ্রামাঞ্চলে হয় প্রায় ৬৩ হাজার। ১৯৬০ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৩৪৬৪টি নূতন ডাকঘর খোলা হইয়াছে। যোগাযোগের বিস্তারে শুধু শহরের দিকে নহে, গ্রামের দিকেও যে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে তাহা ডাকঘর ও ডাকবাক্সের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। ১৯৫১ সালে গ্রামাঞ্চলে ডাকবাক্সের সংখ্যা ছিল ৬১ হাজারের কিছু বেশী, ১৯৬০ সালে (৩১ মার্চ) এই সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে ১ লক্ষের বেশী। আগে দেশের মধ্যে প্রধানত রেলপথেই ডাক বহন করা হইত, এখন দূরের ডাক কতকটা আকাশপথে বিমানে বহন করা হয়। কলিকাতা হইতে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে একদিনে চিঠি পাওয়া যায়। একশত বছর আগেও একটি গ্রামের সহিত অন্য গ্রামের যোগাযোগ রক্ষা করা এক মহাসমস্যা ছিল। এখন হাজার মাইল দূরের শহরের সহিতও একদিনে চিঠিপত্রে এবং কয়েক ঘণ্টায় প্রত্যক্ষভাবে নিজে যাইয়া অথবা টেলিফোন-টেলিগ্রাফ করিয়া যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

টেলিগ্রাফ। 'টেলিগ্রাফ' বলিতে এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বোঝায়। আগে 'সেমাফোর-কৌশলে (Semaphore) বার্তা প্রেরণ করা বুঝাইত। সেমাফোর একরকমের সিগনাল-পদ্ধতি, রেলওয়ে-সিগনাল আজও তাহার নিদর্শনরূপে রহিয়াছে। অক্ষর ও সিগনাল সংখ্যা দিয়া বুঝানো হইত। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কারের পর ইহা প্রায় লোপ পাইয়াছে। আমাদের দেশে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও অ্যাসিসট্যান্ট-সার্জেন ডক্টর ও'শঘনেসি (Dr. W. B. O'Shaughnessy)। ১৮৫১ সালে তিনি কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার, বিষ্ণুপুর হইতে মায়াপুর এবং হুগলিনদীর ওপারে কুকরাহাটি হইতে খেজুরি পর্যন্ত প্রায় ৮২ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন এবং প্রধানত জাহাজের খবরাখবরের জন্য এই বছর হইতেই এই লাইনে বার্তা প্রেরণ আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ সালে প্রথম ভারতের টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট পাস করা হয় এবং পরে ১৮৬০, ১৮৭৬ ও ১৮৮৫ সালে ইহার সংস্কার ও সংশোধন করা হয়।



টেলিগ্রাফ-টেলিভিজন

বর্তমানে টেলিগ্রাফ লাইন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ভারতে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষে ৮ হাজারের কিছু বেশী টেলিগ্রাফ আফিস ছিল, ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা ১১ হাজারের কিছু বেশী হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে টেলিগ্রাফ হইতে আয় হইয়াছিল ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, ১৯৫৯-৬০ সনে এই আয় বাড়িয়া হইয়াছে ৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে মোট টেলিগ্রামের সংখ্যা হয় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টেলিগ্রাম ভারতের ভিতরের এবং বাকি ৪১ লক্ষ টেলিগ্রাম বিদেশের। যোগাযোগের তাগিদ যে আমাদের সমাজে কত দ্রুত বাড়িতেছে তাহা টেলিগ্রামের এই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

টেলিফোন। আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ সালে সর্বপ্রথম টেলিফোন পেটেন্ট করিয়া আমেরিকায় নূতন যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। তারপর ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধীরে ধীরে ইহার বিস্তার হইতে থাকে। বর্তমান শতকের প্রথম পর্বের মধ্যে অধিকাংশ দেশেই টেলিফোন প্রচলিত হয় এবং দূরে অবস্থিত ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ



যোগাযোগ স্থাপনে ইহা অন্যতম মাধ্যম হইয়া ওঠে। আমাদের দেশেও টেলিফোনের চাহিদা দ্রুত বাড়িতে থাকে, বিশেষ করিয়া বড় বড় শহরে। ১৯৫০-৫১ সালে আমাদের দেশে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৮ হাজার, এবং টেলিফোন-এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ছিল ৩৭০০। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা যথাক্রমে বাড়িয়া হয় ৪ লক্ষ ২৪ হাজার এবং ৭২৮২। টেলিফোনের চাহিদা ক্রমে এত বাড়িতেছে যে টেলিফোন-বিভাগ অনেক সময় তাহা মিটাইতে পারেন না। বর্তমানে বড় বড় শহরে 'অটোমেটিক টেলিফোন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফোনোগ্রাম। 'টেলিফোন' ও 'টেলিগ্রাম' নাম দুইটির শেষাংশ লইয়া 'ফোনোগ্রাম' কথাটি হইয়াছে। অর্থাৎ টেলিফোন করিয়া টেলিগ্রাম করা ও পাওয়ার ব্যবস্থাকে 'ফোনোগ্রাম' বলে। বাড়িতে টেলিফোন থাকিলে এখন আর টেলিগ্রাম করিবার জন্য কোন টেলিগ্রাফ আফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, টেলিফোন করিয়া বার্তাটি জানাইয়া দিলে কাজ হইয়া যায়। ঠিক তেমনি যাঁহার টেলিফোন আছে তাঁহার নামে কোন টেলিগ্রাম আসিলে আফিস হইতে টেলিফোন করিয়া তাহা জানাইয়া দেওয়া হয়, কোন পিয়ন পাঠাইবার দরকার হয় না।

বৈদেশিক যোগাযোগ। বিদেশের যে-কোন রাষ্ট্রের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার জন্য এবং নানারকমের বার্তা আদান-প্রদানের জন্য একাধিক ব্যবস্থা আছে। যেমন—

রেডিও-টেলিফোন সার্ভিস
রেডিও-টেলিগ্রাফ সার্ভিস
রেডিও-ফটো সার্ভিস

ভারতের সহিত বাহিরের অনেক দেশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে রেডিও-টেলিফোনে। যেমন অস্ট্রেলিয়া, বর্মা, চীন, পূর্ব-আফ্রিকা, ঈজিপ্ট, ফ্রান্স, জার্মানি, ইরান, ইরাক, ইটালি, জাপান, ইংলণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি। ইহা ছাড়া আরও ৫১টি দেশের সহিত লণ্ডন মারফত রেডিও-টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। যেমন আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, কানাডা, আমেরিকা, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, নরওয়ে, সুইডেন, স্পেন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি। ইহা ছাড়া এইসব দেশের সহিত রেডিও-টেলিগ্রাফ ও রেডিও-ফটো সার্ভিসেরও ব্যবস্থা আছে।

যানবাহন ও সমাজ-জীবন

ভারতের যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা হইতে আমাদের সামাজিক জীবনের অগ্রগতির ধারা সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। গো-যান, এমন কি আদিমতম নর-যান (পাল্‌কি, ডুলি) পর্যন্ত, আজও ভারতের গ্রামাঞ্চল হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কলিকাতার মতো মহানগরে আজও রিকশাগাড়ি মানুষে টানিয়া থাকে। মানুষকে মানুষ বহিয়া লইয়া যায়, ইহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিশ্চয় বর্বর বলিয়া মনে হইবে। বাস্তবিকই ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বর্বর ব্যবস্থা। যখন ভারতের আকাশপথে ভাইকাউণ্ট, জেট, কমেট প্রভৃতি অত্যাধুনিক বিমান উড়িতেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই বিমানে করিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিতেছে; ভারতের স্থলপথে যখন বিশাল বিশাল যান্ত্রিক সরীসৃপের মতো অটোমোবাইল চলিতেছে, বৈদ্যুতিক ট্রেন যাতায়াত করিতেছে, তখন শহরে মানুষে-টানা রিকশা এবং গ্রামে মানুষের কাঁধে পাল্‌কি ও ডুলি অসম্ভব আকালিক (anachronism) বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পথের উপরেও আজ যে আমাদের পাঁচ হাজার বছর আগেকার এই দৃশ্য

দেখিতে হইতেছে তাহার প্রধান কারণ ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের জন্যই গ্রামে যাহারা পাল্‌কি-ডুলি বহিত এবং শহরে আজও যাহারা রিকশা টানে তাহারা এই চিরকালের বহনের কাজ ছাড়িতে পারে নাই। কিন্তু আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার শিষ্টতা ও মানবিকতার দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় যে আইন করিয়া হইলেও ইহা ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

আশা করা যায় এই দৃশ্য আর বেশীদিন দেখিতে হইবে না এবং যানবাহনের ক্ষেত্র হইতে এই উদ্ভট আকালিকতা অচিরেই অদৃশ্য হইবে। গত একশত বছরের মধ্যে ভারতের যানবাহনের যে বিস্তার ও বৈচিত্র্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা জাপান ছাড়া এসিয়ার আর কোন দেশে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। চলাচলের সকল পথেই ভারতে আজ সর্বপ্রকারেব সর্বাধুনিক যানবাহনে লোকজন যাতায়াত করিতেছে। ডাক-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ-ব্যবস্থাও ভারতে আজ যথেষ্ট উন্নত ও প্রশস্ত। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল ১৯৫০-৫১ সালের পর হইতে গত দশ-বারো বছরের মধ্যে ভারতের যানবাহন ও যোগাযোগের অতিদ্রুত ব্যাপক বিস্তার হইয়াছে। সমাজ-জীবনে কাজকর্মের ও চলাফেরার গতিবেগ না বাড়িলে যানবাহন-যোগাযোগের এই দ্রুত বিস্তার সম্ভব হইত না। সমাজের গতিশীলতা ও কর্মমুখরতা মানুষের চলাচল ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। গত দশ-বারো বছরের মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে তাহারই প্রভাবে যানবাহন ও যোগাযোগের এই বিস্তার ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

বিশেষ প্রাকৃতিক অঞ্চলের যানবাহন

এইবার আমরা কয়েকটি বিশেষ প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিশিষ্ট যানবাহনের কথা বলিব। যেমন মরুভূমি অঞ্চলে, তুষারাবৃত শীতপ্রধান মেরু অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল। সমতল দেশে সাধারণ লোকে যে-সমস্ত যানবাহন ব্যবহার করে, এইসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির জন্য তাহা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যে সমস্ত পশু সমতলভূমিতে বোঝা বহন করিতে পারে তাহাদের দিয়া পাহাড়-পর্বতে, মরুভূমিতে বা মেরু অঞ্চলে বোঝা বহন করানো কঠিন।

এই তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে তিন-চারটি জীবকে ভারবহনের বিশেষ উপযোগী দেখা যায়। এই জীবগুলি হইল—

মরুভূমি অঞ্চলে । উট ও গাধা
মেরু অঞ্চলে । কুকুর ও বল্গাহরিণ
পার্বত্য অঞ্চলে । অশ্বতর ও টাট্টু ঘোড়া

এই কয়েকটি জীব ছাড়া ছাগল-ভেড়া-গরুরও ভারবহনের ক্ষমতা আছে।

মরুভূমির বাহন

মরুভূমির বাহন। অতলান্তিক মহাসাগরের কোল হইতে নীলনদের তীর পর্যন্ত উত্তর-আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমি বিস্তৃত। নীলনদ হইতে পূর্বদিকে আরব, মেসোপোতামিয়া ও পারস্যের ভিতর দিয়া মরু অঞ্চলের ধারাবাহিক বিস্তার হইয়াছে। তারপর বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর মরুতুল্য নীরস ভূমির উপর দিয়া গিয়া রাজপুতানার বৃহৎ থর মরুভূমিতে এই ধূসর বালুকা-রাজ্যের শেষ হইয়াছে। একদিকে শেষ হইয়াছে, কিন্তু আর-একদিকে থর মরুভূমির উত্তরপূর্বে হিমালয় পার হইয়া তিব্বতের বিস্তীর্ণ অনুর্বর মালভূমি, মোঙ্গলিয়ার গোবি মরুভূমি এবং মধ্যএসিয়ার অন্যান্য সব পতিত ভূমি। মরুভূমি অঞ্চল দক্ষিণ-আফ্রিকা ও আমেরিকাতেও আছে। মরুভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের উদাস নিষ্ঠুর রিক্ততা সর্বত্র একরকম, এসিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই বিস্তৃত মরু অঞ্চলে চলাফেরা করিবার এবং নানারকম পণ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র বহন করিবার উপায় কি?

উপায় প্রকৃতিই যেন মানুষের জন্য উদ্ভাবন করিয়াছেন মনে হয়। এমন একটি জীব তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন যে জীবটি এই নির্জলা শূন্য মরুভূমিতে মানুষের একমাত্র সঙ্গী ও সকলরকমের বাহন হইবার উপযোগী। এই বিশেষ জীবটি হইল—উট। চারখানি পা ও গলাটি যথাসম্ভব দীর্ঘ, পিঠে উন্নত কুঁজ, দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। আকাশমুখী চোখমুখে এমন একটি উদাস ভাব আছে যাহার সহিত কেবল মরুভূমিরই নির্মম ঔদাস্যের মিল হইতে পারে। দেখিলে মনে হয় যেন কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। দিগন্তবিস্তৃত ধূ ধূ মরুভূমিব উপর মরুযাত্রীকে পিঠে করিয়া উট যখন তাহার দীর্ঘ পা ফেলিয়া, লম্বা গলা প্রসারিত করিয়া চলিতে থাকে তখন মনে হয় বালুর সমুদ্রের উপর দিয়া যেন একটি জীবন্ত জাহাজ ভাসিয়া চলিয়াছে।



মরুভূমির মরুপোত 'উট'

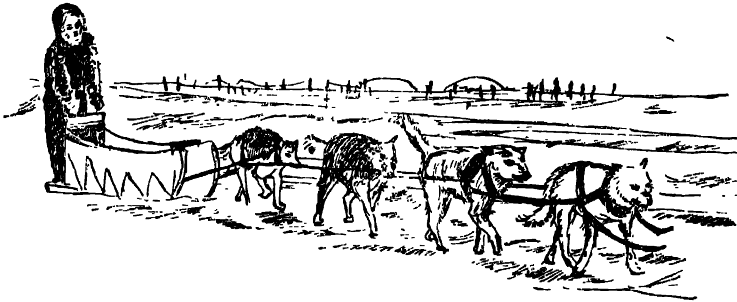
উটকে 'বালুকাপোত' (desert-ship) বলা হয়। ঠিকই বলা হয়, কারণ হাজার হাজার বছর ধরিয়া এই যানবাহনশূন্য মরুভূমিতে উটই মানুষের একমাত্র যান ও বাহনের কাজ করিয়াছে। আজও উটের বোঝা-বহনের কাজ শেষ হয় নাই। বৈজ্ঞানিক যুগে মরুপথে অটোমোবাইল চলিতেছে, মরু-বুকের উপর দিয়া বিমান যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু তবু উট না থাকিলে মরু অঞ্চলে বহনের কাজ বন্ধ হইয়া জীবন অচল হইয়া যাইবে। বাণিজ্যের পণ্য ও বণিকদের পিঠে লইয়া শত শত উটের ক্যারাভান আজও মরুভূমির পথের উপর দিয়া চলিয়া থাকে। মরু অঞ্চলের এই জীবন্ত যানটিকে আজও কোন যান্ত্রিক যান স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। মরুভূমির উপর দিয়া চলিবার উপযোগী যান্ত্রিক যান যে নাই তাহা নহে, কিন্তু ঠিক উটের মতো একটি জীবন্ত যানের বিকল্প কোন যান আজও চোখে দেখা যায় না। উত্তর-আফ্রিকা হইতে আরব, পারস্য, রাজপুতানা ও উত্তরভারত এবং গোবি মরুভূমির উপর দিয়া চীনের সীমান্ত পর্যন্ত চলাচলের বাহনরূপে আজও উট অপরিহার্য।

মেরু অঞ্চলের বাহন

মেরুবৃত্তের মধ্যে সুদূর উত্তর-ইউরোপ, সাইবেরিয়া, আলাস্কা, উত্তর-কানাডা, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি যে-সব অঞ্চল আছে সেখানে শীত ও

তুষারের প্রকোপ এত প্রচণ্ড যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বসবাস ও জীবনধারণ করাই দুরূহ। স্বচ্ছন্দে চলাচল করিবার কথা চিন্তাই করা যায় না। জমাটবাঁধা তুষারবক্ষ হইল সেখানকার চলাচলের ক্ষেত্র। শুধু নীরেট তুষারক্ষেত্র হইলেও কথা ছিল না। এই তুষারের উপর দিয়া যখন প্রবলবেগে ঝড় বহিতে থাকে তখন কোন ধূলিকণা ওড়ে না, বরফের কণা ও টুকরা উড়িতে থাকে। হিমশীতল তুষারপথে মেরুবাসীদের এই তুষারঝটিকার ভিতর দিয়া জীবিকা ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চলাচল করিতে হয়। চলাচলের জন্ম যানবাহনও প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই যানই বা কিরকম এবং তাহার বাহনই বা কোন্ জীব? সাধারণ বাষ্প ও বিদ্যুৎ-চালিত যানে যেখানে চলা প্রায় অসম্ভব, সেখানে কোন জীবের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নাই। এই জীব হইল—বল্‌গাহরিণ ও কুকুর।

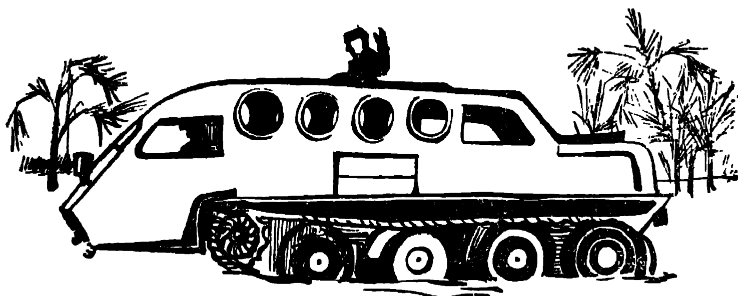
মেরু অঞ্চলের প্রধান যান হইল—স্লেজগাড়ি। এই স্লেজ একরকমের চক্রহীন তুষারযান। মেরু-সাইবেরিয়া ও উত্তর-ইউরোপে এই স্লেজগাড়ি প্রধানত



মেরু অঞ্চলে কুকুরে স্লেজ টানে

বল্‌গাহরিণে টানিয়া থাকে। অন্যান্য মেরু অঞ্চলে—যেমন আলাস্কা, উত্তর-পশ্চিম কানাডা ও গ্রীনল্যাণ্ডে—'হাস্কি' নামে একরকমের অর্ধবন্য কুকুরে স্লেজ টানে। তুষারের উপর দিয়া এই কুকুরের দৌড়াইবার ক্ষমতা খুব বেশী। কুকুরের সহিত বল্‌গাহরিণও প্রতিযোগিতায় পারে না। স্লেজে বোঝা চাপাইয়া কুকুরের পাল ঘণ্টায় প্রায় ১০-১২ মাইল করিয়া তুষারপথ দৌড়াইতে পারে। ঘোড়া ও বল্‌গাহরিণ অপেক্ষা কুকুর অনেক বেশী শীত সহ্য করিতে পারে, কুকুরপালনের খরচও ঘোড়া ও হরিণ অপেক্ষা কম। সেইজন্য দেখা যায় কুকুরই মেরুবাসীদের প্রিয় জীব।

কানাডার একটি বৃহৎ অংশ মেরুবৃত্তের মধ্যে পড়ে এবং তাহা তুষারে ঢাকা থাকে। শীতের সময় এই অঞ্চলে স্লেজে চলাচল করা ছাড়া উপায় থাকে না। স্লেজ ছাড়া এই অঞ্চলে চলাচলের সুবিধার জন্য কিছুদিন হইল বৈজ্ঞানিকরা একরকমের যন্ত্রযান নির্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রযানের নাম দেওয়া হইয়াছে



মেরু অঞ্চলের যন্ত্রযান—স্নোমোবাইল

'স্নো-মোবাইল' (snow mobile) বা 'তুষার-মোটর'। স্লেজের মতো ইহারও চাকার বদলে মসৃণ 'রানার' আছে এবং যুদ্ধের ট্যাঙ্কগাড়ির মতো বরফের উপর দিয়া কেটারপিলার-চেইনে ইহা গড়াইয়া চলে। সমস্ত গাড়িটি আগাগোড়া বর্মাবৃত থাকে। মধ্যে মধ্যে খোপ থাকে বটে, কিন্তু চলিবার সময় তাহাও বন্ধ করিয়া রাখা হয়। কারণ তাহা না হইলে ভিতরের চালক ও যাত্রীদের পক্ষে তুষারঝঞ্ঝার ঝাপ্‌টা সহ্য করা সম্ভব নহে। কুকুর ও বল্‌গা-হরিণের স্লেজের পরে এই তুষার-মোটর নিঃসন্দেহে মেরু অঞ্চলের অত্যাধুনিক অভিনব যান। কিন্তু ইহা সাধারণ মেরুবাসীদের ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই, স্লেজই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন।

পার্বত্য অঞ্চলের বাহন

পার্বত্য অঞ্চলেও চলাফেরা করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদিও পার্বত্য পথে আজকাল মোটর, রেলগাড়ি ও অন্যান্য আধুনিক যানবাহন স্বচ্ছন্দে চলাচল করিতেছে, তাহা হইলেও এইসব অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এগুলি বিশেষ কাজে লাগে না। পার্বত্য অঞ্চলে ভারবহনের উপযোগী পশু হইতেছে টাট্টু ঘোড়া, গাধা, ছাগল ও ইয়াক বা চমরীগাই। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ও অন্যান্য পার্বত্য প্রদেশে

এই সমস্ত পশু পাহাড়ীরা নিজেরা চড়িবার জন্য ও ভারবহনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ঘোড়া ও গাধার পিঠে পণ্যদ্রব্যের বোঝা বহন করা হয়। পাহাড়ী গাধা ও ঘোড়া দেখিতে বেঁটেখাটো হইলেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম। পাহাড়ী ছাগলও বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং অল্পস্বল্প বোঝাও বহন করিয়া



পার্বত্য অঞ্চলে পিঠে বোঝাবহন

থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ নিজের পিঠে করিয়া বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে নানা রকমের কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। বড় বড় ঝুড়িতে ও র‍্যাকে জিনিসপত্র সাজাইয়া, তাহা পিঠে ফিতা-দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, কপালের সহিত লাগামের মতো লাগাইয়া, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পাহাড়ীরা অনেক বেশী

বোঝা অনায়াসে পাহাড়ের উঁচুনিচু পথে বহন করিতে পারে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের হাতে একটা মোটা লাঠিও থাকে, কারণ লাঠিতে ভর দিয়া ওঠানামার সুবিধা হয়।

বিভিন্ন বিশেষ প্রাকৃতিক অঞ্চলের এইসব বিশিষ্ট যানবাহন ও ভারবহনের কৌশল দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতি যেখানে মানুষের চলাফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে সেখানে প্রকৃতি নিজেই কিছুটা মানুষের চলার পথে সহায় হইয়াছে। উট, হাস্কি-কুকুর, বল্গাহরিণ, ঘোড়া, গাধা, অশ্বতর, ছাগল ইত্যাদি জীবজন্তু দৈহিক শক্তি ও গড়নের দিক দিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে মানুষের চলার পথে প্রধান বাহন হইয়াছে এবং মানুষও তাহাদের পালন করিয়া বাহন হইবার উপযোগী করিয়াছে। পথ না চলিলে ও বোঝা বহন না করিলে জীবন অচল হইয়া যাইবে বলিয়া এইসব অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মরু-মেরু ও পার্বত্য প্রদেশে, মানুষ নিজে চলিবার ও বহন করিবার কৌশলও অনেক উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রকৃতির বাধা জয় করিয়া মানুষ জীবনের পথে চিরদিন চলিবার চেষ্টা করিয়াছে। ডুলি-পাল্কি হইতে জেট-কমেট ও স্পেস-শিপ পর্যন্ত যানবাহনের অগ্রগতিতে এই চলার এখনও শেষ হয় নাই। কারণ চলাই জীবন এবং না-চলাই মৃত্যু।

QUESTIONS

Group A

1. Write briefly what you know of the development of transport before the Age of Steam and Electricity.

2. Give a brief account of transport in the Age of Steam and Electricity.

3. When the 'wheel' was invented? How the 'wheeled vehicle' revolutionised transport?

4. Give a brief account of the development of Air transport, with special reference to India.

5. How the 'Railway' came into being? When and how the Railway transport developed in India?

6. When and how the 'Tramway' came into being ? Write what you know about its development in Indian cities.

7. Give a brief account of the development of Water transport through the ages.

8. Write what you know about the development of Automobile and its social effects.

9. Give a brief account of the modern means of Communications, with special reference to India.

10. What are the typical forms of transport in Desert lands, Polar regions and Mountains ?

11. Write notes on :

(a) Phonogram ; (b) Snowmobile ; (c) Macadamising ; (d) Wright brothers.

Group B

I. These are some eminent persons in the history of transport :

John Palmer. John Loudon Macadam. Richard Trevithick, George Stephenson, John Stephenson, Gottlieb Damler, Wilbur Wright, W. B. O'Shaughnessy, Alexander Graham Bell.

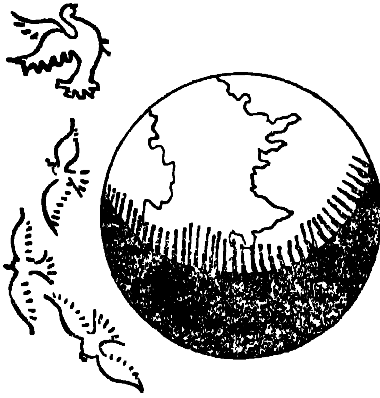
Why they are eminent ?

II. (a) Camel, (b) Dog, (c) Reindeer, (d) Ass and Mule are very useful as transport in :

(a)
(b)
(c)
(d)

III. Some dates are important in the history of Indian Transport and Communication. Here are the dates. Mention the importance of the dates in the space provided after each :

1851 —
1853 —
1854 —
1873 —



একাদশ প্রকরণ

মানুষ ও পৃথিবী

*প্রতিপাদ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের সহিত মানুষের, জাতির সহিত জাতির আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সুযোগ এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধান বলিয়া আজ আর বিশেষ কিছু নাই। ভৌগোলিক ব্যবধান নামমাত্র আছে, কিন্তু তাহার জন্য চলাচল, যোগাযোগ ও মিলনের পথে কোন বাধা নাই। যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার যে ক্রমবিকাশের কথা আগে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই আন্তর্জাতিক পরস্পর-নির্ভরতার পথ যে কত প্রশস্ত হইতে পারে তাহার আভাস পাওয়া যায়। চার-পাঁচ শত মাইল পথ যদি একঘণ্টায় উড়িয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে দুই-একদিনের বেশী সময় লাগে না। আজ এই ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙিয়া যাওয়ার ফলে পৃথিবীর মানুষ একটি অভিন্ন মানব-পরিবারে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

Uuit 11. Shrinkage of distance through development of transport and communication facilities - growing inter-dependence of Nations and countries - Necessity of World Peace—World Organisations and their efforts towards solution of international problems—need of developing world-mindedness.

* প্রথম প্রকরণ হইতে সপ্তম প্রকরণ (Unit I to Unit VII) এবং একাদশ প্রকরণ (Unit XI) লইয়া সমাজবিদ্যা বিষয়ের 'প্রথম পত্রে'র (Paper I) ১০০ নম্বর নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য সপ্তম প্রকরণের পরে একাদশ প্রকরণ সন্নিবেশিত হইল। 'যানবাহন ও যোগাযোগ' বিষয়ের সহিত একাদশ প্রকরণের বিষয়বস্তুরও সম্পর্ক আছে।—লেখক

বিভিন্ন জাতির পরস্পর-নির্ভরতা

যানবাহন ও যোগাযোগের বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পরস্পর-নির্ভরতা অনেক বাড়িয়াছে এবং ক্রমেই বাড়িতেছে। রাষ্ট্রের ও মানুষের কর্মজীবনে সর্বক্ষেত্রে এই নির্ভরতা ও লেনদেনের পরিচয় পাওয়া যায়—অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রেই আজ আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনির্ভর হইয়া কালাতিপাত করার উপায় নাই।

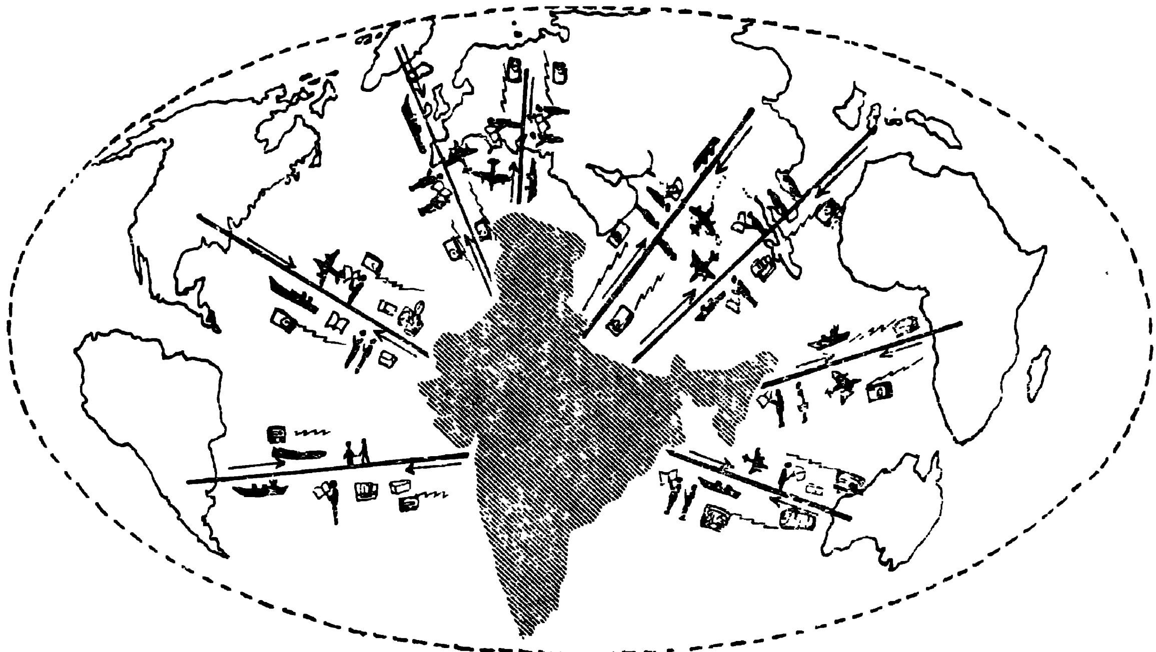
অর্থনীতিক্ষেত্র। অর্থনীতিক্ষেত্রে আজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (international trade) যে বিস্তার হইয়াছে তাহা একপুরুষ আগেও কল্পনাতীত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই অবশ্য একদেশের মানুষ অন্যদেশের মানুষের সহিত পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান করিত। বণিকদের সেইসব পুরাতন ক্যারাভান-পথ আজও পৃথিবীর বুক হইতে লোপ পায় নাই। দুর্গম পার্বত্য ও মরুভূমি অঞ্চলে আজও সেইসব পথের চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের মাথার উপর দিয়া আকাশপথে বিমান আন্তর্জাতিক যোগাযোগের যে জাল বিস্তার করিয়াছে, অতীতের কোন কালে তাহার সমতুল্য কিছু ছিল না। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা, মহাসমুদ্র ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া আজ বিশ্বপথযাত্রী মানুষের সহিত সকলরকমের ব্যবহার্য ও উপভোগ্য পণ্যদ্রব্য বিমান দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে আজ ভৌগোলিক বাধার কোন গুরুত্ব নাই বলা চলে।

পণ্যের সহিত টাকাপয়সাও আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান বাড়িয়া গিয়াছে। একদেশের মূলধন অন্যদেশে নিয়োগ করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ তদারক করা আজ সহজসাধ্য হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও যন্ত্রচালিত শিল্পের বিকাশের পথে বাধাও অনেকটা দূর হইয়াছে। অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশের দ্রুত অর্থনীতিক অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে এবং দেশের সহিত দেশের অর্থনীতিক ব্যবধানও দূর হইয়া যাইতেছে।

খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক নির্ভরতা আজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সব দেশে সকলরকমের খাদ্যফসল সমান উৎপন্ন হয় না। মধ্যে মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য কোন কোন দেশে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে

এবং তাহার ফলে খাদ্যসংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। অতীতে এই ধরনের জাতীয় সংকট দেখা দিলে অনেক সময় অসহায়ের মতো অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইত। যানবাহন-যোগাযোগের উন্নতির ফলে আজ আর তাহা করিতে হয় না। বাষ্পীয় রেলগাড়ি ও রেলপথ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে এই অসহায় অবস্থা কিছুটা দূর হয়। আজকাল ব্যোমযানের উন্নতির ফলে পৃথিবার কোন দেশকেই এই অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় না। সংকট অত্যন্ত ভয়াবহ ও জরুরী হইলেও একদিনের মধ্যে বাহিরের বড় বড় দেশ হইতে যে-কোন বিপন্ন দেশের সাহয্যের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র পাঠানো যায়। বিপন্ন লোকজন কোথাও একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও হেলিকপটারের মতো বিমানে করিয়া তাহাদের উদ্ধার ও সাহায্য করা সম্ভব। এই কারণে পৃথিবীর সমস্ত দেশের পরস্পর-নির্ভরতা আজ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিতে পারে যখন নানাবিধ ফসল ও পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অণুকুল অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবে এবং উৎপন্ন ফসল ও পণ্যদ্রব্য পরে প্রয়োজনমতো আবার প্রত্যেকে ভাগ করিয়া লইবে। সকলরকমের ফসল ও পণ্যের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব না হইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা স্বচ্ছন্দে সম্ভব হইতে পারে।

রাজনীতিক্ষেত্র। রাজনীতিক্ষেত্রে পরস্পর-নির্ভরতা প্রত্যক্ষভাবে আজ আরও অনেক বেশী বাড়িয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তিরক্ষার সমস্যা তো আছেই, অন্যান্য সমস্যারও অন্ত নাই। সীমানার সমস্যা, অধিকারের সমস্যা, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের মতানৈক্য ও বিরোধের সমস্যা—এরকম যে কত সমস্যার উদ্‌ভব হয় তাহার ঠিক নাই। অধিকাংশ সমস্যাই বিচার করিলে হয়ত কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব সমস্যা, কিন্তু অন্যদিক হইতে বিচার করিলে আন্তর্জাতিক সমস্যা। একটি রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের বিরোধ বাধিলে তাহা যে-কোন সময় আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। যুদ্ধের মারণাস্ত্রের আজ এত উন্নতি হইয়াছে যে এখন আর কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ বাধিল তাহা প্রায় অবান্তর প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আজ রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার কোন সুযোগ নাই, কারণ কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ আর গা-ঢাকা দিয়া পরম নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করা



ভারতের সহিত বাহির-বিশ্বের যোগাযোগ—সমুদ্রপথে ও বিমানপথে

সম্ভব নহে। এইজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব আজ অত্যন্ত বেশী।

দুইটি নীতিকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবারও উপায় নাই। একটি নীতির উপর আর-একটি নীতি নির্ভর করে। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ভারতের যদি সদ্‌ভাব ও বন্ধুত্ব থাকে তাহা হইলে ভারতের স্বরাষ্ট্রনীতি প্রকাশ্যে সোভিয়েট-বিরোধী হইতে পারে না। একথা যেমন সত্য, তেমনি যে-সমস্ত দেশ প্রকাশ্যে সোভিয়েট-বিরোধী তাহারাও যে ভারতের উপর প্রীত হইবে না সেকথাও সত্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজনীতিক মতবাদ বা আদর্শের প্রশ্ন বড় করিয়া তুলিয়া না ধরিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, ভারতবর্ষ তাহা অনেকটা প্রমাণ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পরস্পর-নির্ভরতা অস্বীকার না করিয়াও ভারতবর্ষ নিজের স্বাতন্ত্র্য কি করিয়া রক্ষা করা যায় সেই পথ প্রত্যেক রাষ্ট্রকে দেখাইয়াছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্র। শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির পরস্পর-নির্ভরতা আগের তুলনায় আজকাল অনেক বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। ইহার অন্যতম কারণ অবশ্য যানবাহন ও যোগাযোগের বিস্ময়কর অগ্রগতি বিশেষ করিয়া আকাশযানের আশ্চর্য উন্নতি। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি বড় কারণ আছে। সাম্প্রতিক কালে বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ও টেকনোলজির শাখা-প্রশাখা এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে কোন একটি দেশের পক্ষে সকল বিদ্যায় বিশারদ হওয়া প্রায় অসম্ভব বলা চলে। সকল বিদ্যা অনুশীলন করার সমান সুযোগও সর্বত্র নাই। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল বিদ্যা অজস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া এক বিশাল বটবৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে। মূল বিদ্যার তত্ত্বজ্ঞানই যথেষ্ট নহে, তাহার প্রয়োগজ্ঞানেও বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য আজ টাকাপয়সা ও বাণিজ্যের পণ্য-দ্রব্যের লেনদেনের মতো বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানদের আদান-প্রদানও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির সুবিধা হইয়াছে যথেষ্ট। আধুনিক কলকারখানা, জটিল যন্ত্রপাতি, গবেষণাগার, বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউট ইত্যাদি স্থাপনের জন্য কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল পরামর্শের প্রয়োজন হইলে, অথবা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দরকার হইলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহা সহজলভ্য হইয়াছে।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি বড় বড় বিজ্ঞানোন্নত দেশ হইতে এই ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হইতেছে।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে নানারকমের আদান-প্রদানও যানবাহনের উন্নতির জন্য সম্প্রতি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের ছাত্ররা বিভিন্ন দেশে নানারকমের বিদ্যানুশীলনের জন্য বৃত্তি পাইয়া অথবা বিনা বৃত্তিতে যাত্রা করিতেছে, বাহিরের ছাত্ররাও ভারতে আসিতেছে। থিয়েটার, ফিল্ম, সংগীত, লোকশিল্প ইত্যাদিও আজ নানাদেশে পর্যটন করিতেছে। যে-দেশের যাহা উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক নিদর্শন আজ তাহা সকল দেশের লোকের পক্ষে দেখা ও উপভোগ করা সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের গমনাগমন আজ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সেক্সপিয়র, গ্যেটে, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের স্মৃতি-উৎসবও আজ আর জাতীয় উৎসব নহে, আন্তর্জাতিক উৎসব। সংস্কৃতির এই আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিতে পারে যখন সমস্ত জাতীয় সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া আন্তর্জাতিক মানবসংস্কৃতির একটি নিটোল রূপ প্রত্যেক মানুষের চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিবে।

বিশ্বশান্তির আদর্শ

অনাদিকাল হইতে এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে হানাহানি চলিয়া আসিতেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নৃশংস যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানি অসভ্য ও অর্ধসভ্য মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। আদিকালে মানুষ শান্তিপ্রিয় ছিল একথা সত্য নহে। মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে যখন মানুষের চেতনা-উদয় হয় নাই, যে-কোন সাধারণ জীবজন্তুর মতোই মানুষ মানুষকে দেখিত ও বিচার করিত, তখন কোন সংঘর্ষ বা যুদ্ধ বাধিলে তাহা যে কি ভয়ানক বর্বর ও নিষ্ঠুর রূপ ধারণ করিত তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। বন্যজন্তুকে বধ করিয়া আদিম মানুষ যেমন আনন্দ করিত, শত্রুকে বধ করিয়াও তেমনি আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিত। প্রাচীনকালে পৃথিবীর অনেক দেশে যখন দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল তখনও মানুষে-পশুতে কোন তফাৎ ছিল না। অথচ এই দাসত্বপ্রথার মধ্যেই মানুষের গর্বের বস্তু প্রাচীন

গ্রীকসভ্যতা, গ্রীকদর্শন ও শিল্পকলার বিকাশ হইয়াছে। দাসযুগে যুদ্ধের বন্দীদের ক্রীতদাস বা গোলামের জীবন যাপন করিতে হইত। এই গোলামদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার করা হইত তাহার বিবরণ পাঠ করিলে ভয়ে আমরা শিহরিয়া উঠিব। দাসযুগের পর দীর্ঘকালস্থায়ী মধ্যযুগেও মানুষের যুদ্ধবিগ্রহের রীতি ও পরিণতি প্রায় আগেকার মতোই বর্বর ছিল। কথায় কথায় মানুষকে হত্যা করা, ধর্মের নামে যুদ্ধ করা, মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। সামান্য অন্যায়ের জন্য মানুষের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইত। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইত অথবা অস্ত্র দিয়া কাটিয়া ফেলা হইত। সামান্য জমিদাররা ও সামন্ত-রাজারা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করিবার যে সমস্ত অভিনব কৌশল উদ্‌ভাবন করিতেন, বর্বরতার দিক হইতে ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা পৃথিবীর সর্বত্র মানবসমাজে কমবেশী চলিত। কাজেই শান্তি, মৈত্রী, সাম্য ইত্যাদি আদর্শ অতীতে মানুষের মধ্যে বিশেষ ছিল না। এই আদর্শের বিকাশ হইয়াছে আধুনিক যুগে, মানুষ সম্বন্ধে মানুষের শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ যখন জাগিয়াছে তখন।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর নানাদেশের মানুষের মধ্যে পরস্পর চেনা-পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি লোপ পায় নাই বটে, কিন্তু তাহা নিবারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষ দ্রুত সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। দেশ-বিদেশের মানুষের মেলামেশার পথের বাধা যত দূর হইয়াছে তত পরস্পর ভাব-বিনিময়ের সুযোগ বাড়িয়াছে। এই সুযোগের জন্যই মানুষের পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণের উপায় সম্বন্ধে একত্রে বসিয়া চিন্তা করার সুবিধা হইয়াছে। পরস্পর চেনা-পরিচয়ের ফলে মানুষ এই সত্যও আজ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার, আশা-আকাঙ্ক্ষার, কামনা-বাসনার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেটুকু পার্থক্য আছে তাহা লইয়া মানুষে মানুষে বিরোধ বা প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিবার কোন কারণ নাই। মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর মানুষের স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের ফলে যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধে জাতীয়তার উন্মাদনায় বিভ্রান্ত সাধারণ নির্দোষ মানুষ অকাতরে আত্মবলি দিতে বাধ্য হয়। কাজেই সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষ যদি যুদ্ধ বন্ধ করিতে

দৃঢ়সংকল্প হয় তাহা হইলে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত নিশ্চয় একদিন ব্যর্থ হইবে। অকারণ যুদ্ধ ও জীবন-বিসর্জন বন্ধ হইবে, দেশে দেশে ও ঘরে ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যুদ্ধ-নিবারণ ও শান্তি-স্থাপনের গুরুত্ব আজ অত্যধিক বাড়িয়াছে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের জন্য। পারমাণবিক শক্তি মানুষের আয়ত্ত হইবার পর এবং তাহার প্রচণ্ড শক্তিশালী মারণাস্ত্র বড় বড় রাষ্ট্রের অধিকারে থাকার ফলে মহাযুদ্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বের সমস্ত ধারণা আজ বাতিল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এখন যুদ্ধ হইলে যুদ্ধের 'ফ্রন্ট' বলিয়া কিছু থাকিবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এই ফ্রন্টের অস্তিত্ব ছিল এবং যুদ্ধরত দুইপক্ষ তাহার দুই-দিকে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইত অথবা পশ্চাদপসরণ করিত। এখন আর যুদ্ধ সেইভাবে হইবে না। নিজের দেশে বসিয়া প্রচণ্ড শক্তিশালী পারমাণবিক মারণাস্ত্র পৃথিবীর যে-কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায় এবং তাহার গতিপথও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইহা এমনই এক মারণাস্ত্র যাহা একটি বা দুইটি আঘাত করিলেই পৃথিবীর যে-কোন বড় মহানগর ঘরবাড়ি ও লোকজনসহ বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতে পারে। অসহায়ের মতো এই অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া যুদ্ধ বাধিলে মানুষের আর গত্যন্তর নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আকাশচারী দানবের মতো ভয়ঙ্করমূর্তি বোমারু বিমানের দল যখন টন টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করিত তখনও সাইরেনের শব্দ শুনিয়া মানুষ আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানের পারমাণবিক যুগে যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে আত্মরক্ষা করিবার মতো কোন আশ্রয় পৃথিবীর কোন দেশেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আণবিক মারণাস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় বা কোন আশ্রয় কাহারও পক্ষে আজও উদ্‌ভাবন করা সম্ভব হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ আণবিক বিস্ফোরণের ফলে প্রাকৃতিক আবহাওয়া পর্যন্ত যখন দূষিত হইয়া যায়, তখন গাছপালা কীটপতঙ্গ হইতে মানুষ পর্যন্ত কাহারও বাঁচিবার কোন উপায় থাকিতে পারে না। সুতরাং আণবিক মহাযুদ্ধে পৃথিবীর মানবসভ্যতা দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমিতে পরিণত হইবে। সেই মরুভূমিতে আদৌ কোন জীবের অস্তিত্ব থাকিবে কি না, অথবা তাহার মধ্যে বিচ্ছিন্ন কোন মরূদ্যানে ভাগ্যবান কোন একদল মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে কি না, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ পোষণ করেন। আইনস্টাইন

বলিয়াছেন, থাকিতেও পারে আবার না থাকিতেও পারে, তবে থাকা আর না-থাকা দুই-ই প্রায় সমান। যাহারা থাকিবে তাহারাই বা বিশ্বব্যাপী গোর-স্থানে কি করিবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জর্জ বার্নাড শ-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—"তৃতীয় মহাযুদ্ধ হইলে মানুষের কি হইবে?" শ উত্তর দিয়াছিলেন—"কি আবার হইবে? ভালই হইবে মনে হয়, কারণ সভ্যতার এই বিষফোঁড়াটি ফাটিয়া যাইবে এবং পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদের আবার গাছের ছাল প'রয়া তীর-ধনুক লইয়া গোড়া হইতে সভ্যতার ইমারত গাঁথা আরম্ভ করিতে হইবে।"

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবা আণবিক যুদ্ধেব ফলাফলের এই চিত্র আঁকিয়াছেন। এই চিত্র নিশ্চয় কোন দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে। তাঁহারা একথাও বলিয়াছেন যে আগামী যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় বলিয়া কিছু থাকিবে না। চিরদিন যুদ্ধে একপক্ষ জয়ী হইয়াছে, আর একপক্ষ পরাজিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কেহ জয়ী হইবে না, কেহ পরাজিতও হইবে না, সকলেই শুধু সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলায় আত্মাহুতি দিবে। জয় হইবে শুধু মানুষের চরম অ'ামিকার ও নির্বুদ্ধিতার এবং পরাজয় হইবে সভ্যতার ও শুভবুদ্ধির। কোন দেশের কোন রাষ্ট্রনায়কের অথবা কোন সেনাধ্যক্ষের জয় বা পরাজয় হইবে না। বর্তমান আণবিক যুগে তাই শান্তি ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নাই। হয় আন্তর্জাতিক শান্তি, আর না হয় আণবিক মহাযুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপমৃত্যু।

জাতিসংঘ

পৃথিবীর সকল জাতির মানুষের এই শান্তিকামনা আজ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের (United Nations Organisation—সংক্ষেপে U. N. O. বলা হয়) মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার মধ্যে শান্তির আবশ্যকতা রূঢ় বাস্তব সত্যরূপে বিশ্ববাসীর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। মহাযুদ্ধের মধ্যেই রুজভেল্ট, চার্চিল, স্টালিন প্রমুখ রাষ্ট্রনেতারা এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং একাধিকবার একত্রে আলাপ-আলোচনা করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ডাম্বার্টন ওকস-এ কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিয়া একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে—



আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলন ও উৎসব

বিশ্বমৈত্রীর পথে

১। শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সভা (Assembly) গঠন করা।

২। শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি পরিষদ্ (Council) গঠন করা।

৩। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ বা বিবাদ হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহা মীমাংসার চেষ্টা করা; এবং

৪। এই প্রতিষ্ঠান ও তাহার বিভিন্ন শাখার গড়ন কি প্রকার হইবে তাহা স্থির করা।

১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল হইতে ২৬ জুন পর্যন্ত স্যানফ্রান্সিসকোতে পৃথিবীর ৫০টি দেশের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলনে বর্তমান জাতিসংঘের শান্তি ও মৈত্রীর 'চার্টার' বা সনদ রচনা করা হয়। এই বছর ২৬ জুন তারিখে জাতিসংঘের এই সনদ ৫০টি দেশের প্রতিনিধি প্রথম স্বাক্ষর করেন, পরে পোল্যাণ্ড যোগদান করিলে ৫১ জন জাতিসংঘের প্রথম সভ্য হন। আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৫ সনের ২৪ অক্টোবর।

জাতিসংঘের সনদের উপক্রমণিকায় "We the people of the United Nations"—"আমরা জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল জাতির সাধারণ মানুষ" প্রতিজ্ঞা করিতেছি বলিয়া উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে। এই কথা সনদে বলার তাৎপর্য হইল—জাতিসংঘ কেবল পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের কোন সংঘ বা সভা নহে, সমগ্র মানবজাতির মহামিলন-মন্দির।

ছোটবড় সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য এই জাতিসংঘে সম্মিলিত হইবেন এবং পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ, বিদ্বেষ-বিরোধ মিটাইয়া ফেলিয়া শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীর মতো পাশাপাশি বাস করিবার জন্য পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিবেন। জাতিসংঘের এই আদর্শ সনদে এইভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে—

ক। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

খ। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন কর।

গ। অর্থনৈতিক (Economic), সামাজিক (Social), সাংস্কৃতিক (Cultural) ও মানবিক (Humanitarian) সমস্যার সমাধানের জন্য এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা (Fundamental Rights and Freedoms) রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা; এবং

ঘ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজকর্ম এই লক্ষ্যে পরিচালিত করিবার জন্য জাতিসংঘকে একটি ভাব-বিনিময়কেন্দ্রে পরিণত করা।

এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য জাতিসংঘের বিরাট সংগঠন গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

মানহাটান দ্বীপে প্রায় ১৮ একর জমির উপরে জাতিসংঘের প্রধান কেন্দ্রীয় কার্যালয় নির্মাণ করা হইয়াছে। সেক্রেটারিয়েট-গৃহ একটি ৩৯-তালা বিশাল অট্টালিকা। সাধারণ সভাকক্ষ—অর্থাৎ যে সভাকক্ষে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হন তাহা দৈর্ঘে ১৬৫ ফুট, প্রস্থে ১১৫ ফুট এবং উচ্চতায় ৭৫ ফুট। সম্মেলন-গৃহ তিনভাগে বিভক্ত—(ক) অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদগৃহ, (খ) অছি (Trusteeship) পরিষদগৃহ, (গ) নিরাপত্তা (Security) পরিষদগৃহ। প্রত্যেকটি পরিষদগৃহ ('Chamber' বলা হয়) ১৩৫ ফুট দীর্ঘ, ৭২ ফুট প্রশস্ত ও ২৪ ফুট উঁচু। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক আদালত-গৃহ আছে। এই ছয়টি প্রধান বিভাগ লইয়া জাতিসংঘের বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভাগগুলি এই—

সাধারণ সভা
নিরাপত্তা পরিষদ
অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ
অছি পরিষদ
আন্তর্জাতিক আদালত
সেক্রেটারিয়েট

এই বিভাগগুলি প্রত্যেকটি বহু শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত। এই শাখা-বিভাগগুলিকে, অর্থাৎ উপবিভাগগুলিকে 'Agencies' বলা হয়।

জাতিসংঘের বৈশিষ্ট্য। পূর্বেও শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'League of Nations'-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বের এই রাষ্ট্রসংঘের সহিত বর্তমান জাতিসংঘের পার্থক্য কোথায়? জাতিসংঘের বৈশিষ্ট্যই বা কি?

জাতিসংঘের গড়নের মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তে হইল 'নিরাপত্তা পরিষদ'। এই বড় রাষ্ট্রগুলি হইল বর্তমানে ইংলণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স ও আমেরিকা। বড় রাষ্ট্রগুলি

নিরাপত্তা পরিষদের 'স্থায়ী' সভ্য। ইহাছাড়া 'সাধারণ সভা' হইতে দুই বছর অন্তর ছয় জন করিয়া 'অস্থায়ী' সভ্য পরিষদে নির্বাচিত হন। এই নিরাপত্তা পরিষদের উপরেই বিশ্বের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাথমিক গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। কোন আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন হয় এবং পরিষদ যে নির্দেশ দেন সাধারণ সভা তাহাই বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করিতে উদ্‌যোগী হন। পরিষদের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই এবং তাহা বিনা প্রতিবাদে পালন করিতে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিষদের বড় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনীতিক আদর্শ-বিরোধ থাকিতে পারে এবং বর্তমানে তাহা আছেও। যেমন আমেরিকার সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার আছে। পাছে আদর্শ-বিরোধের জন্য কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার অথবা কোন একটি রাষ্ট্রের বিশেষ কোন সমস্যার কেবল ভোটাধিক্যের জোরে একতরফা বিচার হয়, এইজন্য আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের যে-কোন বিষয় 'ভিটো' দিবার বা নাকচ করিবার অধিকার আছে। এই অধিকারের সপক্ষে বড় যুক্তি হইল, পরিষদের কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই নিজের দল ভারী করিয়া কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী রাষ্ট্রসংঘে এই ধরনের কোন সংগঠন গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। তাহার ফলে কোন সমস্যার উদ্‌ভব হইলে সেখানে কেবল দলাদলি ও ভোটাভুটি হইত, আসল কাজ কিছুই হইত না, অর্থাৎ সমস্যার কোন সমাধান হইত না। 'লীগ অফ নেশনস' এই কারণে অল্পদিনের মধ্যেই একটি অকর্মণ্য ও অক্ষম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বৃহৎ কুচক্রী রাষ্ট্র-জোটের কাছে ক্ষমতা লইয়া দাবাখেলার কেন্দ্র হইয়া ওঠে। বর্তমান জাতিসংঘ এখনও তাহা হয় নাই। সংগঠনের বন্ধন মানিয়া চলিলে ভবিষ্যতে তাহা হইবার সম্ভবনাও নাই। দল পাকাইয়া ও ভোটাভুটি করিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাহারও কোন অসৎ উদ্দেশ্য সাসিল করিবার কোন সুযোগ নাই। হয় পরিষদের সকলকে একযোগে মিলিয়া একমত হইয়া কোন সমস্যা সমাধান করিতে হইবে, অথবা একজন কাহারও অমত বা আপত্তি থাকিলে তাহা করা চলিবে না। পরিষদে যাহা স্থির হইবে তাহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া সাধারণ সভাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংগঠনে এই বিশেষত্বের জন্যই আজও জাতিসংঘের পক্ষে গত ১৭-১৮ বছর ধরিয়া পৃথিবীতে শান্তি বজায়

রাখা সম্ভব হইয়াছে। আমেরিকা বা সোভিয়েট রাশিয়ার মতো কোন বৃহৎ রাষ্ট্র যদি ইচ্ছা করিয়া জাতিসংঘের সংগঠনটিকে ভাঙিয়া না ফেলে তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে আন্তর্জাতিক আকাশে ঝড়ের মেঘ উঠিলেও, সেই ঝড় পৃথিবীর বুকের উপর নামিয়া আসিয়া মানুষের শান্তিভঙ্গ করিতে পারিবে না।

আন্তর্জাতিক চেতনার বিকাশ

যানবাহনের উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান ছিল আজ তাহা দ্রুত লোপ পাইতেছে। বিশ্বের মানবজাতি আজ আর অজ্ঞাতকুলশীলের মতো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে পারিতেছে না। দূরের মানুষ, 'সাত সমুদ্র তের নদী' পারের অজানা মানুষ আজ কাছে আসিতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও জাতির পরস্পর-নির্ভরতাও অনেক বাড়িয়াছে। কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, অর্থনীতি শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পরস্পর-সহযোগিতা ও আদান-প্রদান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশ্বের মানবজাতি তাহার সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া আজ অতিক্রুত একটি যৌথ-পরিবারে পরিণত হইতেছে। এই অবস্থায় নিজের ঘরে ও পরিবারে বন্দী হইয়া, অথবা নিজের পল্লীতে বা দেশে বাস করিয়া কেবল আত্মচিন্তায় বা স্বার্থে মগ্ন হইয়া থাকিবার কোন উপায় নাই, থাকা উচিতও নহে।

কেন উচিত নহে? কারণ ব্যক্তি বা মানুষই হইল রাষ্ট্রের ও দেশের ভিত্তিস্বরূপ। একটি একটি করিয়া বহু ব্যক্তি লইয়াই একটি জাতি, একটি দেশ ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি বা মানুষ যদি বর্তমান পৃথিবীর গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন না হয় তাহা হইলে তাহাদের লইয়া গঠিত দেশ ও রাষ্ট্রও সে সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে না। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রনীতি দেশের মানুষই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্র একটি বড় নৌকার মতো। তাহার হাল ধরিয়া থাকেন দেশের বিশ্বস্ত রাষ্ট্রনায়করা, কিন্তু দাঁড় টানিয়া নৌকাটি চালায় দেশের মানুষ। তাই মানুষের বোধবুদ্ধি ও চেতনা রাষ্ট্রীয় কর্মধারায় প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতি লইয়া আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির বিকাশ হয়। ব্যক্তির আন্তর্জাতিকতাবোধ রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিকতাবোধের সহায়।

ব্যক্তির আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করার উপায় কি? উপায় হইল—প্রথমে সুস্থ জাতীয়তাবাধ জাগাইয়া তোলা এবং তাহার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে আন্তর্জাতিকতাবোধের সৌধ গড়িয়া তোলা। যাহার সুস্থ ও বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ নাই, তাহার আন্তর্জাতিকতাবোধ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যে নিজের পরিবারে শ্রদ্ধার পাত্রদের শ্রদ্ধা করিতে পারে না, স্নেহের পাত্রদের স্নেহ করিতে পারে না, সে প্রতিবেশীদেরও শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে পারিবে না, দেশের লোককে একেবারেই পারিবে না। কোন ধর্ম বা নীতি বাহিরে পালন করিতে হইলে তাহা আগে নিজের গৃহে আচরণ করিতে হয়। ইহা বহুকালের প্রাচীন প্রবাদবাক্য।

বাহিরের দেশকে ও বাহিরের মানুষকে ভালবাসিতে হইলে প্রথমে নিজের দেশকে ও দেশের মানুষকে ভাল বাসিতে হয়। জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে নিজের দেশর মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতাই হইল জাতীয়তাবোধ। নিজের দেশের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির দেশপ্রেম সামাজিক শ্রেণীভেদ, বর্ণ-ভেদ, জাতিভেদ ও সম্প্রদায়ভেদের বিষে কলুষিত না হয় তাহা হইলে তাহার মন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির মানুষকে ভালবাসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক দেশের মানুষের মধ্যে যদি সুস্থ জাতীয়তা-বোধের বিকাশ হয়, একমাত্র তাহা হইলেই আন্তর্জাতিক মনোভাব ও চেতনার প্রকাশ হইতে পারে। আমেরিকায় ও আফ্রিকায় যদি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সম্প্রীতি না থাকে, তাহা হইলে এই দুই দেশের মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষকে কি করিয়া ভালবাসিবে? আমরা ভারতজনেরা যদি হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত বৈষম্য লইয়া এবং আসামী-বাঙালী-বিহারী-ওড়িয়া-হিন্দুস্থানী-পাঞ্জাবী-মারাঠী-গুজরাটী-মাদ্রাজী প্রভৃতি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও অহমিকা লইয়া কেবল দেশের মধ্যে বিষ উদ্গীরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে সুস্থ জাতীয়তাবোধের বিকাশ হইবে কোথা হইতে? তাহা যদি না হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই।

তাহা হইলে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগাইবার জন্য প্রথমে প্রত্যেক দেশের মানুষের মধ্যে সুস্থ ও সবল জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। সুস্থ জাতীয়তাবোধ জাগাইতে হইলে দেশের মানুষকে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই শিক্ষা পরিবারে ও

বিদ্যালয়ে পাইলে তবেই বাহিরের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্র-জীবনে আমাদের সুস্থ জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হইতে পারে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে আমাদের আন্তর্জাতিক মনোভাব ও চেতনা সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। বর্তমান পৃথিবীতে ও সমাজে এই আন্তর্জাতিক চেতনার যে কত প্রয়োজন তাহা পদে পদে অনুভব করা যায়। ক্রমেই বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বিস্তারের ফলে এই প্রয়োজন আরও বাড়িতে থাকিবে। আজ তাই সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হওয়া উচিত—সুস্থ দেশাত্মবোধের উপর বিশ্বমানবতাবোধ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জাগাইয়া তোলা এবং সমস্ত সংকীর্ণতা মানুষের মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া।

QUESTIONS

Group A

1. How far the nations of the world have become inter-dependent today due to the development of transport and communication facilities and other factors ?

2. Why World Peace has become a great necessity today ?

3. How the U.N.O. came into being and how it tries to solve international problems ?

Group B

I. Name six important countries who are members of the U. N. O.

II. Which one of the following departments of the U. N. O. is the final authority in settling international disputes ?

1. General Assembly
2. Secretariat
3. Security Council
4. Economic, Social and Cultural Organisation.

'সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা'র প্রথমভাগের বিষয়গুলি এইখানে শেষ হইয়া গেল।

প্রথম প্রকরণ হইতে সপ্তম প্রকরণ (Units 1 to 7) এবং একাদশ প্রকরণ (Unit 11)—এই আটটি প্রকরণ লইয়া এই বিষয়ের 'প্রথম পত্র' (Paper I) রচিত হইবে। সেইজন্য ইহাকে 'প্রথমভাগ' বলা হইল।

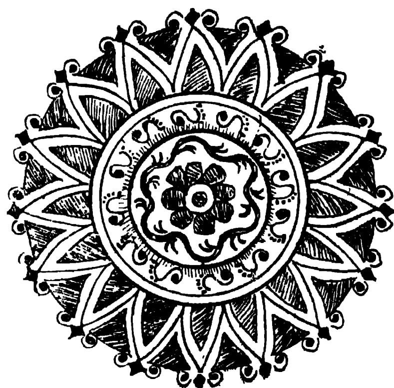
দ্বিতীয়ভাগে অষ্টম প্রকরণ হইতে দশম প্রকরণ (Units 8 to 10) পর্যন্ত সন্নিবেশিত হইল। এই তিনটি প্রকরণ লইয়া এই বিষয়ের 'দ্বিতীয় পত্র' (Paper II) রচিত হইবে।

প্রথমভাগের আটটি প্রকরণের এবং দ্বিতীয়ভাগের তিনটি প্রকরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র কিভাবে রক্ষা করিয়া পাঠ্যবিষয় রচনা করা হইয়াছে, তাহা গ্রন্থের শেষে 'পাঠসমীক্ষা' বিভাগে আলোচনা করা হইয়াছে।

—লেখক

ভারতসংস্কৃতির ধারা





অষ্টম প্রকরণ। প্রথম অধ্যায়

ভারতসংস্কৃতির ধারা

আমাদের ভারতবর্ষ অতিপ্রাচীন দেশ। এত প্রাচীন যে ভূবিজ্ঞানীরা বলেন জীবজগতে মানুষের ক্রমবিকাশের অনেক আগে হইতেই ভূপৃষ্ঠে ভারতের অস্তিত্ব ছিল। অতি পুরাকালে হিমালয়ের চিহ্নমাত্র নাকি ছিল না এবং আর্যাবর্ত, তিব্বত, বর্মা ও চীনের একটি বড় অংশ এক বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল। এই সমুদ্রের নাম দেওয়া হইয়াছে টেথিস। এখনকার ভূমধ্যসাগর এই টেথিসের একটা ক্ষুদ্র অংশ। হিমালয়ের আগে বিন্ধ্যপর্বত বর্তমান ছিল, অর্থাৎ বিন্ধ্য বয়সে হিমালয় অপেক্ষা প্রবীণ। দক্ষিণভারত, আরবসাগর, আফ্রিকা মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া মিলিয়া একটি মহাদেশ ছিল, যাহার নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। কালক্রমে এই মহাদেশের একটি বড় অংশ সাগরে ডুবিয়া যাওয়ায় দক্ষিণভারত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তারপর সাইবেরিয়া ও দক্ষিণভারতের ভূমি ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে আগাইয়া আসে এবং তাহার ফলে মধ্যবর্তী টেথিস-সমুদ্রের গর্ভ ঠেলিয়া উঠিয়া বিশাল হিমালয় পর্বতমালা ও তিব্বতের উচ্চ মালভূমি উদ্ভূত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া হিমালয়ের নদনদী তাহার গা-ধোয়া পাথর-কাঁকর-বালি-মাটি দিয়া উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ ভূমি গড়িয়া তুলিয়াছে। তখনও ভূপৃষ্ঠে মানুষ পদার্পণ করে নাই। ভারতভূমি যে কত প্রাচীন তাহা ভূবিজ্ঞানীদের এই কাহিনী হইতে কল্পনা করা যায়। ভূপৃষ্ঠে মানুষের আবির্ভাবের আগেই যে-ভারত

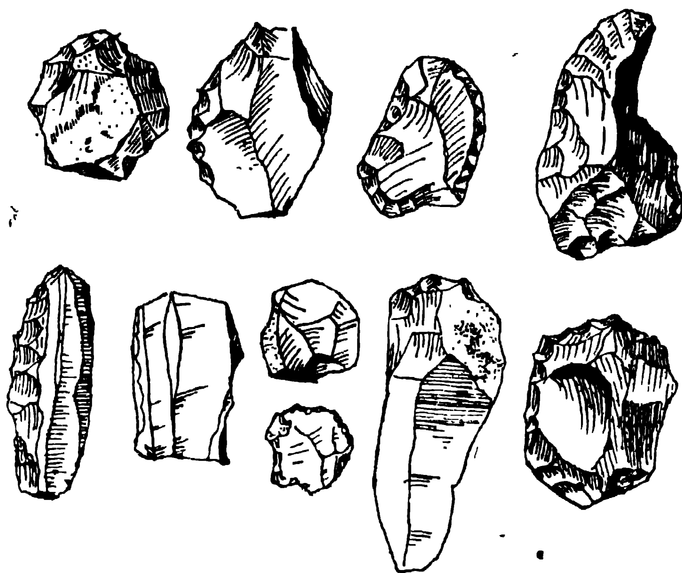
Unit 8 (a) The Past background—a short survey of the evolution of Indian culture and heritage through the Ages (only land-marks to be touched).

গাত্রোত্থান করিয়াছে, তাহার বুকে মানুষের বসবাসও যে কত প্রাচীন তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

প্রাগৈতিহাসিক ভারত

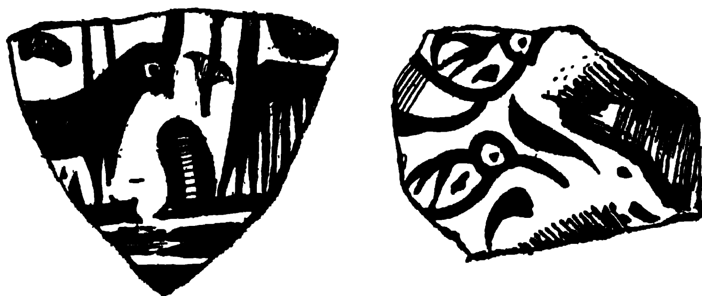
জীবজগতের ক্রমবিকাশের ফলে ভূপৃষ্ঠে যেদিন মানুষের উদ্ভব হইয়াছে সেইদিন হইতে মানুষের ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইয়াছে ভারতভূমিতে। একথা আজ নৃবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে আদিপ্রস্তরযুগের আদিম মানুষও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অমার্জিত পাথরের হাতিয়ার লইয়া বনে-জঙ্গলে বিচরণ করিত এবং পর্বতের গুহায় বাস করিত। নব্যপ্রস্তরযুগে কৃষিকর্মের উদ্ভাবনের ফলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম যে নবযুগের সূচনা হয় তাহার আলোক হইতেও ভারতভূমি বঞ্চিত হয় নাই। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে এই প্রস্তরযুগের একাধিক অঞ্চল ও বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আদি-প্রস্তরযুগের মানুষের দান অগ্নি। অগ্নির দহনশক্তি আবিষ্কার এবং পাথর ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করা তাহাদেরই প্রথম কাজ। নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষের দান কৃষিকর্ম, পশুপালন এবং স্থায়ী বসতিকেন্দ্রে বা গ্রামে বসবাস। ভারতজনের গ্রাম্যসভ্যতার ইতিহাস এই নব্যপ্রস্তরযুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নৃবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন নব্যপ্রস্তরযুগের সূচনা হইয়াছে আজ হইতে অন্তত ১০ হাজার বছর আগে। তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতের গ্রাম ও গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রায় ১০ হাজার বছরের প্রাচীন।

এই নব্যপ্রস্তরযুগের পরে তাম্র-প্রস্তরযুগে উত্তর-পশ্চিমভারতের বেশ বড় একটি নগরসভ্যতার বিকাশ হয়। পাঞ্জাবের হড়প্পা ও সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জদড়ো অঞ্চলে এই সভ্যতার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ অনেক পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় অবস্থিত বলিয়া ইহাকে 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা' বলা হয়। ভারতসংস্কৃতিতে এই সভ্যতার দান বহুমুখী এবং যেহেতু এখানে পাওয়া প্রাচীন লিপির (চিত্রলিপির) পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয় নাই, সেইজন্য এই দানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আজও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। তাহা না হইলেও যে সমস্ত বাস্তব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাই মূল্য নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। শিব-পশুপতি পূজা, বৃক্ষ পূজা, জীবজন্তু পূজা ইত্যাদি যাহা আজও ভারতের লোকধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাহার সমস্ত নিদর্শনই সিন্ধুসভ্যতার



ভারতের প্রস্তরযুগের হাতিয়ার

কালে পাওয়া যায়। ভারতের নারী-পুরুষের ভূষণ ও অলংকার, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, এমনকি দুই চাকার গরুর গাড়ির ছোট একটি মডেল পর্যন্ত সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। নগরের পথঘাট ও বাড়িঘরের যে বিন্যাস বা পরিকল্পনা সিন্ধু অঞ্চলে ভূগর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে তাহার



৫০০০ বছরের প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার মৃৎশিল্প

সহিত ভারতের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরের পথঘাট-বসতিবিন্যাসের সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। এইসব নিদর্শন হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে আর্যদের আগমনের আগে ভারতে বিস্তীর্ণ গ্রাম্যসভ্যতা ও দুই-একটি নগর-

কেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। ভারতসভ্যতা ও ভারতসংস্কৃতির ইতিহাস আর্যদের যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা বলা আজ ভুল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। একশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী আছেন যাঁহারা ভারত-সংস্কৃতির যাহা কিছু পার্থিব ও অপার্থিব সম্পদ সবই আর্যদের দান মনে করেন। ইহা মিথ্যা কল্পনা, ইতিহাস নহে।

আর্যপূর্ব যুগের গ্রাম্য ও নাগরিক সভ্যতায় যে সমস্ত জাতি-উপজাতির দান আজ স্বীকৃত তাহাদের মোটামুটি তিনটি জনগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়—

নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু

অস্ট্রিক বা কোল

দ্রাবিড

নেগ্রিটো। নেগ্রিটোরা দেখিতে খাটো, রং ঘোর কালো, নাক চেপটা, ঠোঁট পুরু, চুল কোঁকড়ানো। ইহারা বেশীর ভাগ সমুদ্র-উপকূলে বাস করিত এবং মাছ ধরিয়া ও শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত। এখন ইহারা প্রায় লোপ পাইযাছে। দক্ষিণভারতে ও আসাম অঞ্চলে কোথাও কোথাও ইহাদের একটু-আধটু অবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্ট্রিক। অস্ট্রিক-ভাষী জনগোষ্ঠী উত্তরভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ও দক্ষিণভারতে ছড়াইযা পড়িযাছিল। চাষবাস, পান-সুপারীর ব্যবহার, হিন্দু লোকাচার, পূজাপদ্ধতি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, লৌকিক উৎসব পার্বণ প্রভৃতি অনেকটা অস্ট্রিকদের দান।

দ্রাবিড়। দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী দীর্ঘকায়, সরল-নাসিক ও দীর্ঘ-করোটি ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। অনেকে বলেন যে আর্যপর্ব যুগের সিন্ধুসভ্যতা দ্রাবিড়দের কীর্তি। হিন্দুসভ্যতায় দ্রাবিড়দের যথেষ্ট দান আছে। শিব-উমা, বিষ্ণু-শ্রীর কল্পনা এবং যোগ-সাধনার মূলতত্ত্ব দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্‌ভূত হয় বলিয়া মনে করিবার সংগত কারণ আছে।

ইহা ঠিক নৃবিজ্ঞানসম্মত ভারতজনের জাতি-পরিচয় নহে। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য—এগুলি ভাষার নাম এবং প্রচলিত অর্থে ইহা জাতিবাচক হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত জাতির নামগুলি জটিল হইবে বলিয়া এখানে তাহা দেওয়া হয় নাই। এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু মনে রাখিলেই হইবে যে আর্যদের আগমনের

আগে ভারতে একাধিক অনার্য (যাহারা আর্য নহে) জাতির বাস ছিল। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এইসব অনার্য জাতির যথেষ্ট দান আছে এবং সেই দানের কথাই আগে বলা হইয়াছে।

ভারতসংস্কৃতিতে আর্যদের দান

আর্যদের দান। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার শেষ পর্বের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদরা আর্যদের আগমনের সহিত তাহার ঐতিহাসিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। আর্যদের সহিত যে সিন্ধুবাসীদের রীতিমত সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহাও অনুমান করিবার মতো কারণ আছে। আর্যদের এই অভিযান ও সংঘর্ষের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ হইতে ২০০০ বছরের মধ্যে। আর্যরা একবারে ও একত্রে এদেশে আসেন নাই, বারে বারে ও দলে দলে আসিয়াছেন। যদু, কুরু, অনু প্রভৃতি বিভিন্ন আর্য জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ হইতে ১৫০০ বছরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমভারতে—পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু অঞ্চলে—আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। এই সময় হইতে স্থানীয় অনার্য জাতিগুলির সহিত তাহাদের যেমন বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতে থাকে, তেমনি নিজেদের মধ্যেও আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়। এই ধরনের একটি বড় যুদ্ধ হইল মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কুরু ও পাণ্ডব অবশ্য দুইটি পৃথক জনগোষ্ঠী নহে, একই জনভুক্ত বংশের দুইটি শাখা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালে, আনুমানিক ১০০০।৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, কেবল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নহে, একই জনভুক্ত বংশের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের মূল কাহিনীর উৎস এই সময়ে (১০০০।৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব) সন্ধান করিতে হয়। দুইটি কাহিনী যাহা লইয়া ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার আসল তাৎপর্য একই—আর্যাবর্ত হইতে পূর্বভারতে ও দক্ষিণভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের এবং রামায়ণে দশরথ-পুত্রদের দিগ্বিজয়ের কাহিনীতে এবং অসুর-রাক্ষস-নাগ-নিষাদ-দৈত্য-দাসদের (অর্থাৎ অনার্যদের) সহিত বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে আর্যসভ্যতার ভারত-বিজয়ের আভাস পাওয়া যায়। আর্যদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সহিত ভারতের জনসমাজ যে নূতন রূপ ধারণ করিতেছিল

তাহারও চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় এই দুই মহাকাব্যে, বিশেষ করিয়া মহাভারতে। এইজন্য কথায় বলে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"—অর্থাৎ যাহা মহাভারতে নাই তাহা ভারতে নাই। আর্য-অনার্যের সংঘাত ও সংমিশ্রণ, সংঘাতের ভিতর দিয়া নূতন হিন্দুসমাজের রূপায়ণ ও গড়ন, নূতন শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত উপকরণ মহাভারতে আগাগোড়া ছড়াইয়া আছে।

আর্য-অনার্য সভ্যতার সংঘাতে ভারতে হিন্দুসভ্যতার বিকাশ হয়। আর্য-সভ্যতা অনার্যদের তুলনায় অন্তত পার্থিব সম্পদে উন্নত ছিল না। আর্যসভ্যতা ছিল প্রধানত যাযাবর পশুপালকের সভ্যতা এবং আংশিক গ্রামীণ সভ্যতা। তাহার আগেই অনার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়রা ভারতে বেশ উন্নত গ্রামীণ ও নাগরিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহা হইলে ভারতসভ্যতায় আর্যদের কি দান আছে?

সভ্যতার বাস্তব সম্পদের মধ্যে আর্যদের বড় দান হইল 'ঘোড়া'। ভারতে হাতী ও গরু ছিল আর্যপূর্ব যুগে পালিত পশুর মধ্যে প্রধান—দুইটিই স্থিরতার প্রতিমূর্তি। চলার পথে গতি অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি যোগান দেওয়া হাতী ও গরুর পক্ষে সম্ভব নহে। ঘোড়া গতিবেগ ও শক্তি দুইয়েরই প্রতিমূর্তি। আর্যদের জয় এই গতির জয় এবং শক্তির জয়। ভারতের সমাজে এই জয়ের ফলে নূতন গতি বা চলৎশক্তি এবং সংগ্রামশক্তি সঞ্চারিত হয়।

বাস্তব পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা ভারতসংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদের দান আর্যদের অনেক বেশী। সামাজিক দানও গুরুত্বপূর্ণ। এই দানগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়—

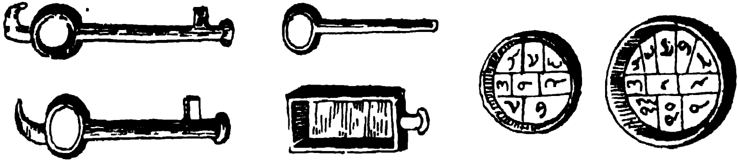
১। মহান আধ্যাত্মিকতা। ইহা উচ্চ দার্শনিক চিন্তার সহায় হইয়াছে এবং হিন্দুসভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

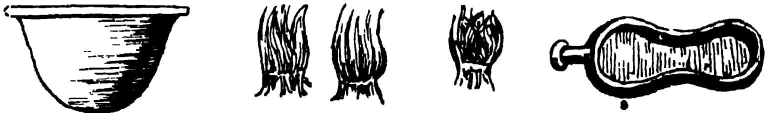
২। সুবিন্যস্ত চিন্তাশক্তি। এই চিন্তাশক্তি জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন শাখাকে একটি সুবিন্যস্ত রূপ দিয়াছে।

৩। কল্পনার শৃঙ্খলা। সাহিত্যশিল্প অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইয়াছে কল্পনার সংযম ও শৃঙ্খলার জন্য। পূর্বে যে কল্পনার উদ্‌ভটত্ব, বিশৃঙ্খলা ও অসংযম ছিল, নূতন শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহা ক্রমেই বর্জিত হইয়াছে।

৪। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। সমাজের নানাজাতি ও জনগোষ্ঠীকে নিজ নিজ কর্ম ও কর্তব্যের বন্ধনে সমাজবদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের

বৃত্তিগত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া আর্যরা নিরাকার জনসমাজকে একটি বিশিষ্ট আকার ও রূপ দিয়াছিলেন। তৎকালে ইহার অর্থনীতিক তাৎপর্যও গভীর ছিল। বিভিন্ন বৃত্তি, ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারনার অনুগামী বহু জনগোষ্ঠীকে একসমাজভুক্ত করিবার কৌশল হিসাবেও বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।





আর্যদের যজ্ঞের জিনিসপত্র

৫। আশ্রম ও তপোবনের শিক্ষা। শিক্ষার উচ্চাদর্শ আর্যরাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করা নহে অথবা কোন বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করা নহে, চিত্তবৃত্তি ও ভাববৃত্তির অনুশীলন করা—ইহা বুঝাইবার জন্য ঋষি ও গুরুর কাছে আশ্রমে-তপোবনে থাকিয়া শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

৬। জীবনের চতুরাশ্রম। সমাজে যেমন 'চাতুর্বর্ণ্য', জীবনে তেমনি 'চতুরাশ্রম' ব্যবস্থা আর্যদের প্রধান দান। জীবনের পব চারটি—বাল্য-কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। এই চারটি পর্বে যথাক্রমে চারটি আশ্রমের ধর্ম প্রত্যেক মানুষের পালন করা কর্তব্য। প্রথম পর্বে বাল্যে ও কৈশোরে ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পর্বে যৌবনে গার্হস্থ্য, তৃতীয় পর্বে প্রৌঢ়ত্বে বানপ্রস্থ এবং চতুর্থ পর্বে বার্ধক্যে সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা ও সংযতব্রত পালন করা উচিত। গার্হস্থ্যাশ্রমে অর্থ ও কামের উপভোগের বিধান আছে। কিন্তু আসক্তি ও উপভোগের সীমা থাকা প্রয়োজন। প্রৌঢ়ত্বে বানপ্রস্থাশ্রমে সমস্ত বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করা উচিত। তারপর বার্ধক্যে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ধর্মসাধনায় মোক্ষলাভের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

সমাজকে আর্যরা চাতুর্বর্ণ্যের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন, চতুরাশ্রমের দ্বারা ব্যক্তিজীবনকেও তাঁহারা সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে এই শৃঙ্খলা-সংযমের ভিত্তির উপরেই হিন্দুসমাজের বিশাল সৌধ গড়িয়া ওঠে। রামায়ণে যে সমস্ত তপোবন ও আশ্রমের বিবরণ পাওয়া যায় সেইগুলি ক্রমে মনে হয় আর্যদের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল এবং হিন্দুসভ্যতার প্রধান বিকিরণকেন্দ্র ছিল এই উপনিবেশগুলি। তারপর ধীরে ধীরে এইসব উপনিবেশের চতুর্দিকে অবস্থিত অনার্যদের নূতন সমাজব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের বিশাল ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। আর্যদের সুবিন্যস্ত চিন্তাধারা নূতন সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার বিকাশে সহায় হইয়াছে।

বৌদ্ধ-জৈনধর্মের দান

বৌদ্ধ-জৈনধর্মের দান। বৈদিক যুগের শেষে এবং আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে গঠিত নূতন হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী পর্বে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হয়। এই দুই ধর্মই আর্যদের বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আর্যরা নূতন ধর্ম ও সমাজকে অত্যধিক ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুনের নিগড়ে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটি বেশী মাত্রায় আচারসর্বস্ব হইয়া উঠিতেছিল। ঋক্‌বেদের দেবতারা বাহিরের প্রকৃতির মতো সরল ছিলেন, তাঁহাদের তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করাই ঋক্‌বৈদিক যুগের আর্যদের ধর্ম ছিল। এই ধর্মের ভিতরে দুর্বোধ্য কোন গূঢ় তত্ত্ব ছিল না, কিন্তু উপনিষদের যুগে ক্রমে ধর্ম নিগূঢ় তত্ত্বে পরিণত হইল। সাধারণের তাহা বোধগম্য হইল না। তাহার উপর ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্র সমাজ ও মানুষের জীবনকে আচার-অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে উদ্যত হইল। এই বন্ধনের বিরুদ্ধে এই সময় বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক হইলেন দুইজন ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসী—মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথা পালনের দ্বারা নহে—এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোন ভেদকে চিরন্তর সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন।"

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর এবং গৌতমের জন্ম। প্রাচীনভারতের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, কারণ বুদ্ধের জন্মকালের উপর নির্ভর করিয়া এই সময় হইতে আমাদের ইতিহাসের একটি কালক্রম (chronology) নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের কাল ৫৬৭-৪৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া বর্তমানে স্বীকৃত। মহাবীর বয়সে গৌতম অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। বুদ্ধের সময়ে উত্তরভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন উজ্জয়িনীর প্রদ্যোৎসেন, কৌশাম্বীর উদয়ন, কোশলের প্রসেনজিৎ ও মগধের বিম্বিসার। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে বুদ্ধের জন্ম হয়। মহাবীরের জন্ম হয় বৈশালী নগরে, উত্তর-বিহারে।

পথে পঙ্গু, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ও মৃত মানুষ দেখিয়া রাজপুত্র গৌতম মানুষের রোগ, দুঃখ, জরা ও মৃত্যুর চিন্তায় কাতর হইয়া পড়েন। তাহা হইলে মানুষের মুক্তি কোথায়, শান্তি কিসে? এই মুক্তির সন্ধানে গৌতম রাজসংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান এবং নানাস্থানে তপস্যা করেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যানস্থ হইয়া সত্য-জ্ঞান লাভ করেন।

বৌদ্ধধর্মের সারকথা—অহিংসা, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী। অসংযত সুখভোগ অথবা অতিসংযত কঠোর তপস্যা ও বৈরাগ্য, কোনটাই গৌতম সাধনার উত্তম পথ বলিয়া মনে করিতেন না। ভোগবিলাস নহে, বৈরাগ্য-বিলাসও নহে—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথই বুদ্ধ ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ পথ মনে করিতেন। ইহাকেই বুদ্ধের 'মধ্য-পন্থা' বলা হয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'শীল' গ্রহণ করাই মুক্তিলাভের উপায়। 'চরিত্র' শব্দের অর্থ হইল যাহাতে করিয়া চলা যায়। শীলের দ্বারা চরিত্র গড়িয়া ওঠে এবং শীল হইল চলিবার নীতি। প্রাণীকে হত্যা করিবে না, যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই তাহা লইবে না, মিথ্যাচরণ করিবে না—এইগুলি প্রত্যেকটি এক-একটি শীল। প্রতিদিন ভাবিবে—সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংস হোক—কারণ ইহাই মৈত্রীভাবনা। ইহাই বৌদ্ধধর্মের সারকথা।

বৌদ্ধধর্ম কোন জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী মানিত না। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধদের বহু দান আছে। প্রধান দান এইগুলি—

১। বৌদ্ধধর্ম আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য-বর্জিত লোকপ্রিয় ধর্ম। ইহা

কোন পুরোহিতশ্রেণীর কুক্ষিগত ধর্ম নহে এবং পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষার বদলে সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় প্রথম প্রচারিত ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের আরও একটি বড় দান হইল মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তারূপে ব্যক্তির আবির্ভাব। ইহার পর হিন্দুধর্মে অবতারবাদের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়।

২। বৌদ্ধরাই বোধ হয় প্রথম ভারতে মূর্তিপূজা ও দেবালয় স্থাপনের প্রথা প্রচলন করেন। বুদ্ধের নির্বাণের পর তাঁহার ভস্মাধার স্তূপের ভিতরে রক্ষিত হয়। ক্রমে তাঁহার মূর্তি তৈরী হইতে থাকে এবং তাহার পূজা আরম্ভ হয়। মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় স্তূপে ও চৈত্যে। ইহার পর হিন্দুধর্মের মূর্তি-পূজা ও দেবালয় প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইয়া যায়।

৩। বৌদ্ধদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দান হইল শ্রমণদের বা ভিক্ষুদের জন্য মঠ ও বিহার স্থাপন। ইহার আগে ভারতের ইতিহাসে আর কোন ধর্মাবলম্বীরা 'মঠ' স্থাপন করেন নাই। ধর্মাচার্যদের বা শ্রমণদের (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের) একত্রে মঠে অবস্থান করার রীতিও এই প্রথম প্রচলিত হয়। নারীদের ভিক্ষুণী হইবার অধিকার আছে, একথা বুদ্ধ নিজে স্বীকার করিয়াছিলেন। নারীর সত্যজ্ঞান লাভের ক্ষমতা আছে কি না—প্রিয়শিষ্য আনন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "নারীরও ক্ষমতা আছে" এবং তিনি নারীর সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া বৌদ্ধরা ভারতের সামাজিক ইতিহাসেও এক যুগান্তকারী আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

৪। বৌদ্ধরা বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

৫। ভারতের শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে বৌদ্ধধর্মের দান অতুলনীয়। আজও পৃথিবীর কাছে ইহা বিস্ময়ের বস্তু।

৬। ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশ ও জাতির সহিত (বিশেষ করিয়া এসিয়া মহাদেশের) সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনে বৌদ্ধধর্মই প্রধান সহায় হইয়াছে। ভারতের বাহিরে বর্মা, চীন, জাপান, শ্যাম, জাভা, মোঙ্গলিয়া, তিব্বত, মধ্যএসিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন: "মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে ব্যাপ্ত হল দেশদেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে

ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্য সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশবিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন, ব্রহ্মদেশ, জাপান, এল তিব্বত, মোঙ্গলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে।"

জৈনধর্ম। 'জি' ধাতু হইতে 'জৈন' কথার উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি সমস্ত প্রবৃত্তি জয় করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত জৈন। জৈনদের 'নির্গ্রন্থ' বলা হয়। যাঁহার কোন গ্রন্থি বা বন্ধন নাই তিনি নির্গ্রন্থ। জৈনধর্মের প্রবর্তক পার্শ্বনাথ চারটি ব্রত পালনের নির্দেশ দিয়াছেন—(১) জীবহত্যা না করা বা অহিংসা; (২) মিথ্যা না বলা বা সত্য; (৩) চুরি না করা বা অচৌর্য; (৪) বিষয়সম্পত্তির প্রতি আসক্ত না হওয়া বা অপরিগ্রহ। পার্শ্বনাথের পরে মহাবীর এই ধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্মের পাশে ভারতে জৈনধর্মের তেমন ব্যাপক প্রসার হয় নাই। সাহিত্যে, শিল্পকলায় ও ভাস্কর্যে জৈনদের কিছু উৎকৃষ্ট দান আছে।

মৌর্যসম্রাট অশোকের ধর্ম

অশোকের ধর্ম। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক ২৬৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মগধের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহাবীর ও বুদ্ধের মৃত্যুর পরে মৌর্যযুগই ভারতের গৌরবময় যুগ এবং এই যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা' অশোক। অভিষেকের অষ্টম বর্ষে অশোক কলিঙ্গদেশ (উড়িষ্যা-গঞ্জাম) জয় করেন এবং যুদ্ধে হতাহতের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার জীবনের মোড় ঘুরিয়া যায়। তিনি প্রকাশ্যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। রাজকীয় বিহারযাত্রা ত্যাগ করিয়া তিনি নিজেই ধর্মযাত্রা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অশোক যে-ধর্ম প্রচার করেন তাহা ঠিক বৌদ্ধধর্ম নহে। তাহাকে এক নূতন মানবধর্ম বলা যায়। রাজ্যের নানাস্থানে শিলাফলকে, শিলাস্তম্ভে ও গুহাগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অশোক তাঁহার অনুশাসনে দ্বাদশটি গুণের অনুশীলন করিতে নির্দেশ দেন। গুণগুলি এই—

দয়া	অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয়
দানশীলতা	সংযম

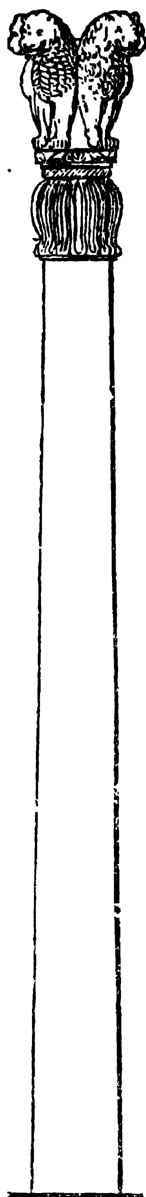
সত্যানুরাগ	ভাবশুদ্ধি
শুচিতা	কৃতজ্ঞতা
মৃদুতা	দৃঢ়ভক্তি
সাধুতা	ধর্মরতি

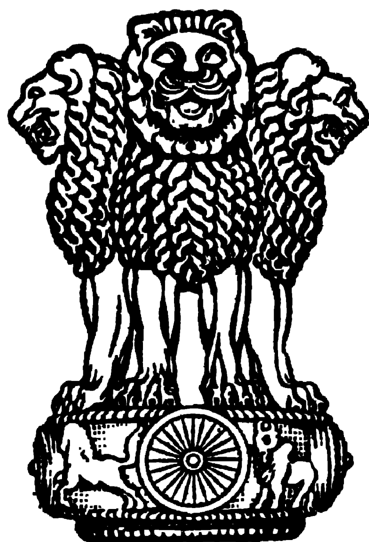
অশোক জনসমাজে মুখে মুখে ধর্মপ্রচার করিবার জন্য ধর্মমহামাত্যদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। যতদূর জানা যায় অশোকের আগে ভারতের আর কোন সম্রাট জনসমাজে ধর্মপ্রচারের জন্য এরকম কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ঐতিহাসিকরা বলেন, রাজশক্তি ও মানবিক উদারগুণের সমন্বয় ভারতের ইতিহাসে তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসেও অশোকের মতো দ্বিতীয় আর কোন সম্রাটের মধ্যে হয় নাই।

ভারতের ইতিহাসে অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইল—উদার মানবধর্মকে রাজধর্মরূপে গ্রহণ এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়াও অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শকে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় শিল্পকলায়, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অশোক-যুগের দান কলাবিদরা অসামান্য বলিয়া স্বীকার করেন। অশোকের স্থাপিত প্রস্তরস্তম্ভগুলি কারুকর্ম ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেহ কেহ বলেন যে ভারতে প্রস্তরশিল্পের বা ভাস্কর্যের প্রথম বিকাশ হয় অশোকযুগে, তাহার আগে কাষ্ঠশিল্পের চর্চাই বেশী হইত, শিল্পীরা তেমন পাথর ব্যবহার করিতেন না। অশোকযুগের আরও একটি বড় দান হইল 'ব্রাহ্মীলিপি'। এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই বহু ভারতীয় ভাষার বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।

যুগসন্ধিকাল

যুগসন্ধি। ১৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া শুঙ্গবংশের পুষ্যমিত্র রাজসিংহাসন দখল করেন। এই সময় হইতে গুপ্ত-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় (৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ বছরের ভারতের ইতিহাসকে যুগসন্ধিকাল বলা যায়। গ্রীক, শক, পার্থিয়ান, কুষান প্রভৃতি বিদেশী জাতি সন্ধিক্ষণের বিশৃঙ্খলার সুযোগে এবং প্রবল রাজশক্তির অভাবের জন্য ভারতে অভিযান করেন। এই বিদেশীদের মধ্যে কুষানরাই বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ কুষানরাজ হইলেন কনিষ্ক।





অশোকস্তম্ভ। বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের প্রতীক

গ্রীক, পার্থিয়ান ও কুষানরা বিদেশী হইয়াও ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। গ্রীকরাজা মিনাণ্ডার ও কুষানরাজা কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। হেলিওডোরস নামে একজন গ্রীক রাজদূত পরম বিষ্ণুভক্ত হইয়া একটি গরুড়স্তম্ভ পর্যন্ত স্থাপন করেন। কুষানরাজা কদফাইসেস ছিলেন শিবভক্ত, তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রার (coin) ছবি হইতে তাহা বোঝা যায়। কনিষ্কের সময় বৌদ্ধ আচার্যদের যে সম্মিলন হয় তাহাতে বুদ্ধমূর্তি পূজার প্রথা প্রচলিত হয়। এই জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মই 'মহাযান' ধর্ম নামে পরিচিত হয় এবং পুরাতন বৌদ্ধধর্ম 'হীনযান' নামে বিভক্ত হইয়া যায়। গ্রীক ও কুষান রাজাদের পোষকতায় বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণে শিল্পীরা উৎসাহিত হন এবং তাহার ফলে ভাস্কর্যের দ্রুত উন্নতি হয়। এই বিদেশী গ্রীক, শক ও কুষান রাজারা প্রথম রাজনামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন এদেশে। ভারত-জনের ধর্মকেও তাহারা রাজধর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। ভারতসংস্কৃতিতে এই যুগসন্ধিক্ষণের ঐতিহাসিক দান এইগুলি এবং ইহা প্রধানত বিদেশীদের দান।

ইহার আগে ভারতসীমান্তে যখন পারসী ও গ্রীকরা হানা দিয়াছিল তখন জনৈক 'চন্দ্রগুপ্ত' ভারতকে অরাজকতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রবল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি মৌর্যবংশের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। দ্বিতীয়বার আর একজন চন্দ্রগুপ্ত ভারতকে বিদেশীদের আংশিক আধিপত্য হইতে মুক্ত করিয়া একচ্ছত্র রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

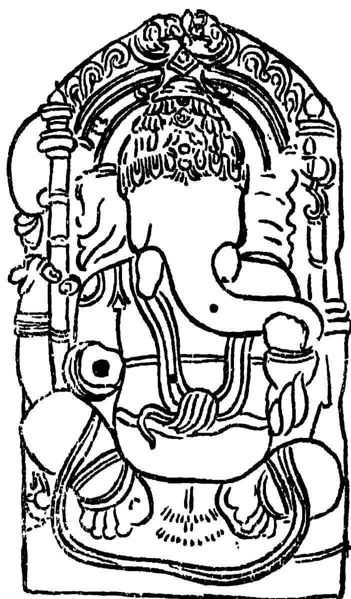
গুপ্তযুগ। প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ

গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন সমুদ্রগুপ্ত এবং চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় অষ্টম দশক পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। যমুনা ও চম্বল হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এবং হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের যে নবরত্নসভার কথা শোনা যায়, ঐতিহাসিকরা কেহ কেহ মনে করেন দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত সেই বিক্রমাদিত্য। প্রায় ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত গুপ্তবংশের রাজারা বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া যায়। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে উত্তরভারতের রাষ্ট্রমঞ্চে দুইজন রাজা প্রবল হইয়া ওঠেন—একজন কনৌজের হর্ষবর্ধন, আর একজন বাংলার শশাঙ্ক।

ভারতীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন



বিষ্ণুমূর্তি



গণেশমূর্তি

গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। যদিও গুপ্তযুগ ভারতে হিন্দুপ্রাধান্য ও অভ্যুত্থানের যুগ, তাহা হইলেও এই যুগে ধর্ম-সংস্কৃতি ও শিল্পকলার চরম বিকাশ হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতেও তাহা বোঝা যায়। ধর্ম সাহিত্য শিক্ষা শিল্পকলা বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে গুপ্তযুগে নব নব প্রতিভার উন্মেষ হয় এবং ভারত-সংস্কৃতির ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরিয়া যায়। এইজন্য গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হইয়া থাকে।

সমুদ্রগুপ্ত নিজে কবি-সম্রাট বা কবি-রাজ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় বিখ্যাত কবি ছিলেন হরিসেন। আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁহার পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের

নবরত্নসভার কথা সর্বজনবিদিত। মহাকবি কালিদাস এই সভার মধ্যমণি। ভারবিও এই যুগের অন্যতম কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সমস্ত কাব্য ও নাটক

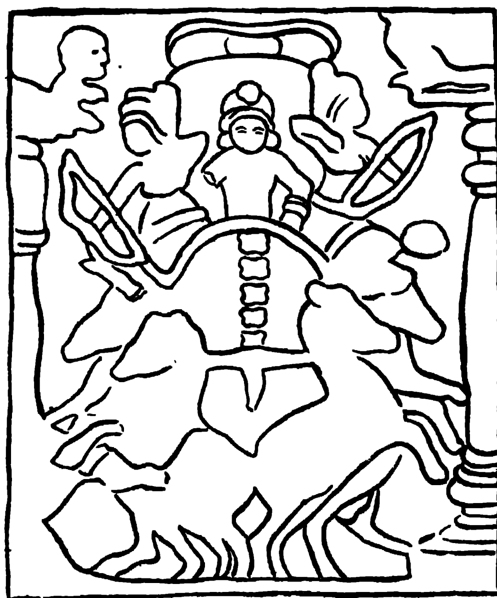


মুখলিঙ্গম নটেশ

আজও গুণীজনেরা সমাদর করিয়া থাকেন, গুপ্তযুগে তাহার অনেকগুলি রচিত হইয়াছে। মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ গুপ্তযুগে বর্তমান আকারে রূপায়িত ও সংকলিত হইয়াছে। স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে 'নারদস্মৃতি' ও 'বৃহস্পতিস্মৃতি' এই সময়ের রচনা। কাব্যনাট্য, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-স্মৃতি প্রভৃতি রচনা-সম্ভারে গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চারও ইহা গৌরবময় যুগ। এই সময় জ্যোতিষ-বিজ্ঞানী আর্যভট্টের আবির্ভাব হয়। পৃথিবী যে তাহার নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরিতেছে, এসত্য প্রথম আর্যভট্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এক-একটি দিন কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে আর্যভট্ট তাহাও প্রায় নির্ভুল গণনা করিয়াছিলেন। এই যুগের ভারতীয় গণিতবিদরা প্রথমে শূন্য-তত্ত্ব (theory of zero) আবিষ্কার করেন এবং দশমিক প্রথায় গণনারও বিকাশ হয় এই সময়। বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষবিদ্যার আরম্ভ হয় আর্যভট্ট হইতে। এই যুগের

আর-একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বরাহমিহির বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। 'বৃহৎসংহিতা' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' তাঁহার প্রসিদ্ধ



সূর্যমূর্তি

গ্রন্থ। ভারতের আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও এই বিশেষ চর্চা হয় এবং শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার যে কতদূর উন্নতি হয় তাহা চরক সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে বোঝা যায়। প্রাচীন হিন্দু রসায়নবিদ্যারও উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। গুপ্তযুগে নির্মিত দিল্লীর লৌহস্তম্ভ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় সেযুগে ধাতুবিজ্ঞানের (metallurgy) কতদূর উন্নতি হইয়াছিল। গত ১৫০০ বছরের মধ্যেও এই লৌহস্তম্ভের গায়ে মরিচা ধরে নাই। সেযুগে এরকম নিষ্কলঙ্ক লৌহ প্রস্তুত করা আর-কোন দেশে সম্ভব হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তামা ও ব্রোঞ্জের দেবদেবীর মূর্তি হইতেও ধাতুবিদ্যার চর্চা ও উৎকর্ষের আভাস পাওয়া যায়।

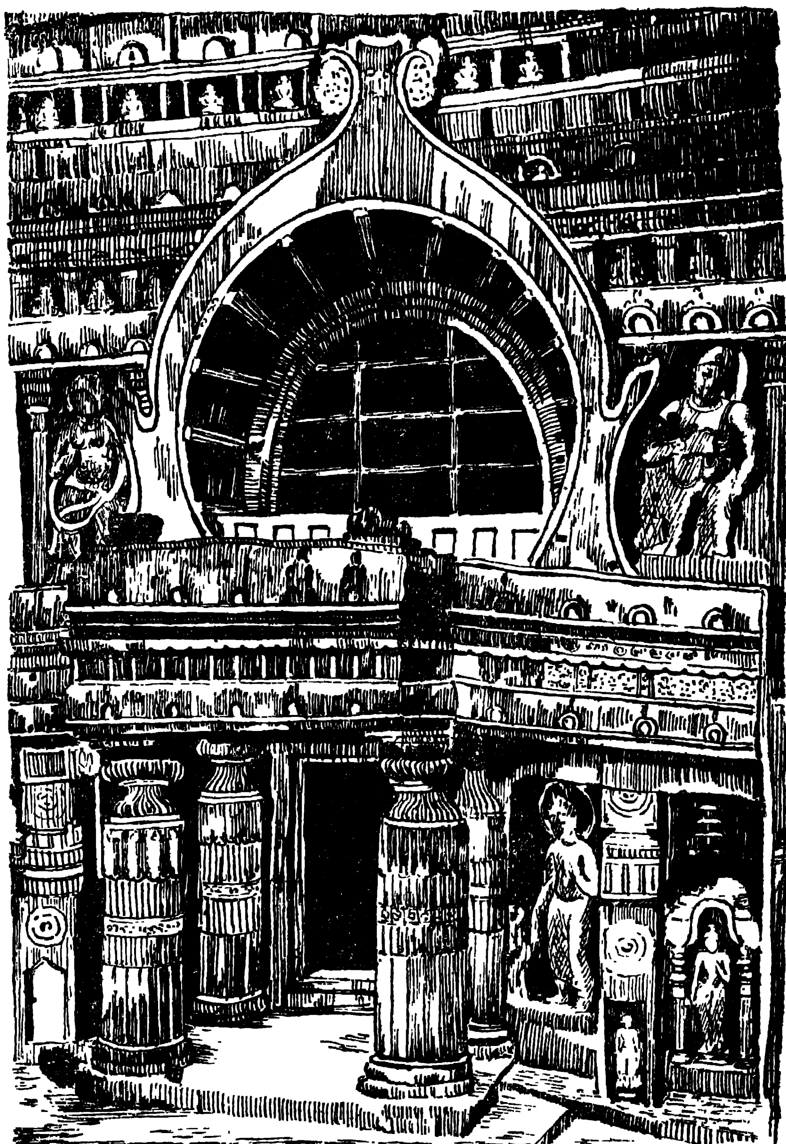
গুপ্তযুগে ভারতের শিল্পকলারও চরম উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ের বহু মন্দির প্রাসাদ, ধাতু ও পাথরের মূর্তি, স্তম্ভ ও খোদিত চিত্র হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। এইসব নিদর্শন বেশীর ভাগ পাওয়া গিয়াছে মথুরা ও বারাণসী অঞ্চলে, বিহার ও বাংলাদেশে কম। কলাবিদরা বলেন যে

গুপ্তযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্য উভয়ই ভাবগাম্ভীর্যে ও অঙ্গবিন্যাসের সামঞ্জস্যে অতুলনীয়। মথুরা ও কুষান ভাস্কর্যে যে রূঢ়তা ছিল এবং গন্ধার ভাস্কর্যে যে গ্রীক প্রভাব ছিল তাহা এইসময় এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত হইয়া ওঠে। ভারতীয় ভাস্কর্যের নিজস্ব ক্ল্যাসিক্যাল রীতির বিকাশ হয়। এই শিল্পরীতি ও ভাস্কর্যই বৃহত্তর ভারতে—সিংহল শ্যাম জাভা ও ব্রহ্মদেশে—পরবর্তীকালে বিস্তারলাভ করে।

হায়দারাবাদে অজন্তাগুহার চিত্রাবলী গুপ্তযুগের চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অজন্তায় কতকগুলি গুহা বৌদ্ধ মঠরূপে ব্যবহার করা হইত, কোন কোন গুহাতে বেশ বড় বুদ্ধমূর্তিও ছিল। অজন্তার ফ্রেস্কো বা দেয়ালচিত্রই বিখ্যাত। এই চিত্রগুলি বৌদ্ধ জাতক ও ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। ইহার মধ্যে সেকালের সমাজচিত্রও অনেক পাওয়া যায়—যেমন বাণিজ্যযাত্রা, উপনিবেশযাত্রা, গার্হস্থ্যজীবন ইত্যাদি। বিশ্বের শিল্পানুরাগীদের কাছে অজন্তার গুহাচিত্র আজও এক বিস্ময়ের বস্তু।

গুপ্তযুগকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানের যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা সত্য, কিন্তু একমাত্র সত্য নহে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রধান রাজপোষকতা লাভ করিলেও গুপ্তযুগে অন্যান্য ধর্মের অনুশীলনে কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় নাই। এক্ষেত্রে গুপ্তসম্রাটরা তাঁহাদের পূর্বগামী সম্রাটদের উদারনীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ, ভাগবত ও পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। অনেক বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য ও দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল গুপ্তযুগে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অসঙ্গ বসুবন্ধু কুমারজীব ও দিগ্‌নাগ।

গুপ্তযুগের ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 'ভক্তিবাদ'। এই ভক্তিবাদ হিন্দুধর্মকে এই সময় আচারনিষ্ঠার কঠোর বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মানবমুখী ও উদার করিয়া তোলে। এই যুগের লিপি মুদ্রা ও নানাবিধ সাহিত্যিক নিদর্শনে দেখা যায় যে বৈষ্ণব রাজারা শৈব ও বৌদ্ধ রাজকর্মচারীদের কর্মে নিযুক্ত করিতেছেন, জৈনরা ব্রাহ্মণদের এবং ব্রাহ্মণরা জৈনদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। এই উদারতা ও মানবতার ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই গুপ্তযুগে ভারতসংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ হইয়াছিল সর্বক্ষেত্রে।



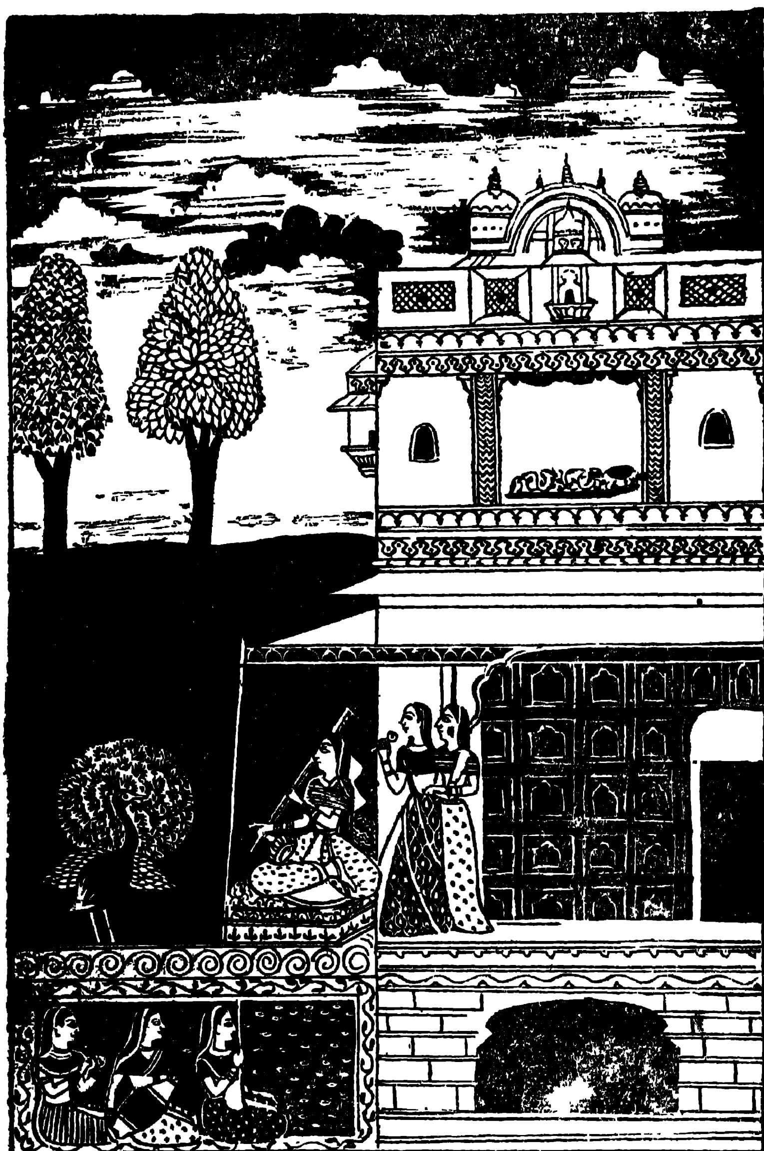
অজন্তা গুহার অভ্যন্তর

বাংলার পাল ও সেনরাজাদের যুগ

গুপ্তযুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজারা রাজত্ব করিতেন। বাংলার কতকাংশ গুপ্তরাজাদের শাসনে ছিল বলিয়া মনে হয়। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বাংলাদেশে শশাঙ্ক নামে এক প্রবল প্রতাপশালী রাজা মাথা তুলিযা দাঁড়ান এবং সমগ্র উত্তর-ভারতের অধীশ্বর হইবার স্বপ্ন দেখেন। কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হন। মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'রাঙ্গামাটি' নামক স্থানে শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। মনে হয় শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে। ধর্মপাল দেবপাল বিগ্রহপাল নারায়ণপাল প্রভৃতি এই বংশের বিখ্যাত রাজা। পালবংশের পরে বাংলাদেশে সেনরাজবংশ রাজত্ব করেন—প্রায় দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বক্তিয়ার খিলজীর অভিযান পর্যন্ত (১২০২-৩ খ্রীষ্টাব্দ)। পালরাজারা প্রায় ৪০০ বছর বাংলাদেশে রাজত্ব করেন এবং সেনরাজারা প্রায় ১৫০ বছর। এই সময় একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে বাঙালীরা রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পালরাজারা বুদ্ধের উপাসক ছিলেন, কিন্তু ধর্মবিষয়ে তাঁহারা যে কত মহানুভব ছিলেন তাহা শুধু একটি দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যায়। রাজারা বৌদ্ধ হইলেও বংশানুক্রমে তাঁহাদের মন্ত্রীরা ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক ব্রাহ্মণ। পালযুগের শিল্পকলা কেবল বাংলাদেশে নহে, সমগ্র ভারতের গৌরবের বস্তু। জৈন বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর শত শত মূর্তি পালযুগের শিল্পনিদর্শন হিসাবে বাংলা বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে বিখ্যাত হইল 'চর্যাপদ' ও সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' কাব্য। বাংলা ভাষা ও পদাবলী সাহিত্যের আদি উৎস এই চর্যাপদ। দর্শনশাস্ত্রে এই সময় একজন প্রতিভাবান বাঙ্গালী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বিখ্যাত 'ন্যায়কন্দলী' প্রণেতা শ্রীধর ভট্ট। পালযুগের বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য ও দার্শনিকদের মধ্যে খ্যাতনামা হইলেন শীলভদ্র (পালযুগের কিছু পরে), শান্তিরক্ষিত, শান্তিদেব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রীমিত্র, অভয়াকরগুপ্ত।



ভারতীয় চিত্রকলা—রাজস্থানী

ইহাদের মধ্যে অনেকে তিব্বত সিংহল জাভা শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

সেনরাজাদের আমলে বাংলাদেশে সংস্কৃত-সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার যথেষ্ট উন্নতি হয়। বল্লালসেন নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বেদস্মৃতিপুরাণাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। রাজা লক্ষ্মণসেন কাব্যসাহিত্যের যথেষ্ট পোষকতা করিতেন—উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব মিশ্র, শরণ ও ধোয়ী তাঁহার আশ্রিত কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কবি উমাপতি ধর বল্লাল-সেনের মন্ত্রীও ছিলেন। ধোয়ী রচিত দূতকাব্য (মেঘদূতের মতো) 'পবনদূত' এবং জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দক্ষিণভারতের সাংস্কৃতিক দান

এতক্ষণ যে ইতিহাসের ধারার কথা আলোচনা করা হইল তাহা প্রধানত উত্তরভারতের। দক্ষিণভারতে অন্ধ্র চের চোল পাণ্ড্য প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিমান রাজারা ছিলেন। অন্ধ্রের সাতবাহনবংশের রাজারা উত্তরে কিছুটা অঞ্চল জুড়িয়া তাঁহাদের প্রভুত্বও বিস্তার করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণভারতে পল্লব চালুক্য ও চোলরাজবংশ রাজত্ব করেন। ধর্ম সাহিত্য শিল্পকলা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এইসব রাজবংশের দান অতুলনীয়।

উত্তরভারতের আর্য জৈন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ চালুক্যরাজ দ্বিতীয়-পুলকেশীর রাজত্বকালে (৬০৯-৪২ খ্রীষ্টাব্দ) যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন সেখানে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি শৈবধর্মের বিকাশও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পল্লব রাজবংশ শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ পোষক ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজধানী কাঞ্চীপুরম ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির মহাকেন্দ্র ছিল। পল্লব ও চালুক্যদের পোষকতায় দাক্ষিণাত্যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রবল অভ্যুত্থান হয় এবং চোলবংশের রাজারাও তাহাতে অকাতরে সাহায্য করেন। জৈন-বৌদ্ধধর্মের প্রধান্য এই সময় হইতে দক্ষিণভারতে দ্রুত কমিতে থাকে।

অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের সমাজ-



দক্ষিণভারতের
মীনাক্ষী মন্দিরের
ভাস্কর্য

সংস্কৃতিক্ষেত্রে দক্ষিণভারতে ধর্মপ্রবর্তকরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময় হইতে মনে হয় যেন উত্তরভারতের সাংস্কৃতিক আধিপত্য বেশ খানিকটা দক্ষিণভারতের কাছে খর্ব হইতে থাকে। ভারতের বিখ্যাত ধর্ম-প্রবর্তকদের আবির্ভাব হয় দক্ষিণে। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক ও আনন্দতীর্থ বা মধ্ব। শঙ্করাচার্য নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ম-এর তিনি নবপ্রবর্তক। ভারতের নানা-স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্কর তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা নূতন ধর্মমত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা পূর্বে বৌদ্ধধর্মে ছিল, সেইজন্য শঙ্করের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধদের প্রভাব ম্লান হইতে থাকে। রামানুজ একাদশ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের কাছে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করের বিশুদ্ধ জ্ঞানসর্বস্ব ধর্মমত সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটা দুর্বোধ্য ছিল, রামানুজ তাহার সহিত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব মিশাইয়া কিছুটা জনগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন। রামানুজের সমকালীন হইলেন নিম্বার্ক। ধর্মের মধ্যে নিম্বার্ক ভক্তিভাব সঞ্চারিত করেন। ত্রয়োদশ শতকে মধ্ব এই ভক্তির ধারাকে পরিপুষ্ট করেন। ক্রমে দক্ষিণভারতে শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে ভক্তি ও প্রীতির বন্যা বহিতে থাকে এবং সেই বন্যায় সমগ্র ভারত ভাসিয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মের এই ভক্তি-প্রীতির ধারাটিকেই পরে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদরা বাংলাদেশে নূতন রূপ দান করেন।

দেবালয় স্থাপত্যে পল্লব চালুক্য চোল ও বিজয়নগরের রাজারা দক্ষিণ-ভারতে এক নূতন যুগ প্রবর্তন করেন। দক্ষিণের দেবালয়গুলি ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। উত্তরভারতে গুরুগৃহ ছিল, তপোবন বিহার ও মহা-বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু এই রকম দেবালয়কেন্দ্রিক বিদ্যাকেন্দ্র বিশেষ ছিল না।

মধ্যযুগ। মুসলমান রাজত্বকাল

সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ আরবদেশে ইসলামধর্ম প্রবর্তন করেন। ইহার অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে মহম্মদ-বিন কাসিম নামে একজন আরব সেনাপতি সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করিয়া ভারতে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ দেখান। এই আরব অভিযানের রাজনীতিক গুরুত্ব বিশেষ না থাকিলেও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কিছু আছে। ভারতসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ উদ্‌যোগী আরব বণিকরা এই সময় বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবার

সুযোগ পান। ভারতের ধর্ম দর্শন চিকিৎসাশাস্ত্র গণিতশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া আরবরা নিজেরা উপকৃত হন এবং ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে তাহার বিস্তারের সাহায্য করেন। আরবের জ্ঞানবিদ্যার সান্নিধ্যে আসিয়া ভারতসংস্কৃতিও সমৃদ্ধ হয়।

ইসলামধর্মীদের মধ্যে তুর্ক-উপজাতি খুব দুর্ধর্ষ ও তেজস্বী ছিল। আফগানিস্তানে গজনি শহরে দশম খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ভাগে তাহারা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজবংশের বিখ্যাত শাসক ছিলেন কুখ্যাত সুলতান মামুদ। সতেরবার তিনি ভারত অভিযান করিয়া নির্বিচারে ধনরত্ন ও দেবদেউল লুটতরাজ করেন। তাঁহার বারংবার আক্রমণে উত্তরভারতের বহু সুসমৃদ্ধ জনপদ জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হয়। তাঁহার পরে গজনি ও হীরাটের মধ্যবর্তী ঘোর রাজ্যের তুর্কীরা প্রবল হইয়া ওঠে। এই ঘোর রাজ্যের শাসক মহম্মদ ঘোরী ভারত অভিযান করিয়া উত্তরভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকের কথা।

ভারতের মুসলমানযুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—একটি পাঠান বা সুলতানীযুগ (১২০৬-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ), আর একটি মোগলযুগ (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ, ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু পর্যন্ত)। কিন্তু ভারতসংস্কৃতিতে মুসলমানদের দান ঠিক এইভাবে ভাগ করা যায় না, তাহাকে সমগ্ররূপে বিচার করিতে হয়।

ভারতসংস্কৃতিতে ইসলামের দান

ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকার (তাঁহার *India through the Ages* গ্রন্থে) ভারতসংস্কৃতিতে মুসলমানযুগের এই কয়েকটি দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

১। বহির্জগতের সহিত পুনরায় সংযোগ স্থাপন। দক্ষিণভারতে চোলরাজাদের পতনের পর ভারতের নৌবহর ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যের যে অবনতি হইয়াছিল, মুসলমানযুগে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

২। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, বিশেষ করিয়া উত্তরভারতে।

৩। একধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলনের ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ঐক্যস্থাপন।

৪। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকের সামাজিক পোশাক-পরিচ্ছদে ও আদব-কায়দায় সংগতি ও সাদৃশ্য স্থাপন।

৫। ইন্দো-ইসলামিক শিল্পকলারীতি প্রবর্তন, বিশেষ করিয়া নূতন স্থাপত্যরীতির প্রতিষ্ঠা। শৌখিন কারুশিল্পের উন্নতি।

৬। 'হিন্দুস্থানী' ভাষার প্রচলন।

৭। মাতৃভাষায় সাহিত্যের চর্চা ও প্রতিষ্ঠা।

৮। একেশ্বরবাদী ধর্মের পুনরুত্থান ও সুফীবাদ।

৯। ইতিহাস-সাহিত্য।

১০। যুদ্ধের কলাকৌশলের উন্নতি।

সাধারণভাবে বিচার করিলে এই দানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সহিত ইসলামধর্মের বা খ্রীষ্টধর্মের মিলন সম্ভব নহে, মিলন হয়ও নাই। কাজেই ধর্ম-সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের অস্তিত্ব হিন্দুসমাজের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছে। সামাজিক জীবনে কোনপ্রকার মিলন সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও ভারত-সংস্কৃতি ভাণ্ডার ইসলাম ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া বহু বিচিত্র সম্পদে ভরিয়া গিয়াছে এবং হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংস্কৃতিও নানাদিক দিয়া আত্মোন্নতির উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছে।

বোখারা সমরকন্দ বল্‌খ খোরাসান পারস্য হইতে লোকজনের সহিত পণ্যদ্রব্য আফগান সীমান্তের গিরিপথের ভিতর দিয়া অজস্র ধারায় ভারতে আসিয়াছে মুসলমানযুগে। কারণ আফগানিস্তান ছিল দিল্লীর মুসলমান শাসকদের অধীন, প্রায় মোগলযুগের শেষ পর্যন্ত। বোলান গিরিপথের ভিতর দিয়া, ভারত হইতে কান্দাহার ও পারস্য পর্যন্ত প্রতি বছরে প্রায় ১৪,০০০ উটের পিঠে-বোঝাই পণ্যদ্রব্য চলাচল করিত, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। ভারতের পশ্চিম-উপকূলের বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য চলিত। পূর্ব-উপকূলের বন্দর হইতে বাণিজ্যপোত সিংহল সুমাত্রা জাভা শ্যাম ও চীনদেশে যাত্রা করিত। মসলিপত্তন বন্দর ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল গোলকুণ্ডার সুলতানদের, তারপর মোগলদের।

দুইশত বছরের মোগল শাসনের ফলে সমগ্র উত্তরভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশে একধরনের সরকারী ভাষা, শাসনব্যবস্থার মুদ্রা (coin) ও

জনসাধারণের ভাষার যে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে ভারতরাষ্ট্রের বাহিরের বহু বৈসাদৃশ্য দূর হইয়াছে। এমন কি মোগল রাজ্যসীমার বাহিরে হিন্দুরাজাদের উপরেও মুসলমান শাসনব্যবস্থা, সরকারী খেতাব-উপাধি, আদব-কায়দা, মুদ্রা ইত্যাদির যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে।

প্রথমদিকে মুসলমান চিত্রকলায় বৈদেশিক (চীন, মধ্যএসিয়া) প্রভাব খুব বেশী ছিল। পরে প্রধানত মোগল সম্রাটদের দরবারী পোষকতায় এক নূতন 'ইন্দো-মুসলিম' শিল্পরীতির বিকাশ হয়—হিন্দু ও মুসলমান উভয় শিল্পরীতির মিশ্রণে এক নূতন ভারতীয় শিল্পরীতির উদ্ভব হয়।

মাতৃভাষার চর্চা ও প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি এই সময়ের আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতিপত্তি ও সমাদর দুই-ই দ্রুত কমিয়া যায়। বাদশাহী দরবারের ভাষা হয় ফার্সী এবং সংস্কৃতের বদলে বাংলা, মারাঠী, হিন্দী-হিন্দুস্থানী প্রভৃতি মাতৃভাষার চর্চা বৃদ্ধি পায়। মাতৃভাষায় সাহিত্যও সৃষ্টি হইতে থাকে। বাংলার বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্ভার, হিন্দী তুলসীদাস ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের সহিত্য-সম্ভার মুসলমানযুগের শ্রেষ্ঠ দানরূপে গণ্য হইতে পারে।

ইসলামের একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের ভিতরে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। হিন্দুধর্মের বহু দেবদেবীর আরাধনা ও জাতিভেদগত সংস্কার ভেদ করিয়া রামানন্দ, কবীর, দাদু, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্ম-সংস্কারকরা একেশ্বরবাদের আদর্শ পুনঃপ্রচার করেন এবং ভক্তি ও মানবতার বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ান। ইসলামের কাছ হইতে হিন্দুধর্ম যে একেশ্বরবাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই অভিমত পোষণ করেন, কিন্তু ইহা ভুল। একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের বহুকালের প্রাচীন আদর্শ, উপনিষদের যুগ হইতে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত এই আদর্শ মুক্তকণ্ঠে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম পৌরাণিক আদর্শের প্রভাবে বহু দেবদেবীর পূজার্চনায় এই আদর্শ হারাইয়া ফেলে, ইসলামের সহিত সংঘাতের ফলে সেই পুরাতন আদর্শই পুনরুজ্জীবিত হয়। এইযুগের হিন্দু-ধর্মসংস্কারকরা যে জাতিবর্ণভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তাহার প্রধান কারণ দুইটি—

(১) ইসলামের গণতান্ত্রিক সাম্যনীতির প্রভাব এবং (২) জাতিভেদের জন্য হিন্দুসমাজে যে জড়ত্ব প্রকাশ পাইতেছিল তাহা ভাঙিয়া ফেলা। এই জড়ত্ব না ভাঙিলে তখন নিম্নবর্ণের অবহেলিত হিন্দুদের ইসলামধর্ম গ্রহণের সামাজিক সমস্যাও প্রবল আকারে দেখা দিত। তৃতীয় আর-একটি কারণও ছিল—সমাজে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম বা ঈশ্বর লইয়া যে-সব বিরোধ দেখা দিতেছিল তাহা দূর করিয়া শান্তি স্থাপন করা। সেইজন্যই কবীরের কণ্ঠে এই বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল—

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি

"আল্লা ও রামের ভ্রম আমার ছুটিয়াছে। হিন্দু ও তুর্কীর মধ্যে কোন ভেদ নাই।"

সব ঘট একৈ আত্মা
ক্যা হিন্দু মুসলমান ?

"সকলেরই আত্মা এক ও অভিন্ন, হিন্দু মুসলমান—এসব আবার কি ?" কবীর তাঁহার একটি বিখ্যাত দোঁহাতে বলিয়াছেন যে পূর্বদিকে হরির বাস আর পশ্চিমদিকে আল্লার মোকাম—এসব ভুল ধারণা। "দিল্ হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা"—নিজের দিল বা হৃদয়ের ভিতরে খুঁজিয়া দেখ, সেখানেই রাম-রহিমান রহিয়াছে।

হিন্দুদের বেদান্তধর্মের সহিত ইসলামের সমন্বয়ের ফলে সুফীবাদের বিকাশ হয়। রামানন্দ কবীর দাদু নানক ও শ্রীচৈতন্যের বাণী যেমন জনসাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল, সুফীবাদ তাহা করে নাই। মুষ্টিমেয় সাধু ফকির চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। তাহা হইলেও ধর্মসংস্কারকদের ভক্তিবাদ ও মানবতাবাদ এবং সুফী সাধকদের জীবনদর্শন মুসলমান শাসক ও হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর যে অনেকটা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাস-সাহিত্যের বিকাশ ও চর্চা মুসলমানযুগের অন্যতম দান। হিন্দুদের পুরাণ, আখ্যায়িকা ইত্যাদির মধ্যে ইতিহাসের চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কালক্রমের (chronology) চেতনা তাহার মধ্যে অত্যন্ত

অসংযত। কালক্রম ছাড়া প্রকৃত ইতিহাসের অনুশীলন হইতে পারে না। মুসলমানযুগে এই কালক্রম-বোধের সংযম প্রথম ইতিহাস-রচনায় প্রকাশ পায়। ফার্সী ভাষায় প্রত্যেক সুলতান-বাদশাহের রাজত্বকালে যে-সব রাজ-কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহাই প্রথম সুবিন্যস্ত কালক্রমের ভিত্তিতে এদেশে ইতিহাস-রচনার চেষ্টা বলা চলে।

মুসলমান যুগে যুদ্ধের কলাকৌশলেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। গোলাবারুদের প্রচলন এবং অশ্বারোহীর প্রাধান্য এইযুগের অন্যতম কীর্তি। প্রাচীন হিন্দু-যুগের হাতি বা গজারোহীর আধিপত্য একেবারে ম্লান হইয়া যায়।

মুসলমানযুগের আরও অনেক দান আছে যাহা ক্ষুদ্র মনে হইলেও ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক দিয়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান সুলতান-বাদশাহরা অধিকাংশই অতিবিলাসী ছিলেন, মনে হয় জীবনে ভোগবিলাসের আদর্শকেই তাঁহারা বড় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ও আমলা-অমাত্যদের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্য ভারতবর্ষে নানারকমের কারুশিল্প ও শিল্পকলার উন্নতি হইযাছে। তাঁতশিল্প, ধাতুশিল্প, সোনারূপা মণিরত্নের শিল্প, পাথরের শিল্প, প্রাসাদ-অট্টালিকা-সমাধি নির্মাণের জন্য স্থাপত্যশিল্প এবং নৃত্যগীতবাদ্যের বিশেষ চর্চা ও সমৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দু-রাজারাও এই সুলতানী ও বাদশাহী বিলাসিতা অনুকরণ করিয়াছেন এবং এইসব কারুশিল্পের পোষকতা করিয়াছেন। খাল কাটিয়া সেচব্যবস্থা করা, বড় বড় পথঘাট ও নূতন নূতন নগর নির্মাণ করাও মুসলমান শাসকদের অন্যতম কীর্তি। কিন্তু বিলাসিতার জন্য তাঁহারা যে শৌখিন বাগান-চাষের পরিকল্পনা করেন তাহা পূর্বে কোন হিন্দুরাজা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। একা ফিরুজ শাহই দিল্লী ও তাহার আশে-পাশে ১২০০টি, সালোরা বাঁধের কাছে ৮০টি এবং চিতোরে ৪৪টি চমৎকার উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রসঙ্গে মুসলমানযুগে রন্ধনশিল্পের (cookery) উৎকৃষ্টতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশে লেখাপড়ার জন্য কাগজের প্রচলনও প্রধানত মুসলমানযুগে হয়। তাহার আগে যে 'কাগজ' একেবারেই ব্যবহার করা হইত না তাহা নহে। খুব অল্প হইত। হিন্দুযুগে অধিকাংশ পুথিপত্র তালপত্রে বা ভূর্জপত্রে লেখা হইত। 'কাগজ' কথাটিই আরবী কথা এবং ইহাই ভারতের সর্বত্র আজ

গৃহীত হইয়াছে। মুসলমাযুগে কাগজে পাণ্ডুলিপি রচনা ও নকল (copy) করা একটি বিশেষ শিল্পকলাচর্চা বলিয়া মনে করা হইত। লিখন ও অক্ষর-শিল্পেরও (calligraphy) বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছিল। পাণ্ডুলিপি সুন্দর করিয়া চিত্রিত (illustrate) করাও শিল্পীদের একটি প্রধান কাজ ছিল। মোগল আমলের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রিত সব হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আজও পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু। শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবেও এইসব পাণ্ডুলিপি অতুলনীয়।

মুসলমানযুগের শ্রেষ্ঠ সামাজিক দান—সচলতা। প্রবীণ হিন্দুসমাজ যখন তাহার ভিতরের বহু বাধাবন্ধনের চাপে জড়ত্ব লাভ করিতেছিল, সেই সময় নবীন ইসলামের গতিশীল আদর্শের আঘাতে সর্বক্ষেত্রে তাহার জড়ত্বের অচলায়তন ভাঙ্গিতে থাকে এবং সমাজ-জীবনে সচলতা সঞ্চারিত হয়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ নবজীবন লাভ করে এবং ভারতের জনসমাজ নূতন প্রাণস্পর্শে সচল হইয়া ওঠে।

ভারতসংস্কৃতিতে পাশ্চাত্ত্যের দান

ভারতের অন্যান্য বিদেশাগতদের সহিত ইউরোপীয়দের দুইটি বড় পার্থক্য আছে। প্রথম পার্থক্য হইতেছে ইউরোপীয়রা এদেশে স্থলপথে সৈন্যবাহিনী লইয়া অভিযান করেন নাই, যেমন গ্রীক শক হূন পাঠান ও মোগলরা করিয়াছিলেন। প্রধানত নৌশক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং বহুদূরে সমুদ্রপারে স্বদেশকে তাহার প্রধান ঘাঁটি করিয়া ইউরোপীয়রা এদেশে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে আসেন। তারপর তাঁহাদের বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয়।

দ্বিতীয় পার্থক্য হইতেছে, অন্যান্য বিদেশাগতদের মতো ইউরোপীয়রা এদেশের জনসমাজের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে আসেন নাই। স্বদেশে ইউরোপের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখিয়া তাঁহারা এদেশ শাসন করিয়াছেন। ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ভাঙাগড়ার উপর তাঁহাদের ভাগ্য নির্ভর করিত না, স্বদেশের রাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভর করিত। এদেশে অর্জিত অর্থ ও মুনাফা তাঁহারা নিজেদের মাতৃভূমির সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেন। ভারতের জাতীয় আয়ের অধিকাংশ নানা

কৌশলে বিদেশে চালান যাইত। অন্য কোন বিদেশীর আগমনে ভারতের ইতিহাসে এরকম ঘটনা ঘটে নাই।

পর্তুগীজদের দান। ভারতের সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশের সম্পর্ক প্রাচীন-কাল হইতেই ছিল, কিন্তু তাহা প্রধানত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক। পরবর্তী-কালের সম্পর্কে ইহার সহিত রাজনীতিক অভিসন্ধিও যুক্ত হয়। এই নূতন ইউরোপীয় পর্বের সূচনা মোগল আমলে, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ মে তারিখে যেদিন ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণভারতে কালিকট বন্দরে সমুদ্রপথে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আরও পর্তুগীজ বণিকদের আগমন হয় এবং গোয়া দমন দিউ প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি ও উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সাম্রাজ্য বলিতে যাহা বুঝায় পর্তুগীজদের তাহা ভারতে কোনদিন ছিল না। তাঁহাদের ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের সাম্রাজ্য। সভ্যতার মানবিক গুণের জন্য বিশেষ কোন প্রশংসা পর্তুগীজদের প্রাপ্য না হইলেও, বাণিজ্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাঁহাদেয় কয়েকটি দান অস্বীকার করা যায় না। বাণিজ্য তাঁহারা নিজেদের স্বার্থেই করিতেন, কিন্তু তাহাতে ভারতেরও পরোক্ষ কিছু উপকার হইয়াছে। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য, বিশেষ করিয়া মসলিন বস্ত্র ও মসলাপাতি, পর্তুগীজদের কল্যাণে সারা পৃথিবীর বাজারে পৌঁছিযাছে এবং ইউরোপ ও চীনের পণ্যদ্রব্য ভারতের বাজারে আসিয়াছে। যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের লেনদেন হইয়াছে তাহা পূর্বে কখনও হয় নাই।

ইহা ছাড়া পর্তুগীজরা এদেশে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। কেবল এই একটি কারণেই তাঁহারা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারেন। খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহাদের পোষকতায় ভারতে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণভারতে, ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা চলে। দক্ষিণভারতের খ্রীষ্টান গির্জা-স্থাপত্য প্রধানত পর্তুগীজদের দান। নূতন ফলমূল ও গাছপালাও কিছু পর্তুগীজরা এদেশে আমদানি করিয়াছেন। যেমন তামাক আলু কাইজুবাদাম কামরাঙা কৃষ্ণকলি ইত্যাদি। বাংলাদেশে হুগলিতে পর্তুগীজদের বড় উপনিবেশ ছিল। প্রথম বাংলা মুদ্রিত বইয়ের জন্য আমরা পর্তুগীজদের কাছে ঋণী। বাংলা ভাষাতেও পর্তুগীজদের দান আছে। ছবি বালতি পেরেক সাবান তোয়ালে আলপিন জানালা বারান্দা

কেদারা প্রভৃতি চলতি বাংলা শব্দ যে মূলত পর্তুগীজ শব্দ তাহা আজ আমরা অনেকেই জানি না।

ইংরেজ ডাচ ও ফরাসী

পর্তুগীজদের পরে ডাচ ইংরেজ ও ফরাসীরা এদেশে আসেন এবং বাণিজ্য ও রাজনীতির প্রতিযোগিতায় অবশেষে ইংরেজরাই জয়ী হন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীলাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যায় ইংরেজরা ১৮২ বছর এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। এই ১৮২ বছরের মধ্যে ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজের প্রত্যক্ষ শাসনধীনে আসা পর্যন্ত ৯৩ বছর হইল 'কোম্পানির আমল' এবং বাকি ৮৯ বছর 'ব্রিটিশরাজের আমল'। মোটামুটি হিসাবে ২০০ বছর ইংরেজদের রাজত্বকাল ধরা যায়।

ইংরেজের দান। ভারতসংস্কৃতিতে ইংরেজদের দান মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—অর্থনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। এগুলি অবশ্য বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র নহে, পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। ইংরেজ আমলে দেশের অর্থনীতিক পরিবর্তন সামাজিক জীবনে ব্যাপক ও গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।

অর্থনীতিক দান। এদেশের প্রাচীন গ্রাম্যসমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ যাহা গ্রাম্যসমাজের মধ্যে উৎপন্ন হইত তাহা হইতেই সেখানকার লোকজনের পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব হইত। জীবিকার সন্ধানে বাহিরে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। জীবন ছিল প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। ইংরেজ আমলে শহর-নগর প্রধান কর্মকেন্দ্র ও জীবিকাকেন্দ্র হইয়া ওঠে, ব্যবসাবাণিজ্য নগরমুখী হয় এবং গ্রামের প্রাচীন অর্থনীতিক ভিত্তি ভাঙিয়া যায়। এই নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিকাশের ফলে সমাজ-জীবনে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়।

ইংরেজ আমলে এদেশে যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশে ১৮৩৮ সালে প্রথম যন্ত্রচালিত কাপড়ের কল এবং ১৮৫৫ সালে পাটকল স্থাপিত হয়। তারপর উনিশ শতকের মধ্যে ভারতে প্রায় ১৪৪টি কাপড়ের কল, ২৯টি

পাটকল এবং ১২৫টি কয়লাখনি গড়িয়া ওঠে। ১৮৫৭ সালের মধ্যে ৩০০ মাইল, ১৮৮১ সালের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ মাইল এবং ১৯০০ সালের মধ্যে ২৫,০০০ মাইল রেলপথ ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়। মন্থরগতি গরুর গাড়ির বদলে দ্রুতগতি বাষ্পীয় ইঞ্জিন-চালিত রেলগাড়ি ভারতীয় সমাজে পথচলার প্রতীক হইয়া ওঠে। সমাজের ও মানুষের জীবনের পথে চলার গতি অনেক বাড়িয়া যায়। টেলিগ্রাফ ও ডাকব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মানুষের সহিত মানুষের যোগাযোগের পথ খুলিয়া যায়, গৃহকোণে আবদ্ধ মানুষের জীবন সমাজমুখী ও সচল হইয়া ওঠে। একথা ঠিক যে ইংরেজ শাসকরা নিজেদের অর্থনীতিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেন বলিয়া এদেশে কলকারখানা ও যানবাহন-যোগাযোগের যতদূর উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তবু তাঁহাদের নীতিগত বাধা সত্ত্বেও যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহাতেই ভারতের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মূল পর্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে। কারখানাশিল্পের বিস্তারের ফলে ভারতে সর্বপ্রথম মজুরশ্রেণীর বিকাশ হইয়াছে ইংরেজ আমলে এবং তাহার বিপরীত প্রান্তে সমাজে আবির্ভাব হইয়াছে আধুনিক মূলধন-ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণীর।

সামাজিক দান। সমাজের উপরে আধুনিক ধনিকশ্রেণীর ও নিচে মজুরশ্রেণী ছাড়া মধ্যবর্তী স্তরে বিশাল এক চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হইয়াছে। ভারতীয় সমাজে এই শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী মধ্যশ্রেণী বোধহয় ইংরেজ আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আধুনিক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, ধর্মসংস্কার, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইত্যাদি এদেশে প্রধানত ইংরেজ আমলে উদ্ভূত এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রবর্তিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজ যুগের দান বোধহয় সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রগতির সহিত সংযোগ রাখিয়া এদেশে তাহার অনুশীলনের পথ এই যুগেই উন্মুক্ত হয়। আধুনিক স্কুল কলেজ বিজ্ঞানাগার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানচর্চার ফলে সমাজের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে। মানুষের অন্ধ প্রথানুগত্য ধীরে ধীরে কমিতে থাকে এবং তাহার ফলে নানারকম সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইহার মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন অন্যতম। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সতীদাহপ্রথা

নিবারণ আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন ইত্যাদি এই যুগের প্রধান সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয় এবং ১৮৭২ সালের 'সিবিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী' অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। এই সামাজিক আইনগুলি বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আঘাত করে, সমাজে বহু বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের পুরোগামী ছিলেন রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রবল আন্দোলন করেন কেশবচন্দ্র সেন।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী হন রামমোহন রায়। হিন্দুদের অসংখ্য দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়। এক ও দ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সত্য এবং উপনিষদের যুগের ঋষিরা যে তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন, এই কথাই রামমোহন তখনকার কুসংস্কারগ্রস্ত হিন্দুসমাজের কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী কোন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন নাই এবং তাঁহার প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম বা 'ব্রাহ্মসমাজ' কোন অহিন্দু ব্যাপার নহে। রামমোহনের পরে তাঁহার ধর্মাদর্শ প্রচারে যাঁহারা ব্রতী হন তাঁহাদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অন্যতম।

খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, ব্রাহ্মধর্মের সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদির ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুধর্মের ভিতরেও প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে এই আলোড়ন সুসমন্বিতরূপে প্রকাশ পায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শের মধ্যে। উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন রামমোহন রায়, আর এক প্রান্তে রামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীচৈতন্যের পর ইঁহাদের মতো আর-কোন ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব এদেশে হয় নাই। এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্বভারতে বাংলাদেশ। পরে উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে ইহার প্রসার হয়। মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই অঞ্চলে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের উদ্‌যোগে 'প্রার্থনা সমাজ' স্থাপিত হয় এবং সমাজ-

সংস্কার কর্মে তাঁহারা অগ্রসর হন। উত্তরভারতে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ স্থাপন করিয়া ধর্ম ও সমাজসংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সাংস্কৃতিক দান। ইংরেজযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক দান হইল হিন্দী বাংলা মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ। আগে সাহিত্য বলিতে প্রধানত কাব্যসাহিত্য বুঝাইত। গদ্যভাষা বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষা; সমাজ-সচেতন মানুষের আত্মপ্রকাশের ভাষা। আধুনিক সমাজ-জীবন যখন সমস্যাসঙ্কুল ও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল তখন আর আগেকার ছন্দোবদ্ধ ভাষায় তাহার বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইল না। তাই উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জন্ম হইল আধুনিক গদ্যভাষার ও গদ্যসাহিত্যের। বাংলা গদ্যভাষা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক সাহিত্যের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। গদ্যভাষার বিকাশের ফলে ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান উপন্যাস গল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় সাহিত্যের বিস্তার সম্ভব হইয়াছে। দেবদেবী ও রাজা-বাদশাহের স্তুতি, ধর্মের কাহিনী প্রভৃতির পরিবর্তে মানুষ ও সমাজ হইয়া উঠিয়াছে আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। মাইকেল মধুসূদন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরবর্তীকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যে এই মানবমুখী ধারাই ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

গদ্যভাষার বিকাশের ফলে কেবল যে সাহিত্যেরই সমৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নহে, আধুনিক সাংবাদিকতারও বিকাশ হইয়াছে। আঠার শতকের চতুর্থ পর্বে এদেশে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি জন অগস্টস হিকি কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রের নাম 'বেঙ্গল গেজেট,' ইহা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। বাংলাভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িকপত্র 'দিগ্দর্শন' (মাসিক) ও 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে। বাংলাভাষায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রথম দৈনিক সংবাপদত্ররূপে প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই সময় হইতে সাময়িকপত্র ও দৈনিক সংবাদপত্রের বিকাশ হইতে থাকে। দেশের জনমত গঠনে, জ্ঞানবিদ্যা ও নূতন ভাবাদর্শ প্রচারে এইসব পত্রিকার দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নবজাগরণের যুগ। অর্থনীতি সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে ইংরেজযুগে যে সকল পরিবর্তনের কথা আলোচনা করা হইল তাহার কয়েকটি যুগবৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল—মানুষের মন ধর্মচিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তা হইতে ক্রমে মানবমুখী ও সমাজমুখী হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর উন্নতি মানুষের কাম্য হইতেছে এবং এই উন্নতি যে মানুষের নিজের ক্ষমতার দ্বারাই করা সম্ভব সেই বিশ্বাসও তাহার হইতেছে। বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে, পুরাতন অন্ধবিশ্বাস দূর হইয়া যাইতেছে এবং পার্থিব সম্পদবৃদ্ধির কামনাও জাগিতেছে। কুসংস্কারের সমস্ত বন্ধন হইতে মানুষ মুক্তি কামনা করিতেছে এবং নিজের মতামতের মর্যাদা দিতেছে ও তাহা প্রকাশের স্বাধীনতা চাহিতেছে।

জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে আধুনিক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। দীর্ঘকাল মানুষ যেন নিজের শক্তি বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্বন্ধে অচৈতন্য ছিল, নূতন দৃষ্টিলাভ করিয়া তাহার নবজাগরণ বা নবজন্ম হইল। মধ্যযুগের পর ইউরোপেও এইরকম নবজাগরণ হইয়াছিল, তাহাকে Renaissance বা পুনর্জন্ম বলা হয়। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক পটভূমির পার্থক্য থাকিলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের দিক দিয়া তাহার সহিত কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এইজন্য আমাদের দেশেও ইংরেজ আমলে আধুনিক যুগের সূচনা-কালকে নবজাগরণের যুগ বলা হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ইংরেজশাসনমুক্ত হইয়াছে। বিদেশী শাসনে থাকার ফলে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যে যে সমস্ত অপূর্ণতা ও শূন্যতা ছিল তাহা মুক্ত পরিবেশে বর্তমানে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

QUESTIONS

Group A

1. Write briefly what you know about the contribution of different races to prehistoric Indian culture.

2. Write what you know about the Aryans and their contribution to Indian culture.

3. What is Buddhism ? What is its contribution to Indian culture and civilisation ?

4. Who was Asoka ? What was his *Dhamma* (religion) ?

5. Why Gupta Age was the 'Golden Age' in ancient India ?

6. What are the contributions of the Pala and he Sena kings to Bengali culture ?

7. Give a brief estimate of the contribution of South India to Indian culture.

8. What is the contribution of Islam to Indian culture ?

9. What are the effects of the impact of Western European culture on Indian culture ?

10. Write notes on :

(a) Brahmacharya Asram
(b) Mahayana Buddhism
(c) Hiuen-Tsang
(d) Aryabhatta
(e) Kabi Jaydev
(f) Sheelbhadra
(g) Sankaracharya
(h) Bengal Gazette.

Group B

I. These are some of the great reformers, races and emperors of India :
Negritos, Kanishka, Buddha, Aryans, Asoka, Rajputs, Sasanka, Ramanuj, Kabir, Dharmapal, Chaitanya, Rammohun, Ramakrishna Paramahamsa, Vidyasagar, Chandragupta, Nanak, Sankaracharya, Harshavardhan, Mahabir, Bimbisar, Dravidians.

Separate the names under three 'heads' as noted below :

Reformers Races Emperors

11. Who are *Kurus* and *Pandavas ?*
What is *Chaturasram ?*
Who is *Aryabhatta* ?
What is *Upanishad ?*

Who is *Fa-Hien ?*
Is *Charak* a poet ?
Where is *Ajanta ?*
Who is *Basubandhu ?*
Where is *Rangamati* ?
Who is *Dipankar Srijnan ?*
Who composed *Geetagovinda ?*
When did poet *Kalidas* flourish ?
What is a *Math* (মঠ) ? When was it first founded in India ?
Where *Buddha* was born ?
Where *Mahavir* was born ?
What is *Varnasram ?*



অষ্টম প্রকরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের ধর্ম

ভারতবর্ষ সকল ধর্মের মিলনক্ষেত্র। পৃথিবীতে এমন কোন বড় ধর্ম নাই, ভারতে যাহার স্থান নাই। ভারতের নিজের মাটিতে তিনটি ধর্মের বিকাশ হইয়াছে—হিন্দুধর্ম জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে জরথুস্ত্রীয়ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামধর্ম। ঘরে-বাহিরের এইসব ধর্ম কালক্রমে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের পাশাপাশি অবস্থানের কোন অসুবিধা হয় নাই, কারণ ভারতজনের প্রধান ধর্ম যে হিন্দুধর্ম (শতকরা ৮৫ জন হিন্দু) তাহা কোনদিন অন্যের সহিত নিজের পার্থক্যকে বড় করিয়া না দেখিয়া ঐক্যের সূত্রটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। তাহার ফলে ভারতের ইতিহাসে ধর্মবিরোধ দীর্ঘকাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, এমন কি কোন কোন ভারত-সম্রাটের ধর্ম-বিদ্বেষনীতি পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সহনশীলতা ও উদারতার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

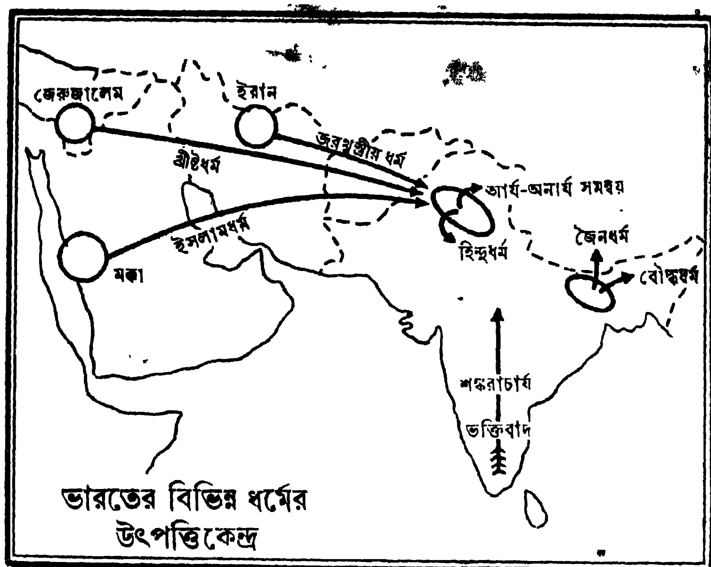
Unit 8 (b) Our Religion—principal religions in India—Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianity and Islam—teaching of some important religious reformers of medieval and modern times.

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য

কেহ কেহ মনে করেন হিন্দুধর্মের বিকাশ হইয়াছে আর্যধর্ম বা বৈদিকধর্ম হইতে। একথা সত্য নহে। আর্যদের আগমনের আগে ভারতে যে বহু প্রাচীন অনার্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল তাহা নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা প্রমাণ করিয়াছেন। আর্যদের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সহিত অনার্যদের ধর্ম ও আচারের বহুকাল ধরিয়া মিলন-মিশ্রণ হইয়াছে এবং অবশেষে উভয়ের সমন্বয়ের ফলে হিন্দুসভ্যতা, হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের বিকাশ হইয়াছে। বৈদিক-অবৈদিক নানারকম ধর্মের পলিমাটির স্তর জমিয়া ভারতে হিন্দুধর্মের বিশাল সমভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। আনুমানিক ১০০০।৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই সমন্বয় ভারতে ঘটিয়াছে এবং এই সমন্বয়ের ফলে হিন্দুধর্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

হিন্দুধর্মের বিশেষত্বগুলি ঠিক সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করা যায় না, অথবা কোন একজন বিশেষ ধর্মপ্রবর্তককে দেখাইয়া বলা যায় না যে তাঁহার অনুগামী যাঁহারা তাঁহারাই হিন্দু ও হিন্দুধর্ম পালন করিয়া থাকেন। 'হিন্দু' কথার অর্থ যাহা 'হিন্দ্'-এর অর্থাৎ যাহা হিন্দুস্থানের সকলরকম সাধনার সমন্বয়ে উৎপন্ন। ধর্মের এতবড় উদার নাম বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ হইয়াছে ধর্মপ্রবর্তকদের নামানুসারে, হিন্দুধর্মের তাহা হয় নাই। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণেই তাহার বিশেষত্ব সূত্রাকারে বুঝাইয়া বলা কঠিন। তবু তাহার বিশেষত্বগুলিকে মোটামুটি এইভাবে নির্দেশ করা যায়ঃ

১। হিন্দুধর্মের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব হইল তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নহে। এমন একজন কোন ধর্মাবতার বা মহাপুরুষের নাম করা যায় না যাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ও মতামতের সহিত হিন্দুধর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন যীশুখ্রীষ্টকে বাদ দিয়া খ্রীষ্টধর্মের কথা ভাবা যায় না, জরথুস্ত্র মহাবীর ও বুদ্ধদেবের কথা ছাড়া জরথুস্ত্রীয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কথা কল্পনা করা যায় না, মহম্মদের জীবন ও শিক্ষা যেমন ইসলামধর্মের সহিত অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত, হিন্দুধর্ম সেরকম কোন একজন ধর্মপ্রবর্তকের সহিত জড়িত



ভারতের বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তিকেন্দ্র

নহে। কোন বিশেষ মানবচরিত্রের সীমার মধ্যে হিন্দুধর্ম তাহার স্বীকৃত সত্যগুলিকে আবদ্ধ রাখিতে চাহে নাই। ইহা অনেকটা মানুষের প্রকৃতিজাত ধর্মের মতো সহজ সরল ও সাবলীল।

২। হিন্দুধর্মের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইল উদারতা। সকল ধর্মই উদার, কিন্তু হিন্দুধর্ম আকাশের মতো উদার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতে আগাগোড়া এই উদারতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে। যেমন 'বনপর্বে' বলা হইয়াছে—'ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ—কোন ধর্ম যদি অন্য ধর্মকে বাধা ও পীড়া দেয় তবে তাহা ধর্ম নহে, কুপথ মাত্র। 'অবিরোধাৎ তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রমঃ'—যে ধর্মের মধ্যে কোন ধর্মেরই বিরোধ নাই সেই ধর্মই সত্যবিক্রম। 'ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্'—ধর্ম লইয়া যদি কেহ কিছু সুবিধা আদায় করিতে চাহে তাহাকে ধর্মবাণিজ্য বলে। এই ধর্ম-বাণিজ্য অতি হীন ও জঘন্য। অনুশাসনপর্বে বলা হইয়াছে—'এক এব চরেদ্ ধর্মং ন ধর্মধ্বজিকো ভবেৎ'—ধর্মকে ধ্বজার মতো ব্যবহার করিয়া কোন বিরোধ ঘোষণা করা অত্যন্ত অন্যায়। ভাগবতেরা বলেন—'অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ'—অন্যদের অন্ন হইতে

বঞ্চিত করিয়া নিজে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টাই অধর্ম। তাহা যে করে না ধর্ম তাহারই। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই সাম্যের আদর্শ আরও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে :

যাবদ্‌ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

"কাহারও ক্ষুধার অন্ন হরণ করিয়া যে ধনসঞ্চয় করে সে চোর, তাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত।" এই ধরনের অজস্র উদারতার বাণী হিন্দুধর্মের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। সুন্দর একটি ফুলবাগানের সহিত হিন্দুধর্মের তুলনা করা যায়। নানাবর্ণের ফুল সেই বাগানে ফুটিয়া রহিয়াছে, নানা মুনি ও ধর্মপ্রবর্তক একই সত্যকে নানারূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ফুলগুলি তাহারই প্রতীক।

৩। "হিন্দুধর্মের তৃতীয় বিশেষত্ব হইল মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া। হিন্দুধর্মে দেবদেবীর বৈচিত্র্য অনন্ত বলা চলে, আবার একব্রহ্মের উপাসনার কথাও তাহাতে আছে। কিন্তু দেবদেবীর ভিড়ের মধ্যেও হিন্দুধর্মের দৃষ্টি মানুষের প্রতি চিরদিন রহিয়াছে। সংহিতায় বলা হইয়াছে—'যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠনম্‌'—যাঁহারা মানুষের মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন তাঁহারাই পরম ব্রহ্মকে পাইয়াছেন। মহাভারতে বলা হইয়াছে—'ন মানুষাচ্ছে ষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'—মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

৪। হিন্দুধর্মের চতুর্থ বিশেষত্ব হইল সত্যনিষ্ঠা। উপনিষদে বলা হইয়াছে—'যো বৈ স ধর্মং সত্যং বৈ তৎ'—যাহা ধর্ম তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। 'সত্যং ব্রহ্ম ইতি'—সত্যই ব্রহ্ম। কি উপায়ে এই সত্যকে জানা যায়? উত্তরে উপনিষৎ বলিয়াছেন—'হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি, হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌'—হৃদয়ের দ্বারাই সেই সত্যকে জানা যায়, কারণ মানুষের হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্মে যোগসাধনা ও সন্ন্যাসের পথ উন্মুক্ত আছে, কিন্তু একথাও পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে 'মৌনান্‌ ন স মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্‌ মুনিঃ'—মৌন থাকিলেই কেহ মুনি হয় না, অরণ্যবাসেও মুনি হওয়া যায় না। তাহা হইলে মুনি কে? যিনি সত্যের স্বরূপ কি তাহা জানেন ও বোঝেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

হিন্দুধর্মের এই কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায় কেন

ভারতের ধর্মোদ্যানে পৃথিবীর সকল ধর্মপুষ্পের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। যে বীজ হইতে ধর্মবিরোধের সৃষ্টি হয় হিন্দুধর্মের উদার মাটিতে তাহা কেহ কোনদিন বপন করেন নাই। যদিও বা কদাচিৎ তাহা বপন করা হইয়া থাকে তাহা হইলেও সামাজিক উপেক্ষার শীতল হাওয়ায় তাহা শুকাইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বিহার প্রদেশ জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের জীবন ও ধর্মপ্রচারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। গৌতম বুদ্ধের জীবন সাধনা নীতি ও বাণী বৌদ্ধধর্মের মূল উৎস। ঐতিহাসিকরা বুদ্ধের কালনির্ণয় করিয়াছেন ৫৬৭-৪৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। প্রধানত বৈদিকধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলেই বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের উদ্ভব হয় ভারতবর্ষে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্বগুলি এই—

১। বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন জগতে স্রষ্টা বা সর্বময় কর্তা বলিয়া কেহ নাই।

২। বৈদিকধর্ম, যাগযজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদি বৌদ্ধরা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এগুলি নিন্দনীয় ও হেয়।

৩। কর্ম ও পুনর্জন্ম, এই দুইটি বৌদ্ধরা স্বীকার করেন। জীবন সুখের নহে—দুঃখময়, ইহাও বৌদ্ধদের আর একটি স্বীকৃতি।

৪। বৌদ্ধরা বলেন যে এই দুঃখময় জীবনের পুনরাবৃত্তির অবসান সম্ভব, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নহে, বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা তো নয়ই। দুঃখনিবৃত্তির পরবর্তী অবস্থাকে বৌদ্ধরা 'নির্বাণ' বলেন। অহিংসা ও মৈত্রী বৌদ্ধদের বড় আদর্শ।

৫। বৌদ্ধধর্মের সাধনপথকে 'মধ্যপথ' বলা হয়। অত্যধিক বিলাসিতা ও উপভোগ-কামনার মতো কঠোর আত্মনিগ্রহ এবং বৈরাগ্যও পরিত্যাজ্য। এই দুই 'অন্ত' পরিত্যাগ করিয়া 'মধ্যম' পথে চলিলে দৃষ্টিলাভ, জ্ঞানলাভ, প্রশান্তিলাভ ও নির্বাণলাভ হয়।

৬। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের—'সংঘ' গঠন বৌদ্ধধর্মের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্মের মধ্যে সন্ন্যাসের বিধান আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী-দের 'সংঘ' করিয়া থাকার কোন বিধি নাই। ইহা বুদ্ধের বিধান। পরে

হিন্দুধর্মে যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ও মঠ স্থাপন প্রচলিত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন বলিয়া মনে করা হয়।

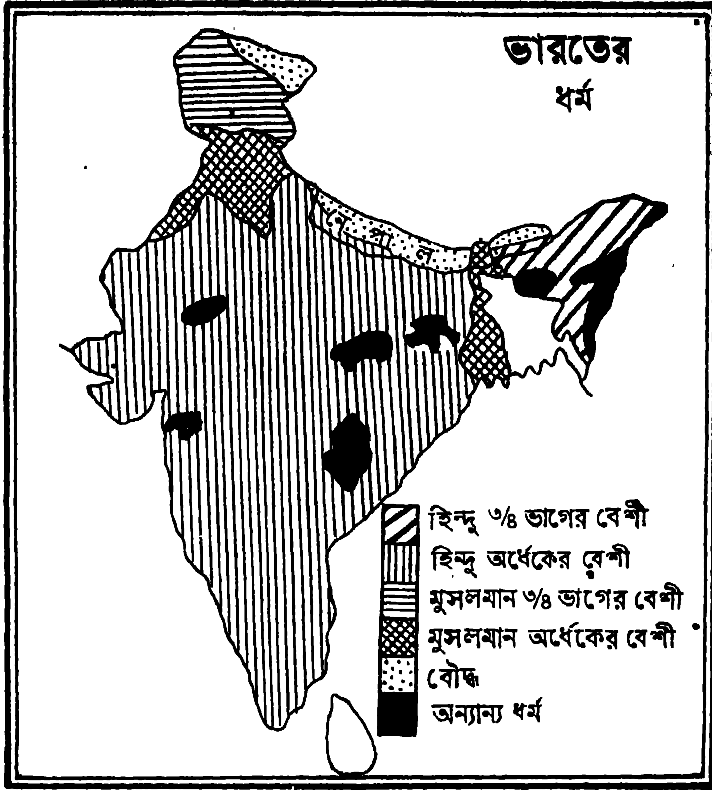
বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব এইগুলি। ভারতে হিন্দুধর্মের পাশে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তার ও প্রতিপত্তি সম্ভব হয় নাই, কারণ বৌদ্ধদের যাহা কিছু ভাল গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাহা অল্পকালের মধ্যেই হিন্দধর্ম আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। বৌদ্ধদের উপরেও হিন্দুধর্মের প্রবল প্রভাব পড়িতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাঁহারা বহু দেবদেবীর পূজাচারের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্মের ভিতরে বিলীন হইয়া যান। বর্তমানে ভারতে বৌদ্ধদের সংখ্যা একলক্ষের কিছু বেশী।

ভারতের ভিতরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমিয়া গেলেও ভারতের বাহিরে মধ্যএসিয়ায়, চীনে, জাপানে, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায়, সিংহলে, তিব্বতে ও বর্মায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের মধ্যে আজ বৌদ্ধধর্ম ঐতিহাসিক নিদর্শনরূপে নামমাত্র টিকিয়া আছে, কিন্তু ভারতের বাহিরে এসিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মই প্রধান ধর্ম। পৃথিবীতে, এবং নিঃসন্দেহে এসিয়ায়, ধর্মক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠদান হইল এই বৌদ্ধধর্ম।

জৈনধর্মের বৈশিষ্ট্য

জৈনধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক, বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে কিছু প্রবীণ। সাধারণত মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, কিন্তু জৈনশাস্ত্রমতে তিনি একজন জৈন সন্ন্যাসী মাত্র। তাঁহার পূর্বের তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্বনাথ, তিনি মহাবীরের ২৫০ বছর আগে দেহরক্ষা করেন। পার্শ্বনাথের আগে ছিলেন অরিষ্টনেমি, তিনি নাকি মহাবীরের ৮০,০০০ বছর আগে আবির্ভূত হন। ইহা যে অলৌকিক আজগুবি কাহিনী তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে পার্শ্বনাথ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। জৈনধর্ম যে বেশ প্রাচীন তাহাও বোঝা যায়।

বৌদ্ধদের মতো জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না এবং কর্ম ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মেরও বৈশিষ্ট্য হইল 'অহিংসা'। কিন্তু অহিংসার আদর্শপালনে বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনরা অনেক বেশী নিষ্ঠাবান। জীবহত্যার বিরুদ্ধে উভয়েরই প্রতিবাদ সমান, কিন্তু জৈনরা ইহাকে এতবড় পাপ বলিয়া মনে করেন যে তাঁহাদের কাছে মাছমাংস ভক্ষণ



একেবারে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধদের মধ্যে, অন্তত ভারতের বাহিরে, মাছমাংস ভক্ষণে তেমন বাধা নাই। পশু তো দূরের কথা, অতি নগণ্য কীটপতঙ্গ পর্যন্ত হত্যা করা জৈনরা পাপ বলিয়া মনে করেন। জীবে দয়া পুণ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেও দৃশ্য-অদৃশ্য কীটাণু বধ করাও যে হিংসা ও পাপ, একথা পৃথিবীতে স্পষ্ট করিয়া জৈনরা ছাড়া বোধ হয় আর কেহ বলিতে সাহস করেন নাই। 'অহিংসা' জৈনদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। এই ব্রতের জন্য জৈনরা কতকগুলি ফল ও উদ্‌ভিদ পর্যন্ত অভক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। বর্তমানে ভারতে জৈনদের সংখ্যা ১৬।১৭ লক্ষ, বৌদ্ধদের তুলনায় অনেক বেশী। বৌদ্ধদের সংখ্যা ১ লক্ষের মতো।

জৈনরা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—"শ্বেতাম্বর" ও "দিগম্বর"। 'শ্বেতাম্বর' কথার অর্থ যাঁহারা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন এবং দিগম্বররা কোনপ্রকার বস্ত্র—কৌপীন পর্যন্ত ব্যবহার করেন না। দিগম্বরদের বক্তব্য, সন্ন্যাসী হইলে সব

ত্যাগ করা উচিত, বস্ত্র পর্যন্ত। এই দুই শাখার মধ্যে শাস্ত্রপাঠে, আচার-বিচারে ও নিয়মেও পার্থক্য আছে।

জৈনদের মন্দির আছে এবং তীর্থংকরদের মূর্তিপূজা প্রচলিত আছে। ক্রিয়াকর্মে হিন্দুদেবতা গণেশেরও পূজা হয়। হিন্দুদের মতো জৈনদেরও তীর্থযাত্রা, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি আচার আছে এবং তাহা দেখিলে অহিন্দু বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানে ও ধর্মাচরণে সামাজিক জীবনে জৈনদের সহিত হিন্দুদের বাহ্যত বেশী পার্থক্য নাই। অহিংসা ও জীবহত্যা না করার আদর্শ হিন্দুদের মধ্যেও (যেমন বৈষ্ণবদের মধ্যে) আছে। কাজেই জৈনধর্মের পক্ষে হিন্দুধর্মের পাশে জীবিত থাকা কঠিন হয় নাই।

অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ

অহিংসা সাম্য মৈত্রী ও শান্তি বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দু-ধর্মের ভিতরেও এই উদার মানবিক আদর্শ আছে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরা কেবল অহিংসা ও জীবহত্যা না করার আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্মের মূলমন্ত্র অহিংসা ও মৈত্রীভাব। ভারতজনের জীবনে এই আদর্শ কালজয়ী রূপ ধারণ করিয়াছে এবং আজও ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই আদর্শ অনুসৃত হইতেছে।

জরথুস্ত্রীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য

জরথুস্ত্রীয় ধর্মের উৎপত্তি হয় ইরানে। ২০০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আর্যজনেরা ইরাক হইতে ইরানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন এবং ইরান হইতে ভারতে আসেন। ভারতের ঋক্‌বেদের যুগের ঋষিদের সমসাময়িক হইলেন ইরানের জরথুস্ত্র। উপনিষদের এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মতো জরথুস্ত্র অহুর-মাজদা-কে একমাত্র স্রষ্টা ও পরমপুরুষ বলিয়া মনে করেন। ইরানের লোকধর্ম যখন বহু দেবদেবী ও দানব-পিশাচের পূজার্চনার স্তরে নামিয়া গিয়াছিল এবং সেখানকার ধর্মক্ষেত্রে এক অসংযত কল্পনার দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছিল তখন জরথুস্ত্র এক অদ্বিতীয় অহুর-মাজদার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইরানের প্রাচীন গাথার মধ্যে তাঁহার ধর্মবাণী

সংকলিত রহিয়াছে। জরথুস্ত্রর বাণীর মধ্যে তিনটি আদেশ প্রধান—'হুমত' (সৎ চিন্তা,) 'হুক্ত' (সৎ কথা বা সু- উক্তি) ও 'হুবষত' (সৎ কর্ম)।

ভারতের পার্সী সম্প্রদায় জরথুস্ত্রীয় ধর্মপন্থী। কিন্তু পার্সীরা কখন্ ও কেন এদেশে আসিয়াছিলেন? জরথুস্ত্র প্রবর্তিত আর্যধর্মের ক্রমে শোচনীয় অবনতি হয় ইরানে। তাঁহার উচ্চচিন্তা ও উচ্চাদর্শের কথা শাসক ও পুরোহিতরা ভুলিয়া যান এবং সাধারণের ধর্মকর্মেও নানারকম অনাচার প্রবেশ করিতে থাকে। তারপর সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে আরবে ইসলামধর্মের অভ্যুদয়ের পর তাহার প্রবল তরঙ্গাঘাতে ইরানের জীর্ণ জরথুস্ত্রীয় ধর্মের ভিত্তি ভাঙিয়া পড়ে। যাঁহারা এই প্রাচীন ধর্মের মোহ ছাড়িয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাঁহারা অহুর-মাজদার পবিত্র অগ্নি সম্বল করিয়া আর্যাবর্ত বা ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেন। দশম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ভারতের বর্তমান পার্সীদের পূর্বপুরুষরা এইভাবে ইরান হইতে এদেশে চলিয়া আসেন। বোম্বাইয়ের ৮০ মাইল উত্তরে উদ্‌ওয়াদা নগরে তাঁহারা পবিত্র ইরানশাহ অগ্নি স্থাপন করেন। আজও সেই অগ্নি অনির্বাণ রহিয়াছে এবং তাহা জরথুস্ত্র কথিত সেই প্রাচীন ধর্মাদর্শের প্রতীকস্বরূপ। বর্তমানে ভারতবর্ষে জরথুস্ত্রপন্থী পার্সীদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ, কিন্তু জরথুস্ত্রের নিজের দেশ ইরানে ১০।১২ হাজার মাত্র।

খ্রীষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম খুব প্রাচীন। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর কয়েকবছরের মধ্যে এদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। বিদেশী শক পহ্লব গ্রীক প্রভৃতি জাতির অভিযানে উত্তরভারত যখন বিপর্যস্ত তখন যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সেণ্ট টমাস খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। সেণ্ট টমাস ছিলেন যীশুর অন্যতম মন্ত্রশিষ্য। প্রথমে তিনি উত্তরভারতে আসেন এবং সেখানে কিছুদিন শক-পহ্লব রাজাদের দরবারে থাকিয়া দক্ষিণভারত যাত্রা করেন। দক্ষিণভারতে পশ্চিম-উপকূলস্থ ক্র্যানগানোর বন্দরে আনুমানিক ৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৌঁছান এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া মালাবারের কূলে কতকগুলি চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। পালুরের (আধুনিক চোঘাট) ব্রাহ্মণদের তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। তারপর টমাস পশ্চিম-উপকূল হইতে পূর্ব-উপকূলে মাদ্রাজ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করিতে যান এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। টমাসের

আগমন ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মনে আগে যে সন্দেহ ছিল এখন তাহা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করা হয়। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্মের আদি প্রচারক্ষেত্রের মধ্যে ভারতবর্ষও অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

টমাসের পরে ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য ও মেসোপোতামিয়া হইতে একদল খ্রীষ্টান মালাবারে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে একটি উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারের সহিত বাণিজ্য করাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কারণ মালাবারী খ্রীষ্টানরা তাঁহাদের দলপতিকে আজও 'সদাগর টমাস' বলিয়া থাকেন। এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে দক্ষিণভারতের মালাবারী খ্রীষ্টানদের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত দক্ষিণভারতে কোন খ্রীষ্টীয় চার্চ প্রতিষ্ঠার সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সময় কসমাস (Cosmas) নামে একজন আলেকজাণ্ড্রিয়ান বণিকের বিবরণে সর্বপ্রথম এই চার্চ প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে দুইটি প্রধান শাখা আছে—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে পর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামার আগমনের পর হইতে দক্ষিণভারতে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে নূতন পর্বের সূচনা হয়। গোয়া কোচিন টিউটিকোরিন প্রভৃতি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া পর্তুগীজ পাদ্রিরা গ্রামের ভিতরে গিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস জেভিয়ার (Francis Xavier ১৫০৬-৫২) ও রবার্ট ডি নোবিলি (Robert de Nobili, ১৫৭৭-১৬৫৬) দক্ষিণভারতে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম-প্রচারকরা প্রথমে দক্ষিণভারতে আসেন ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তরভারতে বাংলাদেশের শ্রীরামপুর অঞ্চলে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোন খ্রীষ্টান মিশনারীকে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে বসবাসের অধিকার দেন নাই। ১৮১৩ সালের সনদে এই অধিকার পাইবার পর খ্রীষ্টান মিশনারীরা অধিক সংখ্যায় এদেশে আসিতে থাকেন এবং খ্রীষ্টধর্মেরও ব্যাপক প্রচার হইতে থাকে। উত্তরভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা ধর্মপ্রচারে অনেক বেশী

তৎপর হইয়াছিলেন এবং সেখানকার দরিদ্র ও অনুন্নত লোকেরা একসময় নানাকারণে খ্রীষ্টান হইযাছিল। উত্তরভারতের মধ্যে বাংলাদেশই খ্রীষ্টানদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে খ্রীষ্টধর্মের স্থান তৃতীয়—খ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ, মোট জনসংখ্যার ২·৩০%।

দয়া করুণা মানবপ্রেম প্রভৃতি মহান আদর্শের কথা যীশুখ্রীষ্টও অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকদের মতো বলিয়া গিয়াছেন। পাপপুণ্যের বিচার ও মোক্ষলাভের কথাও খ্রীষ্টধর্মে বলা হইযাছে। যীশুকে খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মনে করেন এবং মানুষের মুক্তির জন্য তাঁহার আবির্ভাবে বিশ্বাস করেন। ইহা হিন্দুধর্মের অবতারবাদ ও অন্যান্য বহু ধ্যানধারণার সহিত মিলিয়া যায়। খ্রীষ্টানদের সহিত হিন্দুদের প্রধান পার্থক্য হইল খ্রীষ্টানরা বহু দেবদেবীর কল্পনায় ও মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করেন না। ইহা ছাড়া আদর্শ ও আচরণের দিক দিয়া দুই ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম বযসে অনেক নবীন। ধর্ম প্রাচীন হইলে তাহার মধ্যে বহু কুসংস্কার ও নৈতিক আবর্জনা জমিতে থাকে। নবীন খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ-সংঘাতে এই ধরনের অনেক কুসংস্কার হিন্দুধর্মের ভিতর হইতে দূর করিবার জন্য সংস্কার-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐতিহাসিকরা বলেন দক্ষিণভারতের ভক্তিবাদপ্রধান ধর্মের বিকাশে সেখানকার খ্রীষ্টধর্মের দান উপেক্ষণীয় নহে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাতেও খ্রীষ্টধর্ম যথেষ্ট প্রেরণা দিয়াছিল। বাংলাদেশে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, উত্তর-ভারতে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ এবং দাক্ষিণাত্যে প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই খ্রীষ্টধর্মের প্রেরণা। জাতিভেদের বিরুদ্ধে, সতীদাহ বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রথার বিরুদ্ধে, বিধবাবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে আমাদের দেশে যে সমস্ত সামাজিক আন্দোলন হয় তাহাতেও খ্রীষ্টান মিশনারীদের দান ছিল।

ইসলামধর্মের বৈশিষ্ট্য

ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) আরবে মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে মক্কার কাছে তিনি মেষপালন করিয়া

জীবনধারণ করিয়াছেন। আরবরা তখন বহু ছোট ছোট জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং নানারকমের আদিম ধর্মবিশ্বাস তাহাদের মধ্যে প্রবল। আরবে ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরও ছোট ছোট উপনিবেশ ছিল এবং তাহাদের ধর্মের প্রভাবও কিছুটা আরবদের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই প্রভাব আরবদের একধর্ম-পাশে আবদ্ধ করিবার মতো শক্তিশালী ছিল না। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আরবরা একধর্মপাশে আবদ্ধ হইবার আন্তরিক প্রেরণা পায় নাই। মহম্মদ বহুগোষ্ঠী-বিভক্ত আরবদের কাছে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহ্"—আল্লা ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য কেহ নাই। মহম্মদের কণ্ঠে একেশ্বরের এই ঘোষণা জানপদধর্মী আরবদের মানসিক জড়তা ভেদ করিয়া মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। মক্কা হইতে মদিনায় আসিয়া মহম্মদ তাঁহার অনুগামীদের সংগঠিত করিলেন। এই মদিনাযাত্রাকে 'হিজরা' বলে এবং ইহা ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে বলিয়া ইসলামাব্দ হিজরা ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণনা করা হয়। অল্পকালের মধ্যেই ইসলামধর্ম এসিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিমইউরোপ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

ইসলামের অভ্যুত্থানের একশত বছরের মধ্যেই অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় (৭১২ খ্রীষ্টাব্দ) মহম্মদ বিন কাসিম নামে একজন আরব সেনাপতি সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করিয়া ভারতে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করেন। তারপর একাদশ খ্রীষ্টাব্দে গজনির সুলতান মামুদের ১৭ বার ভারত অভিযান হইতে এদেশে মুসলমানযুগের অভ্যুদয় হয়। মামুদের পর মহম্মদ ঘোরী দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষে উত্তরভারতে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বছর ভারতে মুসলমান-রাজত্ব স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে এদেশে ইসলামধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছে।

ইসলামধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ঘোর একেশ্বরবাদ এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতার জন্য ভারতের ধর্মক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারকালে বহু বিরোধ ও সংঘর্ষ হইয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতের সামাজিক পরিবেশে ইসলাম তাহার নিজস্ব আসনে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নবীন বয়সের উদ্দামতা যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন তাহর ভিতরে উদার গণতান্ত্রিক আদর্শ লোকচক্ষুর সামনে তুলিয়া ধরিয়া

ইসলাম ভারতের ধর্মজীবনে ও সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। ইসলামধর্মে সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইহার মধ্যে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ বা মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদের স্থান নাই। স্থান যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে পরে যাঁহারা এই ধর্ম আচরণ করেন তাঁহাদের ত্রুটির জন্য হইয়াছে। তাঁহারা ধর্মাদর্শচ্যুত হইয়াছেন। এইরকম পতন-স্খলন সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই হইয়াছে, কেবল ইসলামের মধ্যে হয় নাই। কোন ধর্মের আদর্শচ্যুতি আমাদের আলোচ্য নহে, প্রকৃত আদর্শই আলোচ্য বিষয়। ইসলামধর্মের এই প্রকৃত আদর্শ বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গত ৭০০-৮০০ বছরে তাহার প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে।

ভারতের জাতিভেদবর্জিত ভক্তিবাদী শৈবধর্মে ও বৈষ্ণবধর্মে, কবীর দাদূ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারকদের মানবধর্মী চিন্তাধারায় খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা ইসলামধর্মের একেশ্বরবাদ ও গণতান্ত্রিক সামাজিক আদর্শের দান অনেক বেশী। ইসলামধর্ম কোনদিনই নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন দিয়া হিন্দুধর্মের সহিত মিলিত হইতে চাহে নাই, সেরকম মিলন তাহার পক্ষে সম্ভবও নহে। সেইজন্য ভারতভূমিতে হিন্দুধর্মের পাশে ইসলাম তাহার নিজস্ব স্থান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও দুই ধর্মের মধ্যে আদর্শলোকে ভাবের যথেষ্ট আদান-প্রদান হইয়াছে এবং তাহার ফলে একদিকে হিন্দুধর্মে যেমন ভক্তিবাদ, ইসলামধর্মেও তেমনি সুফীবাদের বিকাশ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইসলাম তাহার একটি নিজস্ব ভারতীয় রূপও আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা ইসলামি দুনিয়ায় বিরল বলা চলে। ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যানুপাতে ভারতে হিন্দুধর্মের পরেই ইসলামের স্থান। এখন শতকরা প্রায় ১০ জন লোক ভারতবর্ষে মুসলমান।

মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারক

ভারতের ধর্মক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সংযোগ ও সংস্পর্শের পর সকল ধর্মের আদর্শ-সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে মধ্যযুগে বড় বড় ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন রামানুজ রামানন্দ কবীর নানক নামদেব শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব। মাত্র কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সব সাধুসন্ত ও

সংস্কারকদের আবির্ভাব হইতে বোঝা যায় যে ভারতের ধর্মক্ষেত্রে ভেদাভেদ-শূন্য মানবতা ও উদারতার আদর্শ সমাজে তখন কতদূর সক্রিয় হইয়াছিল। অঞ্চলভেদে ও কালভেদে সংস্কারকরা এইভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন :

রামানুজ।	দক্ষিণভারত।	একাদশ শতাব্দী
রামানন্দ।	উত্তরভারত।	চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী
কবীর।	উত্তরভারত।	পঞ্চদশ শতাব্দী
নানক।	উত্তরভারত।	পঞ্চদশ শতাব্দী
নামদেব।	পশ্চিমভারত।	চতুর্দশ শতাব্দী
শ্রীচৈতন্য।	পূর্বভারত।	পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী
শঙ্করদেব।	পূর্বভারত।	পঞ্চদশ শতাব্দী

কালের ব্যবধান দুই-তিন শতাব্দী মাত্র এবং অঞ্চলের বিস্তৃতি সমগ্র ভারত-ব্যাপী। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দক্ষিণভারতে রামানুজ প্রথমে ধর্মের কঠোরতা ও নীরস জ্ঞানতপস্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ভক্তি ও মানবপ্রেমের আদর্শ প্রচার করেন। রামানুজের এই প্রেম ও ভক্তির বাণী দক্ষিণ হইতে উত্তরে বহন করিয়া আনেন রামানন্দ। রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন প্রয়াগে (এলাহাবাদে) কিন্তু তাঁহার ধর্মপ্রচারের প্রধানক্ষেত্র হয় বারাণসী। বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের লোককে তিনি নিজের ধর্মমতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হইলেন কবীর। জাতিতে কবীর মুসলমান ছিলেন এবং তাঁহার পেশা ছিল কাপড়-বোনা। মুসলমান তাঁতীদের 'জোলা' বলিত। মধ্যযুগের ধর্মসাধকদের মধ্যে কবীরের মতো আর কেহ উত্তরভারতে জনচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। জাতিধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের ঐক্যের জন্য, বিভিন্ন ধর্মের আদর্শগত মিলনের জন্য কবীরের মতো সহজ সুন্দর প্রাণস্পর্শী ভাষায় আর কেহ জনসমাজে ধর্মকথা প্রচার করেন নাই। কবীরের বাণী তাঁর দোঁহাবলীতে সংকলিত আছে। কয়েকটি আমরা এখানে উদ্‌ধৃত করিতেছি।

কবীর নীচকুলজাত বলিয়া লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত—কোথা হইতে তুমি এই সব উচ্চ ধর্মনীতিকথা শিক্ষা করিলে, তখন কবীর বলিতেন—

উঁচে পানী না টিকৈ নীচৈ হী ঠহরায়।

একথার অর্থ—উঁচুতে জল তো জমে না, নিচুতে গিয়াই সমস্ত জল জমিয়া থাকে। সত্যকারের জ্ঞানও তেমনি সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে জমিতে পারে না, নিচের সাধারণ লোকের মধ্যেই জমিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা যখন তাঁহার প্রেমভক্তির কথা শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেন, কবীর তখন বলিতেন—

পঢ়ি পঢ়িকে পথর ভয়ে লিখি লিখি ভয়ে জু ইট।
কবীর অংতের প্রেমকী লাগি নেক ন ছীঁট॥

এই কথার অর্থ হইল—পণ্ডিতেরা পড়িয়া পড়িয়া পাথর হইয়া গিয়াছেন এবং লিখিয়া লিখিয়া ইট হইয়াছেন। কবীরের অন্তরের যে প্রেম তাহা কি করিয়া তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিবে! হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মসাধনা সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন—

অরে ইন দুহূ রাহ ন পাঈ।
হিন্দুকী হিন্দ্বাই দেখি তুর্কন কী তুর্কাঈ॥

ইহার অর্থ—হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর মুসলমানের মুসলমানী দুইই দেখিলাম। ইহারা কেহই আসল পথের সন্ধান পাইল না।

হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা মুসলমান মসীত।

হিন্দুরা মন্দিরের দিকে ছুটিতেছে আর মুসলমানরা মসজিদের দিকে ঈশ্বরের সন্ধানে। কিন্তু—

মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে
মৈঁ তো তেরে পাসমে।
না মৈঁ দেবল না মৈ মসজিদ
না কাবে কৈলাস মৈঁ॥

কবীরের কথা হইল—"ভগবান বলেন কোথায় আমাকে মিথ্যা খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, আমি তো তোমার পাশেই রহিয়াছি। আমি দেবালয়েও থাকি না, মসজিদেও থাকি না—কাবাতেও থাকি না, কৈলাসেও থাকি না।" তাই কবীর বলিয়াছেন—

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি॥

"আল্লা ও রামের ভ্রম আমার ছুটিয়াছে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ নাই।" কবীরের ভক্ত দাদু (রাজপুতানা ১৫৪৪ সাল) বলিয়াছেন :

সব ঘট একৈ আত্মা
ক্যা হিন্দু মুসলমান ?

"সকলের আত্মা এক ও অভিন্ন, হিন্দু মুসলমান এসব আবার কি ?'

পাঞ্জাবে নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এবং আসামে শঙ্করদেব এই একই মানবপ্রেম ও ধর্মীয় উদারমতের আদর্শ প্রচার করেন। গুরু নানক শিখধর্মের প্রবর্তক, শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব বাংলায় ও আসামে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক।

আধুনিক যুগের ধর্মসংস্কারক

আধুনিক যুগের ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে প্রধান হইলেন রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এদেশে যখন খ্রীষ্টধর্মের নূতন প্রচারপর্ব আরম্ভ হয় তখন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) হিন্দুধর্মের সংস্কার করিয়া সর্বক্ষেত্রে তাহাকে শক্তিশালী প্রতিযোগী করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী হন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজা, বহু দেবদেবীর পূজা ও নানাবিধ কুসংস্কারের অভিযোগ উত্থাপন করিলে রামমোহনের সহিত তাঁহাদের প্রবল বাদানুবাদ হয়। হিন্দুধর্মের মতো কালক্রমে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও যেসব কুসংস্কার দেখা দিয়াছে রামমোহন তাহার কঠোর সমালোচনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের ভিতরের সঞ্চিত কুসংস্কারগুলিও সংস্কার করার চেষ্টা করেন। খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদের সামনে তিনি উপনিষদের এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আদর্শকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরেন এবং নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার কথা প্রচার করেন। পূর্বগামী সংস্কারকদের মতো রামমোহনও সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে 'ব্রাহ্মধর্ম' বলা হয়। ১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন, পরে ইহাই 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে খ্যাত হয়। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ব্রাহ্মধর্মের প্রসার হয়।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) গুজরাটী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্মসংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র ছিল উত্তরভারত। দয়ানন্দ 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিয়া

সংস্কারকর্মে ব্রতী হন। জাতিভেদ, বহুদেবতার পূজা, মূর্তিপূজা ইত্যাদির তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন আর্য-বৈদিক ধর্মের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিতে, আর রামমোহন চাহিয়াছিলেন সর্বধর্মের আদর্শ-সমন্বয় করিতে। রামমোহন ও দয়ানন্দের মধ্যে ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যের পার্থক্য ছিল।

হিন্দুধর্মের উদার সমুদ্রবক্ষে ধর্মসংস্কারকদের আন্দোলনের তরঙ্গ অল্পকালের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। রামানন্দপন্থী কবীরপন্থী শ্রীচৈতন্যপন্থী শঙ্করদেবপন্থী ব্রাহ্মসমাজপন্থী ও আর্যসমাজপন্থী বলিয়া স্বতন্ত্র ছোট ছোট গোষ্ঠী আজও ভারতবর্ষে আছে, কিন্তু সকল গোষ্ঠীর তরঙ্গমালা হিন্দুধর্মের সমুদ্রতটে আঘাত খাইয়া সেই সমুদ্রের বুকেই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার স্পর্ধা কাহারও হয় নাই।

QUESTIONS

Group A

1. What are the chief characteristics of Hinduism as a religion ?

2. What are the important features of Buddhism ?

3. What is Jainism ? What are its precepts ?

4. What is the religion of the Parsis of India ? Write what you know about it.

5. What are the chief characteristics of Christianity ? When was it first preached in India and by whom ?

6. What are the characteristics of Islam as a religion ? Where did it originate and how did it spread in India ?

7. Write what you know about the religious reformers of medieval India.

8. Give a short account of the religious reformers of modern India.

9. Write notes on :

(a) Francis Xavier
(b) Hijra (622 A. D.)
(c) St. Thomas
(d) Ramananda
(d) Namdev
(f) Kabir
(g) Dayananda Saraswati
(h) Rammohun Roy

Group B

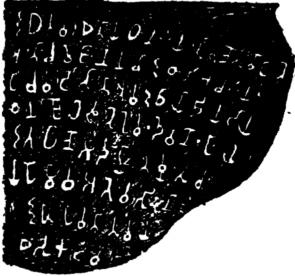
1. When did these religious reformers flourish in India ? Write 'MD' for medieval and 'MN' for modern in the space provided after each name :

Dayananda —
Chaitanya —
Ramananda —
Rammohun —
Nanak —
Maharshi Debendranath Tagore —

II. Which religion is *older*—Christianity or Islam ?
Which religion is *oldest*— Christianity, Buddhism or Hinduism ?
Which religion is *younger*—Buddhism or Christianity ?
Which one of the four is *youngest* ?

III. Write the names of the founders of the following religions in the space provided after each. If there is no founder, put a X mark only ?

(a) Islam —
(b) Hinduism —
(c) Christianity —
(c) Jainism —
(e) Buddhism —



ভারতের ভাষা

ভূমিকা। ভারতবর্ষ আয়তনে প্রায় একটি মহাদেশের মতো এবং বহু জাতি-উপজাতির মানুষ আসিয়া সেখানে মিলিত হইয়াছে। এইসব জাতির মিলিত লোকসংখ্যাও কম নহে, প্রায় ৪৫ কোটি। বিশাল দেশে বহু অধিবাসী এবং নানারকম জাতি-উপজাতি বাস করিলে তাহারা যে বহু বিচিত্র ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অবশ্য চীনও ভারতের মতো বিশাল দেশ এবং চীনের লোকসংখ্যাও ভারতের চেয়ে বেশী। কিন্তু চীনে বহু জাতির মিলন-মিশ্রণ হয় নাই বলিয়া সেখানে বহু ভাষার বিকাশ হয় নাই। বহুজাতির সমাগমের জন্য ভারতবর্ষে তাহা হইয়াছে।

প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে ভাষার এই বহুলতা দেশের মধ্যে সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই। সাধারণ লোক আঞ্চলিক কথ্যভাষায় প্রাত্যহিক কাজকর্ম চালাইত। রাষ্ট্র-পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের কাজকর্ম চলিত হিন্দু আমলে সংস্কৃত ভাষায় এবং মুসলমান আমলে ফারসী ভাষায়। অঞ্চলভেদে ভাষাভেদ তখনও ছিল, কিন্তু আজকালকার মতো সমস্যারূপে ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অধিকারবোধ ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় জন্য আজ বহু প্রান্তীয় ও প্রাদেশিক ভাষা মর্যাদা ও স্বীকৃতি দাবী করিতেছে। এই দাবী উত্থাপন করিবার মতো জাতীয় চেতনা আগেকার কোন যুগে ভারতজনের ছিল না। বর্তমানে জাতীয় চেতনা ও শিক্ষাদীক্ষার বিস্তারের সহিত ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাচেতনাও জাগিয়াছে। শিক্ষা-

---

Unit 8 (c) Our Language—the chief language groups and linguistic areas Federal language and Regional languages—medium of instruction at different stages of education.

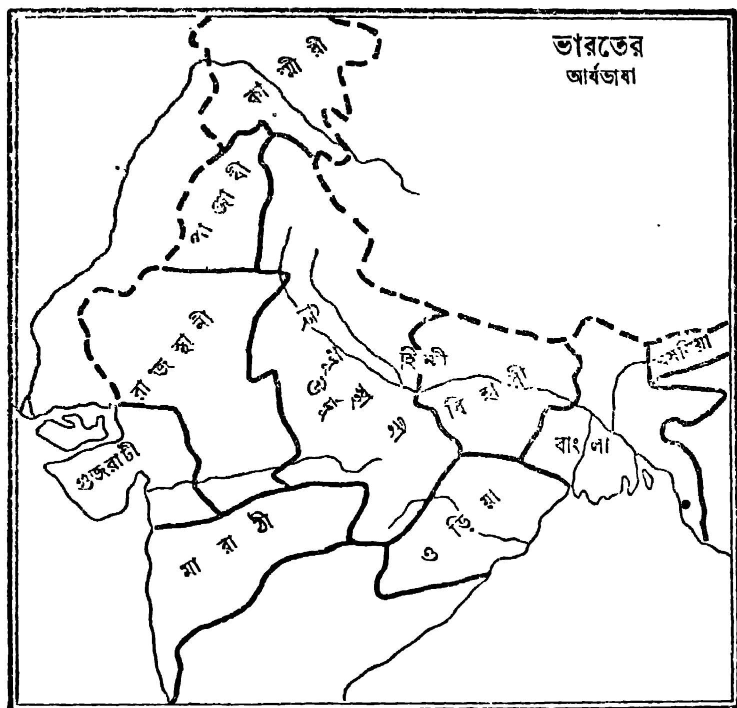
সংস্কৃতির প্রধান বাহন হইল ভাষা এবং সেই ভাষা নিজের মাতৃভাষা। ভাষাচেতনার ভিতর দিয়া ভারতের বিভিন্ন জনপদের এই সংস্কৃতিচেতনারও প্রকাশ হইতেছে।

ভারতের ভাষাগোষ্ঠী ও ভাষাঞ্চল

ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম প্রকরণে ১৪টি ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসের সময় বহু লোক হিন্দী বা উর্দুর বদলে হিন্দুস্থানীকে মাতৃভাষারূপে প্রকাশ করার জন্য এই ভাষার সংখ্যা হইয়াছে ১৫টি। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যাসহ ভাষাগুলি এই—

১।	হিন্দী	প্রায় ১৫ কোটি
২।	উর্দু	
৩।	হিন্দুস্থানী	
৪।	পাঞ্জাবী	
৫।	তেলুগু	প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ
৬।	মারাঠী	প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ
৭।	তামিল	প্রায় ২ কোটি ৬৫ লক্ষ
৮।	বাংলা	প্রায় ২ কোটি ৫১ লক্ষ
৯।	গুজরাটী	প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ
১০।	কানাড়ী	প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ
১১।	মালয়ালম্	প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ
১২।	ওড়িয়া	প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ
১৩।	অসমিয়া	প্রায় ৪৯ লক্ষ
১৪।	কাশ্মীরী	প্রায় ৫ হাজার (জম্মু ও কাশ্মীর বাদে)
১৫।	সংস্কৃত	প্রায় ৫ শত

ভারতের প্রধান মাতৃভাষার এই তালিকা হইতে কাশ্মীরী ও সংস্কৃত বাদ দেওয়া যায়। জম্মু ও কাশ্মীর ধরিলে কাশ্মীরী থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃতের জনভাষারূপে থাকিবার কোন অধিকার নাই। উত্তরভারতীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর জননী বলিয়া 'সংস্কৃত' স্বতন্ত্র আসন দাবী করিলে অবশ্য বলিবার কিছু নাই।



এই প্রধান মাতৃভাষাগুলি ছাড়া ভারতে ২৩টি আদিবাসীদের ভাষা (Tribal Languages) আছে এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক প্রত্যেকটি ভাষায় কথাবার্তা বলে ও কাজকর্ম করে। এইসব ভাষার মধ্যে প্রধান ভাষা এইগুলি—

সাঁওতালী	প্রায় ২৮ লক্ষ
গণ্ড	প্রায় ১২ লক্ষ
ভীল	প্রায় ১১ লক্ষ
ওরাওঁ	প্রায় ৬ লক্ষ
হো	প্রায় ৬ লক্ষ
মুণ্ডারী	প্রায় ৬ লক্ষ
মণিপুরী	প্রায় ৫ লক্ষ
শবর	প্রায় ২½ লক্ষ
গারো	প্রায় ২½ লক্ষ
খাসিয়া	প্রায় ২½ লক্ষ

আদিবাসীদের এই ভাষাগুলি ছাড়া আরও প্রায় ২৪টি প্রান্তীয় ভাষা ভারতবর্ষে আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে—

মারওয়াড়ী	প্রায় ৪৫ লক্ষ
মেওয়ারী	প্রায় ২০ লক্ষ
জয়পুরী	প্রায় ১৬ লক্ষ
ছত্তিশগঢ়ী	প্রায় ৯ লক্ষ
সিন্ধী	প্রায় ৭½ লক্ষ
রাজস্থানী	প্রায় ৬½ লক্ষ
কুমায়নী	প্রায় ৬ লক্ষ
গাঢ়ওয়ালী	প্রায় ৫ লক্ষ
আজমিরী	প্রায় ৪½ লক্ষ
নেপালী	প্রায় ৪ লক্ষ
ত্রিপুরী	প্রায় ১½ লক্ষ

ভারতের ভাষাগুলিকে তাহা হইলে ৩টি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়:

প্রাদেশিক মাতৃভাষা	১৪ টি ('সংস্কৃত' বাদে)
আদিবাসীদের ভাষা	২৩ টি
আঞ্চলিক ভাষা	২৪ টি

বর্তমানে এইভাবেই ভারতের ভাষাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রিয়র্সন সাহেব তাঁহার বিরাট *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে ভারতের ভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ১৭৯টি এবং উপভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ৫৪৪টি। ভাষার পার্থক্য সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিলে সংখ্যা হয়ত আরও বেশী দেখানো যায়। প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে কথ্যভাষার পার্থক্য আছে। বাংলাদেশে বর্ধমান জেলার ভাষা ও ঢাকা জেলার ভাষা একরকম নহে, আবার বর্ধমান ও বাঁকুড়া পাশাপাশি জেলা হইলেও কথ্যভাষার তফাত দেখা যায়। এইভাবে ভাষাবিচার করিলে ভারতের ভাষারাজ্যকে দুর্ভেদ্য মহারণ্য মনে হইবে এবং তাহাতে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিচার করিলে ভারতে প্রধান ভাষা ১৪টি বলা যাইতে পারে। অবশ্য এমন দুই-একটি আদিবাসীদের ভাষা আছে—যেমন সাঁওতালী গণ্ড প্রভৃতি, যাহা একটি



বিশিষ্ট অঞ্চল জুড়িয়া স্বতন্ত্র মাতৃভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় হইতেছে ইহাদের বর্ণমালা নাই।

অঞ্চলভেদে ভারতের প্রধান ১৪টি ভাষাকে ভাগ করিলে উত্তরভারতের ভাষা হয় ১০টি এবং দক্ষিণভারতের ভাষা হয় ৪টি। উত্তরের ভাষাগুলি আর্যভাষাগোষ্ঠীর এবং দক্ষিণের ভাষাগুলি দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। হিন্দী উর্দু হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী মারাঠী বাংলা গুজরাটী ওড়িয়া অসমিয়া কাশ্মীরী—উত্তরভারতের এই ১০টি ভাষা আর্যভাষা, এবং তেলুগু তামিল কানাড়ী মালয়ালম—দক্ষিণভারতের এই ৪টি ভাষা দ্রাবিড়ভাষা। অঞ্চল হিসাবে এই ভাষাগুলিকে আরও ভাগ করা যায় এইভাবে—

উত্তর ও মধ্যভারত	। হিন্দী উর্দু হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী
পূর্বভারত	। হিন্দী বাংলা অসমীয়া
পশ্চিমভারত	। মারাঠী গুজরাটী
দক্ষিণভারত (পশ্চিমাঞ্চল)	। কানাড়ী

• দক্ষিণভারত (পূর্বাঞ্চল) । তেলুগু ওড়িয়া
. দক্ষিণভারত (দক্ষিণপূর্বাঞ্চল) । তামিল

মোটামুটি এইভাবে ভারতের ১৪টি প্রধান ভাষার অঞ্চলভেদ করা যায়। হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটি বিভিন্ন সাহিত্যিক রূপ হইতেছে সাধু-হিন্দী বা নাগরী-হিন্দী ও উর্দু।

সর্বভারতীয় ভাষা—হিন্দী কেন?

ভারত স্বাধীন হইবার পর একটি সর্বভারতীয় ভাষার (federal language) বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আন্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের জন্য এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে একটি ভাষা না থাকিলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন ইংরেজী ভাষাকেই আপাতত রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কাজকর্ম চালানো যাইতে পারে। তাহা আপাতত অল্পকালের জন্য চলিতে পারে এবং বর্তমানে চলিতেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল নিশ্চয় চলিতে পারে না, চলা উচিতও নহে। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, তাহা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে কেন? ভারতের শতকরা কয়জন লোক ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে ও লিখিতে পারে? মুসলমান আমলে ভারতের উচ্চসমাজে অনেকে ফার্সী ভাষা জানিত ও চর্চা করিত। ইংরেজ আমলেও সেইভাবে ইংরেজীর চর্চা হইয়াছে। ইংরেজী যদি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দাবী করিতে পারে, তাহা হইলে ফার্সীও তাহা করিতে পারিবে না কেন? এইসব দাবী যুক্তিহীন। ভারতের ভাষার মধ্যে একমাত্র হিন্দীই এই দাবী করিতে পারে।

একাধিক কারণে হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা দাবী করিতে পারে। প্রথম কারণ হইল ভারতের প্রায় তিনভাগের একভাগ লোক এই ভাষায় ভাববিনিময় করিয়া থাকে। সাধু-হিন্দীর সহিত পাঞ্জাবী ও নেপালী ভাষার বেশ মিল আছে। দ্বিতীয় কারণ হইল আন্তঃপ্রাদেশিক সূত্ররূপে একরকমের সহজ চল্‌তি হিন্দী ভাষা কেবল উত্তরভারতে নহে, দাক্ষিণাত্যেরও অনেকটা অংশে প্রচলিত রহিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন এই হিন্দী ভাষার সাহায্যেই সাধারণ কাজকর্ম চালাইবার মতো ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। তৃতীয় কারণ হইল হিন্দীর সহিত সংস্কৃত বর্ণমালার ও ভাষার অনেক

সাদৃশ্য আছে এবং সংস্কৃত সমস্ত আর্যভাষার জননী। দক্ষিণভারতেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃতের চর্চা যথেষ্ট হইয়াছে, সুতরাং হিন্দী ভাষার প্রসার যতটুকু আয়াসে ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে হইতে পারে তাহা আর অন্য কোন ভাষার হইতে পারে না। এই কয়েকটি কারণে ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে সর্বভারতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতির দাবী হিন্দীরই সর্বাধিক।

শিক্ষার বাহন ও ভাষা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার বাহন কোন্ ভাষা হইবে তাহা বিচার করিতে গেলে দুইটি ভাষার কথা প্রথমেই মনে পড়ে—প্রথমটি মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রভাষা। ইহা ছাড়া বর্তমান জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন করিতে হইলে ইংরেজী ভাষাকেও বর্জন করিবার উপায় নাই। আবার এদিকে সংস্কৃত ভাষা পুনরনুশীলন না করিলে অধিকাংশ মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করাও সম্ভব নহে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে চারটি ভাষারই গুরুত্ব আছে—মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, ইংরেজী ও সংস্কৃত। কিন্তু চারটি ভাষা একসঙ্গে নিশ্চয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে, দিবার চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে। কাজেই শিক্ষার স্তরভেদে বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

মাতৃভাষায় শিক্ষা। প্রত্যেক প্রদেশে বা রাজ্যে প্রাথমিক স্তর হইতে অন্তত স্নাতক (Graduate) স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত মাতৃভাষা—বাংলা হিন্দী গুজরাটী মারাঠী তেলুগু তামিল ইত্যাদি। যতদিন না মাতৃভাষায় ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা সম্ভব হইবে ততদিন স্নাতকস্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার 'একমাত্র' বাহন করা অবশ্যই সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও চেষ্টা করিতে ক্ষতি নাই এবং এই আদর্শ সামনে রাখিয়া চেষ্টা না করিলে কোনদিনই মাতৃভাষার উন্নতি হইবে না। গোড়ার দিকে স্নাতকস্তরে মাতৃভাষার সহিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন থাকিতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাতেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। মাতৃভাষায় সামান্য কিছু শিক্ষালাভের পর হইতেই রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করা উচিত। একেবারে প্রাথমিক স্তর বাদ দিয়া উচ্চ-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে হিন্দী বর্ণপরিচয় হইতে শিক্ষা আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং মোটামুটি লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা পর্যন্ত বিদ্যা মাধ্যমিক স্তরে আয়ত্ত করিতে পারিলে কাজ চলিয়া যাইবে। ইহা আবশ্যিক শিক্ষা হওয়া উচিত। যেসব ছাত্র হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে অনুশীলন করিতে চাহিবে তাহারা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ইহা স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে পড়িতে পারিবে। স্নাতকস্তরেও 'বিশেষ পাঠ্যরূপে' হিন্দী থাকিতে পারে।

ইংরেজী ভাষা। কেবল ভারতে নহে, সারা পৃথিবীতে আজ ইংরেজী ভাষা এমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে যে তাহাকে আর বিদেশী ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। ভারতের ইতিহাসে আধুনিক নবযুগের উদ্‌বোধন হইয়াছে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে, একথা অস্বীকার করা চলে না। ভারতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হইয়াছে প্রধানত ইংরেজী ভাষায়। ভারতের বিশাল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ইংরেজী ভাষার সহিত পরিচিত, এমন কি শিক্ষিত ভারতের ইহা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। দক্ষিণ-ভারতের শিক্ষিতশ্রেণীর বেশ বড় একটি অংশ কতকটা মাতৃভাষার মতো ইংরেজী ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। পৃথিবীর জ্ঞানবিদ্যার সম্পদ অধিকাংশই ইংরেজীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। সুতরাং ইংরেজী না শিখিয়া উপায় নাই এবং যে-ভাষা আজ বিশ্বমানবের সংস্কৃতির প্রধান বাহন তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হইবে এবং নিজেদের জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষতি করা হইবে।

মাধ্যমিক স্তর হইতেই পূর্ণমাত্রায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং তাহা আবশ্যিক থাকাই বাঞ্ছনীয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী ছাড়া গতি নাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারী বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিদ্যার অনুশীলন দূর ভবিষ্যতেও ইংরেজীর মাধ্যম ছাড়া সম্ভব হইবে কি না বলা যায় না। সেইজন্য মাধ্যমিক স্তরেই ইংরেজী শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া গড়া উচিত।

সংস্কৃত। শিক্ষার্থীদের যদি মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী—এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে আর বেশী ভাষার বোঝা তাহাদের কাঁধে

চাপানো সংগত নহে। সুতরাং সংস্কৃত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 'অতিরিক্ত' বা ঐচ্ছিক ভাষারূপে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে আরও একটু শেষকথা থাকিয়া যায়। কথাটি হইল—হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল উত্তরভারতের বৃহত্তম অঞ্চল। এই অঞ্চলে মাতৃভাষা হিন্দীর সহিত অন্য কোন রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না, কারণ হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা। সুতরাং এই অঞ্চলে হিন্দীর সহিত ভারতের আর ১৩টি প্রধান মাতৃভাষার যে-কোন একটি ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাতে অন্যান্য প্রদেশে হিন্দী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা দূর হইয়া যাইবে, প্রত্যেক মাতৃভাষার প্রসার হইবে এবং একটি রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমে ভারতে একরাষ্ট্রীয়তার বন্ধনও দৃঢ় হইবে।

QUESTIONS

Group A

1. What are the chief language-groups and linguistic areas of India?

2. Do you think that India needs a federal language? What should be the federal language of India?

রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা একটি না থাকিলে ভারতের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি বজায় রাখা সম্ভব নহে। 'হিন্দী' ভাষার দাবী এইদিক হইতে কেন অগ্রগণ্য তাহা বুঝাইতে হইবে।

3. What should be, in your opinion, the medium of instruction at different stages of education?

Group B

I. Write the names of languages of the following regicns in the 2nd column:

1st Column	2nd Column
South India (eastern)	
North India	
South India (western)	

Eastern India
Western India
South India (south-eastern)

II. These are some of the important regional languages of India. Write the names of regions in the space provided after each ?

Tamil—
Telugu—
Kanarese—
Urdu—
Punjabi—
Hindusthani—
Marathi—
Oriya—



অষ্টম প্রকরণ। চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিল্পকলা

ভূমিকা। শিল্পকলা বলিতে প্রধানত চিত্রকলা ভাস্কর্য ও নানারকমের কারুশিল্প সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হইবে। ভারতের শিল্পকলার ইতিহাস আজ সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আদিমযুগের শিল্পীদের গুহাচিত্র পর্যন্ত ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধুসভ্যতার ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শিল্পকলার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে চিত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ঠিক পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু যেসব চিত্রিত মাটির পাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লতাপাতা ও জীবজন্তুর বিচিত্র রূপায়ণ দেখা যায় এবং তাহাকে চিত্রাঙ্কন বলিলেও ভুল হয় না। লাল বেলেপাথরের দুই-একটি ছোট ছোট মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, যাহাকে এদেশের ভাস্কর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা চলে। পোড়ামাটির বহু মূর্তি, শীলমোহর, ধাতুর তৈরী জিনিস ইত্যাদি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বোঝা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০ বছরের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতাকেন্দ্রে ভারতের শিল্পকলার বেশ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আধুনিকযুগ পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ বছর ধরিয়া ভারতীয় শিল্পকলার অনুশীলন ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। তাহাতে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পাঠান-মোগল রাজপুত গ্রীক ইরানীয় ও ইউরোপীয় প্রভৃতি ভারতের ও ভারতের বহুজন-জাতির বিশিষ্ট দান আছে। তাহাদের

Unit 8 (d) Our Art—some notable forms of art—Ajanta, Ellora, Gandhara, Mahavalipuram. Mughal and Rajput Art—Modern Art.



অজন্তার গুহাচিত্রে বিদেশীদের ছবি

মিলন-মিশ্রণে ও সমন্বয়ে ভারতীয় শিল্পকলারীতির বিকাশ ও ক্রমোন্নতি হইয়াছে। এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসহ আমরা তাহার বিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিবে।

গন্ধারশিল্প

গন্ধারপ্রদেশ প্রাচীনকালে বর্তমান আফগানিস্তানের অনেকখানি জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল এবং তাহার রাজধানী ছিল বিখ্যাত তক্ষশিলা নগর। এসিয়া ও ইউরোপের সুপ্রাচীন বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত বলিয়া বহু বিদেশী জনসংস্কৃতির ধারা গন্ধারের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। গ্রীক কুষান প্রভৃতি বিদেশী রাজারাও এই প্রদেশ হইতে রাজত্ব করিয়াছেন এবং অধিকাংশই ভারতসংস্কৃতির সাগরসঙ্গমে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়াছেন। ভারতের এই উত্তরপশ্চিম কোণটিতে সেইজন্য বিচিত্র এক শিল্পরীতির বিকাশ হইয়াছে। শিল্পজ্ঞরা বলেন যে গন্ধার শিল্পরীতির চরম বিকাশকাল প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ কুষানরাজাদের আমলে, বিশেষ করিয়া কনিষ্কের কালে।

কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের জীবনে মহাযান মতের প্রবর্তনের জন্ম এক নূতন পর্বের সূচনা হয়। বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধের পূজা আরম্ভ হয়। এতদিন যাঁহার ভস্মাবশেষ স্তূপের অন্তরালে থাকিয়া ভক্তজনের চিত্ত আকর্ষণ করিত, মহাযানী মতের প্রাবল্যের পর হইতে তাঁহার অসংখ্য কাল্পনিক মূর্তি ভক্তরা ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শিল্পীরা তাহা পাথর কাটিয়া-কুঁদিয়া রূপায়িত করিতে লাগিলেন। এই সময় গ্রীকরা এই অঞ্চলে ও ইহার কাছে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাস্কর্যশিল্পে গ্রীকদের কুশলতা অদ্বিতীয়। কাজেই বুদ্ধের মূর্তি রূপায়ণে গ্রীকদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িল। গ্রীকদেবতাদের মূর্তির অনুকরণে ভারতের বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইতে লাগিল। এইজন্য গন্ধারশিল্পকে 'গ্রীক-বৌদ্ধ' শিল্প বলা হয়।

তক্ষশিলা পেশোয়ার বামিয়ান জালালবাদ হাদ্দা প্রভৃতি অঞ্চলে গন্ধার-শিল্পের নিদর্শন অনেক পাওয়া গিয়াছে। ছোট ছোট মূর্তি হইতে প্রায় ১৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বুদ্ধের মূর্তিও আছে। যেখানে পাথর পাওয়া যায় নাই সেখানে চুনের উপাদান ব্যবহার করা হইয়াছে এবং মাথামুখ ছাঁচে ঢালাই করিয়া দেহের অংশ প্লাস্টার করা হইয়াছে। পূর্বে ভারহুত সাঁচী অমরাবতী প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধ স্তূপশিল্পে জাতকের কাহিনী ও বুদ্ধের জীবনকথা শিল্পীরা যেভাবে পাথরের গায়ে রূপায়িত করিয়াছেন, গন্ধারের শিল্পীরাও সেইভাবে বুদ্ধকে রূপ দিয়াছেন। তবে পূর্বের এই বৌদ্ধশিল্পের সহিত গন্ধারের গ্রীক-বৌদ্ধশিল্পের একটি বড় পার্থক্য আছে। আগেকার স্তূপশিল্পে বুদ্ধ কদাচিৎ থাকিতেন এবং থাকিলেও কোন মূর্তিতে থাকিতেন না, প্রতীকরূপে থাকিতেন। গন্ধারশিল্পে বুদ্ধ হইলেন কেন্দ্রস্থ মূর্তি, কখনও তিনি শীর্ণকায় সাধু, আদর্শ ভিক্ষু, কখনও বা রাজকুমার। যে-রূপেই হোক গন্ধারশিল্পে সর্বত্র তিনি বিরাজমান—সিদ্ধার্থরূপে, শ্রমণ গৌতমরূপে, বুদ্ধ শাক্যমুনিরূপে। সাঁচী-ভারহুত-অমরাবতীর স্তূপশিল্পের সহিত গন্ধারের গ্রীক-বৌদ্ধশিল্পের এই পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়।

ইলোরা ও অজন্তা

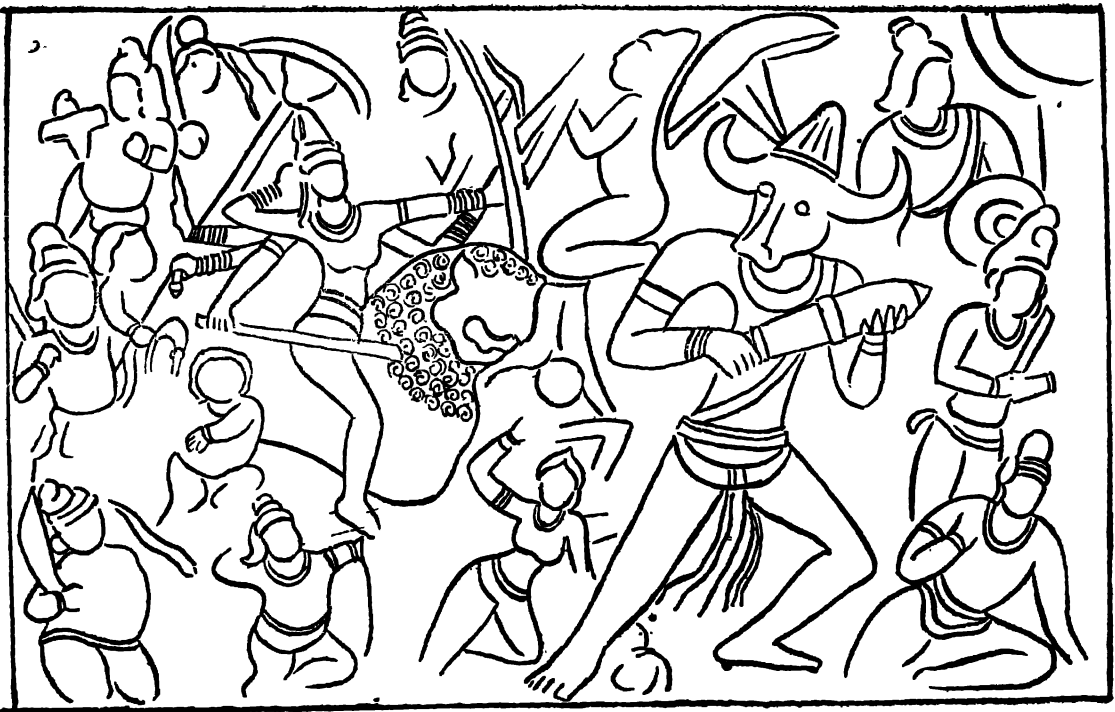
ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে গুপ্তযুগকে বলা হয় স্বর্ণযুগ। এই যুগে চতুর্থ হইতে সপ্ত খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন ভারতে সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চরম বিকাশ হইয়াছিল। গুপ্তসম্রাটদের প্রভাব অবশ্য উত্তরভারতের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ছিল, দাক্ষিণাত্যে তাহার বিস্তার হয় নাই। কিন্তু গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শ গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেও প্রসারিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের বা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পরাজয় সূচিত হইলেও, ভারতের হিন্দুসম্রাটরা দীর্ঘকাল



অজন্তার গুহাচিত্র। পরিচারিকাসহ রাজা

বৌদ্ধ-জৈনশিল্পের উদার পোষকতা করিয়াছেন। উত্তরের গুপ্তসম্রাটদের মতো দক্ষিণের চালুক্য রাষ্ট্রকুট পল্লব ও চোল রাজবংশ হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধ-জৈনধর্মেরও পোষকতা করিয়াছেন এবং শিল্পকলার অনুশীলনে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ হইতে অষ্টম-নবম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলোরা ও অজন্তার বিস্ময়কর পর্বত-গুহাশিল্পের বিকাশকাল নির্ধারিত হইয়াছে। অজন্তা ও ইলোরা দুইটি শিল্পকেন্দ্রই দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদে অবস্থিত।



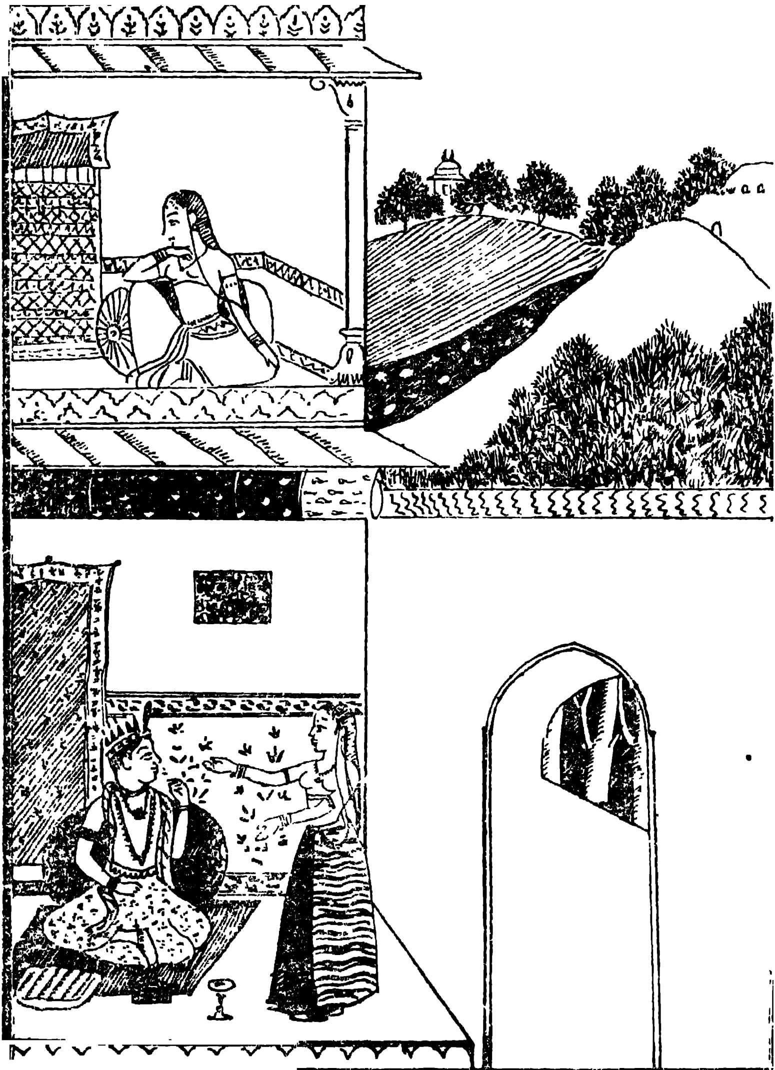
মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য। পাথরে খোঁদিত মহিষমর্দিনী মূর্তি

করা হইয়াছে যে আজও তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। অন্যান্য দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনীও বহু পাথরে রূপায়িত করা হইয়াছে এবং রূপায়ণে ভাস্কররা অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রকাশ-ভঙ্গির বলিষ্ঠতাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মোগল চিত্রকলা

ইসলামধর্মে চিত্রকলার চর্চা শাস্ত্রসম্মত নহে, কারণ জীবজন্তু ফলফুল লতাপাতা ইত্যাদি প্রকৃতির বা ভগবানের সৃষ্টি, কোন শিল্পীর পক্ষে তাহা রঙতুলিতে রূপায়িত করার চেষ্টা খোদার উপর খোদকারি করা ছাড়া আর কিছু নহে। তবু বাগদাদের খলিফাদের পতনের পর প্রধানত পারস্যের রাজাদের পোষকতায় ইসলামিক চিত্রকলার বিকাশ হয় এবং সেই পারস্যের চিত্রকলার ধারা মোগল বাদশাহদের আমলে ভারতে প্রবাহিত হইয়া আসে। তুর্কী বা পাঠান সুলতানরা প্রাসাদ মসজিদ সমাধি নির্মাণে কিছুটা উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু চিত্রকলার প্রতি তেমন অনুরাগী ছিলেন না মোগল বাদশাহরা শিল্পকলার সর্বক্ষেত্রে সোৎসাহে পোষকতা করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই রাজসভার আশ্রয়ে চিত্রকলার চর্চা হইয়াছে।

পঞ্চদশ শতকের শেষে পারস্যের তৈমুরবংশের সুলতান হুসেন মির্জার রাজসভায় কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর সমাবেশ হয়। এই শিল্পীদের মধ্যে বিহ্‌জাদ অন্যতম। সাফাবী সম্রাট শাহ ইসমাইলের রাজসভাতেও বহ্‌জাদ ছিলেন রাজশিল্পী। বিহ্‌জাদের পর মীর সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদ নামে দুইজন শিল্পী পারস্যে খুব সুনাম অর্জন করেন। শের শাহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া হুমায়ুন যখন কিছুদিন তাব্রিজের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন এই দুইজন প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইঁহাদের সঙ্গে করিয়া হুমায়ুন কাবুলে চলিয়া আসেন এবং 'আমীর হামজা' কাহিনীর চিত্রায়ণে তাঁহাদের নিযুক্ত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবরের দরবারে মীর সৈয়দ আলি শিল্পচর্চা করিতে থাকেন। আলি ও সামাদের হাতে মোগল চিত্রশিল্প প্রথমে পারসিক রীতি হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় পরিবেশে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে থাকে। পোর্টেট বা প্রতিকৃতি এবং ভারতীয় ফুল-লতা-পাতা চিত্রণে এই মোগল শিল্পীরা ক্রমে



মোগল চিত্রকলা

পারসিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে থাকেন, তারপর হিন্দু শিল্পীদের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহাদের শিল্পে হিন্দু শিল্পরীতিরও প্রভাব পড়িতে থাকে। এই



পাহাড়ী (পাঞ্জাব) চিত্র

প্রভাব যে কেবল একপক্ষেই পড়িয়াছিল তাহা নহে, হিন্দুদের উপরও পড়িয়াছিল। মোগল শিল্পরীতির প্রভাবে নূতন হিন্দু শিল্পরীতির বিকাশ হইয়াছিল রাজপুত চিত্রকলায়।



কাংড়া চিত্র

মোগল চিত্রকলাকে এককথায় সূক্ষ্ম চিত্রকলা বা চিত্রিকাশিল্প (miniature painting) বলা হয়। এই সূক্ষ্মতা পারসিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। মোগল রাজধানীর সৌধমালার দেয়ালচিত্র অঙ্কনে, পুঁথি-পাণ্ডুলিপি চিত্রণে মোগলযুগে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা অপূর্ব কলা-কুশলতা দেখাইয়াছেন। আকবরের আশ্রিত হিন্দুশিল্পীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দশবন্ত (জাতিতে কাহার) ও বসবন। মহাভারত-রামায়ণে ফার্সী অনুবাদের পুঁথি আকবর এই শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আকবরনামা হামজানামা ইত্যাদির পুঁথিচিত্র মোগল চিত্রকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পুঁথিচিত্র ছাড়া মোগল বাদশাহরা চিত্রের পৃথক অ্যালবাম তৈরী করাইতে ভালবাসিতেন এবং তাহাতে ভাল ভাল চিত্র সযত্নে বাঁধাইয়া রাখা হইত।

রাজপুত শিল্পকলা

মোগল শিল্পরীতির প্রভাবে হিন্দু শিল্পরীতির যে পরিবর্তন হয় তাহারই প্রকাশ হয় রাজপুত চিত্রকলায়। মোগল ও রাজপুত উভয় চিত্রশিল্পে পারসিক রীতির প্রভাব বেশ স্পষ্ট। মোগল চিত্রকলার বিকাশ হয় মোগল দরবারে, রাজপুত চিত্রকলার বিকাশ হয় রাজপুত রাজাদের দরবারে। কিন্তু দুই শিল্পের মধ্যে বিষয়বস্তুর পার্থক্য আছে। মোগল শিল্প ইসলামিক ভাবপ্রধান, অনেকটা দরবারী এবং প্রধানত জাগতিক। রাজপুত শিল্প হিন্দুভাবপ্রধান, অনেকটা লোকাশ্রয়ী এবং প্রধানত আধ্যাত্মিক। রাজপুত শিল্পীরা হিন্দু পৌরাণিক বিষয় লইয়া ছবি আঁকিয়াছেন, আবার সুরের রাগরাগিণীর মূর্তি কল্পনা করিয়া তাহাকেও রূপ দিয়াছেন। রাজপুত চিত্রকলাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—রাজস্থানী ও পাহাড়ী (বা কাংড়া)। রাজস্থান অঞ্চলের শিল্পকে রাজস্থানী এবং হিমালয় অঞ্চলের ও কাংড়া উপত্যকার শিল্পকে পাহাড়ী বা কাংড়া শিল্প বলে। পাহাড়ী শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হইল রেখার সাবলীল টান এবং কতকটা পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গিতে গাছ-লতা-পাতা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপায়ণ। রাজপুত চিত্রকলার পূর্ণবিকাশের কাল হইল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী।

আধুনিক চিত্রকলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে খ্যাতনামা ইউরোপীয় শিল্পীরা আসিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা মাদ্রাজ পাটনা



পাহাড়ী চিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দী

প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির প্রচার হইতে থাকে। ইংরেজদের প্রধান শাসনকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র বলিয়া বাংলাদেশে কলিকাতা শহর এই ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইয়া ওঠে। পাশ্চাত্ত্য শিল্প-রীতির প্রথম সংস্পর্শে ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপীয় স্টাইলের অন্ধ অনুকরণ করিতে থাকেন। এই অনুকরণপর্বের অন্যতম ভারতীয় শিল্পী হইলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারের রবিবর্মা। মোগল ও রাজপুত রাজগৌরব অস্তমিত হইবার পর ভারতশিল্পের অবনতি হইতে থাকে। এই অবনতির সময় স্বভাবতঃই ইউরোপীয় শিল্পের প্রথম আবির্ভাবে ভারতীয় শিল্পীরা নিজেদের ঐতিহ্য ও আদর্শের কথা ভুলিয়া গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া যান এমন কি ভারতের লোক-শিল্পীদের উপরেও বিদেশী প্রভাব পড়িয়াছিল দেখা যায়। কালীঘাটের পট-শিল্পীদের দৃষ্টান্ত এই দিক দিয়া উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘ দিন এই বিভ্রান্তিতেই কাটিয়া যায়, তারপর নিজেদের শিল্প-ঐতিহ্যের দিকে ভারতীয় শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয় এবং তখন হইতেই শুরু হয় ভারতীয় শিল্পকলার আধুনিক যুগ।

শিল্পকলাক্ষেত্রে এই আধুনিক যুগের প্রবর্তক হইলেন কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব (E. B. Havell) ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্যরীতিতে তেলরঙে ছবি আঁকিতেন বেশী, পরে তিনি জলরঙে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন। ভারতের অজন্তার প্রাচীন শিল্পরীতি হইতে মোগল ও রাজপুত শিল্পরীতি পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া অবনীন্দ্রনাথ নূতন শিল্পপ্রেরণার উৎস খুঁজিয়া বাহির করেন। পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির নূতন জ্ঞানও তাহার সহিত যুক্ত করা হয়। তাহার ফলে ভারতে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার পথে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, ঈশ্বরীপ্রসাদ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, হাকিম মহম্মদ খাঁ প্রমুখ শিল্পীরা নিজেদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য লইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন।

শিল্পসাধনার এই ধারা আজও ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতি বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাবে আর একটি নূতন শিল্পধারাও সম্প্রতি বিকাশ হইতেছে। প্রধানত এ-যুগের তরুণ শিল্পীরাই এই নব্যপথের পথিক এবং তাঁহাদের মধ্যে শক্তিমান শিল্পী অনেক

আছেন। শিল্পের বিষয়বস্তুর দিক দিয়া তাঁহারা ভারতীয়তা বর্জন করিতে চান না, কিন্তু আঙ্গিকের বা স্টাইলের দিক দিয়া পশ্চিমের পথে পরীক্ষা করিতে চান। শিল্পকলার ইতিহাসে এই পরীক্ষা যুগে যুগে হইয়াছে এবং তাহা



কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা ছবি

হইয়াছে বলিয়াই শিল্পকলার প্রাণস্পন্দন স্থির হইয়া থামিয়া যায় নাই। নবীন শিল্পীদের বলিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ভারতশিল্পের এই প্রাণস্পন্দনই শোনা যাইতেছে। ভবিষ্যতে এই পরীক্ষার ভিতর হইতেই ভারতশিল্পের নূতন কালোপযোগী ধারার বিকাশ হইবে।

QUESTIONS

1. What are the characteristics of Gandhara art? When did it flourish?

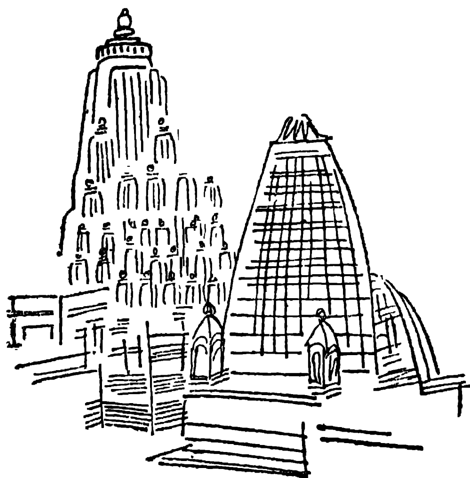
2. Write what you know about the arts of Ajanta and Ellora.

3. What are the characterisics of Mughal art? How far is it related to Rajput art? Is there any difference between Mughal and Rajput arts?

4. What are the characteristics of modern Indian art?

5. Write notes on?

   (a) Mahavalipuram
   (b) Mughal Miniature painting
   (c) Daswant
   (d) Abanindranath Tagore



অষ্টম প্রকরণ। পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের স্থাপত্য

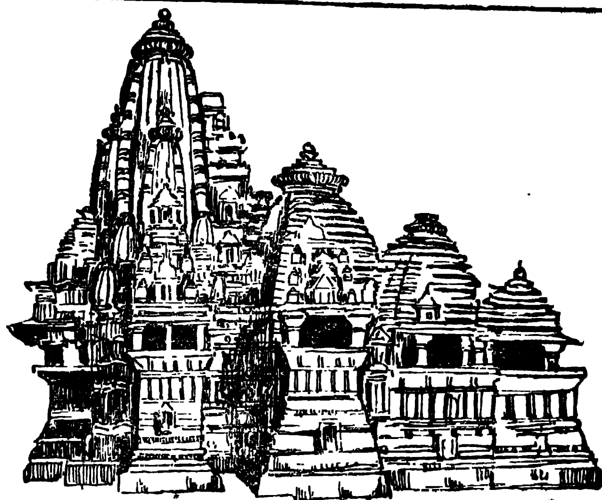
ভূমিকা। গৃহনির্মাণশিল্পকে স্থপতিবিদ্যা বা স্থাপত্য বলে। একেবারে আদিম অসভ্য মানুষের ডাল-লতাপাতা দিয়া তৈরী পর্ণকুটিরে এবং অতি-আধুনিক সুসভ্য মানুষের লোহা-পাথরের তৈরী আকাশস্পর্শী অট্টালিকা—দুইটিই স্থাপত্যের নিদর্শন। গৃহ কেবল মানুষের বাসের জন্য তৈরী হয় না, মানুষের সমাধির জন্যও তৈরী হয় এবং দেবতাদের বাসের জন্যও প্রয়োজন হয়। গ্রামের কুঁড়েঘর হইতে শহরের নানারকম ইমারত প্রাসাদ অট্টালিকা, দেবতাদের মন্দির মসজিদ গির্জা—সবই স্থাপত্যের নিদর্শন। যুগে যুগে গৃহের উপাদান ও নির্মাণকৌশলের পরিবর্তনের জন্য স্থাপত্যশিল্পেরও পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রধানত মানুষের বাসগৃহের ও সামাজিক গৃহের স্থাপত্যে হইয়াছে, দেবালয় বা ধর্মীয় স্থাপত্যে বিশেষ হয় নাই। বর্তমান যুগে ভারতে কোন মন্দির মসজিদ বা গির্জা নির্মাণ করিতে হইলে নিশ্চয় তাহা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রীতিতে করা হইবে না। কিন্তু আধুনিক বাসগৃহ, আফিস আদালত বিদ্যালয় হাসপাতাল ইত্যাদির মতো সামাজিক গৃহ কখনই মোগল বা হিন্দুযুগের মতো করিয়া নির্মাণ করা হইবে না। স্থাপত্যশিল্পের একটি ধারা মোটামুটি স্থায়ী, আর একটি ধারা পরিবর্তনশীল। ধর্মীয় স্থাপত্য অনেকটা স্থায়ী, সামাজিক স্থাপত্য পরিবর্তনশীল।

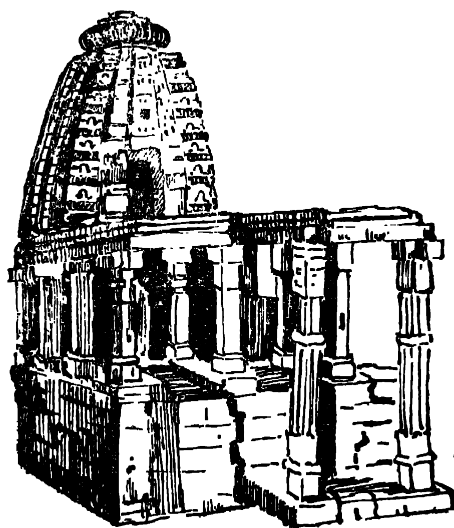
Unit 8 (c) Our Architecture—some notable forms of architecture—temples, mosques and other famous historical buildings.

কিন্তু মন্দিরে মসজিদে ও গির্জায় ধর্মীয় স্থাপত্যের যে-রূপ বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই, এযুগে বা একদিনে তাহার বিকাশ হয় নাই। বহু যুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার বিকাশ হইয়াছে এবং তারপর দেশে দেশে তাহা জাতীয় ঐতিহ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। এইজন্য এই সব ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন হইতে আমরা অতীত ইতিহাসের কথা জানিতে পারি। ভারতের হিন্দুযুগের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসহ দেবালয়-স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছে। উত্তরভারতে একরকম হইয়াছে, দক্ষিণভারতে হইয়াছে অন্যরকম। গুপ্তযুগে যেভাবে হইয়াছে, অশোকের আমলে সেই-ভাবে হয় নাই। পাঠানযুগে যাহা হয় নাই, মোগলযুগে তাহা হইয়াছে। আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতিরও স্বাতন্ত্র্য আছে। উড়িষ্যার দেবালয় ('রেখ-দেউল' বলে) আর বাংলাদেশের দেবালয় পাশাপাশি অঞ্চলে হইলেও একরকম নহে। বাংলা ও উড়িষ্যার বাহিরে দেবালয়গুলি একেবারে অন্য-রকমের। দক্ষিণভারতের দেবালয় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থাপত্যের এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসের ধারা নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর অঞ্চলে রেখদেউলের আধিক্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে অতীতে কোনসময় এইখানে উড়িষ্যার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশের দেবালয় যদি উত্তর-ভারতের বা দক্ষিণভারতের কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোনসময় সেইখানে বাঙালীদের বসবাস ছিল অথবা কোন ঐতিহাসিক কারণে বাঙালী সংস্কৃতির ধারা প্রবেশ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল পরগণা হইতে রাজপুতানা পাঞ্জাব পর্যন্ত এইরকম একাধিক অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। স্থাপত্য যেমন জাতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন, তেমনি আবার আঞ্চলিক সংস্কৃতিরও নিদর্শন। ভারতের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যশিল্পের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

উত্তরভারতের মন্দির

ভারতীয় স্থাপত্যে বৌদ্ধদের বিশিষ্ট দান হইল বৃত্তাকারে গঠিত 'স্তূপ'। এই স্তূপের নিদর্শন সাঁচী ভারহুত প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। স্তূপ ছাড়া পার্বত্য গুহাস্থাপত্য বৌদ্ধদের বড় দান। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই বলিয়া পরবর্তীকালে বৌদ্ধ স্থাপত্যের এই বিশিষ্ট ধারার





উপরে : বিশ্বনাথ মন্দির, খাজুরাহো

নিচে : ওসিয়া সূর্যমন্দির, যোধপুর

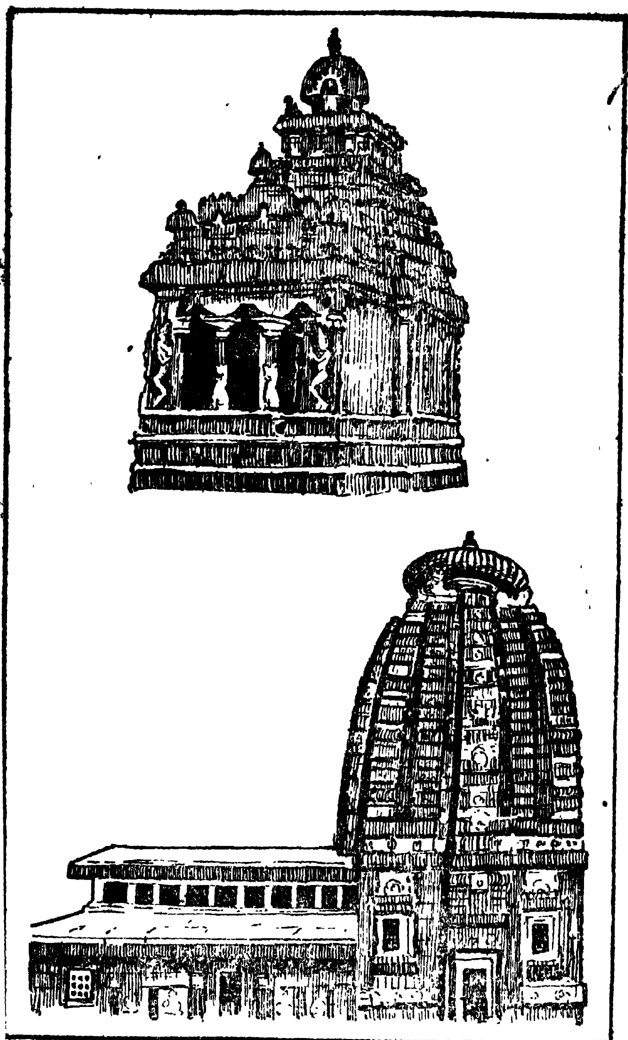
বিকাশ হয় নাই। হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্যের জন্য হিন্দু মন্দিরস্থাপত্যের ধারাবাহিক ও আঞ্চলিক বিকাশ হইয়াছে। হিন্দুশিল্পশাস্ত্রে এই মন্দির-স্থাপত্যের রীতি বা স্টাইলকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—'নগর' বা আর্যাবর্তরীতি, 'বেসর' বা দাক্ষিণাত্যরীতি। উত্তর ও দক্ষিণভারতের মন্দিরের গড়নের মধ্যে যথাক্রমে এই দুই রীতির বিকাশ হইয়াছে।

মন্দিরের গড়নের মধ্যে চারটি অংশ প্রধান—চারকোণা একটি কেন্দ্রস্থ গৃহ ('বিমান' বলে), গৃহের উপরের ঊর্ধ্বমুখী অংশ ('শিখর' বলে), গৃহের ভিতরে দেবতার স্থান ('গর্ভগৃহ' বলে) এবং মন্দিরের সামনে উপাসকদের সমাবেশের স্থান ('মণ্ডপ' বলে)। মন্দিরের চারদিকে চলিবার মতো একটি পথও ঘেরা থাকে, তাহাকে 'প্রদক্ষিণপথ' বলে। আর্যাবর্তের বা নগর-রীতির মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হইল—বিমানের উপরের শিখরটি বঙ্কিম-বৃত্তাকারে চারদিক হইতে উঠিয়া ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া চূড়ায় মিলিত হয় এবং চূড়াতে ঘট বা আমলক থাকে। শিখরের পিঠের উপর অনেক সময় ছোট ছোট শিখরের 'মডেল' বা প্রতিরূপ অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই ধরনের গড়নবিশিষ্ট মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—রাজপুতনায় যোধপুর রাজ্যে ওসিয়ার সূর্যমন্দির (নবম শতাব্দীতে), মধ্যপ্রদেশে বুন্দেলখণ্ডে খাজুরাহোর চন্দেল-রাজপুতদের নির্মিত বিখ্যাত কয়েকটি মন্দির (৯৫০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ—প্রথমে ৮৫টি মন্দির ছিল, বর্তমানে ২০টি আছে), উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর মন্দির (অষ্টম শতাব্দী), লিঙ্গরাজ মন্দির (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ), রাজধানী মন্দির (১১০০-১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ), পুরীর জগন্নাথ-মন্দির (একাদশ শতাব্দী), কোনারকের সূর্যমন্দির (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর-রাজাদের মন্দিরগুলি (অষ্টাদশ শতাব্দী)।

দক্ষিণভারতের মন্দির

বিমান শিখর গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ—মন্দিরের এই চারটি প্রধান অঙ্গের গড়নের মধ্যে উত্তরের সহিত দক্ষিণভারতের মন্দিরের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে। দক্ষিণের মন্দিরের শিখর চারিদিক হইতে থাক-কাটা সিঁড়ির মতো উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে এবং চূড়ায় বৃত্তাকার গম্বুজ অথবা ব্যারেলের মতো কিরীট আছে। আকারের দিক হইতেও দক্ষিণভারতের মন্দিরের বিশালতার সহিত অন্য কোন অঞ্চলের মন্দিরের তুলনা হয় না। মনে হয় সেখানকার



উপরে : মুক্তেশ্বর মন্দির, কাঞ্চীপুরম

নিচে : পরশুরামেশ্বর মন্দির, ভুবনেশ্বর

গোলগুম্বজ, আহমেদাবাদের আবু তুরাবের সমাধি এই বিশিষ্টতার নিদর্শন। ভারতীয় স্থাপত্যে মুসলমানযুগের প্রধান কীর্তি হইল পারসিক স্থাপত্যরীতির সহিত হিন্দু স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে এক নূতন স্থাপত্যকলা সৃষ্টি। পাথরের সূক্ষ্ম জালির কাজ, লতাপাতা মণ্ডন, রঙ্গিন ও চিত্রিত টালির কাজ মুসলমানযুগের স্থাপত্যের অন্যতম দান।

ব্রিটিশযুগের স্থাপত্য

ভারতীয় স্থাপত্যে ব্রিটিশযুগেরও কিছু দান আছে। গির্জা নির্মাণ ছাড়াও এই যুগে ইউরোপীয় গথিক ও অন্যান্য স্টাইলে বড় বড় অট্টালিকাও নির্মাণ করা হইয়াছিল। উদ্যোগপর্বে কলিকাতা শহর ছিল অন্যতম নির্মাণকেন্দ্র। সেইজন্য কলিকাতা শহরেই এইসময়কার স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—কলিকাতার পুরাতন সব গির্জা, টাউনহল, হাইকোর্ট, মিউজিয়াম, রাইটার্স বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট আফিস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনালুপ্ত সিনেটহল, লাটভবন ইত্যাদি। এই সব অট্টালিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশাল বড় বড় থাম বা স্তম্ভ, বড় বড় দরজা ও জানালা, উঁচু সিলিং ও প্রশস্ত সিঁড়ি। এগুলি সবই গথিক প্রভৃতি ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির দান। এই রীতির প্রভাব আমাদের দেশীয় স্থাপত্যের উপরেও পড়িয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত সেকালের দেশীয় রাজা জমিদার ও ধনিকদের বাসগৃহ।

ভারতে হিন্দুস্থাপত্যের ঐতিহ্যের সহিত মুসলমানযুগের ও ব্রিটিশযুগের স্থাপত্যরীতির মিশ্রণের ফলে একটি নূতন স্থাপত্যকলা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে বিদেশী রীতি এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে যে ভবিষ্যতে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ঠিক কোন্ পথে যে ভারতীয় স্থাপত্যের বিকাশ হইবে তাহা এখনই বলা যায় না।

QUESTIONS

1. Write what you know about the temple architecture of Norh India with some examples.

2. Give a brief description of the temple architecture of South India with some examples.

3. What is the contribution of the Muslims to Indian architecture ? Illusrate your answer with some examples.

4. Was there any new development of architecture in the British period ?

5. Write notes on :

(a) Garbhagriha
(b) Rekha deul
(c) Mandapa
(d) Sikhara
(e) Gopuram

Group B

I. Put HN for Hindu period (northern) and HS for Hindu period (southern), M for Muslim period and B for British period, in the space provided after each of the following monuments and building :

1. Town Hall of Calcutta—
2. Khajuraho temple—
3. Parasurameswar temple—
4. Meenakshi temple of Madura—
5. Calcutta High Court—
6. Humayaun's tomb—
7. Red fort—



অষ্টম প্রকরণ। ষষ্ঠ অধ্যায়

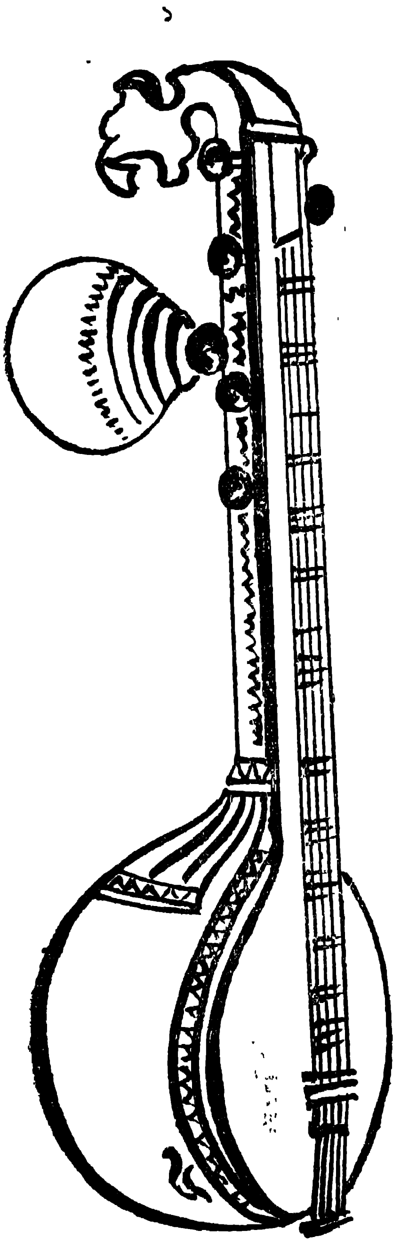
ভারতের সংগীত

ভূমিকা। ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য অতিপ্রাচীন। বিখ্যাত হিন্দু সংগীতশাস্ত্রগুলি রচনাকাল হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। ঐ সব সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, নারদের সংগীতমকরন্দ, শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকর, সোমনাথের রাগবিরোধ, দামোদরের সংগীতদর্পণ, লোচনপণ্ডিতের রাগরঙ্গিণী এবং অহোবলের সংগীত-পারিজাত পণ্ডিতেরা সমাদর করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'—রচনাকাল প্রথম খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে হইতে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মনে করা হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রগুলি উত্তরকালে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে।

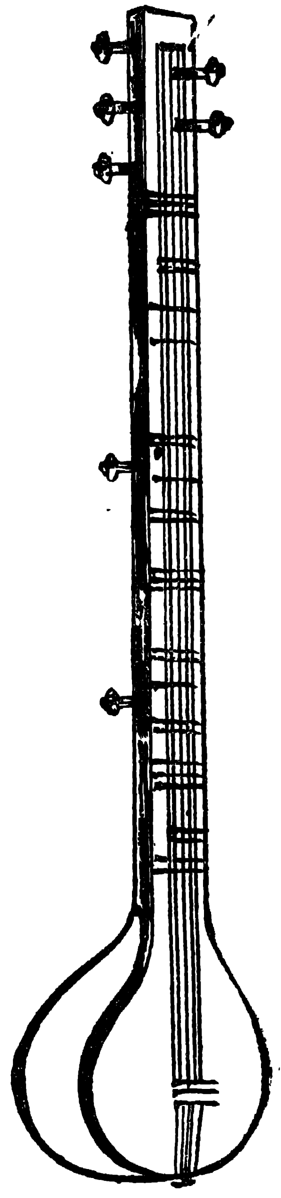
প্রথম খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে যদি ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সংগীতের বিশেষ অনুশীলন যে আরও অনেক আগে হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর্যদের স্তবস্তোত্রমন্ত্র আবৃত্তি হইতে একনিষ্ঠ সুরচর্চা শুরু হইয়াছে মনে হয়। অবশ্য সুর ও সংগীতের উৎপত্তি আরও অনেক আগে হইয়াছে, মানুষের আবির্ভাবের কাল হইতে বলা চলে। আমরা যাহাকে মার্গসংগীত (classical music) বলি তাহারও উৎপত্তি (যেমন ধ্রুপদের) লোকগীত ও স্তোত্র আবৃত্তি হইতে হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। তাহারও অনেক আগে হইতে নিশ্চয়

Unit 8 : Our Music—Classical and other forms of music—Baul. Bhatiali, Folk-songs, 'Rabindra Sangeet'

১



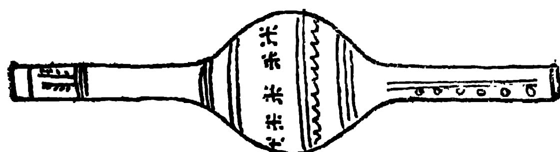
২



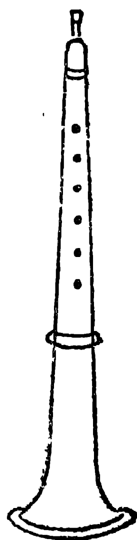
১ বীণা

২ সেতার

৩



৪



৫

৬

৩ পুঙ্গি

৪ সানাই

৫ শিঙা

৬ ডুগডুগি

ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মধ্যে নানারকম দেশী-সংগীতের প্রচলন ছিল। হিন্দুযুগের এই প্রাচীন সংগীতধারা মুসলমানযুগে বিশেষরূপে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়, মার্গ-সংগীতের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার হয় এবং বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পায়। 'ক্লাসিকাল' কথার অর্থ যাহা শাস্ত্রসম্মত। বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে নানাবিধ-ভাব-অনুভাব আবেগ হইতে যে-সমস্ত দেশী-সংগীত বা লোক-সংগীতের উৎপত্তি হইয়াছিল, পরবর্তীকালে তাহাই গুণীজনেরা বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কতকগুলি শাস্ত্রীয় নিয়মাবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার ঐশ্বর্য ও অলংকার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মাঠের গান, বনজঙ্গলের গান, নদনদীর গান, উৎসবের গান ক্রমে শাস্ত্রীয় বেশভূশায় ও অলংকারে সজ্জিত হইয়া রাজ-দরবারের ও আসরের গান হইয়াছে। এই দরবারী শাস্ত্রীয় সংগীতকেই মার্গ-সংগীত বা ক্লাসিকাল গান বলা হয়।

আরও একটি বিষয় জানা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে সংগীত বলিতে গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয় মনে করা হইত। অর্থাৎ আদর্শ সংগীতে একসংগে গীত-বাদ্য-নৃত্য হইবে, এই ছিল অভিপ্রায়। তিনটির সমন্বয় সম্ভব না হইলে অন্তত দুইটির হওয়া একান্ত প্রয়োজন—গীত-বাদ্য, নৃত্য-বাদ্য। শুধু গীত, শুধু বাদ্য বা শুধু নৃত্য সংগীত-পদবাচ্য নহে। আধুনিক ধারণা কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। শুধু বাদ্য, শুধু গীতও সংগীত। শুধু বাদ্য (সেতার, বাঁশ ইত্যাদি) যেমন আধুনিক যুগে সংগীত বলিয়া গ্রাহ্য, প্রাচীনকালে তাহা গ্রাহ্য হইত না।

প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা

ভরত নারদ শার্ঙ্গদেব প্রমুখ যে-সব সংগীতশাস্ত্রকারের কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদের গ্রন্থগুলিই প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তার উৎস। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রোক্ত সংগীতকথাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেইজন্য সংগীত প্রসঙ্গে ভরতের কয়েকটি সাধারণ কথা জানিয়া রাখা ভাল। ভরত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক গান করিবে, পুরুষ বাদ্য বাজাইবে, কারণ নারীকণ্ঠ স্বভাবতঃই মধুর এবং বাদ্য শ্রমসাপেক্ষ কর্ম বলিয়া তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর। শার্ঙ্গদেব অবশ্য গায়ক ও গায়িকা উভয়ের কথাই বলিয়াছেন।

বাদ্যযন্ত্র চার রকমের—তন্ত্রী-জাতীয় বাদ্য বা তারের বাজনা, মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্য, বংশী বেণু মুরলী প্রভৃতি ফুৎকার-বাদ্য (যাহা ফুঁ দিয়া বাজাইতে

হর্ষ) এবং কাংস্য-জাতীয় ধাতুময় ঘন (solid) বাদ্য। তন্ত্রী ও মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্য গীত-নৃত্যের ছন্দ-তাল অনুগমন করে, বংশী ও ধাতুময় ঘন-বাদ্য তাহার ছন্দ ও মাত্রাকে অনুবর্তন করিয়া স্ফুটতর করে। এই চারশ্রেণীর বাদ্যের বহু প্রকারভেদ আছে। একতন্ত্রী (একতারা), দ্বিতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী হইতে নবতন্ত্রী পর্যন্ত তারের বাজনা, পনের রকমের বাঁশী, পটহ করল ডক্কা ঢক্কা (ঢাক) প্রভৃতি মৃদঙ্গ-জাতীয় বাজনা এবং ঘন-বাদ্যের মধ্যে কাঁসরঘণ্টা জয়ঘণ্টা শুক্তিবাদ্য প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাদ্যের মধ্যে বীণাকে খুবই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

মার্গ-সংগীত ও দেশী-সংগীত

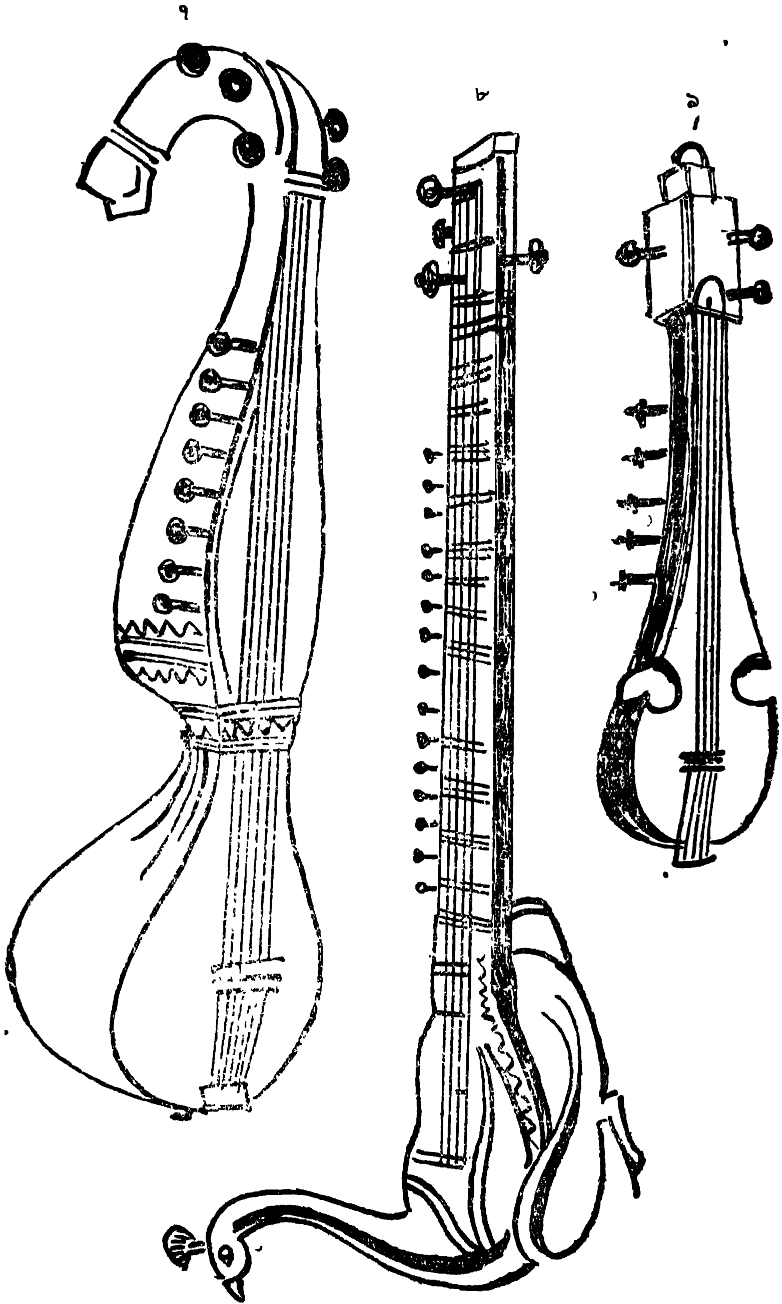
যাবতীয় সংগীতকে ভরত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—মার্গ-সংগীত ও দেশী-সংগীত। ব্রহ্মা মার্গ-সংগীতকে চতুর্বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, ভরত তাহাকে নির্বাচন করিয়া প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে তাহা সুশ্রাব্য মনোরম ও উপাদেয় হয়। এইজন্য মার্গ-সংগীতকে বলা হইয়াছে উৎকৃষ্ট-সংগীত। শ্রোতার মনোরঞ্জন করা এবং তাঁহার চিত্তে রসভাবাদি সৃষ্টি করা ছাড়াও মার্গ-সংগীতের বড় লক্ষ্য হইল শ্রোতার অন্তরের সুপ্ত অধ্যাত্মবোধকে জাগ্রত করা।

যে সংগীত দেশগত ও কালগত রুচির বশবর্তী হইয়া লোকজনের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে তাহাকে দেশী-সংগীত বলা হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুভারতের বিশুদ্ধ মার্গ-সঙ্গীতের রূপ যে কিরকম ছিল তাহা এখন খুঁজিয়া পাওয়া অথবা ব্যাখ্যা করিয়া বলা কঠিন। শোনা যায় দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতে, বিশেষ করিয়া কর্নাটিকী সংগীতে, ইহার কিছু পরিচয় এখনও মিলিলেও মিলিতে পারে। এখনকার সমস্ত সংগীত ষড়জগ্রামিক ও দ্বাদশ-স্বরাত্মক। একালের মার্গ-সংগীত বলিতে ইহাই বোঝায়। ইহার প্রবর্তন হইয়াছে মুসলমানযুগে এবং ইহার প্রধান পথপ্রদর্শক হইলেন আমীর খসরু (ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

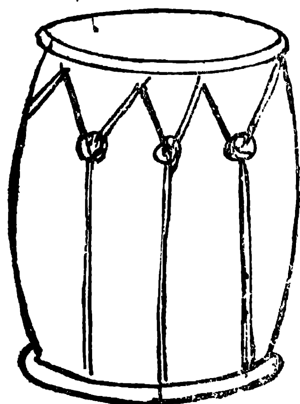
মার্গ-সংগীতের বিচার ও বৈচিত্র্য

বর্তমানে ভারতের মার্গ-সংগীতের যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই তাহা মুসলমান আমলে সুলতান-বাদশাহদের পোষকতায় বিকাশলাভ

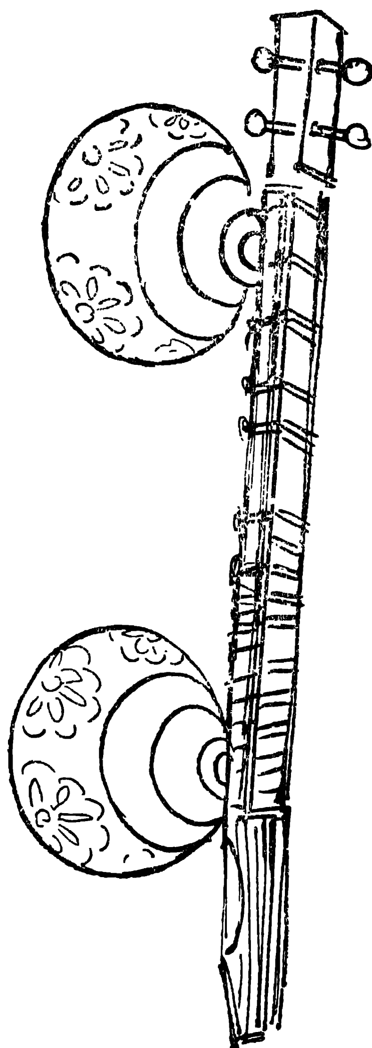


৭ সুরশৃঙ্গার ৮ তাউস ৯ সারেঙ্গী

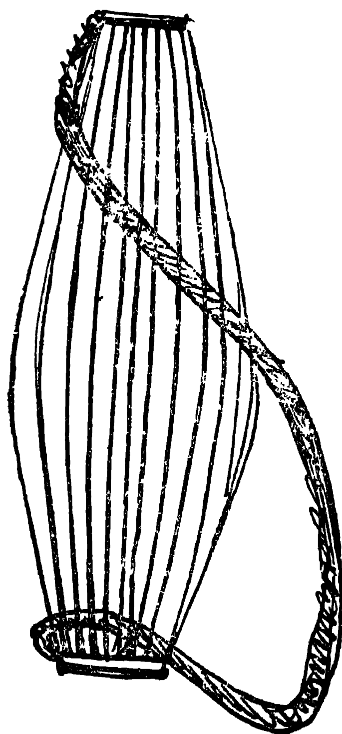
১০



১১



১২



১০ ঢোল ১১ বাণ ১২ খোল



আশাবরী রাগিণীর রূপায়ণ

করিয়াছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হইল এই যে ইসলামধর্মে সংগীতচর্চা ও চিত্রকলার অনুশীলন একরকম নিষিদ্ধ বলা চলে। খসরু বিদেশী হইলেও ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির উৎসাহী গুণগ্রাহী ছিলেন। বহু বিদেশী ও পারসিক রাগ-রাগিণীকে তিনি ভারতীয় রূপ দিয়াছেন—'ইমন' ও তাহার সংশ্লিষ্ট রাগ-রাগিণী ইহাদের মধ্যে প্রধান। তিনি ভারতে প্রাচীন লোক-সংগীতকে

অদলবদল করিয়া ত্রয়োদশ শতকে 'ধ্রুবপদ' বা 'ধ্রুপদ' গানের প্রবর্তন করেন। এদেশে সেতারেরও তিনি প্রবর্তক। ধ্রুপদ সংগীতের উৎপত্তি বিষয়ে আবুল ফজল তাঁহার বিখ্যাত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বলিয়াছেন যে গোয়ালিয়র প্রদেশে যে লোকসংগীত প্রচলিত ছিল রাজা মানসিংহ তোমরের* তাহা খুব ভাল লাগিত, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা অবজ্ঞা করিতেন। শেষে মানসিংহ মহাগুণী নায়ক বখশূ ও অন্যান্য ওস্তাদের সহায়তায় এই সংগীতকে উন্নত করিয়া ধ্রুপদে রূপ দেন। পরে বখশূ কলিঞ্জরের রাজা কীর্তিসিংহের দরবারে এবং গুজরাটের সুলতানের দরবারে থাকিয়া ধ্রুপদ গানের প্রচার করিতে থাকেন।

আকবর বাদশাহের দরবারে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী ছিলেন মিঞা তানসেন। তানসেন পূর্বে হিন্দু ছিলেন (বাংলাদেশের গৌড়ের ব্রাহ্মণ, নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে), পরে মুসলমান গুরুর শিষ্য হন এবং বিবাহসূত্রে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। মিঞাসারঙ্গ মিঞামল্লার প্রভৃতি বিখ্যাত সুর তানসেনের সৃষ্টি। মল্লারের সহিত গান্ধার মিশাইয়া তানসেন মিঞামল্লার সৃষ্টি করেন। ইহা ছাড়া দরবারীকানাড়া দরবারীটোড়ী বাহার প্রভৃতি সুরও তানসেনের সৃষ্টি। মোগল বাদশাহদের যুগকে, অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীকে, ভারতীয় মার্গ-সংগীতের স্বর্ণযুগ বলা যায়। হিন্দু ও মুসলমান কলাবতরা এই সময় বিচিত্র রাগ-রাগিণীর প্রশস্ত ভিত্তির উপর মার্গ-সংগীতের তাজমহল গড়িয়া তোলেন। তানসেন ছাড়া এই সময়ের সংগীতসাধকের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, কালিদাস ত্রিবেদী, হরিদাস, ত্যাগরাজ, মিশ্রী খাঁ, সদারঙ্গ, গুলাব খাঁ, বিলাস খাঁ, মসীদ খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে বাদশাহদের দুর্দিনে এই সব সাধকবংশের কেহ কেহ যান রাজপুতানায় হিন্দুরাজাদের আশ্রয়ে, কেহ যান কাশীরাজের আশ্রয়ে। উদয়পুর ধ্রুপদীদের এবং গোয়ালিয়র ও রেওয়া খেয়াল-গায়কদের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে। কাশীতে যান রবাবীরা, জয়পুরে যান সেতারীরা, রামপুর নবাবের আশ্রয়ে যান বীণকারেরা। কাশী অযোধ্যা গয়া বেতিয়া ও বাংলা-দেশের বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর পর্যন্ত গায়কেরা ছড়াইয়া পড়েন। পূর্বভারতের দিকে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের 'পূরবিয়া' বলে, এবং যাঁহারা রাজপুতানা রামপুর গোয়ালিয়রে যান তাঁহাদের বলে 'পশ্চিমা'।



অষ্টম প্রকরণ। সপ্তম অধ্যায়

ভারতের নৃত্যকলা

ভূমিকা। ভারতের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—'নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতি ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে'—নৃত্য গীত ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলিত নামই হইল 'সংগীত'। প্রাচীন ভারতে সংগীত বলিতে গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয়কে মনে করা হইত। অর্থাৎ আদর্শ সংগীত হইলে গীত বাদ্য ও নৃত্য একসঙ্গে হইবে, ইহাই ছিল প্রাচীন শিল্পকারের অভিপ্রায়। তিনটির সমন্বয় সম্ভব না হইলে অন্তত দুইটির সমন্বয় নিতান্ত প্রয়োজন—গীত ও বাদ্য অথবা নৃত্য ও বাদ্য। সুতরাং ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য অনুযায়ী নৃত্যকে সংগীতেরই একটি বিশেষ অঙ্গ বলিতে হয়।

ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তির কাহিনী

নৃত্যের উৎপত্তি। ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্রের আদিগুরু ভরত একদা দেবতাদের তুষ্টির জন্য একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকটি অভিনয় করা হইয়াছিল শিব ও পার্বতীর সামনে। অভিনয় দেখিয়া ভোলানাথ শিব অত্যন্ত খুশী হইয়া নাট্যকার ভরতকে তাঁহার নিজস্ব নৃত্যকলা শিক্ষা দিতে সম্মত হন। ভরত কৃতার্থ হইয়া করজোড়ে বলেন: "হে নাথ! আমাকে

Unit 8 (g) Our Dance—classical, modern and folk dances of India—their characteristics.

আপনার সৃষ্টি-প্রলয় লীলানৃত্য শিক্ষা দিন।" মহাদেব তাঁহার অনুচর তণ্ডুকে ডাকিয়া বলিলেন ভরতকে নৃত্যশিক্ষা দিতে। তণ্ডু ভরতকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নৃত্য শিক্ষা দিলেন। শিবের আদেশে তাঁহার অনুচর তণ্ডু এই শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া এই নৃত্যের নাম হইয়াছে 'তাণ্ডব' (তণ্ডু=বিশেষণ 'তাণ্ডব')।

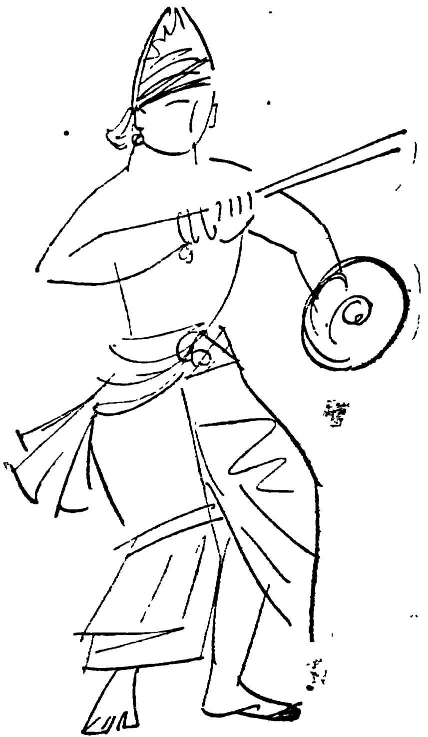
কেবল শিব নহেন, পার্বতীও নৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী উষাকে পার্বতী যে নৃত্য শিখাইয়াছিলেন, তাহারই নাম 'লাস্য'। এই 'লাস্য' হইতেছে নারীসুলভ কোমল ভাবপ্রধান নৃত্য। উষা এই নৃত্য পরে সৌরাষ্ট্রে দ্বারকার মহিলাদের শিক্ষা দেন এবং দ্বারকা হইতে সারা ভারতে এই নৃত্যকলা বিস্তার লাভ করে। এই কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তিস্থল যে সৌরাষ্ট্র বা দ্বারকা তাহা মনে করিবার সংগত কারণ নাই।

ভরতের প্রাচীন 'নাট্যশাস্ত্র' (আনুমানিক প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রচিত) ভারতের ধ্রুবনৃত্যের (classical dance) প্রধান উৎস। কিন্তু তাই বলিয়া এই ধ্রুবনৃত্যের আগে ভারতে যে কোনপ্রকার নৃত্যকলার প্রচলন ছিল না, তাহা মনে হয় না। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে প্রথম খ্রীষ্টাব্দে ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হইবার আগে ভারতের বহু জাতি-উপজাতির লোকজন গান বা নৃত্য কিছুই করিত না। অথচ প্রথম খ্রীষ্টাব্দের আগে অন্তত ৮।১০ হাজার বৎসর ধরিয়া ছোট ছোট গ্রাম্যসমাজে, পাহাড়-পর্বতে ও বনে-জঙ্গলে ভারতের নানা জাতি-উপজাতি বাস করিয়াছে— একথা আজ আমরা নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছি। এই হাজার হাজার বছর ধরিয়া মানুষ কেবল মেহনত করিয়াছে, খাইয়াছে ও ঘুমাইয়াছে, নাচগান কিছুই করে নাই ইহা ভাবা যায় না।

পৃথিবীর মনীষী ও বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে আদিম মানুষ যেদিন হইতে ধরিত্রীর বুকে পদার্পণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে নৃত্য ও সংগীতের জন্ম হইয়াছে। সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে সংগীত নৃত্য ও চিত্রকলা মানুষের প্রাচীনতম শিল্প, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ হইতে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্র-অনুমোদিত ধ্রুবনৃত্যের বিকাশের আগেও যে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারকম লোকনৃত্যের (folk



কথকলির মুখোশ



কেরলের লোকনৃত্য

dances) প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের ধ্রুবনৃত্য ও অন্যান্য নৃত্য খুব সমৃদ্ধ হইলেও একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের ও নানা জাতি-উপজাতির লোকনৃত্যের সম্ভার, বৈচিত্র্য



ভরত নাট্যম্

ও সৌন্দর্য আরও অতুলনীয়। ধ্রুবনৃত্য ও অন্যান্য সমস্ত প্রকার নৃত্যের উৎপত্তি হইয়াছে লোকনৃত্য হইতে। লোকনৃত্যের ভাবভঙ্গিকে অনেক বেশী ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া ধ্রুবনৃত্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে।

'নৃত্য' কথার অর্থ কি?

'নৃত্য' কথাটির মূলধাতু হইল 'নৃতি'—ইহার অর্থ হইল গাত্র বিক্ষেপ করা, অর্থাৎ গা-হাত-পা নাড়া। গাত্রবিক্ষেপ নানারকমের হইতে পারে। নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষ অঙ্গসঞ্চালন করে। কিন্তু হাত-পা নাড়িলেই নৃত্য হয় না। তাহা হইলে নৃত্য কি? ছন্দোবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদৃশ্য ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িলে তাহা নৃত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অর্থাৎ গাত্রবিক্ষেপ মাত্রই নৃত্য নহে, যাহা সুদৃশ্য ছন্দোময় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অঙ্গভঙ্গি তাহাই নৃত্য। সুতরাং নৃত্যের বড় কথা হইল ছন্দ। আমাদের সামান্য হাঁটা-চলার মধ্যেও ছন্দ থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। যখন ছন্দ থাকে না তখন তাহা শুধু হাঁটা বা চলা। কিন্তু চলিবার সময় যদি চলার গতি সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং চলার ভঙ্গির মধ্যে বিশেষ একটি ছন্দ থাকে, তাহা হইলেই তাহা সুদৃশ্য হইবে এবং সেই চলাই মনে হইবে নৃত্য। সুতরাং নৃত্যের প্রথম কথা হইল অঙ্গভঙ্গির ছন্দ ও শৃঙ্খলা।

দ্বিতীয় কথা হইল, নৃত্যের ভিতর দিয়া আমরা নানারকমের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। কতরকমের মনোভাব তাহারও সংখ্যা অগণিত। ইহাও একরকমের 'অভিনয়'। বোবাদের কথা বলিবার শক্তি নাই বলিয়া তাহারা নানারকমের মনোভাব হাতমুখের ভঙ্গিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। যিনি নৃত্যশিল্পী তিনি বোবা না হইলেও বোবার কাজটি তাঁহাকে করিতে হয়। তফাত এই যে সাধারণ বোবা লোকের মুখহাতের ভঙ্গির মধ্যে কোন ছন্দ, গতি ও শৃঙ্খলা থাকে না, এবং সুন্দর ও মনোহর করিয়া ভাবপ্রকাশের আগ্রহও তাহার থাকে না, কোনরকমে ভাবটি প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহার দায় চুকিয়া যায়, কিন্তু নৃত্যশিল্পীর তাহা যায় না। তিনি মনের বিশেষ ভাব-অনুভাবকে বিশিষ্ট ছন্দোবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গভঙ্গির ভিতর দিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। কথায় যাহা অভিনয় করা হয় তাহাকে 'বাচিকাভিনয়' বলে, আর যাহা শুধু অঙ্গভঙ্গিতে অভিনয় করা হয় তাহাকে বলে 'অঙ্গাভিনয়'। নৃত্যকে নির্বাক অঙ্গাভিনয় বলা চলে।

নাটকের অভিনেতা প্রধানত কথায় কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া রাগ দুঃখ অভিমান বৈরাগ্য চাঞ্চল্য প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত 'ভাব' নৃত্যশিল্পীকেও প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু কথায়

প্রকাশ করিবার তাঁহার উপায় নাই। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমার ভিতর দিয়া তাঁহাকে এই ভাবগুলি প্রকাশ করিতে হয়। যাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাব-প্রধান ভঙ্গিমার মধ্যে বাঙ্ময় হইয়া ওঠে, মনে হয় যে অঙ্গের প্রতিটি স্পন্দন পর্যন্ত ভাবটিকে সুন্দর ও স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতেছে, তিনিই প্রকৃত নৃত্য-শিল্পী এবং তাঁহার নৃত্য সার্থক নৃত্য।



কথকলি নৃত্যের মুখোশ ও অঙ্গসজ্জা—(নলদময়ন্তী পালা)

আর একরকমের নৃত্য আছে যাহার মধ্যে কোন বিশেষ ভাবকে ফুটাইবার চেষ্টা না করিয়াও কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির বা চরিত্রের অনুকরণ করিবার জন্য

বিশেষ অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাম রাবণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র এবং শিবাজী ঔরঙ্গজীব রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া নৃত্যাভিনয় করিতে হইলে বিশেষ অঙ্গসজ্জা (make up) ও অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই অঙ্গসজ্জা বা মেকআপকে নৃত্যের 'আহার্য' বা খাদ্য বলা হইয়াছে।

নয়টি প্রধান রস বা ভাব

ভাবপ্রধান নৃত্য কয়েকটি মূলভাব ('রস' বলা হয়) আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আলংকারিকরা এই নয়টি ভাবের বা রসের এই নাম দিয়াছেন :

শৃঙ্গার		রৌদ্র
হাস্য		ভয়ানক
করুণা		বীভৎস
বীর	শান্ত	অদ্ভুত

প্রেম ভালবাসা ভক্তি ও 'শৃঙ্গার' রসভুক্ত। এইজন্য শাস্ত্রকাররা শৃঙ্গারকে অন্যান্য সকল রসের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যের মধ্যেও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দেখা যায়। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল ধারা হইল প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার ধারা। সেইজন্য ভারতীয় নৃত্যের বিস্তার, বৈচিত্র্য সমৃদ্ধি শৃঙ্গার রস কেন্দ্র করিয়া যতদূর হইয়াছে, তাহা অন্য কোন রসের আশ্রয়ে হয় নাই

ভারতীয় নৃত্যের প্রকারভেদ

রীতি বা স্টাইলের দিক হইতে বিচার করিয়া ভারতীয় নৃত্যকে সাধারণত চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই চারটি শ্রেণী হইল :

১। ভরত নাট্যম
২। কথকলি ('কথাকলি' না বলিয়া 'কথকলি' বলাই শুদ্ধ)
৩। কথক
৪। মণিপুরী

এই চাররকমের নৃত্য ছাড়াও নানারকমের লোকনৃত্য আছে।

ভরত নাট্যম

'ভরত নাট্যম' ধ্রুব বা ক্লাসিক্যাল নৃত্যের মূলরীতি। এই নৃত্যরীতি ভারতের কোন বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা ভারতের সর্বত্র কমবেশী প্রচলিত আছে। প্রধানত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া ভারতের এই ক্লাসিক্যাল নাট্যরীতির বিকাশ হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'ভরত নাট্যম' বলা হয়।

কোথাও কোথাও এই ভরত-নাট্যম রীতির সহিত এক-একটি অঞ্চলের প্রচলিত লোকনৃত্যের রীতির মিলন-মিশ্রণ হইয়াছে, যেমন দক্ষিণভারতের 'কথকলি' নৃত্যে। ধ্রুবনৃত্য যেমন লোকনৃত্যের গুণ আত্মসাৎ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে, লোকনৃত্যও তেমনি ধ্রুবনৃত্যের শৃঙ্খলা সংযম ও দক্ষতা গ্রহণ করিয়া উন্নত হইয়াছে।

কথকলি নৃত্য

'কথকলি' নৃত্য দক্ষিণভারতের। কেরল হইতেছে কথকলির জন্মভূমি। সুদূর দক্ষিণপশ্চিম ভারতে কেরলের ভৌগোলিক অবস্থান কথকলির নৃত্যরীতির বিশুদ্ধতা বহুকাল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বাহিরের অন্য কোন নৃত্যরীতির প্রভাব ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও বাধার জন্য কেরল অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেইজন্য কথকলির বিচিত্র ও অদ্ভুত নৃত্যরীতি প্রায় ৫০০ বছর ধরিয়া একরকম রহিয়াছে, বিশেষ কোন পরিবর্তন তাহার হয় নাই। কথকলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কেরল অঞ্চলের লোকপ্রবাদ হইল—ষোড়শ শতাব্দীতে মালাবার রাজ্যের এক রাজা এই নৃত্যরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, কিন্তু ইহার সবটুকু সত্য নহে। দক্ষিণভারতের দেবালয়ে দীর্ঘকাল হইতে দেবদাসীনৃত্যের প্রচলন ছিল। তাহা ছাড়া নানাবিধ উৎসব-পার্বণে লোক-নৃত্য ও লোকসংগীতের প্রচলনও ছিল যথেষ্ট। এইসব লোকনৃত্যের ধারা কথকলি নৃত্যের মধ্যে আসিয়া মিশিয়াছে। কথকলির পোশাক ও অঙ্গসজ্জার মধ্যে 'মুখোশ' (mask) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মুখোশ ভারতের তো বটেই, সারা পৃথিবীর লোকনৃত্যের অন্যতম অঙ্গসজ্জা। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কথকলি নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছে কেরল-মালাবার অঞ্চলের লোকনৃত্য হইতে।



পাঞ্জাবী লোকনৃত্য (মেয়েদের



পাঞ্জাবী লোকনৃত্য (পুরুষদের)

কথকলি হইল মূলত নৃত্যনাট্য (dance-drama)। কোন একটি কাহিনীকে সংগীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়া কথকলিতে রূপ দেওয়া হয়। আগে ইহার নাম ছিল 'রামকথম্'—রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের কাহিনী কেন্দ্র করিয়া কথকলির নৃত্যনাট্য রচিত হইত। পরে মহাভারত পুরাণ ও অন্যান্য কাহিনী-উপকথা অবলম্বন করিয়া কথকলির বিষয় রচনা আরম্ভ হয়। এই বিষয়বস্তু হইতেই বোঝা যায় যে কথকলি নৃত্যের পশ্চাদ্‌ভূমির (background) গুরুত্ব খুব বেশী। যে-কোন পৌরাণিক কাহিনীকে অভিনয়ে রূপ দিতে হইলে তাহার পটভূমিকে স্বভাবতঃই খুব জমকাল করিতে হয় এবং রাম রাবণ অসুর দানব প্রভৃতি চরিত্রের রূপায়ণেও বিশেষ অঙ্গসজ্জার বা মেক-আপের প্রয়োজন হয়। কখন নর্তকরা মুখ রঞ্জিত করে, কখন বা মুখোশ ব্যবহার করে। অসুর-দানব, দশানন-রাবণ, বীর-হনুমান প্রভৃতির রূপ দর্শকদের সামনে সজীব করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত মুখোশ না হইলে চলে না। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে ও মানভূমে 'ছৌ-নাচ' বলিয়া একরকমের লোকনৃত্য আছে। ইহাও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচনা করা হয় এবং মুখোশ ছৌ-নাচেরও একটি প্রধান অঙ্গসজ্জার উপকরণ। এই দিক হইতে কথকলির সহিত ছৌ-নাচের সাদৃশ্য আছে।

সম্প্রতি অবশ্য কথকলি নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে, প্রায় উঠিয়া যাইতেছে বলা চলে। মুখোশের বদলে মুখে খুব গাঢ় করিয়া 'পেইণ্ট' দেওয়া হয় এবং তাহাতেই দশানন বা হনুমানের চরিত্রের ভাব যথাসম্ভব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পেইণ্টে কাজ হয় না বলিয়া উদ্ভট পোশাক পরিচ্ছদ, কিম্ভূতকিমাকার টুপি, ঘাগরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেবল দক্ষিণভারতে নহে, উত্তরভারতেরও সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কথকলির মতো লোকপ্রিয় নৃত্য খুব কমই আছে দেখা যায়।

মণিপুরী নৃত্য

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো মণিপুরের নৃত্যকলাও স্থানীও ধর্মজীবনের ধারাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে। মণিপুরী নৃত্যের প্রাচীন ধারা শিব-পার্বতীর কাহিনী আশ্রিত। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের পর রাধাকৃষ্ণের লীলাই হইয়াছে মণিপুরী নৃত্যের



মধ্য প্রদেশের উপজাতিদের নৃত্য

প্রধান বিষয়বস্তু। প্রাচীন মণিপুরী নৃত্যে ভরত-নাট্যম-রীতিরও যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে।

'অস্ত্রবিদ্যা' নামে একরকমের মণিপুরী নৃত্য আছে যাহা খুবই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। তরবারি বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নর্তকরা এই নৃত্য করিয়া থাকে এবং নৃত্য করিবার সময় তাহাদের দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ অঙ্গভঙ্গি ও ক্রীড়া-কৌশলও অনেক দেখাইতে হয়। মধ্যে মধ্যে নর্তকরা দুইটি দলে ভাগ হইয়া গিয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে যুদ্ধের অভিনয়ও করিয়া থাকে। শোনা যায় প্রাচীনকালে এই অস্ত্রবিদ্যা-নৃত্য মণিপুরের প্রত্যেক পুরুষকে বাধ্য হইয়া শিখিতে হইত। এমন কি মণিপুরের মেয়েদেরও এই নৃত্য শিক্ষা করিতে কোন বাধা ছিল না। মণিপুরে বৈষ্ণব ভাবপ্রধান নৃত্যের বিস্তার হইলেও সাধারণ লোকের কাছে এই প্রাচীন অস্ত্রবিদ্যা-নৃত্যের আকর্ষণ আজও একটু কমে নাই। বড় বড় উৎসব-পার্বণে এখনও এই অস্ত্রবিদ্যা-নৃত্যের অনুষ্ঠান রীতিমত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব ভাবপ্রধান নৃত্যের মধ্যে মণিপুরে কীর্তন-নৃত্য, রাসলীলা, গোষ্ঠলীলা ইত্যাদি প্রধান। করতাল খোল মৃদঙ্গ ও মঞ্জীর সহযোগে কীর্তন-নৃত্য হয়। নর্তকরা অর্ধবৃত্তাকারে করতাল হাতে লইয়া দাঁড়ায়, দুইজন খোলবাদক দুইপ্রান্তে থাকে, মধ্যে থাকে দলপতি। পোশাক অত্যন্ত সাদাসিধা—ধবধবে ধুতি, উত্তরীয় ও পাগড়ি। দলপতি অঙ্গভঙ্গি করিয়া প্রথম কীর্তন গান আরম্ভ করে, তারপর নর্তকরা সেই তালে তালে গান ও নৃত্য করিতে থাকে। সরল ও অনাড়ম্বর হইলেও এই মণিপুরী কীর্তন-নৃত্যের এমন একটি সর্বজনীন আবেদন আছে যাহাতে দর্শকরা মোহিত হইয়া যায়। গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলা-নৃত্যে সুন্দর রঙিন মণিপুরী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয় এবং সেইজন্য তাহা দেখিতে আরও সুন্দর লাগে।

কথক-নৃত্য

উত্তরভারতের নৃত্যকলার মধ্যে প্রধান হইল 'কথক,' যেমন দক্ষিণভারতের 'কথকলি'। হিন্দু পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতে 'কথক' নামে একটি চরিত্র আমরা দেখিতে পাই। কথকের কাজ হইল কোন অনুষ্ঠানে বা রাজার কাছে গাথা ও কাহিনী আবৃত্তি করা। তবে এই আবৃত্তি কথক শুধু কণ্ঠস্বর দিয়া করিত না, তাহার সহিত অঙ্গভঙ্গি করিয়াও



মহারাষ্ট্রের লোকনৃত্য

শ্রোতা ও দর্শকের মনোরঞ্জন করিত। কথকের এই প্রাচীন ভূমিকা হইতেই পরবর্তীকালে উত্তরভারতে কথক-নৃত্যের উদ্‌ভব হইয়াছে। পরে কণ্ঠের আবৃত্তির বদলে অঙ্গাভিনয় সংযোজিত হইয়াছে।

বর্তমানে কথক-নৃত্য সুসমৃদ্ধ ধ্রুবনৃত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সমস্ত-রকম ভাব-অনুভাবকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিসূক্ষ্ম ভঙ্গিমার ভিতর দিয়া কথক-নৃত্যে প্রকাশ করা হয়। নৃত্যের ও নাট্যের দুইটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের কথা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—একটিকে বলে 'নাট্যধর্ম', আর-একটিকে বলে 'লোকধর্ম'। নাট্যধর্ম হইল আধ্যাত্মিক ভাবের রূপায়ণ এবং লোকধর্ম হইল ইহলৌকিক বা পার্থিব ভাবের রূপায়ণ। আধ্যাত্মিক ভাব অনেক সূক্ষ্ম অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। কথক-নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হইল লোকধর্মী ভাবগুলিকে নাট্যধর্মী সূক্ষ্ম অঙ্গাভিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করা।

উত্তরভারতীয় কথক-নৃত্যের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল চক্রাকারে নৃত্য ('ঘুমেরি' বলা হয়)। নর্তকরা নৃত্য করিতে করিতে ঘূর্ণীর মতো প্রবণ্ড বেগে ঘুরপাক খাইয়া আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে থাকে। ঘূর্ণীবেগে ঘুরপাক খাইবার সময় দেহের ও পায়ের ভারসাম্য নর্তকরা এমন সুন্দরভাবে বজায় রাখে যে তাহা দেখিতে দেখিতে দর্শকদের মাথাঘোরার ভাব হইলেও নর্তকদের কিছুই হয় না। পা দুইখানি দিয়া সমস্ত দেহটিকে কতখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে এই ধরনের ঘূর্ণীবাত্যার মতো অঙ্গসঞ্চালন সম্ভব তাহা কল্পনা করা যায় না।

ভারতের লোকনৃত্য

ভারতের লোকনৃত্যের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের কাছে ভারতীয় লোকনৃত্যের বিচিত্র সম্ভার একটি বিস্ময়ের বস্তু। এই লোকনৃত্যকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের নানারকম সংঘনৃত্য।

২। আদিবাসীদের নানারকমের নৃত্য।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এতরকমের লোকনৃত্যের প্রচলন আছে যে তাহার হিসাব করিয়া শেষ করা যায় না। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত—এই ছয়টি ঋতুতে শত শত উৎসব-পার্বণ চক্রবৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতির পরিবেশের সহিত এবং ফসল উৎপাদনের সহিত এইসব লোকোৎ-



নাগা নৃত্য

সবের ও লোকনৃত্যের অধিকাংশেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অবশ্য সবই যে ফসল উৎসব তাহা নহে, বিভিন্ন ঋতুর আগমন ও বিদায় উৎসব, বহুরকমের কামনা-বাসনার উৎসব, বীরত্বের ও বেদনার উৎসব, আনন্দোৎসব ইত্যাদিও আছে। এইসব উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হইল লোকনৃত্য।

রাজস্থানে ঘুমের নৃত্য, হিমাচলপ্রদেশের পঙ্গি নৃত্য, কেরলের ওনম্ বা নববর্ষ উৎসবের নৃত্য, মণিপুরের রাস নৃত্য, গুজরাটের গরব নৃত্য, মহারাষ্ট্রের কোলি নৃত্য, পাঞ্জাবের ভাংড়া ও গিধ্‌ধ নৃত্য, বাংলাদেশের গাজন গম্ভীরা রাসলীলা ইত্যাদি নৃত্য, ভারতীয় লোকনৃত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান সাধারণত হোলি, দেওয়ালী, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, নববর্ষ, জাতীয় বীরত্বের কাহিনী ইত্যাদি কেন্দ্র করিয়া হইয়া থাকে।

দক্ষিণভারতে টোডা চেঞ্চু, উত্তরভারতে গণ্ড আগারিয়া বাইগা মারিয়া, পূর্বভারতে সাঁওতাল হো মুণ্ডা ওরাঁও শবর জোয়াঙ খাসিয়া নাগা প্রভৃতি আদিবাসীদের জীবনের প্রায় সকলরকমের কাজকর্মের সহিত নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের গভীর সম্পর্ক আছে। লোকনৃত্যের এইসব অনুষ্ঠান দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে সমাজে গোষ্ঠীজীবনের দৃঢ়তা ও ঐক্যবন্ধন অটুট রাখিবার জন্য ইহার প্রয়োজন কতখানি। কাজকর্মে উৎসাহিত করিতে, ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিকাশে সাহায্য করিতে এবং জাতীয় জীবনে বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে লোক-উৎসব ও লোকনৃত্য বড় সহায় হইতে পারে।

QUESTIONS

1. What is the meaning of the word *Nritya* ? What are the characteristics of Indian *nritya* or dancing as an art ?

2. What are the main characteristics of Classical Indian dancing ?

3. What is Kathakali dance ? Where did it flourish ? What are its characteristics ?

4. What is Kathak dance ? What are its characteristics ?

5. What are the characteristics of Manipuri dances ? What are its different forms ?

6. Write briefly what you know about the folk dances of India.



স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী



নবম প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীন ভারত

ভূমিকা। বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় একশত বছর সংগ্রাম করিয়া আমরা ১৯৪৭ সালে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। সেই সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস আমরা ইহার পরে আলোচনা করিব। এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কতখানি বাড়িয়াছে। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসকের অধীনে নানারকম দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া, পরাধীনতার অসংখ্য বন্ধন ও গ্লানি সহ্য করিয়া আমরা নিজেদের দেশেই কতকটা পরবাসীর মতো নিরুদ্যম ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বাস করিতেছিলাম। কোন কিছুতেই আমাদের উদ্যম বা উৎসাহ ছিল না, কিছু করিতে গেলেই মনে হইত কাহার জন্য ও কিসের জন্য করিতেছি। দেশ স্বাধীন হইবার পর আজ আর আমাদের সেই মনোভাব নাই, থাকা উচিতও নহে। এখন আমরা দেশের ঐহিক ও মানসিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে যতটুকু মেহনত করিব তাহাই সার্থক হইবে। হয়ত তাহাতে আমার ব্যক্তিগত উপকার না হইতে পারে, কিন্তু অন্য দশজনের উপকার হইবে এবং তাহাদের উপকার হইলে শেষ পর্যন্ত আমিও উপকৃত হইব। কিন্তু দেশের জন্য কিছু করিতে হইলে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যেক দেশবাসীর ধারণা থাকা উচিত। আগে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের অতীত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে কত সমৃদ্ধ ছিল তাহাও বলিয়াছি। এখন আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও দুই-একটি কথা বলিব। এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে

Unit 9 (a) Living as citizens of Free India—achievement of Independence in 1947—building up a New India—a free, sovereign, democratic republic with a rich heritage and culture—unity in diversity.

সচেতন থাকিলে আমরা অনেক বেশী সজাগ হইয়া দেশের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

নূতন ভারত গঠনের দায়িত্ব

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাইবার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি হইতে ভারতে যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাতে ভারতরাষ্ট্রকে একটি 'সাধারণতন্ত্র' (Republic) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণার গুরুত্ব আছে। ভারত শুধু স্বাধীন রাষ্ট্র নহে, একটি সাধারণতন্ত্র, অর্থাৎ জনসাধারণের রাষ্ট্র। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং তাহার উপর তাহাদের কর্তৃত্বের অধিকার এই ঘোষণায় স্বীকার করা হইয়াছে। পরে আবাদী কংগ্রেসে (১৯৫৫)। এই আদর্শের সহিত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক (Socialist) আদর্শের মিলন হইয়াছে। সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি হইল গণতান্ত্রিক। দেশের বৃহত্তম জনসাধারণ স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া যে-রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। ভারত সাধারণতন্ত্র ও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

কিন্তু গণতন্ত্র হইল রাজনীতিক সাম্যের বা সমান অধিকারের আদর্শ। নির্বাচনের সময় দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোট দিবার বা নিজের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার সাধারণতন্ত্রে ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকার করা হয়। একজন দরিদ্র কৃষকের যে অধিকার আছে, ধনিকেরও সেই অধিকার আছে। নারী ও পুরুষেরও অধিকার সমান। কিন্তু ইহার সহিত আর্থিক সাম্যের কোন সম্পর্ক নাই। সমাজতন্ত্র বা সোশ্যালিজম-এর আদর্শে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক সমতা স্থাপনের লক্ষ্য থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইলেই যে তাহা সমাজতান্ত্রিক হইবে এমন কোন কথা নাই। যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নহে। স্বাধীন ভারত তাহার লক্ষ্য গণতন্ত্রের বিশাল ক্ষেত্র হইতে সমাজতন্ত্রের গৌরীশৃঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছে। এই লক্ষ্য বা আদর্শ বাস্তব সত্যে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক ভারতজনের বহু গুরুদায়িত্ব ও কঠোর কর্তব্য পালন করিতে হইবে। ধাপে ধাপে ভিত হইতে নূতন ভারতের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সৌধ সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় গড়িয়া তুলিতে হইবে।



ভারতীয় প্রাচীন তীর্থগুলি ঐক্যের সূত্র ছিল

ভারতের ঐতিহ্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ও ঐশ্বর্যের বিস্তারিত পরিচয় আগে দেওয়া হইয়াছে (অষ্টম প্রকরণ)। ভারতে কত রকমের জনগোষ্ঠী, কতরকমের ভাষা ও ধর্ম, কত বিচিত্র শিল্পকলা তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তখন মনে হয় যে-দেশে এত রকমের জাতি, এত রকমের ভাষা ও ধর্ম, তাহার বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐক্য কোথায়?

ভারতের ঋষি, ভারতের কবি ও পুরাণকাররা যে-ভারতের যুগ যুগ ধরিয়া কীর্তিগান করিয়াছেন, সে-ভারত উত্তরভারত দক্ষিণভারত পূর্বভারত বা পশ্চিমভারত নহে। হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে ও ভারতসমুদ্রের উত্তরে যে বিশাল দেশ অবস্থান করিতেছে, আমাদের পুরাণকাররা সেই দেশের নাম দিয়াছেন 'ভারতবর্ষ'। সেখানে যতরকমের লোকেরই বাস থাক, তাহারা সকলেই 'ভারতী সন্ততি' অর্থাৎ পুরাকালের ভরতরাজার সন্তান। এই প্রাচীন পৌরাণিক ধারণার মধ্যেও এক ও অখণ্ড ভারতের কল্পনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সকল অঞ্চলের লোক সমান ভক্তিভরে পাঠ করিয়াছে, এখনও করে। ভারতের দেবদেবী হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন এবং সকলশ্রেণীর মানুষকে সমান আশাভরসা ও শান্তি দান করিতেছেন। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের মেলা ও তীর্থগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের সমাবেশ হইয়াছে, পার্থিব বস্তু ও অপার্থিব ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছে এবং তাহার ভিতর দিয়া বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের আন্তরিক ঐক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ যদি ভারতের চারটি প্রধান তীর্থ দর্শন করিতে চান, তবে তাঁহাকে উত্তরে বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ, পূর্বে শ্রীক্ষেত্র, পশ্চিমে গুজরাটে সারদাপীঠ এবং দক্ষিণে মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠে যাইতে হইবে, নতুবা তীর্থভ্রমণ ব্যর্থ হইবে। অর্থাৎ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিকে মহাতীর্থগুলি অবস্থিত। সেইজন্য তীর্থগুলির ভারতজনের মহামিলনকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

এইভাবে অতীতে ভারতজনের ঐক্যবন্ধন অটুট রাখার চেষ্টা হইয়াছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে এই ঐক্যের পথ আরও অনেক প্রশস্ত হইয়াছে। ভারতের মানুষের চলাচল ও যোগাযোগের ব্যবস্থা আজ এত উন্নত হইয়াছে যে বিভিন্ন অঞ্চলের তো দূরের কথা, সারা পৃথিবীর মানুষকেই একটি বিশাল পরিবারের মানুষ বলিয়া মনে হয়। তবু আজ যেহেতু ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জাতি-উপজাতি নিজেদের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আগের তুলনায় অনেক বেশী সজাগ হইয়াছে, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদের ভাষাগত ও ধর্মগত দাবীদাওয়ার মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধেরও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিরোধ ও কলহ স্বাভাবিক, কিছুটা হইবেই এবং তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না।

পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন সাবালক হইয়া ওঠে তখন তাহারাও দাবীদাওয়া ও মতামত প্রকাশের অধিকার পায়, মধ্যে মধ্যে সেইজন্য পরিবারের শান্তিভঙ্গও হইতে পারে। স্বাধীন ভারতেও তাহাই হইয়াছে। ভারতের বিশাল জন-পরিবারে আজ বহু জাতি-উপজাতি সাবালক হইয়া স্বাধিকার দাবী করিতেছে। মারাঠী গুজরাটী আসামী বাঙালী ওড়িয়া বিহারী প্রভৃতির রাষ্ট্রীক ও আর্থিক দাবীদাওয়া এই অধিকারবোধ হইতে উদ্ভূত। ইহা সুলক্ষণ, যদিও ভ্রাতৃবিরোধ অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই বিরোধও সাময়িক, কারণ সর্বভারতীয় চেতনাও প্রত্যেক ভারতজনের মধ্যে দৃঢ়মূল। এই ঐক্যবোধের মূল অতীতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, হঠাৎ কোন সাময়িক উত্তেজনার ঘূর্ণিঝড়ে তাহা উপড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবার জন্য এই একতাই হইবে আমাদের প্রধান সম্বল। একতার জোরেই আমরা নূতন ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র, উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ এবং সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে পারিব।

QUESTIONS

1. What are our new responsibilities as citizens of Free India ?

2. Show how India offers an example of unity in diversity.



নবম প্রকরণ । দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

ভূমিকা। বিদেশী ইংরেজদের শাসনমুক্ত হইয়া ১৯৪৭ সনে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এই স্বাধীনতা আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফল। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব হইতে ধীরে ধীরে আমাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। রামমোহন রায় ও নবযুগের অন্যান্য মুখপাত্ররা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করিয়াছেন। উনিশ শতকের প্রথমভাগে ওয়েলেসলি হইতে ডালহৌসি পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছিলেন। মারাঠা ও রাজপুত নায়কদের ছলেবলে পরাজিত করিয়া, বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহারা সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর

Unit 9 (b) How we attained Independence in 1947. First War of Independence against the British in 1857—growth of Nationalism and the Indian National Congress—Partition of Bengal—Swadeshi Movement—Mahatma Gandhi and Non-violent Non-co-operation movement—armed struggle in Bengal—August Movement 1942—Netaji and the I. N. A. Achievement of Independence in 1947.

হইতেছিলেন। ভারতের বহুকালের প্রাচীন সামাজিক আচারপ্রথা ও ধর্মগত ধ্যানধারণায় আঘাত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার উপর আর্থিক শোষণ ও নির্যাতনের সভ্য সীমা পর্যন্ত তাঁহারা লঙ্ঘন করিতেছিলেন। দুর্ভিক্ষ মহামারী ও অভাব-অনটনে সাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

এইসব কারণে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জাতিবৈরিতা ও বিক্ষোভ ক্রমেই ধূমায়িত হইতেছিল। কোথা দিয়া কখন বিদ্রোহ আকারে এই বিক্ষোভের বিস্ফোরণ হইবে, সে সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকরাও বেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতের বড়লাটপদে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবার পূর্বে লর্ড ক্যানিং বলিয়াছিলেন: "ভারতের রাজনীতিক আকাশে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে। কখন যে একখণ্ড মেঘ এই আকাশের বুকে ভাসিয়া উঠিবে এবং ক্রমে বৃহৎ দৈত্যের রূপ ধারণ করিয়া সমগ্র ভারতের বুকে ধ্বংসের তাণ্ডব আরম্ভ করিবে, তাহা কিছুই বলা যায় না।" ক্যানিং যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভারতে পৌঁছাইবার কিছুদিনের মধ্যেই ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

প্রথম বৃটিশবিরোধী গণবিদ্রোহ: ১৮৫৭-৫৮

বিদ্রোহের প্রথম পর্ব: সিপাহীবিদ্রোহ। ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৭ কলিকাতার কাছে দমদমের হিন্দু সিপাহীরা বন্দুকের নূতন চর্বি-মাখানো কার্তুজ ব্যবহার করিতে আপত্তি করে, ২৯ মার্চ বারাকপুরে একজন ইংরেজ মিলিটারি অফিসার হিন্দু সিপাহীর হাতে নিহত হন। এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঘটনাটি বহুদিনের বহু অভিযোগের বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগের মতো। দেখিতে দেখিতে সমগ্র উত্তরভারতে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে দিল্লী লক্ষ্ণৌ কানপুর রহিলখণ্ড মধ্যভারত বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল। ১০ মে (১৮৫৭) মীরাটের তিনটি ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্রমে সৈন্যদলের বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্ব: গণবিদ্রোহ। উত্তরভারতে মারাঠারা ছিল হিন্দুরাজ্যের শেষ প্রতিনিধি। সিন্ধিয়া হোলকার ভোঁসলে প্রভৃতি

বড় বড় রাজবংশগুলি যখন বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হইয়া যায়, সাতারা নাগপুর ঝাঁসি পর্যন্ত যখন ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়, তখন মারাঠা ও উত্তরভারতের হিন্দু-সাধারণের মধ্যেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমিতে থাকে। উত্তর-ভারতের মুসলমানদের কাছে অযোধ্যার মতো রাজ্য ছিল গৌরবের বস্তু, কারণ ইহা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের শেষ চিহ্ন ও সান্ত্বনার মতো ছিল। সেই অযোধ্যার নবাবও যখন ব্রিটিশের দ্বারা বিতাড়িত হইলেন, তখন মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লী পর্যন্ত সারা উত্তরভারতের মুসলমানদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এদেশে মুসলমানী শাসনের যুগ বাস্তবিকই শেষ হইয়াছে। এই অবস্থায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে কোন বাধা রহিল না। বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করিল। মীরাটের বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্রোহীরা দিল্লী অধিকার করিল এবং হতভাগ্য মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া 'ভারত-সম্রাট' বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহা বিদ্রোহীদের এক আশ্চর্য কীর্তি। ভারতে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এই কীর্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

বিদ্রোহের পরিণতি : বিদ্রোহীদের পরাজয়। কয়েকমাস পরেই (সেপ্টেম্বর ১৮৫৭) ব্রিটিশসৈন্য দিল্লী পুনরধিকার করে। বাহাদুর শাহকে গ্রেফ্তার করিয়া নির্বাসন দেওয়া হয় এবং রেঙ্গুনে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৬২)। লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার বিদ্রোহও দমন করা হয় (১৮৫৮), অধিকাংশ বিদ্রোহী নেপাল-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করে। বিদ্রোহকালে অপূর্ব বীরত্ব ও নেতৃত্বের জন্য যাঁহারা স্মরণীয় হইয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁহার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি, কানপুরের বিদ্রোহী নেতা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পোষ্যপুত্র বিখ্যাত নানাসাহেব ও বিহারের কুনওয়ার সিংহ। ঝাঁসির রানী পুরুষবেশে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেন। তাঁতিয়া টোপি ধরা পড়েন, বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। নানাসাহেব নেপালে পলায়ন করেন, শোনা যায় সেখানেই অজ্ঞাতবাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বিদ্রোহকে কেহ কেহ শুধু সিপাহীবিদ্রোহ আখ্যা দিয়া ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিতে চান নাই। কিন্তু এই ধরনের গণবিক্ষোভকে সিপাহীবিদ্রোহ না বলিয়া সত্যের

খাতিরে 'জাতীয় অভ্যুত্থান' বলা উচিত। ইহাই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

জাতীয়তাবোধের বিকাশ

১৮৫৭-৫৮ সালের গণবিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হইল বিদ্রোহী-দের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব এবং সংগঠনের দুর্বলতা। ব্রিটিশের মতো সুসংযত শক্তির বিরুদ্ধে কোন বিচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ কখনও সফল হইতে পারে না। কিন্তু তাহা না হইলেও বিদ্রোহে যাহারা বীরের মতো সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের দৃষ্টান্ত দেশবাসীকে নূতন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এইদিক দিয়া বিচার করিলে এই বিদ্রোহ সার্থক হইয়াছিল বলিতে হইবে। বিদ্রোহের পর হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ও আন্দোলন প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই ধরনের আন্দোলনের মধ্যে প্রধান হইল তিনটি ঃ

১। নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৮৫৯-৬১।

২। লিটনের 'অস্ত্র আইন' ও দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ আইন বা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৮৭৮-৭৯।

৩। ইলবার্ট বিলের আন্দোলন, ১৮৮২-৮৩।

এই তিনটি আন্দোলনের ভিতর দিয়া দেশবাসীর মনে জাতীয় চেতনার দ্রুত বিকাশ হয় এবং তাহার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়।

নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ১৮৫৯-৬০ সাল হইতে বাংলার চাষীরা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকে তাহা ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দেয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা নীলবিদ্রোহের সময় চাষীদের দাবী সমর্থন করেন। তখনকার বিখ্যাত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কঠোর ভাষায় নীলকর সাহেবদের সমালোচনা করেন। এই বিষয় লইয়া নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহিত গণআন্দোলনের সংযোগ স্থাপন করে বাংলার নীলবিদ্রোহ।

অস্ত্র আইন ও সংবাদপত্র-দমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। লিটনের শাসনকালে (১৮৭৬-৮০) এই দুইটি আইন পাশ হয়। অস্ত্র আইন (Arms Act) পাশ করিয়া লিটন ভারতীয়দের পক্ষে অস্ত্র ধারণ ও বহন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় ভার্নাকুলার প্রেস আইন পাশ করিয়া (১৮৭৮) দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও তিনি হরণ করেন। ইংরেজী ভাষার সংবাদপত্রগুলিকে এই আইনের বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। অস্ত্র ও সংবাদপত্র দুই ক্ষেত্রেই লিটন পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন যে ইংরেজরা যেহেতু শাসকের জাতি সেইজন্য তাঁহাদের অস্ত্র ধারণ করিবার এবং স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র চালাইবার অধিকার আছে, কিন্তু ভারতীয়রা পরের শাসনাধীন বলিয়া সেই অধিকার হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। জাতিবৈরের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ইহা অপেক্ষা বেশী আর কি হইতে পারে? ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয় এবং ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের বিস্তারে ইহা যে কতখানি সাহায্য করে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন। রিপনের শাসনকালে (১৮৮০-৮৪) এই আন্দোলন হয়। রিপন ঠিক লিটনের মতো কড়া প্রকৃতির শাসক ছিলেন না। তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা ও সহানুভূতির জন্য তিনি ভারতীয়দের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম কীর্তি হইল 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন। বিলের উদ্দেশ্য ছিল বিচারবিভাগে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে শাসক-শাসিতের ব্যবধান দূর করা। ফৌজদারী অপরাধ বিচারের ব্যাপারে এদেশীয় জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা ইউরোপীয় অপরাধীদের সমুচিত দণ্ড দিতে পারিতেন না, তাহা দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। রিপন ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এই অবিচার দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আইনসচিব ছিলেন স্যার কোর্টনি ইলবার্ট (Courtney Ilbert), সেইজন্য ইলবার্টকে তিনি এই মর্মে একটি আইনের খসড়া করিতে বলেন যাহাতে বিচারক্ষেত্রে ইংরেজ-ভারতীয়ের বৈষম্য দূর হইয়া যায়। আইনসচিব ইলবার্ট এই আইনের খসড়া করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত।

আইনের খসড়াটি যখন ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করা হয় (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২) তখন বাহিরে ইউরোপীয় সমাজে হঠাৎ যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ার মতো অবস্থা হয়। শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা তেলেবেগুনে ক্ষেপিয়া ওঠেন,



জাতীয় আন্দোলন ॥ ১৮৫৭-১৮৮৫

কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় বিচারকরা তাঁহাদের অপরাধের বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন ইহা কিছুতেই তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন না। তাঁহারা এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। একবছর পরে (২৮ জানুয়ারি ১৮৮৩) এই আইন সংশোধিত আকারে পাশ হইল। ইউরোপীয়রা জুরীর দ্বারা বিচারের অধিকার পাইলেন। ইলবার্ট বিলের আন্দোলন এদেশবাসীর চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে ইংরেজরা পরাধীন ভারতীয়দের অবজ্ঞা করে এবং নিজেরা শাসক বলিয়া জাতি হিসাবেও নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। ইহা বুঝিবার পর ভারতীয়দের মনে ইংরেজবিদ্বেষ দাবানলের মতো জ্বলিয়া ওঠা স্বাভাবিক।

ইহার কিছুদিন আগে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারতসভা' নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে স্থাপিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইহাব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই সভা কলিকাতায় একটি 'জাতীয় সম্মেলন' আহ্বান করিল। সুরেন্দ্রনাথ ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশবাসীর কাছে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সংগঠনের ভিতর দিয়া সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিবাব জন্য আবেদন করিতে থাকিলেন (১৮৮৩)। ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত "আনন্দমঠ" উপন্যাস প্রকাশিত হইল এবং তাহাতে ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় সংগীতও উদ্‌গীত হইল—

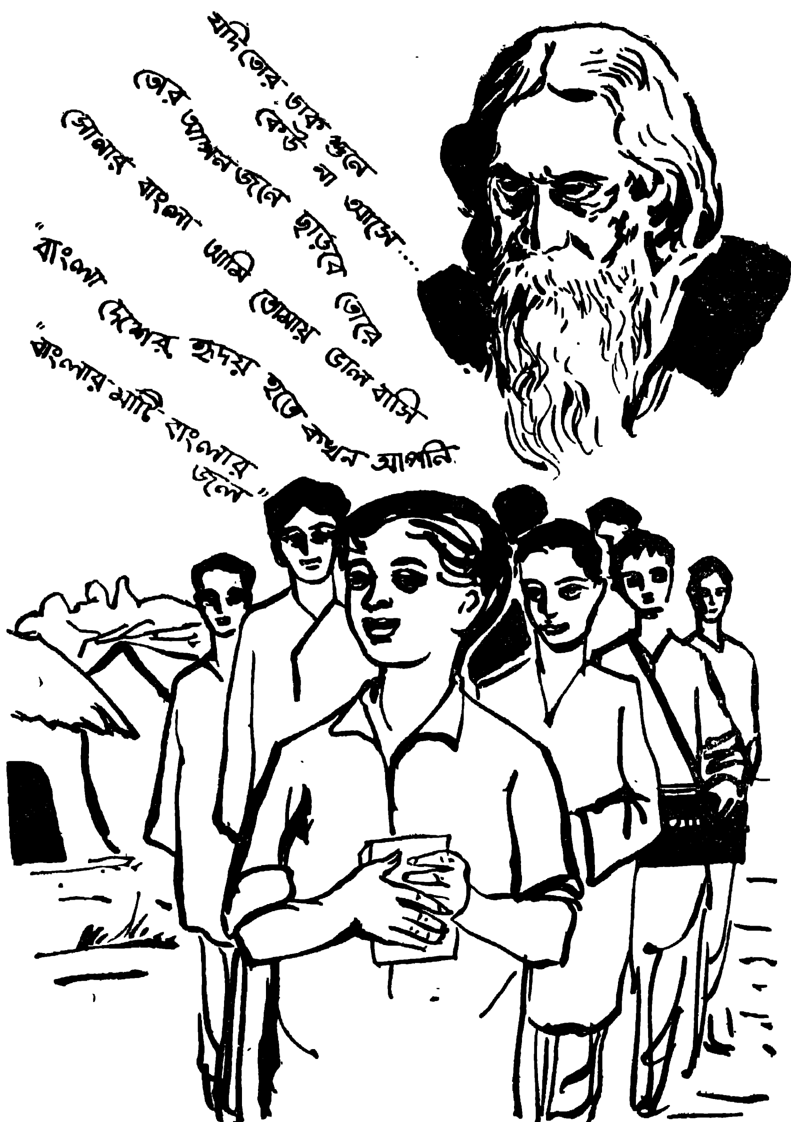
বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

'জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনও হয় কলিকাতায় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ইহাতে যোগদান করেন।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫

বাংলাদেশের যেমন 'ভারত সভা' ছিল, তেমনি পুনায় ছিল 'সার্বজনিক সভা', মাদ্রাজে 'মহাজন সভা', বোম্বাই-এ 'বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন'। এই সব সভার ভিতর দিয়া জাতীয় চেতনার যেমন বিস্তার হইতেছিল, সর্বভারতীয় জাতীয় সংগঠনেব প্রয়োজনবোধও তেমনি সকলের মনে জাগিতেছিল। এই প্রয়োজনবোধ হইতে জাতীয় নেতারা সকলে মিলিত হইয়া ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইতে



রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত 'স্বদেশী আন্দোলনে'
বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ দিনেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল।

বিদেশীদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লু. সি. বনার্জি নামে পরিচিত)। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ধারা বদলাইয়া যায়। আন্দোলন বিচ্ছিন্ন না হইয়া একটি আদর্শ, নীতি ও পথ ধরিয়া চলিবার সুযোগ পায় এবং সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনাও ক্রমে স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

কার্জনের শাসনকালে, বিশ শতকের গোড়ায়, বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত করা হয়। বাংলাদেশ ও বাঙালীদের উপরেই ব্রিটিশ শাসকদের রাগ ছিল বেশী। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে বাংলাদেশ এবং সেই আন্দোলনে কেবল সাধারণ কৃষকরা নহে, শিক্ষিত বাঙালীরাও আগাইয়া আসিতেছেন দেখিয়া শাসকরা বিচলিত হন। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার প্রসারও উনিশ শতকে বাংলা-দেশেই বেশী হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বাংলাদেশে যেরকম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়িয়াছিল সেরকম আর অন্য কোন প্রদেশে বাড়ে নাই। কাজেই বাংলাদেশের উপর আঘাত হানা দরকার। কতকটা এই ধরনের মনোভাব হইতেই ব্রিটিশ শাসকরা বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহার জাতীয় সংহতি নষ্ট করিতে উদ্যত হন।

বড়লাট কার্জনের নির্দেশে বাংলার ছোটলাট ফ্রেজার ১৯০৩ সালে বঙ্গ-বিভাগের একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা রচনা করেন। ইহাতে প্রস্তাব করা হয় যে, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ময়মনসিংহ জেলা আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে। প্রস্তাব উত্থাপন করিতেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শত শত সভা করিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদের তীব্রতায় বিচলিত হইয়া কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গে সফর করেন (ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। ইহার পর কিছুদিন বাংলার রাষ্ট্রিক আবহাওয়ায় একটা স্তব্ধতা বিরাজ করিতে থাকে। ঝড়ের আগের স্তব্ধতার মতো। হঠাৎ কিছুদিন পরেই শোনা যায় যে ভারতসচিব



লাজপৎ তিলক বিপিনচন্দ্র

বঙ্গ-বিভাগের পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। রাজশাহী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে, এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ ছোটনাগপুর-বিহার-উড়িষ্যার সহিত যুক্ত করিয়া "বাংলাদেশ" গঠন করা হইবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে বঙ্গবিভাগের সংবাদটি ঠিক বোমার মতো দেশের জনসাধারণের মধ্যে ফাটিয়া পড়ে, সকলে অবাক ও অভিভূত হইয়া যায়। গ্রামে গ্রামে, শহরে নগরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ভারতের সর্বত্র আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে।

'স্বদেশী' আন্দোলন বলা হয় কেন? জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্দোলনকে 'স্বদেশী' আন্দোলন বলা হয় কেন? ইহার আগে হইতে আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর তাহার প্রসারও হইতেছিল বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে। সেই আন্দোলনও

তো এদেশের লোকের আন্দোলন এবং তাহাও তো স্বদেশী। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী যে আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাকেই বিশেষ করিয়া 'স্বদেশী' আন্দোলন বলা হয় কেন ?

'স্বদেশী' আন্দোলন বলা হয় তাহার কারণ এই সময় (১৯০৫) জাতীয় আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রে 'স্বদেশী' ভাবধারা, 'স্বদেশী' আদর্শ ও ঐতিহ্য, এমন কি 'স্বদেশী' জিনিসপত্র পর্যন্ত লোকের মনে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল। এরকম স্বদেশীভাবের উন্মাদনা এদেশের লোকের মনে পূর্বে আর কখনও জাগে নাই। স্বদেশের ইতিহাস, স্বদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বদেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়, যাহা কিছু দেশের নিজস্ব তাহাই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা আমাদের দেশের মারাঠা রাজপুত শিখ প্রভৃতি জাতির অতীতের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কাহিনী হইতে মানসিক শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চয় করিয়াছি, শিবাজী-উৎসব করিয়াছি, প্রতাপাদিত্য-উৎসব করিয়াছি, বীরপূজা করিয়াছি। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' বলিয়া দেশের কাপড় ব্যবহার করিয়াছি, বিদেশী ও বিলাতি জিনিস 'বয়কট' করিয়াছি। বিদেশী শিক্ষা বর্জন করিয়া জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মনপ্রাণ আমাদের 'স্বদেশী' ভাবে ও আদর্শে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই ইহাকে আমরা বলি 'স্বদেশী' আন্দোলন।

বাংলাদেশে এই স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং আরও অনেকে। মহারাষ্ট্রের নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। পাঞ্জাবের নেতা ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। বিপিনচন্দ্র-তিলক-লাজপৎ রায় সর্বভারতীয় নেতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও এই সময় শিবাজী-উৎসবের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল এবং এখানে তাহা প্রবর্তন করিয়াছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন মারাঠী যুবক। 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে তিনি একখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন এবং এই পুস্তিকার ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অমূল্য দান আছে। উনিশ শতকের শেষ পর্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস এবং বঙ্গদর্শন, প্রচার



স্বামী বিবেকানন্দ



বঙ্কিমচন্দ্র

প্রভৃতি পত্রিকায় বিবিধ রচনাবলীর ভিতর দিয়া জাতীয় ভাবধারা প্রচার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ দেশে-বিদেশে ভারতসংস্কৃতির ঐতিহ্য ও আদর্শের মহত্ত্ব এমনভাবে প্রচার করিলেন যে এদেশের পাশ্চাত্ত্য ভাববিলাসী শিক্ষিতদের এবং সাধারণ অশিক্ষিতদেরও স্বদেশ সম্বন্ধে চৈতন্য ও মর্যাদাবোধ জাগিল। বিবেকানন্দের বাণী ভোরের শঙ্খধ্বনির মতো। ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের মোহনিদ্রায় যাহারা অসাড় হইয়া ছিল তাহারা তাঁহার বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। তাঁহার অকালমৃত্যু না হইলে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যে কি অফুরন্ত প্রেরণার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি হইতেন তাহা কল্পনা করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলনে নানাভাবে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' রচনাবলীর মধ্যে, বঙ্গদর্শন ভারতী ভাণ্ডার প্রভৃতি পত্রিকার কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বদেশী ভাবধারাকে তিনি নানারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশী সংগীতের মধ্যে বহু গান তখন লোকের মুখে মুখে গীত হইত। যেমন:

'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'
'আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি'
'বাংলার মাটি বাংলার জল'
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'
'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে'
'এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে'

এইসব সংগীত স্বদেশীযুগে জনচিত্তে যে কি গভীর আলোড়ন ও আবেগ সৃষ্টি করিতে পারে, আজ আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথের দানের কথা বাদ দিলেও, কেবল সংগীতের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার দান অতুলনীয় মনে হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসিয়া মহাদেশে চীন ও জাপানের জাগরণ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষ প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই সময় জাপানের প্রসিদ্ধ মনীষী বেরন ওকাকুরা বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলার তরুণদের প্রাচ্যের নবজাগরণের বাণী শুনাইয়া উৎসাহিত করেন। সমগ্র এসিয়াবাসীকে তিনি একজাতির মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান করেন এবং বলেন যে এসিয়ার শক্তি ও সংস্কৃতির কাছে গর্বোদ্ধত ও ধনমত্ত পাশ্চাত্যকে একদিন মাথা হেঁট করিতেই হইবে। ওকাকুরার এই আহ্বানে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে তো বটেই, সারা এসিয়ায় সেদিন এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার পরবর্তী বিপ্লব-আন্দোলন যে পরোক্ষভাবে ওকাকুরার কাছে কতখানি ঋণী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে তাহা আলোচনা করিয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলন কয়েকটি আদর্শ লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল। সেই আদর্শগুলি এই :

১। বিদেশী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জন।
২। 'স্বদেশী' শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশী দ্রব্যের পোষকতা।
৩। 'জাতীয় শিক্ষা' ও 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা।
৪। 'স্বরাজ' লাভের সংগ্রাম।
৫। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি।

প্রথম দুইটি আদর্শ অর্থনীতিক আত্মনির্ভরতার আদর্শ, তৃতীয়টি শিক্ষার আদর্শ এবং চতুর্থ ও পঞ্চমটি রাজনীতিক আদর্শ।

জাতীয় কংগ্রেসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া

১৯০৮ সালে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পর ভারতের প্রকৃত জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে বলিলে ভুল হয় না। গান্ধীজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ঠিক। এতদিন কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদন করিয়া কিছু কিছু 'কনসেশন' বা সুবিধা আদায় করার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশীযুগে যে নূতন তরুণ নেতাদের আবির্ভাব হইল তাঁহারা ব্রিটিশের কাছে আবেদনের পালা শেষ করিয়া সত্যকার স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ জাতীয় সংগ্রামের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কংগ্রেসের ভিতরে পুরাতন ও নূতন দলের মধ্যে মতবিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯০৭) পুরাতনপন্থীদের ও নূতনপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া গেল। পুরাতনপন্থীদের নরমপন্থী বা 'মডারেট' বলা হইত। ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শা মেহতা, গোখলে প্রভৃতি। নূতনপন্থীদের চরমপন্থী ও 'ন্যাশনালিস্ট' বলা হইত, ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপৎ রায় প্রভৃতি। সুরাট অধিবেশনে পুরাতনপন্থীদের জয় হয় বটে, কিন্তু নূতন বা চরমপন্থীরা হাল ছাড়িয়া দেন না, দলবদ্ধভাবে কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া তাঁহারা নরমদের বিরোধিতা করিবেন স্থির করেন।

জাতীয় আন্দোলনের গতি দেখিয়া ১৯০৯ সালে নূতন ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ করিয়া শাসনসংস্কারের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ ভারতীয়দের সামান্য কিছু ক্ষমতা দিয়া সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা হয়। ইহার কয়েকবছর পর প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া যায় (১৯১৪-১৮)। আবার ভারতশাসন আইন (১৯১৯) সংস্কার করিয়া ভারতীয়দের হাতে কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহাতেও উদ্দেশ্য বিশেষ সফল হয় না। যুদ্ধের মধ্যে ভারতের কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়িয়াছিল। এদিকে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বাংলাদেশে গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও (terrorism) আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিদ্বেষ ও বৈরিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহা দমন করিবার জন্য এই সময় শাসকরা 'রাওল্যাট অ্যাক্ট' (১৯১৯) নামে একটি আইন পাশ করেন। রাওল্যাট নামে একজন ইংরেজের অধীনে একটি কমিটি ব্রিটিশ-



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



মহাত্মা গান্ধী

বিরোধী কার্যকলাপ তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী আইনটি পাশ করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'রাওল্যাট অ্যাক্ট' বলা হয়। রাজনীতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহ হইলে যে-কোন ব্যক্তিকে বন্দী করা, নির্বাসন দেওয়া ও বহিষ্কৃত করা চলিবে—ইহাই এই আইন পাশের উদ্দেশ্য। এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয়।' সমগ্র দেশব্যাপী ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব

এই সময় জাতীয় সংগ্রামের এক সন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া দাঁড়ান। রাওল্যাট আইন পাশ হইবার আগে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে প্রস্তাবিত আইন পাশ হইলে তিনি 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন আরম্ভ করিবেন।



জাতীয় আন্দোলন। ১৮৮৫-১৯৪৭

কিন্তু আইন পাশ হইয়া গেল (১৮ মার্চ ১৯১৯)। বোম্বাই-এ 'সত্যাগ্রহ সভা' গঠন করিয়া গান্ধীজী দেশব্যাপী 'হরতাল' পালন করিবার জন্য সকলের কাছে আবেদন করিলেন। দেশের লোক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল, ৬ এপ্রিল (১৯১৯) দেশের সর্বত্র হরতাল হইল। ইহার সাতদিনের মধ্যে (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) জালিয়ানওয়ালাবাগে পাঞ্জাবের মেজাজী লাটসাহেব মাইকেল ও' ডায়ার নিরস্ত্র নিরীহ জনতার উপর নৃশংসভাবে গোলাগুলী বর্ষণ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে সারা ভারতে ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ আগুনের মতো ছড়াইয়া পড়িল। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'সত্যাগ্রহ' ও 'অহিংস অসহযোগের' নূতন আদর্শ লইয়া জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অবতীর্ণ হইলেন।

মহাত্মা গান্ধী ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগের আদর্শ। অহিংস থাকিয়া ব্রিটিশের সহিত সর্বক্ষেত্রে অসহযোগিতা করাই হইল এই আদর্শের মূলকথা। হাজার প্ররোচনা ও উত্তেজনার কারণ থাকিলেও যাঁহারা এই নীতি অনুযায়ী সংগ্রাম করিবেন, তাঁহারা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অহিংসার পথ ছাড়িয়া হিংসার পথে চলিবেন না। আদর্শ ও সত্যের প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠা অবিচলিত থাকিবে বলিয়াই তাঁহারা 'সত্যাগ্রহী'। বাস্তবক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এই নীতি একটি কঠিন পরীক্ষা বিশেষ, ইহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নহে। সমস্ত পীড়ন ও অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া অহিংস অসহযোগের সংগ্রাম করিতে হইবে—ইহাই গান্ধীজীর নির্দেশ।

কলিকাতায় ও নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯২০) গান্ধীজীর এই নূতন নীতি লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক হইল। একদল নেতা ইহা কার্যকর হইবে বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তবু শেষ পর্যন্ত মহাত্মারই জয় হইল। ১৯২০ সনের ১ আগস্ট হইতে এই নূতন অসহযোগ নীতির বিরাট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে স্থির হইল। সংগ্রামের আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত, শিক্ষক-ছাত্র, উকিল-ব্যারিস্টার-সিভিলিয়ান, সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিল। এরকম দেশজোড়া আলোড়ন পরে হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বে আর কখনও

হয় নাই। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন যতীন্দ্রমোহন সুভাষচন্দ্র, বিহারে রাজেন্দ্র-প্রসাদ, উত্তরপ্রদেশে মতিলাল জওহরলাল কিদওয়াই ভগবানদাস, পাঞ্জাবে লাজপৎ কিচলু, গুজরাটে প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়, মহারাষ্ট্রে কেলকার বোমংকর বাপাৎ, মাদ্রাজে সীতারামাইয়া, উড়িষ্যায় গোপবন্ধু, আসামে বরদলুই প্রভৃতি শত শত ভারতসন্তান সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অসহযোগের যজ্ঞানুষ্ঠানে আত্মাহুতি দেন। তরুণদের মধ্যে ছাত্ররা পুলিশের নির্দয় জুলুম ও নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করে। মুসলমানদের মধ্যেও এই সময় আশ্চর্য জাগরণের লক্ষণ দেখা যায়, হিন্দুদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাঁহারাও দুঃখবরণ করেন। জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা, মাদকদ্রব্য বর্জন, চরকা প্রচলন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা বর্জন—এইগুলি ছিল প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য। এই সময় বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দেশবাসীকে তাঁহার 'চরকার গান' শোনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন:

ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ—আপনায় নির্ভর!
গুজরাট—পাঞ্জাব—বাংলায় সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

আন্দোলন দমন করিবার জন্য বৃটিশ শাসকরা ধরপাকড়, লাঠি ও গুলিবর্ষণ নির্মমভাবে চালাইয়াছিলেন। এই নির্যাতনের মুখে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধও কয়েকস্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহারা আর অহিংস থাকিতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশে চৌরিচোরা থানার দারোগা ও একুশজন সিপাহীকে স্থানীয় জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া অগ্নিদগ্ধ করে। এই সংবাদে দুঃখিত ও বিচলিত হইয়া মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন

দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন ১৯৩০-৩১। ইহার পর মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয়বার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন ১৯৩০ সালে। ইহার মধ্যে কংগ্রেসের ভিতরে অনেক পরিবর্তন হইয়া যায়। নূতন নেতারা



দেশবন্ধু



অরবিন্দ

আসিয়া কংগ্রেসের ক্ষীণ সুরটিকে আরও বলিষ্ঠ করিয়া তোলেন। এই নূতন নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরেন। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে কাহারও কণ্ঠে ঘোষিত হয় নাই। ব্রিটিশ শাসকদের মাথার উপর রাখিয়া ভারতীয়দের নানারকম ক্ষমতা ও অধিকারের বিষয় সেখানে আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের কণ্ঠেই 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র আদর্শ সর্বপ্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে নীতিগতভাবে ঘোষিত হয় (১৯২৯)। লাহোর অধিবেশনে এই স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহাও স্থির হয় যে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি যখনই উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তখনই দেশব্যাপী ট্যাক্সবন্ধ ও আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারিবেন।

এদিকে ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের অধীনে একটি পার্লামেন্টারী কমিশন নিয়োগ করা হয় ভারতীয় শাসনসংস্কার বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য। ইহা 'সাইমন কমিশন' নামে পরিচিত। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ভারতের সমস্ত রাজনীতিক দল তাহা বাতিল করিয়া দেন। ইহার পর মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয়বার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। গান্ধীজী স্থির করেন যে তাঁহার সবরমতী আশ্রমের শিষ্যদের লইয়া তিনি আইনভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। ৬ এপ্রিল ১৯৩০ তিনি আশ্রমের শিষ্যদের লইয়া সমুদ্রকূলে ডাণ্ডিতে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য যাত্রা করেন। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটিকে একটি ঐতিহাসিক দিন বলা যায়।

ভারতের গ্রামে গ্রামে আইনভঙ্গের ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হয়। লবণ তৈরী করা, মাদকদ্রব্য ও বিদেশী পণ্যের দোকানে পিকেটিং করা, স্কুল-কলেজ ও সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করা, অস্পৃশ্যতা বর্জন করা ইত্যাদি ছিল আন্দোলনের কর্ম্মসূচী। ব্রিটিশ শাসকরা পূর্ণমাত্রায় দমননীতি প্রয়োগ করিয়াও আন্দোলন দাবাইতে পারেন নাই। সামরিক আইন, জরুরী আইন ইত্যাদি জারি করা হইয়াছিল, কংগ্রেস ও তাহার সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল. তবু আন্দোলনের বিপুল জোয়ার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিলাতে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়, কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে যোগ দেয় নাই। পরে গান্ধীজী ও সত্যাগ্রহীদের বিনা শর্তে কারামুক্ত করিলে গান্ধীজী বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন (১৯৩১)। কিন্তু বৈঠক ব্যর্থ হয়, কারণ মুসলমানদের পক্ষ হইতে 'মুসলিম লীগ' এমন কতকগুলি দাবীদাওয়া পেশ করেন যাহা মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া গান্ধীজী আবার আইনভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করেন।

বাংলার বিপ্লবীদের আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ১৯০৭-৮ সাল হইতেই বিপ্লবীরা গোপন 'চক্র' গঠন করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। প্রথম যুগে বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ,

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বাঘা যতীন') প্রভৃতি। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বন্ধ হয় নাই। এই পর্বের বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সূর্য সেন এবং 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' এই পর্বের বিপ্লবীদের একটি রোমাঞ্চকর কীর্তি। বাংলার বিপ্লবীদের এই নীতি গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সেইজন্য কংগ্রেস কোনদিনই বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সমর্থন করে নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই বিপ্লবীদের দান কখনই অস্বীকার করা যাইবে না। তাঁহাদের মহান আদর্শ, অপূর্ব বীরত্ব ও অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষীণধারাকে নানাদিক দিয়া বলিষ্ঠ ও পুরুষোচিত করিয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের ফল। অসহযোগ আন্দোলনের ফল হইল আবার একদফা শাসনসংস্কার। ১৯৩৫ সালে নূতন ভারতশাসন আইন পাশ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর শাসনের দায়িত্ব দিবার প্রস্তাব হইল বটে, কিন্তু গবর্নরের সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রহিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুসমাজকেও দ্বিখণ্ডিত করা হইল। অনুন্নত তপশীল হিন্দুদের (Scheduled castes) কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইল। সম্প্রদায়ভেদে এই অধিকার দেওয়াকে Communal Award বা **'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'** বলা হয়। এই নূতন শাসনতন্ত্র কংগ্রেস প্রথমে গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। পরে ব্রিটিশ শাসকরা কংগ্রেসের নেতাদের বুঝাইলেন যে গবর্নরের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও তাহা তিনি মন্ত্রীদের উপর যথাসম্ভব কম প্রয়োগ করিবেন। ইহার পর নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে (বিহার উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ বোম্বাই মাদ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত) মন্ত্রিসভা গঠন করে।

আগস্ট আন্দোলন। আজাদ হিন্দ ফৌজ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৩৯। ইহার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)। হিটলারের জার্মানি ও মুসোলিনির ইটালির সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে। ভারতের ভাইসরয়



নেতাজী সুভাষচন্দ্র



জওহরলাল নেহরু

ভারতবর্ষকেও ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করেন। কংগ্রেস এই ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া বলে যে যুদ্ধে যোগদান করা বা না-করা ভারতের জনসাধারণের ইচ্ছা ও স্বার্থের উপর নির্ভর করে, ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্রমেই ইউরোপ হইতে এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। জাপান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়া সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিল। ভারত-সীমান্তে যুদ্ধের কুচকাওয়াজ শোনা গেল, ভারতের আকাশে জাপানী বোমারু বিমান পর্যন্ত হানা দিল। ব্রিটিশের সামনে মহাসংকট, যুদ্ধোদ্যমে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা না পাইলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু ভারতের জাতীয় নেতারা ক্ষুব্ধ হইয়া আছেন, দেশবাসীর সমর্থন পাইতে হইলে শাসনকার্যে তাঁহাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই সময় ব্রিটিশ

প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতে পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া একটা কিছু আপসের পথ বাহির করা। কিন্তু ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে কংগ্রেস রাজী হইল না। যুদ্ধের পরে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে, কিন্তু যুদ্ধকালে ব্রিটিশের উপরেই শাসনভার থাকিবে—ইহাই ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের মর্ম। গান্ধীজী এই প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করেন—যে-ব্যাঙ্ক ফেল হইতেছে (অর্থাৎ ইংরেজরা) তাহার কাছ হইতে ভবিষ্যৎ তারিখের কোন চেক নেওয়া অর্থহীন।

আগস্ট আন্দোলন ১৯৪২

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করে (১৪ই জুলাই ১৯৪২)। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই প্রস্তাব ৮ আগস্ট তারিখে অনুমোদিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট কংগ্রেসকে একটি বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেন এবং নেতাদের গ্রেফতার ও বন্দী করা হয়। ইহার প্রতিবাদে ভারতের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। গান্ধীজী পরিষ্কার ভাষায় নিজেই ইহাকে 'Open rebellion' বা 'প্রকাশ্য গণবিদ্রোহ' আখ্যা দেন এবং 'do or die' বা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সকলকে অনুরোধ করেন। রেলপথ থানা ডাকঘর ও সরকারী ঘরবাড়ি উপড়াইয়া, আগুন জ্বালাইয়া, ভারতের বহুদিনের সঞ্চিত গণবিক্ষোভ সারা দেশ জুড়িয়া ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আগস্ট মাসে (১৯৪২) এই গণবিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'আগস্ট আন্দোলন' বলা হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে নিজ গৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়।

তিনি সেখান হইতে গোপনে অন্তর্ধান করেন এবং ব্রিটিশ প্রহরীদের চোখে ধুলা দিয়া ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়া জাপান-জার্মানির সহিত হাত মেলান। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সিঙ্গাপুরে ভারতের মুক্তিফৌজ বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। Indian National Army বলিয়া সংক্ষেপে ইহাকে I. N. A. বলা হয়। শোনা যায় এই মুক্তিফৌজ নাকি আসাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু জাপানের উপর অ্যাটম বোমা হানিবার ফলে হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায়, জাপানেরও পরাজয় হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই সময় অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেন। তাঁহার এই অন্তর্ধান—মৃত্যু বলিয়া ঘোষিত হইলেও—আজও অনেকের কাছে রহস্যাবৃত হইয়া আছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী নেতাদের বিচার হয় দিল্লীর লালকেল্লায়। বিচারের সময় ভারতের সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও সশস্ত্র বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হয় (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। ইহা যে এক নিদারুণ ভয়াবহ পরিস্থিতির সংকেতধ্বনি, ব্রিটিশ শাসকরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন।

ক্যাবিনেট মিশন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ইংলণ্ডে 'লেবার পার্টি' (শ্রমিকদের দল) সাধারণ-নির্বাচনে জয়ী হইল। ভারতেও যে সাধারণ-নির্বাচন হইল তাহাতে বিপুল জন-সমর্থনে কংগ্রেসের জয় হইল। নূতন ভারত-সচিব হইলেন পেথিক-লরেন্স। তাঁহার নেতৃত্বে আরও দুইজন ব্রিটিশ মন্ত্রী (স্টাফোর্ড ক্রিপস ও আলেকজাণ্ডার) ভারতবর্ষে আসিলেন একটা কিছু চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করিলেন: "আমার সহকর্মীরা ভারতবর্ষে যাইতেছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের নেতাদের উপর ভারতশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিভাবে অর্পণ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। ভারতে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে তাহা ভারতীয়রাই ঠিক করিবেন, আমরা শুধু সাধ্যমত তাঁহাদের সাহায্য করিব।" তিনজন ব্রিটিশমন্ত্রী এই আলোচনার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'ক্যাবিনেট 'মিশন' বা 'মন্ত্রী মিশন' বলা হয়। ২৪ মার্চ ১৯৪৬ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সহিত মিশনের আলোচনা হইল, কিন্তু লীগের জিদের জন্য কংগ্রেসের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের কোন মিলিত দাবী মিশনের

কাছে উপস্থিত করা সম্ভব হইল না। তিনটি অঞ্চলে ভারতকে বিভক্ত করিয়া মিশন সবভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত করিলেন। অঞ্চল তিনটি এই :

ক। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। ইহার অন্তর্গত হইবে—

১। পাঞ্জাব

২। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

৩। বেলুচিস্তান

খ। উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। বাংলা ও আসাম ইহার মধ্যে থাকিবে।

গ। অবশিষ্ট ব্রিটিশ-ভারত।

এই তিনটি অঞ্চলের নিবাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সংবিধান সভা গঠিত হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে সবভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে পারিবে। যে পর্যন্ত না কোন সংবিধান (Constitution) রচিত হয় সেই পযন্ত ভারতের প্রধান রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি 'মধ্যকালীন সরকার' (Interim Government) গঠন করা হইবে।

এই ব্যবস্থাতেও কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে পুনরায় মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস মধ্যকালীন সরকার গঠনে রাজী হইল না, লীগ রাজী হইল। কিন্তু শুধু লীগের সম্মতিতে কোন জাতীয় সরকার গঠন করা যায় না জানিয়া তদানীন্তন ভাইসরয় ওয়াভেল কোন সরকার গঠন করিতে চাহিলেন না। হতাশ হইয়া লীগ সংবিধান-সভার নিবাচন বয়কট করিবে স্থির করিল এবং 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ('direct action') করিবার ভয় দেখাইল। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে হিন্দু-মুসলমানে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইল এবং তাহার প্রধান রঙ্গভূমি হইল কলিকাতা। হিন্দু-মুসলমানে এরকম নৃশংস হানাহানি ভারতের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৬) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মধ্যকালীন সরকার গঠন করিলেন এবং অনেক টালবাহানা করিয়া অবশেষে লীগ তাহাতে যোগদান করিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে লীগের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপে এই সাময়িক শাসনব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হইল। মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয় হইয়া আসিলেন।

স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান

দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভারতের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মাউণ্টব্যাটেন কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা করিলেন যে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে,

তবে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি ইচ্ছা করিলে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। এইভাবে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' দাবী স্বীকার করা হইল। আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কংগ্রেসকেও ইহা মানিয়া লইতে হইল। 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে চিরদিনের অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

৫ জুলাই ১৯৪৭ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতার বিল পেশ করা হইল। বিলে বলা হইল যে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিয়া তাহাদের হাতে ব্রিটিশ শাসকরা সম্পূর্ণ শাসনভার অর্পণ করিবেন। ইহাকেই 'Independence Bill' বলা হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ হইতে ইহা কার্যকর হইল এবং ঐদিন হইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনেরও অবসান হইল।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ভার পড়িল দেশের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সংবিধান-সভার উপর। এই সভার কাজ শেষ হইল ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯। তারপর ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ হইতে নূতন সংবিধান কার্যকর হইল এবং ভারতরাষ্ট্র একটি 'সাধারণতন্ত্র' বা 'প্রজাতন্ত্র' (Republic) বলিয়া ঘোষিত হইল।

QUESTIONS

1. Briefly narrate the history of our Indian Freedom Movement from the First War of Independence in 1857 to the birth of Congress in 1885.

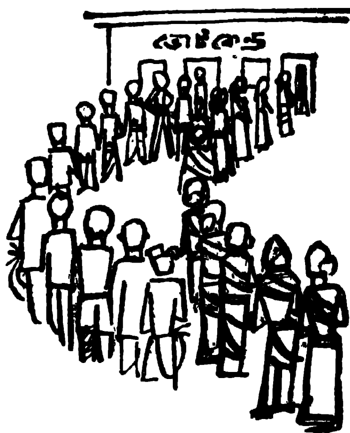
2. Trace briefly the growth of our Nationalist Movement from the birth of the Indian National Congress in 1885 to the achievement of Independence in 1947.

3. Write briefly what you know about the Swadeshi Movement in Bengal (1905-10).

4. Give a brief estimate of the contribution of Bankimchandra, Rabindranath and Vivekananda to our nationalist movement.

5. Write notes on :

(a) Vernacular Press Act, 1878
(b) Ilbert Bill, 1882-83.
(c) Cabinet Mission, 1946.
(d) Azad Hind Fauj.
(e) 'Quit India' Resolution, 1942
(f) 'Direct Action' Resolution of Muslim League, 1946.



নবম প্রকরণ। তৃতীয় অধ্যায়

নূতন ভারতরাষ্ট্র•

ভূমিকা। ভারত স্বাধীন হইবার পর প্রথম সমস্যা হইল তাহার রাষ্ট্রীয় আদর্শ, নীতি ও শাসনবিধির, সংবিধান রচনা করা। ইহা একটি বিরাট রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র কোন্ আদর্শ ও নীতি মানিয়া চলিবে, কোটি কোটি ভারতজনকে কি কি রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার দিবে, তাহা সমস্তই পরিষ্কার ভাষায় সংবিধানে লেখা থাকিবে। সংবিধান শুধু রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য চালাইবার কয়েকটি বিধিবিধান নহে, দেশবাসীর কাছে ইহা সকলরকমের মানবিক অধিকারের একটি পবিত্র ঐতিহাসিক দলিল। ১৮৫৭ সালে প্রথম ব্রিটিশবিরোধী গণবিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত প্রায় শত বছরের সুদীর্ঘ জাতীয় সংগ্রামে ভারতের জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে যে আত্মত্যাগ করিয়াছে তাহা অকারণে করে নাই। বহুদিনের বহু স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা-কামনা সেই সংগ্রামের ভিতর মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্যর্থতা ও হতাশার

• Unit 9 (c) Our National Government - The New Constitution, 1950 —Important features of the Constitution—Fundamental Rights and Duties—Federal character Centre and Constituent Units —Parliamentary Government—universal suffrage and democratic government —How our laws are made and administered — our Local Administration.

India, a Welfare State—increasing role of Government in the economic life of the people India's striving for a socialistic goal.

মধ্যেও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। সুতরাং দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের আদর্শ ও শাসননীতি কিভাবে রচিত হয় তাহা জানিবার বুঝিবার জন্য দেশের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে। দেশের রাষ্ট্রনেতারা ইহা জানিতেন এবং স্বাধীনতালাভের পর নূতন ভারতের সংবিধান রচনার গুরুদায়িত্ব যে কতখানি তাহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান

জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া যে গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয় তাহার প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। স্বাধীনতা পাইবার আগেই এই কাজ আরম্ভ করা হয়। ২২ জানুয়ারি ১৯৪৭ পরিষদ মোটামুটি ভারতরাষ্ট্রের কয়েকটি আদর্শ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে সংবিধানের খসড়া রচনার ভার বিভিন্ন কমিটির উপর অর্পণ করেন। এইসব কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া খসড়া সংবিধান (Draft Constitution) রচনা করা হয় এবং তাহা আলোচনার জন্য বাহিরে প্রকাশ করা হয় (নভেম্বর ১৯৪৮)। ইহার মধ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার ফলে উক্ত গণপরিষদের স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিবার সামান্য যে-সব বাধা ছিল তাহা দূর হইয়া যায়। আটটি বিভিন্ন বিভাগে (Schedules) ৩৯৫টি ধারা-সহ (Articles) স্বাধীন-ভারতের নূতন সংবিধান রচিত হয় এবং ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ তাহা সভায় গৃহীত হয়। সংবিধান অনুযায়ী নূতন ভারতরাষ্ট্রের শাসনকার্য আরম্ভ হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর মতো ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন হইতে ভারতের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকস্বরূপ নূতন সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেশনায়করা গ্রহণ করেন। ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

নূতন ভারতীয় সংবিধানে আটটি বিভিন্ন বিভাগ ও ৩৯৫টি ধারায় ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ, শাসননীতি এবং ভারতীয় নাগরিকদের রাষ্ট্রিক অর্থ-

নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা একটি দীর্ঘ দলিল এবং সমস্ত বিষয়ের পরিচয় দিতে হইলে শুধু এই সংবিধানের উপর বিরাট একটি গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এখানে তাহার প্রয়োজন নাই। সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক নাগরিকেরই পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। সেই বিষয়গুলি এখানে আমরা আলোচনা করিব।

ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ। সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) অল্পকথায় ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই আদর্শের প্রধান স্তম্ভ হইল চারটি ঃ

ন্যায়বিচার (Justice)
সাম্য (Equality)
স্বাধীনতা (Liberty)
মৈত্রী (Fraternity)

ন্যায়বিচার কোন্ ক্ষেত্রে? সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার।

সাম্য কিসের? সমস্ত কিছুর—মর্যাদার সাম্য ও সুযোগের সাম্য। মর্যাদার সাম্য কি? জাতিবর্ণভেদে, অথবা বিত্তভেদে ধনী-নির্ধন বলিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন সামাজিক মর্যাদার ভেদ থাকিবে না, এবং সকলরকমের সুযোগ সকলকে সমানভাবে দেওয়া হইবে।

স্বাধীনতা কিসের? স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া সকল রকমের স্বাধীনতা। যেমন চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মমত প্রকাশের ও নিজধর্ম আচরণের স্বাধীনতা।

মৈত্রী কাহাদের? ভারতের সকল জাতি-উপজাতির, সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর মৈত্রী। এই মৈত্রীর লক্ষ্য হইল ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক ভারতীয়ের মানবিক মর্যাদা স্বীকার করা এবং ভারতজনের একতার ভিতর দিয়া ভারতরাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

নূতন সংবিধানের মহান আদর্শের মূল সুরটি এই প্রস্তাবনার গম্ভীর ও সংযত কথাগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

মৌলিক অধিকার

ভারতজনের কয়েকটি মৌলিক অধিকার। আধুনিক যুগের প্রত্যেক সুসভ্য, উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের কয়েকটি 'অধিকার' (rights) স্বীকার করা হয়। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের না দিলে তাহাদের মানুষের মর্যাদা দেওয়া যায় না এবং তাহা না দিলে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক আদর্শ কলঙ্কিত হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে বলা হয় মূল বা 'মৌলিক অধিকার' (fundamental rights)। এইরকম কতকগুলি মৌলিক অধিকার ভারতীয় নাগরিকদেরও দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের মুখবন্ধে বা প্রস্তাবনায় যে আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই এই মৌলিক অধিকার কি হইতে পারে না-পারে সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। যে চারটি প্রধান রাষ্ট্রীয় আদর্শ ভারতরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই আদর্শগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে রচনা করা হইয়াছে। সংবিধানের তৃতীয় বিভাগে (Part III) মৌলিক অধিকারগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সাতভাগে অধিকারগুলিকে ভাগ করা হইয়াছে:

১। **সাম্যের অধিকার** (১৪ হইতে ১৮ ধারা)। এই অধিকার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ভারতরাষ্ট্রে ধর্মগত জাতিগত বর্ণগত নারী-পুরুষগত অথবা জন্মস্থানগত কোন ভেদ-বৈষম্য থাকিবে না। জন্মস্থানগত ভেদের অর্থ হইল—ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাঁহারা ভারতের নাগরিক হইবেন, ভারতজাত নাগরিকদের সহিত সমান অধিকার তাঁহাদেরও থাকিবে। সাম্যের অধিকার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হইল যে ভারতীয় সমাজে একসময় যে জাতিবর্ণগত অস্পৃশ্যতার ব্যাধি দেখা দিয়াছিল এবং যাহার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনও করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতে তাহা বেআইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। হাড়ি ডোম চণ্ডাল যে-কোন তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতির আজ ভারতের সমস্ত সাধারণ স্থানে (ধর্মস্থানে ও মন্দিরে পর্যন্ত) প্রবেশের অধিকার আছে। ইহাতে বাধা দিবার কাহারও ন্যায়সংগত অধিকার নাই। সাম্যের অধিকারের মধ্যে 'জাতিসাম্য' একটি বড় অধিকার। ভারতরাষ্ট্রে আজ এই অধিকার কেবল

যে স্বীকৃত তাহা নহে, কার্যক্ষেত্রে আইনের বল প্রয়োগ করাও হইয়াছে। ইহাও স্থির হইয়াছে যে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে কোনরকম জাতিবর্ণগত অথবা স্ত্রী-পুরুষগত ভেদনীতি প্রয়োগ করা হইবে না।

২। **মতামতের ও বৃত্তির স্বাধীনতা** (১৯ ধারা)। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং যে-কোন বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতাও একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানেও এই অধিকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরার (movement), মেলামেশার (assembly), সভা-সংঘ গঠন করিবার, মতামত ব্যক্ত করিবার, বসবাস করিবার, সম্পত্তি কেনাবেচা করিবার এবং যে-কোন বাণিজ্য বৃত্তি ও পেশা অবলম্বন করিবার অধিকার আছে।

কিন্তু এই স্বাধীনতা ও অধিকার সম্বন্ধে একটি বিষয় চিন্তা করিবার আছে। ইহা কতকগুলি আইনের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া না রাখিলে অনেকে এই স্বাধীনতার অপব্যবহারও করিতে পারে। সেই অপব্যবহারের ফল যদি শুধু তাহাকেই ভোগ করিতে হইত তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু অপব্যবহারের ফলে যদি সমাজের বেশীর ভাগ লোকের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের দিক হইতে নিশ্চয় সে-সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। সেইজন্য এই স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বার্থে প্রয়োজন হইলে আইনের দ্বারা নাগরিকদের এই স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে। যেমন মানুষের সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার আছে, কিন্তু নিশ্চয় চুরি-ডাকাতি বা গুণ্ডামি করিবার জন্য নহে। প্রত্যেক নাগরিকের বলিবার বা লিখিবার অধিকার আছে, কিন্তু অশোভন ও অসামাজিক কিছু প্রকাশ্যে বলিবার বা লিখিবার অধিকার নিশ্চয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের ও বৃত্তির স্বাধীনতা সকলের আছে, কিন্তু ভেজাল খাদ্যের বা ঔষধের নামে বিশেষ ব্যবসা করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। তেমনি কোন অশিক্ষিত হাতুড়ে লোক যদি ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারের বৃত্তি গ্রহণ করিতে চায়, তাহা নিশ্চয় তাহাকে গ্রহণ করিতে দেওয়া যায় না। আমার চলাফেরা করার স্বাধীনতা আছে বলিয়া আমি অশোভনভাবে বা উন্মাদের মতো রাস্তা দিয়া চলিলে নিশ্চয় পুলিশে আমায় হাতকড়া দিবে। অসাধু ও অসামাজিক কোন ব্যবসা বা বৃত্তি সমাজে প্রচলনের অধিকারও কাহারও নাই। অতএব

স্বাধীনতার এই ব্যক্তিগত অধিকার বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের জন্য কতকগুলি আইনের সীমানার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ রাখার প্রয়োজন এবং সংবিধানে এই ধরনের আইন পাশ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে।

৩। **আইনগত অধিকার** (২০ ও ২১ ধারা)। কতকগুলি আইনগত অধিকারকেও ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যেমন (ক) একটি কোন অপরাধের জন্য একাধিকবার কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না; (খ) কোন অপরাধীকে জোর করিয়া কখনও তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী আদায়ের চেষ্টা করা হইবে না; (গ) আইনসম্মত উপায়ে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইবে না।

এই অধিকার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। অনেক সময় দেখা যায়, যে-দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের বদলে ডিক্টেটরী শাসন প্রচলিত আছে সেখানে একই অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিকবার দণ্ড দেওয়া হয় এবং জোর করিয়া নানারকম কৌশলে অপরাধীর কাছ হইতে এমন সব কথা আদায় করা হয় যাহাতে নিজেরই দণ্ড হইতে পারে। কোন গণতান্ত্রিক দেশে কখনও তাহা হওয়া উচিত নহে। যে অপরাধী তাহার বিচার করিবেন নিরপেক্ষ বিচারক, তাহার জন্য সাক্ষীসাবুদ তদন্ত প্রমাণাদি যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আদালতে উভয়পক্ষ বিচারকের সামনে উপস্থিত করিবে। তাহা না করিয়া রাষ্ট্র যদি বিচারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্বই থাকে না। কারণ গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যে-কোন ব্যক্তির অভিযোগ থাকিতে পারে এবং সে ন্যায়বিচারের জন্য আদালতে বিচারকের কাছে উপস্থিত হইতে পারে। কাজেই আইন ও ন্যায়-অন্যায় বিচারে যদি গবর্নমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সেই গবর্নমেণ্টকে কোনমতেই গণতান্ত্রিক গবর্নমেণ্ট বলা যায় না। এইজন্য আইনগত এই মূল অধিকারগুলিকেও ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

৪। **শোষণমুক্তির অধিকার** (২৩ ও ২৪ ধারা)। মানুষের অসহায় অবস্থা ও আর্থিক অনটনের সুযোগ লইয়া মানুষকে শোষণ করার

মতো বড় অপরাধ সমাজে আর নাই। আগেকার দিনে জোর করিয়া মানুষকে বেগার খাটানো হইত, যে-কোন শ্রমসাধ্য কাজ করানো হইত, কিন্তু এখন আর তাহা করিবার উপায় নাই। জোর করিয়া কাহারও শ্রম বা মেহনত আদায় করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, মানুষ নিজের ইচ্ছায় মেহনত করিবে এবং তাহার ন্যায্য মূল্য বা পারিশ্রমিকও সে পাইবে। ইহাকেই শোষণমুক্তির অধিকার বলা হয়।

৫। ধর্মগত স্বাধীনতার অধিকার (২৫ হইতে ২৮ ধারা)। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মমত গ্রহণের ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। কেহ কাহারও ধর্মাচরণে যাহাতে বাধা দিতে না পারে রাষ্ট্র তাহা দেখিবে এবং রাষ্ট্রের চোখে সকল ধর্মই সমান মর্যাদা পাইবে। এককথায় আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে ভারতরাষ্ট্র ধর্মের ব্যাপারে একেবারে নিরপেক্ষ থাকিবে, কোন ধর্মের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিবে না।

এই অধিকার প্রসঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির (minorities) নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতি ভাষা ইত্যাদির সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র সর্বতোভাবে পোষকতা করিবে। অর্থাৎ ছোট ছোট যে-সব সম্প্রদায় বা জাতি-উপজাতি ভারতে আছে তাহাদের উপর জোর করিয়া কোন উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা বা সংস্কৃতি চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষারও যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করা হইবে।

৬। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার (৩১ ধারা)। সংবিধানের এই ধারাটিতে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে আইনসম্মত উপায়ে ছাড়া কাহাকেও কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। 'আইনসম্মত উপায়ে' কথাটি রাখা হইয়াছে এইজন্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রের তরফ হইতে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন রাষ্ট্রীয় কলকারখানা, নগর, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, সমবায়-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সময় কাহারও ভূসম্পত্তি হয়ত রাষ্ট্র দখল করিতে পারে। সেজন্য

সম্পত্তির মালিককে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিয়া তাহা দখল করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রের আছে।

৭। **বিধিসম্মত প্রতিকার দাবীর অধিকার** (৩২ ধারা)। বিধিসম্মত প্রতিকার দাবীর অধিকারও (constitutional remedies) প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের আছে। অর্থাৎ সংবিধানে যে-সমস্ত অধিকার আমাদের দেওয়া হইয়াছে (পূর্বে যাহা আলোচনা করা হইল) তাহা কোন কারণে খর্ব করা হইতেছে অথবা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি মনে করিলে আমরা তাহার প্রতিকার দাবী করিতে পারিব। তবে বিধিসম্মতভাবে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের কাছে আমাদের প্রতিকার বা বিচার প্রার্থনা করিতে হইবে। এই বিচার প্রার্থনার অধিকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের আছে।

এই সাতটি হইল ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। সংবিধানের মুখবন্ধে যে আদর্শের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাই অনেকটা এই মৌলিক অধিকার রচনায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলি এই আদর্শেরই প্রকাশ, কারণ এইগুলির মধ্যে ন্যায়বিচার সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার নীতি-গুলিকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রের দিগ্‌দর্শী নীতি

মৌলিক অধিকার ছাড়া সংবিধানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে যাহাকে Directive Principles of State Policy বলা হয়। কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতরাষ্ট্র পরিচালিত হইবে, তাহাই এই অংশে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে আমরা ভারতরাষ্ট্রের "দিগদর্শী নীতি" বলিতে পারি। একটি কথা মনে রাখা দরকার এই নীতি প্রসঙ্গে। ইহা 'নীতি', কোন বিধান বা আইন নহে। অর্থাৎ কতকগুলি নীতি ভারতরাষ্ট্রের পালনীয় বলিয়া সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নীতিগুলি রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহারা সবসময় পালন করিতে নাও পারেন। যদি তাঁহারা পালন না করেন তাহা হইলে আমরা রাষ্ট্র নীতিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে পারি, বাহিরে আন্দোলন করিতেও বাধা নাই, কিন্তু মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে যেমন সুপ্রিমকোর্টে ন্যায়পালের দ্বারস্থ হইতে পারি প্রতিকারের জন্য, এক্ষেত্রে

তাহা পারি না। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে জোর করিয়া বা আইনের ভয় দেখাইয়া এই নীতি পালন করিতে বাধ্য করা সম্ভব নহে। মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র যেমন, এই নীতিগুলিও তেমনি রাষ্ট্রীয় চরিত্রের উপাদান। ইহা পালন করা বা না-করা রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। দিগ্‌দর্শী নীতির প্রধান উদ্দেশ্য এইভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

> জনকল্যাণের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া ভারতরাষ্ট্রের চেষ্টা হইবে আর্থিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

জনকল্যাণের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-নীতি যে-ক্ষেত্রে যে-সময় গ্রহণ করা দরকার তা গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রের পরিচালকরা দ্বিধা করিবেন না। নীতিগুলি এই :

১। প্রত্যেক কর্মক্ষম নারী ও পুরুষের জীবিকার সংস্থানের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

২। সমান কাজ ও মেহনতের জন্য সমান বেতন দেওয়া।

৩। রাষ্ট্রের আর্থিক সংগতি ও উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব—

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের কর্মসংস্থান করা ;

(খ) প্রত্যেকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(গ) বার্ধক্যে, অসুখবিসুখে ও অন্য কারণে কর্মশক্তিহানি হইলে আর্থিক সাহায্য করা বা উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা ;

(ঘ) কাজকর্মের ও মেহনতের পরিবেশ যথাসম্ভব স্বাস্থ্যকর ও মানুষের উপযোগী করা ;

(ঙ) প্রত্যেক মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং আরাম-বিরাম ও আনন্দ উপভোগের অবসর ও সুযোগ করিয়া দেওয়া।

অর্থনীতিক কর্মনীতি

ভারতরাষ্ট্রের 'দিগ্‌দর্শী' নীতির মধ্যে সংবিধানে অর্থনীতিক কর্মনীতিও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্তমান যুগে এই কর্মনীতির গুরুত্ব অত্যধিক।

কারণ রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, সাংস্কৃতিক নীতি—সমস্ত নীতির মূল হইল এই অর্থনৈতিক কর্মনীতি। অন্যান্য কর্মনীতির মধ্যে যত বড় বড় আদর্শ, নীতিকথা বা আশ্বাসবাণী ঘোষিত হোক না কেন, তাহার সত্যতা সততা ও বাস্তবতার যাচাই হইবে এই অর্থনৈতিক কর্মনীতির কষ্টিপাথরে। সেইজন্য সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মনীতি প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব এত বেশী। এই নীতি হইল—

১। সমাজের পার্থিব ও অর্থকরী ধনসম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা (ownership and control of the material resources of the community) এমনভাবে বণ্টন করা হইবে যাহাতে ভারতের সর্বাধিক সংখ্যক জনসাধারণের কল্যাণে ও স্বার্থে তাহা নিয়োজিত হইতে পারে। রাষ্ট্রের ইহাও লক্ষ্য থাকিবে যাহাতে দেশের ধনসম্পদ ও ধনোৎপাদন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তে না আসে এবং তাহাতে বৃহত্তর জনসমাজের স্বার্থহানি না হয়।

২। এই অর্থনৈতিক কর্মনীতি প্রয়োগকালে রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে শ্রমজীবীদের, শিশু ও যুবকদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির উপর। যাহাতে শ্রমজীবীদের মেহনতের এবং শিশু ও যুবকদের কর্মক্ষমতার অপব্যয়, অপব্যবহার ও অন্যায় প্রয়োগ না হয়, অথবা কোন অসামাজিক ও অবাঞ্ছনীয় কাজে তাহাদের নিযুক্ত না করা হয়, তাহাও রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে শোষণ, দুর্নীতি ও অসাধুতার পথ বন্ধ করিতে হইবে।

এই কর্মনীতির মধ্যে ভারতরাষ্ট্রের যে আর্থিক আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা 'সোশ্যালিজ্‌ম' বা সমাজতন্ত্রের আদর্শ। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হইল, সমাজের ধনসম্পদ ও ধনোৎপাদন মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত মালিকানার কবল হইতে মুক্ত করিয়া জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্তে আনা এবং যতদূর সম্ভব উৎপন্ন সম্পদের বণ্টনব্যবস্থায় বৈষম্য ও অসাম্য দূর করা। সংবিধানের আর্থিক কর্মনীতির মধ্যে যে আদর্শের কথা বলা হইয়াছে তাহা যে সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শেরই অনুরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ তাহা হইলে 'জনকল্যাণ' (welfare of the people) ও 'সমাজতন্ত্র' (socialism)।

ভারতরাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মনীতি

অর্থনীতিক উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করিয়া সংবিধানের অন্যান্য কর্মনীতিও নির্দেশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ভারত- রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে—

১। আধুনিক যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাজ ও পশুপালনের ব্যবস্থা করা।

২। পল্লী অঞ্চলে কুটিরশিল্পের উন্নতি করা।

৩। পুষ্টিকর খাদ্য, জীবনযাত্রার মান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা।

৪। মাদকদ্রব্য ও পানীয় গ্রহণ বন্ধ করা।

৫। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬। গ্রামে গ্রামে 'পঞ্চায়েৎ' গঠন করা।

৭। বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ হইতে পৃথক করা।

৮। সারা ভারতে দেওয়ানী আইন একরকম করা।

৯। ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০। তপশীল জাতি, তপশীল উপজাতি ও জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সংখ্যা-লঘু দুর্বল সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা।

১১। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করা, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান পালন করা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবাদ-বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এইসব কর্মনীতির মধ্যেও ভারতরাষ্ট্রের 'জনকল্যাণ' ও 'সমাজতন্ত্রের' আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সংবিধানের মুখবন্ধে (Preamble) যে আদর্শের কথা বলা হইয়াছে—ন্যায়বিচার সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—তাহাই পরে 'দিগ্‌দর্শী নীতি'র (Directive Principles) মধ্যে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই নীতিগুলির সহিত পরিচয় থাকা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের আবশ্যক। কারণ এই নীতির সহিত পরিচয় থাকিলে ভারত-সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক যোজনার ভিতর দিয়া কৃষিকাজ শিল্পবাণিজ্য শিক্ষাসংস্কৃতি সমাজকল্যাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংবিধানের নীতিসম্মত কাজ করিতেছেন কিনা তাহা আমরা বিচার করিতে পারিব। কোথায় এই

নীতির অমর্যাদা হইতেছে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব এবং বুঝিতে পারিলে সরকারী কাজকর্মের আলোচনা ও সমালোচনাও করিতে পারিব। সমাজ-সচেতন বুদ্ধিমান ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকদের এই আলোচনা-সমালোচনা যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সচলতা সক্রিয়তা ও অগ্রগতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

নূতন ভারতরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংবিধানের এই 'মৌলিক অধিকার' ও 'দিগ্‌দর্শী নীতির' মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংবিধানের অন্যান্য বিষয়গুলি প্রধানত ভারতরাষ্ট্রের শাসন-সংগঠন সম্পর্কিত। তাহার মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠন ও প্রশাসনিক (administrative) ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক নাগরিকের এই রাষ্ট্রীয় গঠন ও শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। যে-দেশে আমরা বাস করি সে-দেশের গবর্ণমেণ্ট কিভাবে গঠিত হয়, কিভাবে তাহার রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম চলে, তাহা না জানিলে আমরা 'যোগ্য নাগরিক' বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। নাগরিক হিসাবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহাও পালন করা সম্ভব হইবে না। এইবার আমরা সেইজন্য ভারতরাষ্ট্রের গড়ন ও তাহার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভারতরাষ্ট্রের গড়ন

ভারতরাষ্ট্রের গড়ন (structure) হইল 'ফেডারাল', অর্থাৎ কতকগুলি রাজ্যের 'ফেডারেশন' হইল ভারতরাষ্ট্র। 'ফেডারেট' ('বিশেষ্য') হইতে' ফেডারেশন' ('বিশেষণ') হইয়াছে। 'Federation' কথাটি ইংরেজী কথা, ইহার অর্থ কি ? অক্সফোর্ডের নূতন ইংরেজী অভিধানে 'ফেডারেশন' কথার এই অর্থ লেখা আছে—

> The form of Government in which a number of states join together, each state keeping control of some matters but allowing the Central Government to control foreign affairs, national defence, etc.—*The Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford.*

কতকগুলি রাজ্য (States) একত্রে মিলিত হইয়া যদি কোন গবর্ণমেণ্ট গঠন করে এবং রাজ্যশাসনের ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় নিজেদের হাতে রাখিয়া বৈদেশিক ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার মতো গুরুবিষয়গুলি যদি

সেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সেই গবর্ণমেণ্টকে 'ফেডারেশন' বা 'ফেডারাল গবর্ণমেন্ট' (যুক্তরাষ্ট্র) বলা হয়। নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এইভাবে কতকগুলি রাজ্যের সম্মিলনে গঠিত হইয়াছে বলিয়া ভারতরাষ্ট্রকে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলা হয়।

বর্তমানে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ১৫টি রাজ্য (States) এবং ৬টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল (Union Territories) লইয়া গঠিত। রাজ্যগুলি হইল :

১।	অন্ধ্র প্রদেশ	৬।	গুজরাট	১১।	মধ্যপ্রদেশ
২।	আসাম	৭।	মহারাষ্ট্র	১২।	উত্তরপ্রদেশ
৩।	বিহার	৮।	মহীশূর	১৩।	রাজস্থান
৪।	পশ্চিমবঙ্গ	৯।	কেরল	১৪।	পাঞ্জাব
৫।	উড়িষ্যা	১০।	মাদ্রাজ	১৫।	জম্মু ও কাশ্মীর

ইহা ছাড়া ৬টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল হইল :

১। দিল্লী	২। হিমাচল প্রদেশ	৩। মণিপুর
৪। ত্রিপুরা	৫। আন্দামান-নিকোবর	৬। লাক্ষা মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ

অদূর ভবিষ্যতে উত্তরপূর্বাঞ্চলে নাগাভূমিকে যদি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয় (দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে) তাহা হইলে রাজ্যসংখ্যা হইবে ১৬টি। কেন্দ্রীয় শাসনে ফরাসী উপনিবেশগুলি ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি আসিবার পর ইউনিয়ন-অঞ্চলের সংখ্যা ৮টি হইয়াছে। এতগুলি রাজ্য ও অঞ্চল লইয়া ভারতরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামটি গড়া হইয়াছে।

পূর্বের 'ডেফিনিশনে' বা সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে যুক্তরাজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল—সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় নিজেদের আয়ত্তে এবং কতগুলি কেন্দ্রীয় আয়ত্তে রাখিতে সম্মত হয়। এই সম্মতি ছাড়া যুক্তরাজ্যের বনিয়াদ মজবুত করিয়া গড়া যায় না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেও এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। বিষয়গুলিকে তিনভাগে ভাগ করিয়া কতকগুলি রাখা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, কতকগুলি রাজ্য-সরকারের অধীনে, আবার কতকগুলি উভয়েরই অধীনে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিষয়ের সংখ্যা প্রায় ১০০, রাজ্যসরকারের অধীন বিষয়-সংখ্যা ৬৬, এবং উভয় সরকারের অধীন বিষয় ৪৭। ইহার বিস্তারিত তালিকার প্রয়োজন নাই। কয়েকটি

প্রধান বিষয়ের নাম দেওয়া হইল। কেন্দ্রীয় ভারত-সরকারের অধীন বিষয়ের মধ্যে প্রধান হইল :

কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন বিষয়

দেশরক্ষা	রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
সামরিক বাহিনী	স্টেট ব্যাঙ্ক
যুদ্ধ ও শান্তি	মুদ্রা
আণবিক শক্তি	বীমা
বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি	লোকগণনা (Census)
জাতিসংঘ (U. N. O.)	পোস্ট-টেলিগ্রাফ
রেলপথ	বেতার
বিমান	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
বন্দর	লবণ ও আফিম

বিষয়গুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, এগুলি সমগ্র ভারতের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য এই বিষয়ের কোনটিকেই একটি কোন রাজ্যের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যায় না এবং দিলেও তাহা কোন রাজ্যের পক্ষে বহন করা সম্ভব নহে।

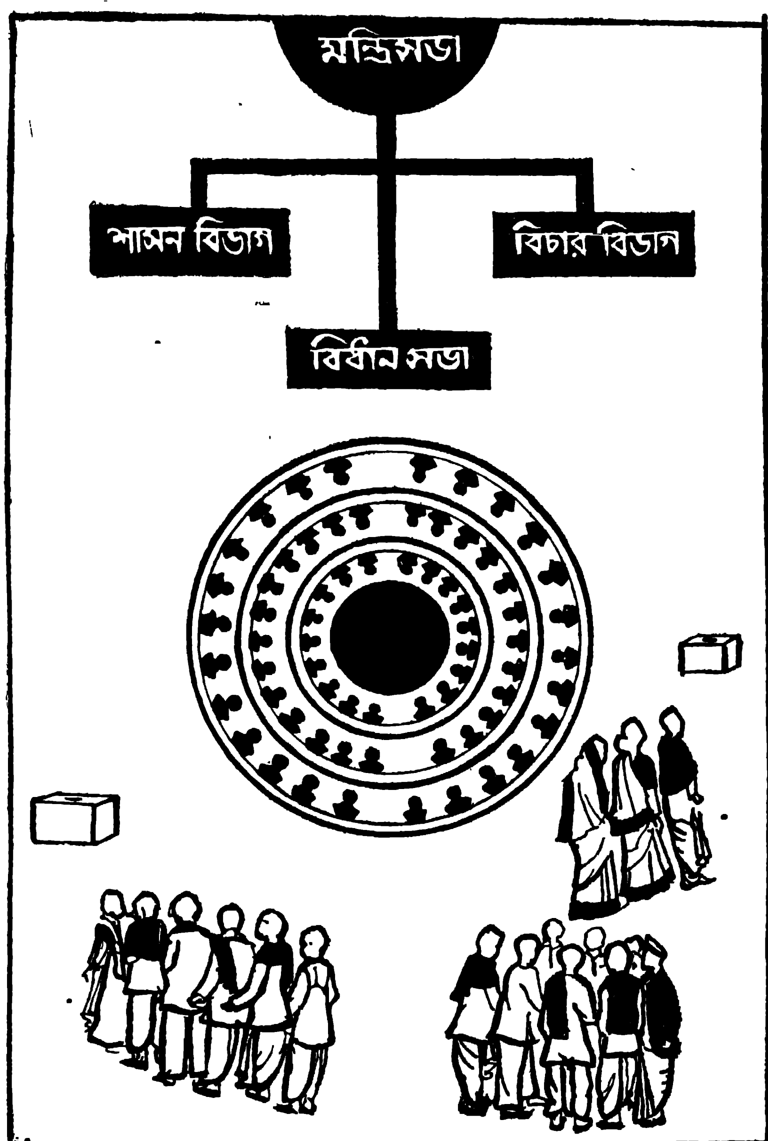
প্রাদেশিক রাজ্য-সরকারের অধীন বিষয়সংখ্যা ৬৬টি, তাহার মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি :

প্রাদেশিক রাজ্যের অধীন বিষয়

রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা	রাস্তাঘাট
পুলিস বিচার জেল	পরিবহণ
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন	ব্যবসা-বাণিজ্য
কৃষি	মৎস্য, পশুপালন
শিক্ষা	সমবায় আন্দোলন
সেচ	

বিষয়গুলি প্রাদেশিক রাজ্যের আয়ত্তেই থাকা উচিত, থাকিলে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের অধীন বিষয়সংখ্যা ৪৭টি ; তাহার মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি :



ভারতরাষ্ট্রের গড়ন

Democratic Republic with a parliamentary form of 'government based on universal adult franchise." ইহার অর্থ হইল—

ক। ভারতরাষ্ট্র একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

খ। ভারতরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট 'পার্লামেণ্টারী' বা গণতান্ত্রিক।

গ। এই গবর্ণমেণ্ট সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোট দ্বারা গঠিত।

ভারতের যে গবর্ণমেণ্ট শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহা 'পার্লামেণ্টারী গবর্ণমেণ্ট'। এই গবর্ণমেণ্ট কাহাকে বলে? ইহাকে 'ক্যাবিনেট গবর্ণমেণ্ট' বা মন্ত্রিসভা-শাসিত গবর্ণমেণ্ট বলা হয়। অর্থাৎ ইহা গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট তো নিশ্চয়, কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে একটি 'মন্ত্রিসভা' (Cabinet) সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসভা কিভাবে গঠিত হয় তাহা পরে আলোচনা করিব। তাহার আগে গবর্ণমেণ্ট কিভাবে পরিচালিত হয় তাহা বলা দরকার।

যে-কোন রাষ্ট্র পরিচালনা করিতে হইলে তিনটি জিনিস না হইলে চলে না। যেমন:

১। কতকগুলি আইনকানুন প্রণয়ন করা দরকার, তাহা না হইলে কিছুই করা সম্ভব নহে।

২। আইন অনুযায়ী দেশ শাসনের ব্যবস্থা করা। কেবল আইন পাশ করিলেই চলিবে না, সেই আইন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেশের শাসনকাজ চালাইতে হইবে।

৩। আইন কোথায় মানা হইতেছে, কোথায় হইতেছে না তাহা বিচার করার ব্যবস্থা করা।

এই তিনরকমের ব্যবস্থা লইয়াই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, ইহার কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না। এক-একরকমের ব্যবস্থা এক-এক বিভাগের অধীন। আইনকানুন যে-বিভাগে প্রণয়ন করা হয় তাহাকে বলে "আইন-বিভাগ" বা Legislature; আইন অনুযায়ী দেশের শাসনকার্য যে-বিভাগ পরিচালনা করে তাহাকে বলে 'শাসন-বিভাগ' বা Executive; আইন মানা বা না মানার বিচার করে যে বিভাগ তাহাকে বলে "বিচার-বিভাগ" বা Judiciary.। তাহা হইলে মন্ত্রিসভা শাসিত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের বিভাগ থাকে তিনটি—আইন, শাসন ও বিচার। প্রথম দেখা যাক ভারতরাষ্ট্রে এই বিভাগগুলি কিভাবে গঠিত। মনে রাখা দরকার যে এই বিভাগগুলি কেন্দ্রীয়

বা ইউনিয়ন সরকারের এবং প্রাদেশিক রাজ্য-সরকারের উভয়েরই থাকিবে। কারণ সর্বভারতীয় শাসনকার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আছে, আবার প্রাদেশিক রাজ্য শাসনের জন্য রাজ্য-সরকারও আছে। কাজেই 'আইনবিভাগ', 'শাসন বিভাগ' ও 'বিচারবিভাগ' উভয় সরকারেরই থাকিবে।

ভারতরাষ্ট্রের আইনবিভাগ

কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইনবিভাগ তাহারই নাম 'পার্লামেণ্ট'। এই পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি ও দুইটি সভা লইয়া গঠিত—একটি 'রাজ্যসভা' (Council of States), আর একটি 'লোকসভা' (House of the People)।

রাজ্যসভা। কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৫০ জনের বেশী হইতে পারিবে না। সদস্যদের মধ্যে সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজসেবা ও শিল্পকলা—এই চারটি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্য হইতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্য সব সময় মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বাকি ২৩৮ জন হইবেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলের প্রতিনিধি। রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন করিবেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় ২৩৬ জন সদস্য আছেন।

রাজ্যসভার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল ইহা একরকম স্থায়ী সভা বিশেষ। লোকসভার সদস্যরা যেমন পাঁচবছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হন, রাজ্য-সভার সদস্যরা তাহা হন না। ইহার নিয়ম হইল দুই বছর অন্তর সভার তিন-ভাগের একভাগ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং পুনরায় নির্বাচন ও মনোনয়ন দ্বারা তাঁহাদের শূন্য আসন পূরণ করা হইবে।

লোকসভা। কেন্দ্রীয় লোকসভার সদস্যরা সাধারণ নির্বাচনে ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় লোকসভা ৫২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে রাষ্ট্রপতি ইঙ্গভারতীয় সম্প্রদায়ের (Anglo-Indians) দুইজন সদস্য লোকসভায় মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বর্তমানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫০৬ জন। পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়ার মুক্তির পর দাদরা ও নগর হাবেলি হইতে রাষ্ট্রপতি

একজন লোকসভার সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন স্থির হইয়াছে। তাহা হইলে লোকসভার সদস্যদের সংখ্যা হইবে ৫০৭ জন।

লোকসভার মেয়াদ সাধারণত ৫ বছর। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রপতি যে-কোন সময় ইহা ভাঙিয়া দিতে পারেন, আবার জরুরী প্রয়োজনে একবছর মেয়াদ বৃদ্ধিও করিতে পারেন। সভার সদস্যরা তাঁহাদের কাজকর্ম নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পরিচালনার জন্য একজন 'মুখপাত্র' (Speaker) ও 'সহকারী-মুখপাত্র' (Deputy Speaker) নির্বাচন করেন।

রাজ্য-সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারে যেমন রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া 'আইনবিভাগ' গঠিত, তেমনি প্রাদেশিক রাজ্য-সরকারে রাজ্যপাল (Governor) এবং 'বিধান-পরিষদ' (Legislative Council) ও 'বিধানসভা' (Legislative Assembly) লইয়া 'আইনবিভাগ' গঠিত। সকল রাজ্যে অবশ্য দুইটি সভা নাই—যেমন আসাম, গুজরাট, কেরল, উড়িষ্যা ও রাজস্থান। এই পাঁচটি রাজ্যে একটি করিয়া সভা আছে এবং তাহাকে 'বিধান-সভা' বলা হয়। মধ্যপ্রদেশে 'বিধান-পরিষদ' গঠনের ব্যবস্থা করা হইলেও আজও তাহা গঠিত হয় নাই। সুতরাং একটি 'বিধানসভা' এখন ছয়টি রাজ্যে আছে।

বিধান-পরিষদ। কোন প্রদেশের বা রাজ্যের 'বিধান-পরিষদে'র বা কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা সেই রাজ্যের 'বিধানসভার' বা অ্যাসেম্বলির মোট সদস্যের তিনভাগের একভাগের বেশী হইবে না এবং ৪০ জনের কমও হইতে পারিবে না। এই সদস্যরা এইভাবে নির্বাচিত হইবেন—

মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি
স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা—$\frac{১}{৩}$
বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা—$\frac{১}{৩}$
অন্ততঃ তিন বছরের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা—$\frac{১}{১২}$
মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের দ্বারা—$\frac{১}{১২}$

বাকি সদস্যদের মনোনয়ন করিবেন রাজ্যপাল। সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজসেবা শিল্পকলা ও সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে তিনি বিধান-পরিষদের এই সদস্যদের মনোনয়ন করিবেন। বিধান-পরিষদের সভ্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি থাকেন।

বিধানসভা। রাজ্যের বিধানসভার সদস্য ৫০০ জনের বেশী হইবে না, অথবা ৬০ জনের কম হইবে না। প্রদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা প্রত্যক্ষভাবে সদস্যদের নির্বাচন করিবেন। বিধানসভার সদস্যদের মধ্য হইতে একজন 'মুখপাত্র' বা 'স্পীকার' এবং একজন 'সহকারী-মুখপাত্র' বা 'ডেপুটি-স্পীকার' নির্বাচিত হন।

কেন্দ্রীয় লোকসভার মতো প্রাদেশিক বিধানসভার মেয়াদও ৫ বছর। তবে রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধে ইহা আগেই ভাঙিয়া দিতে পারেন, আবার একবছর মেয়াদ বৃদ্ধিও করিতে পারেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের 'আইনবিভাগ' (Legislature) কিভাবে গঠিত তাহা আলোচনা করা হইল। এইবার এই বিভাগের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কি আছে না-আছে তাহা আলোচনা করা হইবে।

আগে যে কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন বিষয়গুলির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—দেশরক্ষা, আণবিক শক্তি, যুদ্ধ-শান্তি, রেলপথ, বিমান, মুদ্রা, বীমা ইত্যাদি তাহার যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের আছে। তবে কেন্দ্রীয় কোন আইনের সহিত যদি রাজ্য-সরকার অনুমোদিত কোন আইনের বিরোধ বা অসংগতি ঘটে, তাহা হইলে অসংগত অংশটুকু আইন হইতে বাতিল করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের আইনই গৃহীত হইবে।

প্রাদেশিক রাজ্যের অধীন বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের (State Legislature) আছে। উভয় সরকারের এলাকাধীন বিষয় সম্বন্ধেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের আছে, তবে তাহাতে কেন্দ্রীয় আইনের সহিত কোন বিরোধ বাধিলে বিরোধের অংশটুকু বাতিল করিয়া দিতে হইবে।

ভারতরাষ্ট্রের শাসনবিভাগ

আইনবিভাগের পর শাসনবিভাগের (Executive) বিষয় আলোচ্য। আইনবিভাগে আইনকানুন প্রণয়ন করা হয় রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য। এই শাসনের দায়িত্ব থাকে শাসনবিভাগের উপর।

কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সর্বময় কর্তা হইলেন রাষ্ট্রপতি (President)। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের পতি হইলেও, কার্যক্ষেত্রে তিনি শাসনবিভাগের কর্তা নহেন। ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর সহিত কতকটা আমাদের রাষ্ট্রপতির তুলনা করা যায়। পদমর্যাদায় তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ থাকিলেও তাহা প্রয়োগ করার প্রথা নাই। আসল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইলেন প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister), তিনিই কার্যক্ষেত্রে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা।

মন্ত্রিসভা। আগেই বলা হইয়াছে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় আসল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিসভার হাতে, প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি যাহাকে খুশী নিযুক্ত করিতে পারেন না। লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, অর্থাৎ যে-দলের (পলিটিকাল পার্টির) প্রতিনিধিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী থাকে, সেই দলের নেতা যিনি তাঁহাকেই ডাকিয়া রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। যেমন বর্তমানে ভারতীয় লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইল কংগ্রেসের এবং এই দলে নেতা হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হইলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন। অবশ্য কাজটা রাষ্ট্রপতি করেন না, প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রী-পদের যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করিয়া রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠান। সাধারণত রাষ্ট্রপতি তাহা যথারীতি অনুমোদন করেন।

মন্ত্রীসভাকে বলে 'ক্যাবিনেট'। সকল মন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভ্য নহেন। মন্ত্রিসভাভুক্ত মন্ত্রী যাঁহারা তাঁহাদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য 'রাষ্ট্রমন্ত্রী' (Ministers of State) ও 'উপমন্ত্রী' (Deputy Minister) থাকেন। মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের সমস্ত কাজকর্মের জন্য লোকসভার কাছে দায়ী থাকেন। তাঁহাদের কর্মনীতি, পরিকল্পনা ইত্যাদি লোকসভার অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয়, লোকসভার সদস্যরা তাহা লইয়া আলোচনা-সমালোচনা করেন, তারপর তাহা গৃহীত হয়। লোকসভার অধিকাংশ সভ্য যদি কোন মন্ত্রিসভার কাজকর্মে

অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ইহাই রীতি।

রাজ্য-সরকার। প্রত্যেক রাজ্যের (জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া) শীর্ষস্থানে আছেন 'রাজ্যপাল' (Governor)। রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে ৫ বছরের জন্য নিয়োগ করেন এবং ইচ্ছা করিলে তিনিই তাঁহাকে এই পদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান যিনি—তাঁহাকে 'সদর-ই-রিয়াসৎ' বলা হয়, রাজ্যের আইনসভা তাঁহাকে নির্বাচন করেন। এই সদর-ই-রিয়াসৎকে ভারতের রাষ্ট্রপতি জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান বলিয়া স্বীকার করেন না। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যপালই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা, যেমন রাষ্ট্রপতি ভারতরাষ্ট্রের। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজ্যপাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন না, রাজ্যের মন্ত্রিসভাই (Council of Ministers) করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভার প্রধান হইলেন 'মুখ্যমন্ত্রী' (Chief Minister), কাজেই রাজ্যের প্রধান শাসনভার মুখ্যমন্ত্রীকেই বহন করিতে হয়।

মন্ত্রিসভা। রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রিসভা। বিধানসভার (State Assembly) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা তাঁহাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অনুরোধ করেন। মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের বাছাই করিয়া রাজ্যপালের অনুমতি চাহিয়া পাঠান, রাজ্যপাল তাহা যথারীতি অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মতো রাজ্যের মন্ত্রিসভাতেও সকল মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সমান থাকে না। মন্ত্রিসভাভুক্ত মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অন্যদের তুলনায় বেশী। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের সাহায্য করিবার জন্য 'রাষ্ট্রমন্ত্রী' ও 'উপমন্ত্রী' নিয়োগ করা হয়।

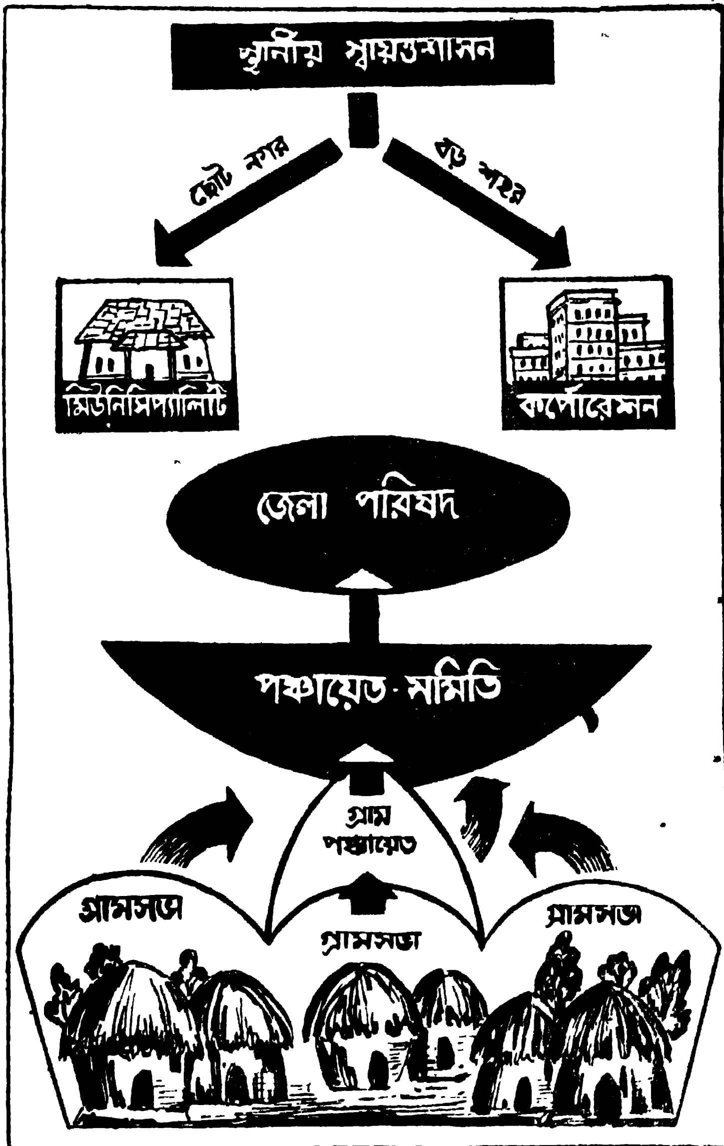
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা যেমন লোকসভার কাছে তাঁহাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকেন, তেমনি রাজ্যের মন্ত্রিসভাও দায়ী থাকেন বিধানসভার কাছে। বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদন ছাড়া তাঁহারা কোন কাজ করিতে পারেন না। বিধানসভার অধিকাংশ সদস্য যদি মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের উপরের স্তর। নীচের স্তরে আরও অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া জেলা, মহকুমা, গ্রাম পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যের জন্য বহু কর্মচারী এবং নানা স্তরের কর্মচারী প্রয়োজন হয়। এই সব কর্মচারী যাহাতে নিরপেক্ষভাবে যোগ্যতা ও গুণ অনুযায়ী নিযুক্ত হন, সেইজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার উভয়েরই একটি করিয়া 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' আছে। সংবিধানের ৩১৫ (১) ধারা অনুযায়ী এই কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের যাঁহারা সদস্য হইবেন তাঁহাদের অন্তত ১০ বছরের সরকারী চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কিন্তু যাহাতে তাঁহারা চাকরিতে লোকজন নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদির কাজে সুবিচার করিতে পারেন সেইজন্য এই নিয়ম করা হইয়াছে যে কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য ভবিষ্যতে আর কখনও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই কমিশনের সুপারিশ বা অনুমোদন ছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার সরকারী কাজকর্মে কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন না। পরীক্ষাদির দ্বারা যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করা, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব করা, পেনসন ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির নিয়ম ঠিক করা—এই সব কাজ কমিশনের সদস্যরা করিয়া থাকেন।

সাধারণত প্রত্যেক রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাজ্যটিকে বিভিন্ন বিভাগে (Divisions), বিভাগের অন্তর্গত জেলায় (Districts) এবং জেলার অন্তর্গত মহকুমায় (Subdivisions) ভাগ করা হয়। বিভাগের শাসন-ভার থাকে বিভাগীয় কমিশনারের উপর। জেলার শাসনভার থাকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের (District Magistrate) উপর। মহকুমার শাসনভার থাকে মহকুমা-শাসকের (Sub-Divisional Officer) উপর। সকলের উপরে মন্ত্রিসভা তাঁহাদের কাজকর্ম তদারক করেন।

জেলা-মহকুমার পরেই গ্রাম আছে। গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড (এখন 'পঞ্চায়েৎ'), জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এগুলির শাসনকার্য কতকাংশে (যেমন শান্তিশৃঙ্খলা নহে) ইহারাই পরিচালনা করে। এইজন্য ইহাকে বলা হয় 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন' (Local Self-Government)। এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।



গ্রামসভা হইতে মিউনিসিপ্যালিটি। কর্পোরেশন

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

কতকগুলি অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা কতকটা স্থানীয় লোকের স্ব-আয়ত্ত বলিয়া ইহাকে আঞ্চলিক বা 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন' বলা হয়। ভারতের নগর এলাকায় ও গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে অঞ্চল হিসাবে দুইভাগে ভাগ করা যায় :

১। নাগরিক স্বায়ত্তশাসন

২। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন

বড় বড় শহরে-নগরে যে-প্রতিষ্ঠান এই শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহাকে 'কর্পোরেশন' বলে। গ্রামাঞ্চলে বা ছোট ছোট নগরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'মিউনিসিপ্যালিটি' বা 'বোর্ড'। সম্প্রতি ভারত-সরকার গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের মূল পর্যন্ত পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগেকার জেলা-বোর্ড, ইউনিয়ন-বোর্ড ইত্যাদি লইয়া যে ব্যবস্থা ছিল তাহা বদলাইয়া বর্তমানে নূতন করিয়া গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ভিত্ গড়িবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাকে বলা হয় 'পঞ্চায়েতী রাজ'।

কর্পোরেশন। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার আইন অনুযায়ী বড় বড় শহরে 'কর্পোরেশন' স্থাপিত হয়। কর্পোরেশনের বড়কর্তা হইলেন 'মেয়র'। মেয়র নির্বাচন করা হয়। কর্পোরেশনে নগর-শাসনের ভার তিনটি বিভাগের উপর অর্পণ করা হয়। সেই তিনটি বিভাগ এই :

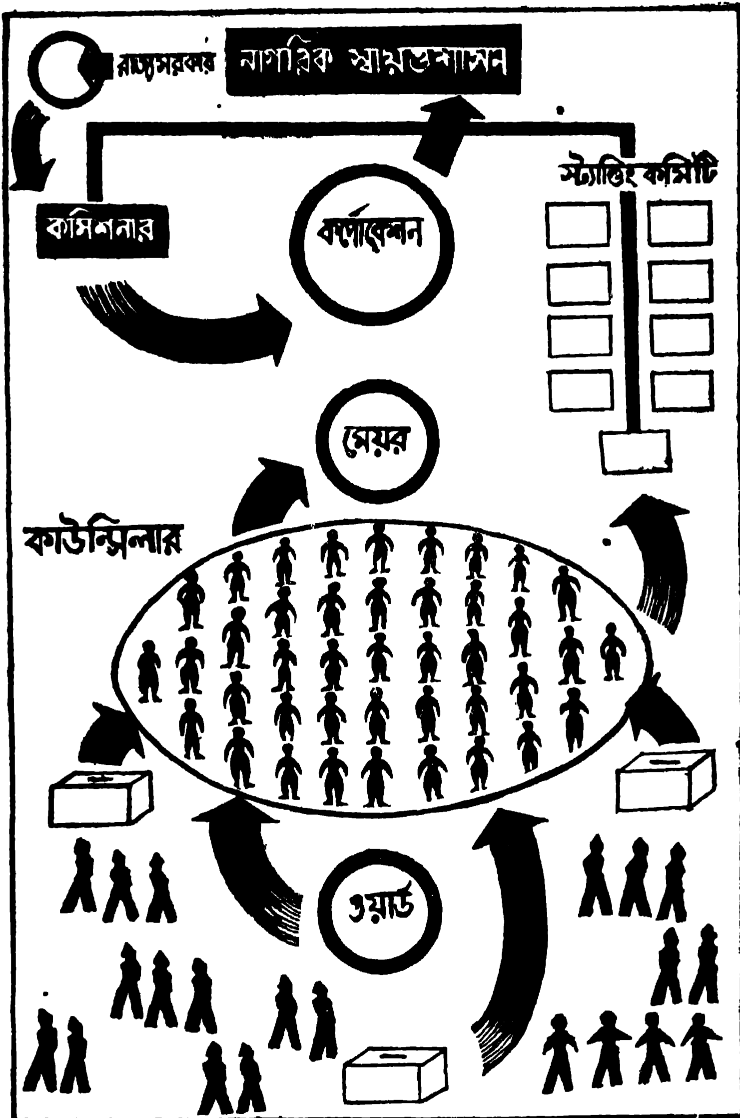
১। কর্পোরেশনের জেনারেল কাউন্সিল।

২। কাউন্সিলের কতকগুলি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি।

৩। কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ অফিসার।

কর্পোরেশনের সমস্ত অফিসার নিয়োগ করেন জেনারেল কাউন্সিল, কেবল কমিশনার নিয়োগ করেন রাজ্যসরকার। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানদের লইয়া এই কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলারদের নির্বাচন করেন নগরের ভোটাধিকারী নাগরিকরা।

কাউন্সিল কয়েকটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর নগরের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেন। আয়ব্যয় ইঞ্জিনিয়ারিং *স্বাস্থ্য শিক্ষা গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ এক-একটি* কমিটি দেখাশুনা করেন।


রাজ্যসরকার
নাগরিক স্বায়ত্তশাসন
স্ট্যান্ডিং কমিটি
কমিশনার
কর্পোরেশন
মেয়র
কাউন্সিলার
ওয়ার্ড

কর্পোরেশনের গঠন

কমিশনারের কাজ হইল বিভিন্ন বিভাগের করণীয় কাজকর্ম ঠিকমত ভাগ করিয়া দেওয়া, কাজগুলি যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং সকলের উপর দৃষ্টি রাখা।

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনা প্রভৃতি বড় বড় শহরে কর্পোরেশন আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনে বর্তমানে নির্বাচিত কাউন্সিলের সংখ্যা ৮০ জন। এই কাউন্সিলাররা ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচন করেন এবং আরও একজন কাউন্সিলার পদাধিকারবলে থাকেন। এই ৮৬ জনকে লইয়া 'জেনারেল কাউন্সিল' গঠিত হয়।

মিউনিসিপালিটি। মিউনিসিপালিটির সদস্যরাও কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের মতো নির্বাচিত হন। সভাপতি ও সহসভাপতিও নির্বাচিত হইয়া থাকেন। অধীন এলাকার কাজকর্ম সদস্যরাই করিয়া থাকেন এবং কর্পোরেশনের মতো মিউনিসিপালিটিরও নানারকম কাজের দায়িত্ব থাকে। পথঘাট, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল সরবরাহ, পাঠাগার ইত্যাদি নানাবিধ কাজ-কর্ম মিউনিসিপালিটিকে করিতে হয়।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত। সেইজন্য ইহাকে 'three tier structure' বা 'তিনতালা গড়ন' বলা হয়। এই তিনতালার ভিত্ ও একতালা 'গ্রামসভা' বা 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' লইয়া গঠিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত এক-একটি ব্লক বা 'তালুক পঞ্চায়েত-সমিতি' গঠিত এবং ইহাই দোতালা। তিনতালায় বা উপরের স্তরে থাকে 'জেলা-পরিষদ।' বর্তমানে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি এইভাবে গঠন করার চেষ্টা হইতেছে।

আগে যে সংবিধানের দিগ্‌দর্শী নীতির কথা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গ্রামে গ্রামে 'পঞ্চায়েত' গঠন করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি মজবুত করিয়া গাড়তে হইবে। সংবিধানের ৪০ নং ধারায় এই নীতি আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভারত-সরকার এই নীতি বাস্তবক্ষেত্রে যথাসাধ্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাবৃদ্ধি ও অগ্রগতি হইতে বুঝিতে

পারা যায়। ১৯৬০,৩১ মার্চের মধ্যে সারা ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সংখ্যা হইয়াছে ১৭৯,৯০৬। প্রদেশ বা রাজ্য হিসাবে পঞ্চায়েতের সংখ্যা হইতে বিভিন্ন রাজ্যের অগ্রগতিও বোঝা যায়। নিচে কয়েকটি প্রদেশের পঞ্চায়েতের সংখ্যা এবং মোট গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা কতজন সেই পঞ্চায়েতভুক্ত, তাহার একটি হিসাব দেওয়া হইল।

প্রদেশ		পঞ্চায়েত সংখ্যা		মোট গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা
অন্ধ্রপ্রদেশ	:	১৪,৫২৪	:	৯৯%
আসাম	:	২,৬৫৭	:	৮০%
বিহার	:	১০,০৩০	:	৯৩%
বোম্বাই (অবিভক্ত)	:	২৬,৭৩২	:	৮৮%
জম্মু ও কাশ্মীর	:	৯৪৯	:	৯৭%
কেরল	:	৮৯২	:	৯১%
মধ্যপ্রদেশ	:	১৩,৪৬৫	:	৬৯%
মাদ্রাজ	:	১০,০৩১	:	৭৪%
মহীশূর	:	৭,৪৪৪	:	১০০%
উড়িষ্যা	:	২,৩৪৭	:	৯৭%
পাঞ্জাব	:	১১,০২৯	:	১০০%
রাজস্থান	:	৩,৬৫২	:	১০০%
উত্তরপ্রদেশ	:	৭২,৪০৯	:	১০০%
পশ্চিমবঙ্গ	:	৩,০২২	:	১৯%
দিল্লী	:	২০৫	:	১০০%
হিমাচল প্রদেশ	:	৫১৮	:	১০০%

গ্রাম-পঞ্চায়েতের এই হিসাব হইতে বোঝা যায়, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া, ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে নূতন পঞ্চায়েত-রাজের ব্যাপক প্রসার হইয়াছে এবং কয়েকটি প্রদেশে সমস্ত গ্রামের লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছে।

পঞ্চায়েত গঠন। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোক 'গাঁও-সভা' বা 'গ্রামসভা' গঠন করিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন করে। স্বভাবতঃই গ্রামের মধ্যে ভাল কর্মী, সচ্চরিত্র ও গুণী লোক যাঁহারা তাঁহাদেরই পঞ্চায়েতে নির্বাচন করা হয়।

গ্রামের পথঘাট জলাশয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র নলকূপ বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধন করা পঞ্চায়েতের কাজ। ইহা ছাড়া গ্রামের কৃষিকাজ পশুপালন ও গ্রাম্যশিল্পের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখাও পঞ্চায়েতের কর্তব্য। কতকগুলি পঞ্চায়েত লইয়া 'ব্লক' ও তালুক-স্তরে 'পঞ্চায়েত-সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির কাজ হইল তাহার অধীন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কাজকর্মের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাহাদের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া। পঞ্চায়েত-সমিতির উপরে থাকে 'জেলা-পরিষদ'।

ন্যায়-পঞ্চায়েত। গ্রাম্য বিবাদ, অন্যায়-অপরাধ ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটিয়া থাকে। এইসব ছোটখাট বিবাদ ও লঘু অপরাধের জন্য গ্রামের লোকের পক্ষে কোর্ট-কাছারী করা ব্যয়সাপেক্ষ তো বটেই, ঝঞ্ঝাটও কম নহে। এইসব ছোটখাট বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েত ছাড়া আলাদা একটি ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠন করা হইয়াছে। গ্রামের বিচক্ষণ লোকদের লইয়া এই ন্যায়-পাঞ্চায়েত গঠিত হয় এবং ইহার সভ্যরা বিচারকের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী সবরকমের ছোটখাট মামলার তাঁহারা বিচার করিতে পারেন। জরিমানা করার ও দণ্ড দিবার অধিকারও তাঁহাদের আছে, তবে তাহা খুবই সীমাবদ্ধ। অপরাধ গুরুতর হইলে এবং বেশী দণ্ড দিতে হইলে বড় আদালতের দ্বারস্থ হইতে হয়।

ভারতের নূতন গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা এইভাবে পঞ্চায়েতের ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা হইতেছে। ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে নূতন ব্যবস্থা বলা যায় না। ইহা ভারতের বহু প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন হিন্দুযুগে ও মুসলমানযুগে এই পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা ভারতের গ্রাম্যসমাজে প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশযুগে এই নূতন প্রশাসনিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার চাপে পড়িয়া ভারতের বহুপ্রাচীন গ্রাম্যসমাজের ভিত্ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার সহিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে লোপ পায়। স্বাধীন ভারতে এই পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হইতেছে।

কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা

দিল্লী হিমাচলপ্রদেশ মণিপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি কেন্দ্রাধীন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধারণত রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একজন

করিয়া 'অঞ্চলপতি' (Adiministrator) নিয়োগ করেন, পাশাপাশি কোন রাজ্যের রাজ্যপালের উপরেও তিনি এই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিতে পারেন। কেন্দ্রাধীন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য হিমাচল মণিপুর ও ত্রিপুরায় একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ (Territorial Council) এবং পণ্ডিচেরিতে একটি প্রতিনিধিসভা (Representative Assembly) গঠন করা হইয়াছে। ইহার সদস্যরা অধিকাংশই নির্বাচিত হন এবং ইহার কাজ অনেকটা রাজ্যের বিধানসভার মতো।

ভারতরাষ্ট্রের বিচারবিভাগ

এতক্ষণ আমরা ভারতের আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের কথা আলোচনা করিয়াছি। শাসনবিভাগ প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভা হইতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূলকেন্দ্র গ্রাম-পঞ্চায়েত পর্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। বাকি রহিয়াছে বিচারবিভাগ (Judiciary)। এইবার এই বিচারবিভাগের কথা আলোচনা করিব।

সুপ্রিমকোর্ট। ভারতের বিচারবিভাগকে একটি পিরামিডের সহিত তুলনা করিলে তাহার শীর্ষস্থানে দেখা যাইবে 'সুপ্রিমকোর্ট' প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন প্রদেশের বা রাজ্যের বিচারবিভাগের প্রধান আদালত হইল 'হাইকোর্ট'। প্রত্যেক বড় আদালতের বিচার্য বিষয়ের একটি প্রত্যক্ষ আসল সীমানা বা ক্ষেত্র থাকে, তাহাকে 'Original Jurisdiction' বলা হয়; অর্থাৎ কতকগুলি বিষয়ের বিচার সোজাসুজি বা প্রত্যক্ষভাবে এই আদালতের অধীন। আবার এমন কতকগুলি বিষয় থাকে যাহা প্রত্যক্ষভাবে সেই আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা যায় না, কিন্তু অন্য কোন ছোট আদালতের বিচারের পর সেখানে আপীল করা যায় পুনর্বিচারের জন্য। ভারতের সুপ্রিমকোর্টেরও এই ধরনের প্রত্যক্ষ এবং আপীল-সংক্রান্ত পরোক্ষ বিচার্য বিষয় নির্দিষ্ট করা আছে।

প্রত্যক্ষ বিষয়ের মধ্যে প্রধান হইল—ইউনিয়ন-সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া মতভেদ বা বিরোধ বাধিলে তাহা বিচার করার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিমকোর্টের আছে, কোন হাইকোর্টের নাই। ফেডারাল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এইরকম বিবাদ-বিরোধ সাধারণত সংবিধানের

ব্যাখা লইয়াই বাধিয়া থাকে। সংবিধানের ব্যাখা-বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের ছাড়া আর কাহারও নাই।

পরোক্ষ আপীল-সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক, ফৌজদারী ও দেওয়ানী যে-কোন বিষয় হাইকোর্ট হইতে সুপ্রিমকোর্টে আপীল করা চলে। সংবিধানে যে-সব মৌলিক অধিকার ভারতের নাগরিকদের দেওয়া হইয়াছে তাহা রক্ষা করার ভারও সুপ্রিমকোর্টের উপর। এই অধিকার-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের মামলা সোজাসুজি সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত করা যায়।

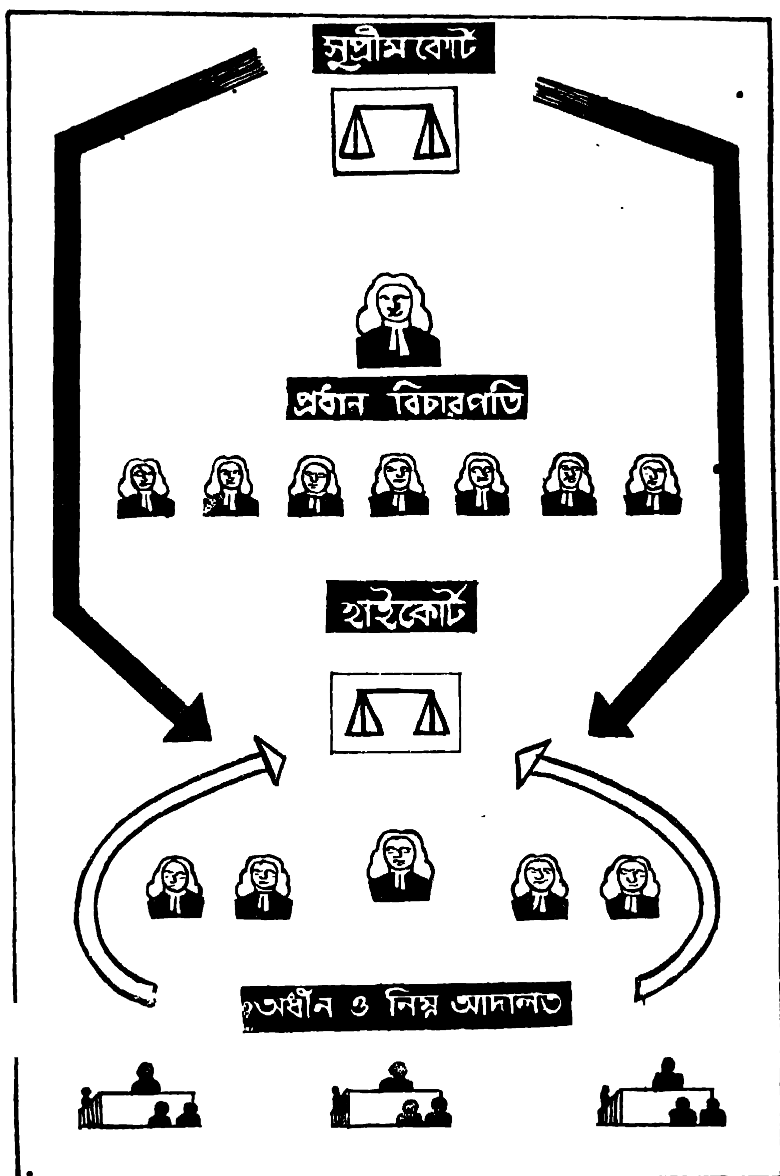
প্রধান-বিচারপতি ছাড়া সুপ্রিমকোর্টে বর্তমানে আরও ১৩ জন বিচারপতি আছেন। রাষ্ট্রপতি এই বিচারপতিদের নিয়োগ করেন।

হাইকোর্ট। সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে বা রাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবার কথা। কাজেই ১৫টি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া হাইকোর্ট আছে। সকল হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা এক নহে, কোথায় কতজন বিচারপতি থাকিবেন তাহা রাষ্ট্রপতি ঠিক করেন এবং তিনিই নিযুক্ত করেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান-বিচারপতি ও রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয়।

প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যে হাইকোর্ট হইল সর্বোচ্চ আপীল আদালত। নিচের আদালতগুলি হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকলরকমের মামলার বিচারের জন্য হাইকোর্টে আপীল করা যায়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক হাইকোর্টের প্রত্যক্ষ বিচার্য বিষয়ও নির্দিষ্ট আছে। বড় বড় দেওয়ানী মামলা এবং গুরুতর ফৌজদারী মামলা হাইকোর্টের এই প্রত্যক্ষ বা 'অরিজিনাল' বিভাগে বিচার করা হয়।

ছোট আদালত। হাইকোর্টের নিচে বিভিন্ন জেলা, মহকুমা হইতে গ্রাম-পঞ্চায়েত পর্যন্ত দেওয়ানী-ফৌজদারী সবরকম মামলা বিচারের জন্য জেলা-জজের আদালত, সাব-জজের আদালত, মুন্সেফের আদালত ও ন্যায়-পঞ্চায়েত আছে। সাধারণত এইসব আদালতে দেওয়ানী মামলার বিচার হয় এবং বিচার হইলে পরে হাইকোর্টে আপীলও করা যায়।

গ্রামাঞ্চলে খুব ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচার হয় ন্যায়-পঞ্চায়েতে। শহরাঞ্চলে অবৈতনিক ও বৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটরা ফৌজদারী মামলার বিচার



ভারতরাষ্ট্রের বিচারবিভাগ

করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার সম্বন্ধে জেলা-জজের কাছে আপীল করা যায়, আবার অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেটও ছোট আদালতের মামলার আপীল শুনিয়া থাকেন। ইঁহাদের সকলের বিচার সম্বন্ধে রাজ্যের হাইকোর্টেও আপীল করা যায়।

শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ হইল—আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। ভারতরাষ্ট্রের এই তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। আইনবিভাগের গণতান্ত্রিক গডন স্বতঃসিদ্ধ, কারণ আইনসভার সদস্যরা কেন্দ্রীয় লোকসভায় ও রাজ্যের বিধানসভায় ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের কর্মচারীদের রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগের ব্যাপারে তাঁহারা যে সবসময় গণতান্ত্রিক নীতি মানিয়া চলিবেন, তাহার নিশ্চয়তা কি? এইজন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকারী কাজে নিয়োগের দায়িত্ব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনের' উপর দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অনেকটা নিরপেক্ষতা বজায় থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়াও শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের ব্যাপারে আরও একটি গুরুতর সমস্যা আছে। শাসনবিভাগের লোক অথবা তাহার সহিত-সংশ্লিষ্ট লোকের হাতে যদি বিচারের ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে সুশাসন ও সুবিচার কোনটারই সম্ভাবনা থাকে না। যিনি শাসক তিনিই যদি বিচারক হন তাহা হইলে বিচার প্রহসনে পরিণত হয়, কারণ শাসন ন্যায়সংগত বা নীতি ও আইন-সম্মত হইতেছে কিনা তাহা এই ক্ষেত্রে জানা সম্ভব নহে। সেইজন্য গণতন্ত্রের একটি প্রধান নীতি হইল—শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা এবং তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইহাকে 'theory of separation of powers' বা 'ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যনীতি' বলা হয়। ইহার অর্থ হইল শাসনক্ষমতা ও বিচারক্ষমতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবে, উভয়ের মধ্যে কোনরকম সম্পর্ক রাখা হইবে না। এই নীতি না মানিলে শাসনের অবনতি হইবে এবং স্বেচ্ছাচারিতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা যদি জানেন যে বিচারের ক্ষমতাও তাঁহাদের হাতে আছে তাহা হইলে যাহা খুশী তাঁহারা করিতে পারেন। কিন্তু বিচারের ক্ষমতা যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকদের হাতে

থাকে, তাহা হইলে শাসকরা স্বভাবতঃই সংযম ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে বাধ্য হন। কারণ শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও যে-কোন সাধারণ লোক বিচারকের কাছে অভিযোগ করিয়া ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতে পারে। বিচার-বিভাগের এই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভারসাম্য বজায় রাখে, তাহার আদর্শকে কলুষিত হইতে দেয় না। তাহা না হইলে 'ডেমোক্রেসি' সহজেই 'ডিক্‌টেটরশিপ'-এ পরিণত হইতে পারে। স্বাধীন বিচারকরা সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো রাষ্ট্রের সংবিধান, আইনকানুন ও নাগরিকদের অধিকারগুলি পাহারা দেন।

ভারতরাষ্ট্রের সংবিধানে এইজন্যই পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে শাসন-বিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা হইবে এবং তাহার স্বাধীন মর্যাদাও কদাচ ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। এই নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতের বিচারবিভাগ গঠিত হইয়াছে এবং কোথাও কোন মন্ত্রিসভার হাতে বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিয়োগ করেন। তাঁহাদের কার্যকলাপের জন্য কোন কৈফিয়ত তলব করিবার ক্ষমতা মন্ত্রিসভার নাই। একেবারে গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত স্বতন্ত্র ন্যায়-পঞ্চায়েতের উপর বিচারের ভার দিয়া ভারতরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি যথাসম্ভব মজবুত করিয়া গড়ার চেষ্টা হইতেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ভোটাধিকার

ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। ভারতের রাষ্ট্রীয় গড়ন ও শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। এখন জানা দরকার, এই গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট কি পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয় এবং কি কারণে ইহাকে জনগণের প্রতিনিধিদের গবর্ণমেন্ট বলা হয়।

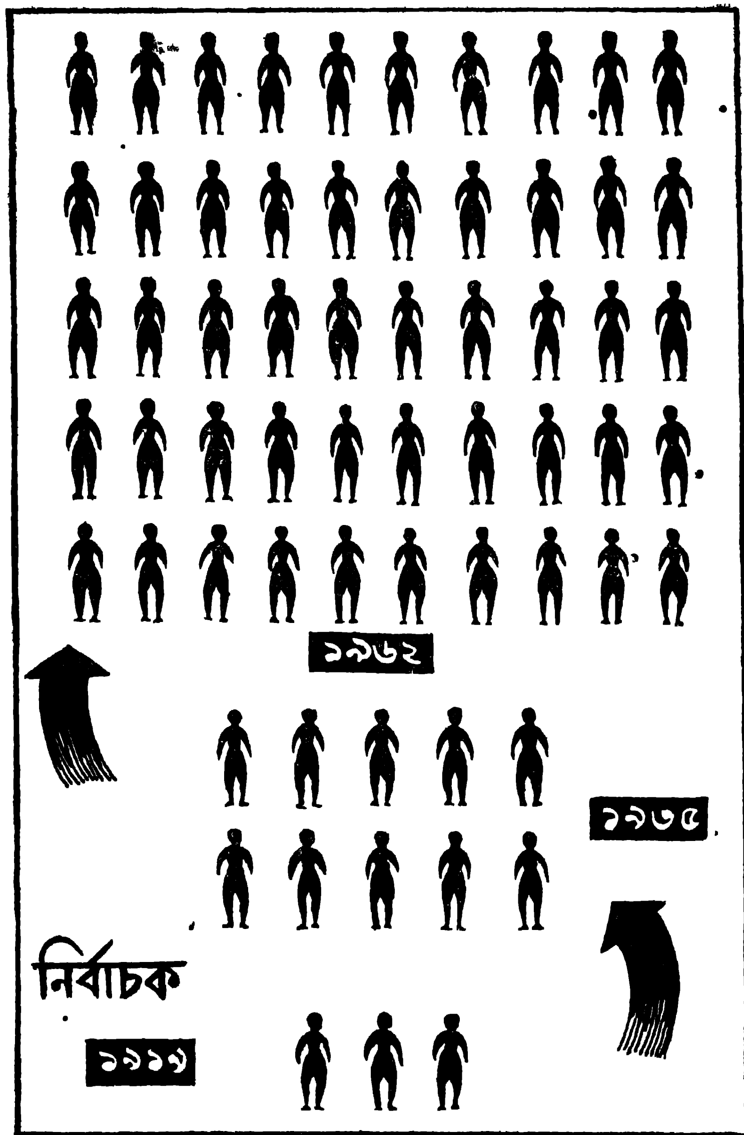
'গণতন্ত্র' কাহাকে বলে ? ইংরেজী 'ডেমোক্রেসি' কথার বাংলা প্রতিশব্দ হইল 'গণতন্ত্র'। 'Democracy' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে গ্রীক *demos* ও *krateo* এই দুইটি শব্দ হইতে। গ্রীক *demos* কথার অর্থ হইল 'people' বা জনসাধারণ এবং *krateo* কথার অর্থ হইল 'to rule' বা শাসন করা। তাহা হইলে 'ডেমোক্রেসি' কথার অর্থ হইল 'জনসাধারণের শাসন' এবং এইজন্যই ইহাকে

বাংলায় আমরা 'গণতন্ত্র' বলি। ইহা এমন এক শাসনতন্ত্র যাহা জনগণের দ্বারা পরিচালিত, সেইজন্য ইহার নাম 'গণতন্ত্র'।

নির্বাচন ও ভোটাধিকার। 'ডেমোক্রেসির' একটি বহুপ্রচলিত সংজ্ঞা (definition) আছে ইংরেজীতে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ডেমোক্রেসিকে' বলা হয়—"government *of* the people, *for* the people and *by* the people." এই সংজ্ঞায় 'of the people,' 'for the people' ও 'by the people' কথা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ হইল—জনসাধারণের গবর্ণমেণ্ট, জনসাধারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের দ্বারা (নির্বাচিত) গবর্ণমেণ্ট। এই সংজ্ঞা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট 'জনসাধারণের দ্বারা' গঠিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, 'জনসাধারণের দ্বারা' কিভাবে গঠিত হয়? যে-দেশের জনসংখ্যা কোটি কোটি, সে-দেশে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠনের উপায় কি? উপায় হইল—'নির্বাচন' (election)। সামান্য একটি ছোট সংঘ বা ক্লাব চালাইতে হইলেও আমাদের সম্পাদক ও কার্যকর-কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করিতে হয়। বৃহৎ একটি রাষ্ট্রের জন্যও তাহা না করিয়া উপায় নাই। নির্বাচন হয় 'ভোট' দিয়া। 'ভোট' কি? ভোট হইল যে কোন ব্যক্তির স্বাধীন মতামত। আমি দেশের প্রাপ্তবয়স্ক (adult) নাগরিক হিসাবে কাহাকে যোগ্য প্রতিনিধি মনে করি তাহা জানানোকেই ভোট দেওয়া বলে। একজনের বেশী লোক প্রতিনিধি পদের প্রার্থী হইতে পারেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আমি যাঁহাকে যোগ্য মনে করি তাঁহাকেই ভোট দিই বলিয়া ইহাকে 'নির্বাচন' করা বা বাছাই করা বলে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় কেন? কারণ শিশু ও বালকদের বিচারবুদ্ধি পরিণত নহে, রাজনীতিক যোগ্যতা বিচার করিয়া কোন প্রতিনিধি বাছাই বা নির্বাচন করার ক্ষমতা তাহাদের থাকিতে পারে না। তাই ভোটের অধিকার আছে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের।

ভারতীয় সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিককে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অন্তত যাঁহাদের বয়স ২১ বছর তাঁহারাই প্রাপ্তবয়স্ক। যে বিশেষ নির্বাচন-এলাকায় (constituency) যিনি বাস করিবেন, সেই এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে পারিবেন। উন্মাদ বা বিকৃত-মস্তিষ্ক


১৯৬২
১৯৩৫
নির্বাচক
১৯১৯

এবং সমাজবিরোধী গুরুতর অপরাধে অপরাধী কোন ব্যক্তির ভোটের অধিকার থাকিবে না। আর সকলেই ভোট দিতে পারিবেন। এই নিয়ম অনুসারে ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের মোট ৪৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২১ কোটি, অর্থাৎ ৫০% 'ভোটার' হইয়াছেন। ব্রিটিশ আমলে ১৯১৯ সালে ইহা ছিল ৩% এবং ১৯৩৫ সালে ১০%। এই 'ভোটার' সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের অগ্রগতির আভাস পাওয়া যায়।

ভোট দিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার (অর্থাৎ লোকসভার ও বিধানসভার) সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। আইনসভার সদস্যরাই দেশের আসল রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। যে রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিরা আইনসভায় সর্বাধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হন, তাঁহাদেরই মন্ত্রিসভা গঠন করার ক্ষমতা থাকে। অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা তখন বিরোধীপক্ষের (Opposition) কাজ করেন। এই বিরোধীপক্ষ না থাকিলেও গণতান্ত্রিক শাসন আদর্শচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সরকারী কাজকর্মের ও নীতির আলোচনা-সমালোচনা না হইলে দেশের সাধারণ লোক তাহার ভালমন্দ বিচার করিবার সুযোগ পায় না। লোকসভায় ও বিধানসভায় সংখ্যালঘু হইয়াও বিরোধীদল এই গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালন করেন এবং গণতন্ত্রের রথচক্র সচল রাখিতে সাহায্য করেন।

আইনসভার কর্মপদ্ধতি

আইনসভার কাজ হইল আইনকানুন পাশ করা। কেন্দ্রীয় লোকসভা ও রাজ্যসভা এবং প্রাদেশিক বিধানসভা ও বিধান-পরিষদ এই কাজই করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাজের, অর্থাৎ যে-কোন আইন প্রণয়নের একটি পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিটি খুব সরল নহে, বেশ জটিল। জটিল হইবারই কথা, কারণ একটি 'আইন' প্রণয়ন করারও গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। কাজেই তাহা পাস করিবার আগে তাহার সবদিক ভাল করিয়া দেখিতে হয়, বিচার-বিবেচনা করিতে হয়। স্বভাবতঃই কাজটি সহজ হইতে পারে না।

যে-কোন 'আইন' প্রণয়ন করিবার সময় একটি 'বিল' (Bill) রচনা করিতে হয়। কেন্দ্রাধীন বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং রাজ্যাধীন বিষয়ে (এই বিষয়গুলির কথা আগে বলা হইয়াছে) রাজ্যমন্ত্রীরা বিলটি লোকসভায় ও বিধানসভায় পেশ করেন। তাহার আগে বিলটি 'গেজেটে' প্রকাশিত হয়।

সভার অন্যান্য সদস্যরাও বিল আনিতে পারেন, তবে তাহার জন্য অন্তত একমাস আগে 'নোটিস' দিতে হয়। বিলের 'প্রথম পাঠ' (first reading) শেষ হইলে একটি 'নির্বাচিত কমিটির' কাছে উহা বিবেচনার জন্য দেওয়া হয়। কমিটি সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া, সংশোধন ও সংযোজন যাহা প্রয়োজন তাহা করিয়া, একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। তারপর বিলের 'দ্বিতীয় পাঠ' আরম্ভ হয়। 'পাঠ' মানে আলোচনা। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের প্রত্যেকটি ধারা (clause) সম্বন্ধে আইনসভার সদস্যরা আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকটি ধারা ভোট গ্রহণ করিয়া পাস করা হয়। তৃতীয় পাঠান্তে আলোচনা শেষ হইলে বিলটি গৃহীত হয়। লোকসভা ও বিধানসভায় গৃহীত হইলে রাজ্যসভা ও বিধান-পরিষদেও পাঠ শেষ করিয়া গ্রহণ করা হয়। তারপর রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হয় এবং তাঁহারা সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য বিলটি আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন। দ্বিতীয়বারও যদি বিল পাস হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহারা সম্মতি দেন। লোকসভা-রাজ্যসভা অথবা বিধানসভা-বিধানপরিষদের মধ্যে বিল সম্বন্ধে কোন মতভেদ ঘটিলে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন ডাকিয়া তাহার সমাধান করেন।

এইভাবে প্রত্যেকটি আইন পাস করা হয়। আইন পাস করার আগে 'বিল' আকারে তাহার সবদিক বিবেচনা ও আলোচনা করা হয়, তারপর ধারাক্রমে ভোট লইয়া তাহা পাস করা হয়। ইহাই আইন পাস করিবার গণতান্ত্রিক রীতি। অনেক সময় সংকটকালে বা জরুরী অবস্থায় এত দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ নিয়মাদি পালন করার অবকাশ থাকে না। যেমন যুদ্ধের সময়, অথবা গৃহবিপ্লবের সময়। তখন রাষ্ট্রপতি 'অর্ডিন্যান্স' বা 'জরুরী আইন' রাষ্ট্রীয় স্বার্থে জারী করিতে পারেন। যেমন ভারতসীমান্তে চীনের আক্রমণের জন্য সম্প্রতি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পর এই ঘোষণা সর্বপ্রথম করা হইল। তবে এই 'জরুরী আইন' স্বল্পস্থায়ী।

ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ। জনকল্যাণ ও সমাজতন্ত্র

ভারতের সংবিধান, ভারতরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক গড়ন, দিগ্‌দর্শী রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ

কি তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহা গণতন্ত্রের (democracy) আদর্শ, জনকল্যাণের (welfare) আদর্শ, সমাজতন্ত্রের (socialism) আদর্শ।

গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের আদর্শ ভারতের রাষ্ট্রীয় গড়নের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং ৪৩ কোটি লোকের মধ্যে যে-দেশে প্রায় ২১ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের ভোটে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় তাহা শুধু গণতান্ত্রিক দেশ নহে, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এত বিপুল সংখ্যক লোকের ভোটে এরকম বিরাট নিবাচনপর্ব পৃথিবীর আর কোন গণতান্ত্রিক দেশে অনুষ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে ভারতের এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষা একটি বিস্ময়ের বিষয়।

জনকল্যাণ। ভারত কেবল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নহে, 'জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র' (Welfare State)। এই জনকল্যাণের আদর্শ সংবিধানের প্রতিটি ধারার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংবিধানের মুখবন্ধেই 'ন্যায়বিচার, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার' আদর্শ ঘোষণা করা হইয়াছে। 'মৌলিক অধিকারের' মধ্যেও এই আদর্শকে যথাসম্ভব রূপায়িত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের 'দিগ্‌দর্শী নীতির' মধ্যে (Directive Principles) ইহা আরও মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। এই দিগ্‌দর্শী নীতির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি সেইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে ভারতের জনগণের কল্যাণ হয় ('to promote the welfare of the people')। অর্থনীতিক পরিকল্পনা, সামাজিক পরিকল্পনা ও রাজনীতিক কার্যকলাপ ভারতরাষ্ট্রে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রচিত হয় যাহাতে বৃহত্তম জনসাধারণের কল্যাণ হয়। এইজন্য ভারতরাষ্ট্রকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বা একটি 'জনকল্যাণতন্ত্র' বলা যায়।

সমাজতন্ত্র। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্টে ঘোষণা করা হয় যে ভারতরাষ্ট্রের অর্থনীতিক উদ্দেশ্য "socialist pattern of society"—'সমাজতান্ত্রিক আদর্শসম্মত সমাজ' স্থাপন করা। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের গোড়ার কথা হইল—সমষ্টির বা সমাজের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা বড়, অতএব সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি এমনভাবে গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে

ব্যক্তির অথবা মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ অপেক্ষা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থসাধন সম্ভব হয়। অর্থনীতিক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, কারণ অর্থ বর্তমান সমাজে সমস্ত অনর্থের মূল তো বটেই, সামাজিক বৈষম্যেরও প্রধান কারণ। সমাজতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য হইল অর্থনীতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা করা, শিল্পবাণিজ্যনীতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাহাতে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোক লাভবান হইয়া বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি করিতে না পারে। ভারতরাষ্ট্রের অর্থনীতিক পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক যোজনার অন্তর্গত) ও শিল্পনীতি (industrial policy) এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচনা করা হইয়াছে। সেইজন্য দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ ও বড় বড় শিল্পকারখানা (লোহা-ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, রেল-বিমান-জাহাজ ইত্যাদি) রাষ্ট্রায়ত্তে (nationalise) আনা হইতেছে, মুষ্টিমেয় ধনিক শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। ক্রমেই এই রাষ্ট্রায়ত্ত নীতির (nationalisation policy) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে এই কারণে।

অবশ্য সমস্ত শিল্পকর্ম রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা ভারত-সরকারের নীতি নহে। ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যম, উদ্‌যোগ ও প্রচেষ্টারও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। শিল্প-পতিদের এই উদ্যম অবশ্য রাষ্ট্রীয় নীতিসম্মত হইবে এবং রাষ্ট্রের আদর্শ অনুযায়ী শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনায় তাঁহারা সংযম ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবেন। অতিরিক্ত মুনাফা (profit) তাঁহারা যাহাতে না করিতে পারেন, শিল্পকর্মে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর কোন অন্যায় অবিচার না হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত শিল্পকর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে মধ্যস্তরের ও ছোটখাট শিল্পমালিক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের উপর। তাঁহাদের শিল্পকর্মে সুযোগ ও সাহায্য দেওয়া হইতেছে বেশী, বড় বড় ধনিক শিল্পপতিদের নহে। সুতরাং ব্যক্তিগত শিল্পকর্মক্ষেত্রেও ভারত-সরকার যতদুর সম্ভব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সমাজতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শ মানিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই জনকল্যাণ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে যথাসম্ভব শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও রূপ দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহা কতদুর সার্থক হইবে তাহা কেবল সরকারী নীতি ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উপরও অনেকখানি নির্ভর করে।

QUESTIONS

1. When did the new Indian Constitution come into force ? What are the 'fundamental rights' of an Indian citizen ?

2. What is a Federation ? Why the Indian Union is a Federation of States ?

3. What are the powers divided between the Union Government and the States, according to our Constitution ?

4. Write what you know about the composition and function of the Council of Ministers at the Centre and at the States.

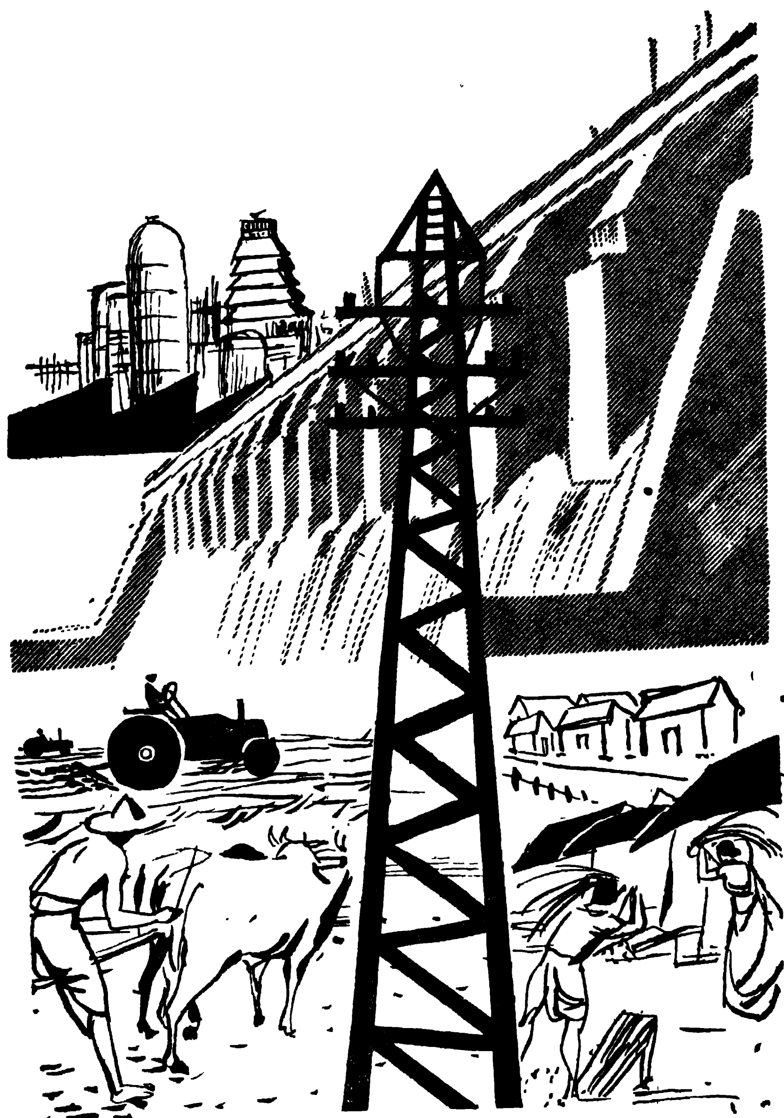
5. Briefly describe the position and powers of the President of the Indian Union and the Governor of a State.

6. Give an account, in outline, of the local self-governing institutions in India.

7. Briefly describe the system of Judicial Administration in India.

8. What are the powers of the Supreme Court of India ? What are the powers of a High Court ?

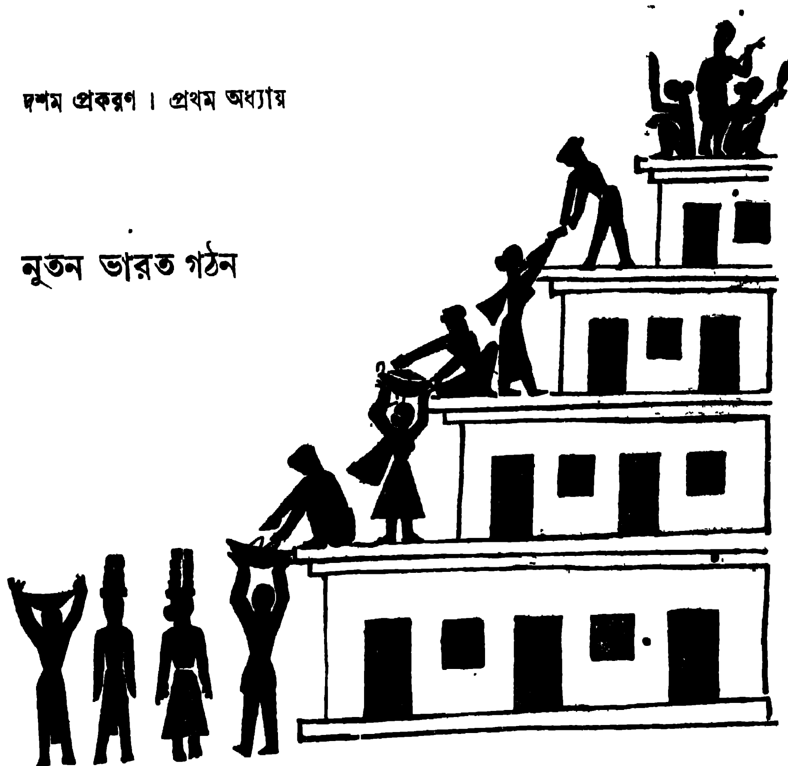
9. What is Democracy ? How are the representatives of a democratic State chosen ?



নূতন ভারত গঠন

দশম প্রকরণ । প্রথম অধ্যায়

নূতন ভারত গঠন



ভূমিকা। বর্তমান ভারতের সমস্যার অন্ত নাই। স্বাধীন হইবার পর সমস্যা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বিদেশী শাসকরা বহু সমস্যাকে 'সমস্যা' বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না। দেশের জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক অভাব অবনতি—কোনটাই তাঁহাদের কাছে সমাধানযোগ্য সমস্যা বলিয়া মনে হইত না, নিজেদের স্বার্থকেই তাঁহারা বড় করিয়া দেখিতেন। আজ আর ভারতের সেদিন নাই। আজ দেশের প্রত্যেকটি সমস্যা যেমন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তেমনি তাহার সমাধানের চেষ্টাও আন্তরিক হইয়াছে। হয়ত সব সমস্যা সমাধান করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এখনও সম্ভব হয় নাই, এবং সেই সামর্থ্যও আমাদের সর্বক্ষেত্রে নাই। যেমন আর্থিক

Unit 10. (a) Our immediate problems - growing population—economic problems—problems of health and education - our efforts to solve them. The Five-Year Plans—their main features—Development of Power, Heavy Industries, Community Development, etc. Family Planning.

সমস্যা। এত বড় দেশের এত লোকের আর্থিক সমস্যা সমাধান করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তেমনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যাও। কিন্তু তবু বর্তমান ভারতের এই সমস্যাগুলি আমাদের জানা ও বোঝা দরকার এবং আমাদের জাতীয় সরকার কি পন্থা, কি নীতি, কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলি সমাধানের জন্য তাহাও জানা কর্তব্য।

কয়েকটি গুরুতর সমস্যা। দেশের সামনে কয়েকটি সমস্যা আজ গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে। যেমন :

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

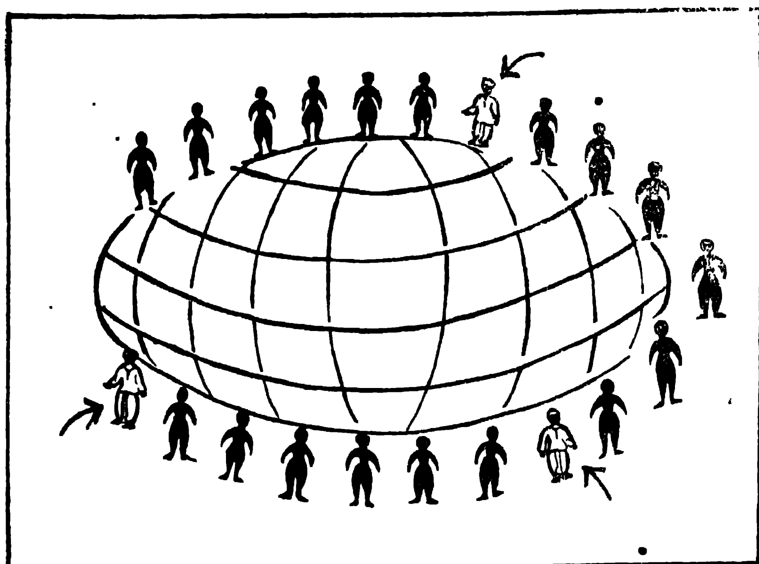
২। আর্থিক সমস্যা নানারকমের

৩। জনস্বাস্থ্যের সমস্যা

৪। শিক্ষার সমস্যা

পরে আমরা একটি-একটি করিয়া এগুলির বিচার করিব। প্রথমে শুধু সমস্যা-গুলির গুরুত্ব ইঙ্গিত করিতেছি।

জনসংখ্যার কথাই ধরা যাক। ভারতের জনসংখ্যা যে দ্রুতহারে বাড়িয়া যাইতেছে তাহা আমরা জানি ও শুনিয়া থাকি। এই বৃদ্ধির ফল কি? প্রথম ফল হইল খাদ্যসমস্যা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতেছে। যে-লোক আগে ছিল অথবা এখন আছে, তাহাদের খাদ্যের সংস্থান করিতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। ইহার পর গড়পড়তায় প্রতি বছরে যদি ৮০ লক্ষ করিয়া লোক বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে খাদ্যের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা কল্পনা করা কঠিন নহে। তারপর বহুরকমের আর্থিক সমস্যা তো আছেই। বহু কর্মক্ষম লোককে আজকেই আমরা উপযুক্ত কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতেছি না। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে। তারপর ৮০ লক্ষ করিয়া লোক যদি বছরে বছরে বাড়িতে থাকে তাহা হইলে কোথা হইতে তাহাদের কর্মের সংস্থান হইবে? পঞ্চবার্ষিক যোজনার দ্বারা? যোজনার সমস্ত হিসাব তো গরমিল হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া জাতির সামর্থ্য ও দেশের সংগতির প্রশ্নও আছে। তাহাতেও তো সমস্যার কোন সমাধান করা যাইবে না। তারপর এইসব লোকজনের শিক্ষার সমস্যা আছে, স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্যা আছে। সুতরাং সমস্যা আমাদের গুরুতর এবং যে-কোন সমস্যার অর্ধ-সমাধান হইতে না হইতেই আবার তাহা নূতন আকারে দেখা দেয়।



পৃথিবীর প্রতি সপ্তম মানুষ ভারতীয়

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা

ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। এই বৃদ্ধির গতি যে কত দ্রুত তাহা হিসাব না দেখিলে বোঝা যাইবে না। ১০ বছর অন্তর ভারতের জনগণনা (Census) হইয়া থাকে। গত ৫০ বছরের মধ্যে কি হারে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিচের এই হিসাব হইতে জানিতে পারা যাইবে :

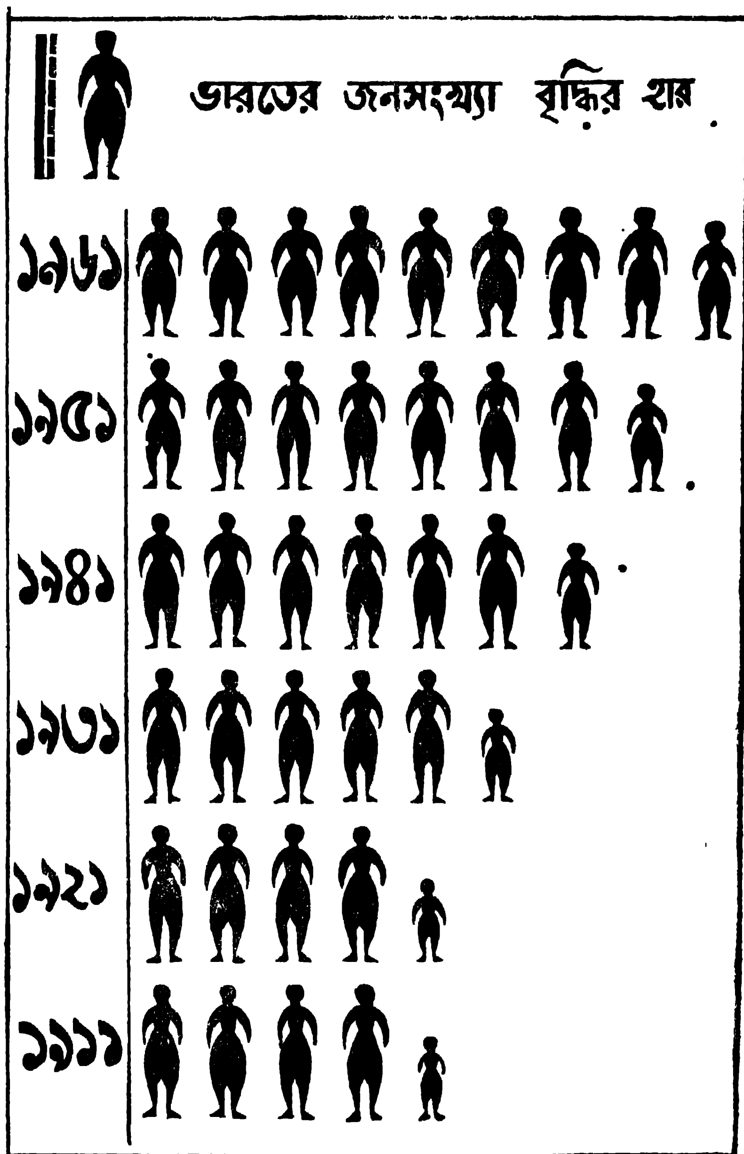
১৯১১ সাল	:	২৪ কোটি ৮০ লক্ষ
১৯২১ সাল	:	২৪ কোটি ৮০ লক্ষ
১৯৩১ সাল	:	২৭ কোটি ৫০ লক্ষ
১৯৪১ সাল	:	৩১ কোটি ৪০ লক্ষ
১৯৫১ সাল	:	৩৫ কোটি ৬০ লক্ষ

এই হিসাবের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে ৪ কোটি আন্দাজ লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে বাড়িয়াছে প্রায় ৮ কোটি আন্দাজ লোক। অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার

গত ১০ বছরে আগেকার ১০ বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। এই হারবৃদ্ধি বজায় থাকিলেই (সাধারণত এই 'হার' আরও একটু বাড়িবার কথা) আগামী ১০ বছরে ১৯৮১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা হইবে ৫৯ কি ৬০ কোটি, অর্থাৎ ১৯৫১ সালের লোকের প্রায় দ্বিগুণ। ৩০ বছরের মধ্যে কোন দেশের লোকসংখ্যা যদি ঠিক দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং ভারতের মতো এত বড় জনবহুল দেশের, তাহা হইলে সমাজের চেহারা কি হইতে পারে এবং রাষ্ট্রের সমস্যাও বা কি দেখা দিতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অবশ্য এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আজ শুধু যে ভারতের সমস্যা তাহা নহে, সারা পৃথিবীর সমস্যা। খুব সম্প্রতি (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২) লিসবনে আন্তর্জাতিক শিশুস্বাস্থ্য সম্মেলন হইয়া গেল। সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক সালাজার বলিয়াছেন যে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতিদিন ৯০ হাজার (প্রায় ১ লক্ষ) করিয়া লোক বাড়িতেছে। এই হারে লোক বাড়িলে বর্তমান শতাব্দীর বাকি ৩৭-৩৮ বছরের মধ্যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২৫০ কোটি হইতে বাড়িয়া ৪০০ কোটি পর্যন্ত হইবে। পৃথিবীতে মানুষের পদার্পণকাল হইতে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত হাজার হাজার বছরে যে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহা ১৯০০-২০০০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ ১০০ বছরে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। প্রকৃতির খাদ্য-উৎপাদনশক্তি এবং পৃথিবীর খাদ্যসম্পদের ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। সুতরাং বিজ্ঞানীরা বলেন যে এত দ্রুতহারে লোক বাড়িলে সকলের খাদ্য যোগান দেওয়া সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিক দিয়া আজ আমরা সভ্যতার উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়াছি এবং সেখান হইতে গ্রহান্তরে যাত্রারও আয়োজন করিতেছি। ইহা যে মানুষের বিস্ময়কর কীর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কীর্তির চূড়ায় বসিয়া যদি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বংশধরদের অনাহারে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখিতে হয় এবং যে গ্রহে আপাততঃ বাস করিতেছি তাহাই বসবাসের অযোগ্য হইয়া ওঠে, তাহা হইলে যন্ত্রের খোলের মধ্যে বসিয়া আমরা চন্দ্রলোকে অভিযানের চেষ্টা করিয়াছি শুনিলে ভবিষ্যতের অভুক্ত মানুষ কোন সান্ত্বনালাভ করিবে না। কেবল জনসংখ্যার চাপেই এই হতভাগ্য গ্রহের অপমৃত্যু ঘটিবে।

সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা কেবল এদেশের সমস্যা নহে, সারা পৃথিবীর সমস্যা। এই পৃথিবীর স্থলভাগের যেটুকু আমরা ভারতীয়রা দখল করিয়া আছি তাহা শতকরা ২½ ভাগের বেশী নহে, অর্থাৎ ৪০-ভাগের ১-ভাগ মাত্র। কিন্তু



প্রতি পূর্ণমানুষের মূর্তি ৫০ লক্ষ হিসাবে

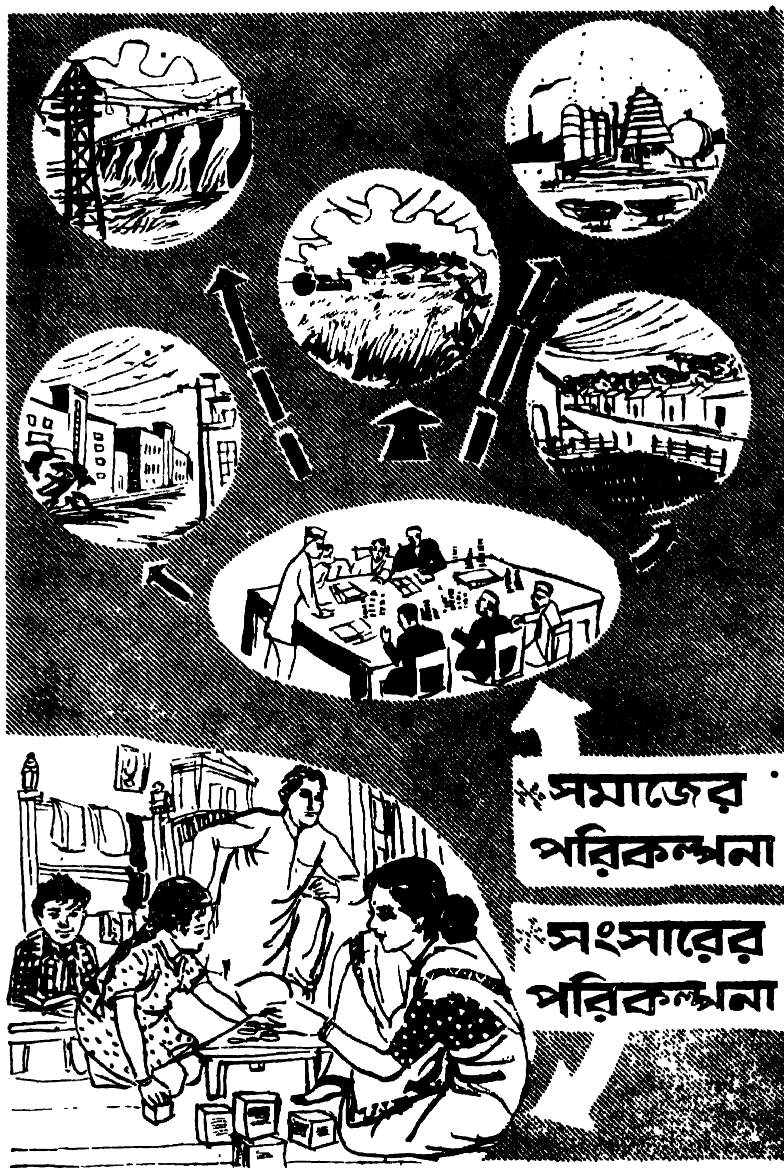
জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর শতকরা ১৪-১৫ জন লোক ভারতবর্ষে বাস করে। পৃথিবীর লোক সারিবদ্ধভাবে চলিলে ৬ জন লোকের পর একজন করিয়া ভারতীয়কে দেখা যাইবে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক 'সপ্তম' লোকটি একজন ভারতীয়। এই হিসাব হইতে সমস্যার প্রকৃত রূপ আরও পরিষ্কার হইয়া ধরা পড়িবে। পৃথিবীর সাতভাগের একভাগ হইল ভারতের জনসংখ্যা, অথচ ভারতের ভৌগোলিক স্থান মাত্র পৃথিবীর ৪০-ভাগের ১-ভাগ। সুতরাং ভারতের লোকবসতি অন্যান্য দেশের তুলনায় যে কত বেশী ঘন হইতে পারে তাহা খুব সহজ অঙ্ক কষিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান গতি যদি বজায় থাকে তাহা হইলে বর্তমানের সমস্ত লোকের খাদ্যের সংস্থান করিয়াও প্রতি বছরে প্রায় ৮০ লক্ষ করিয়া বাড়তি লোকের খাদ্য যোগান দিতে হইবে। ভারতের খাদ্য ও খাদ্যসমস্যার আলোচনাপ্রসঙ্গে (দ্বিতীয় প্রকরণ, ১৯-৪০ পৃষ্ঠা) আমরা দেখিয়াছি যে এখনই ভারতে প্রয়োজনীয় খাদ্যের ঘাটতি রহিয়াছে এবং বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিয়া তাহা পূরণ করিতে হইতেছে। ইহার উপর ৮০ লক্ষ করিয়া লোক বছরে বাড়িতে থাকিলে ভারতের খাদ্যসংকট যে কতখানি প্রকট হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

খাদ্যসমস্যা প্রথম ও প্রধান সমস্যা, কিন্তু একমাত্র সমস্যা নহে। তাহা ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা আছে। চাকরিবাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দিবে। দেখা দিতেছেও। বলিতে কি, ভারতের অধিকাংশ সমস্যাই জনসংখ্যার সহিত জড়িত। কোন সমস্যাই সহজে বা যে-কোন রকমে সমাধান করিবার উপায় নাই। পাঁচলক্ষ লোকের চাকরির সংস্থান করা হইল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচলক্ষ লোক কর্মক্ষম হইয়া চাকরির সন্ধান করিতে লাগিল। দশকোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হইল তো আরও পাঁচকোটি লোক বাড়িল। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি কোনকিছুতেই আর কুলাইয়া ওঠা সম্ভব হইল না। এইভাবে সমস্যার সমাধান না করিতে করিতে আবার নূতন নূতন সমস্যা দেখা দেয়।

সমাধান—সামাজিক পরিকল্পনা বা 'প্ল্যানিং'

এই ধরনের জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় হইল—পরিকল্পনা বা যোজনা (Planning)। ভাল করিয়া সবদিক বিবেচনা করিয়া, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া,


সমাজের
পরিকল্পনা
সংসারের
পরিকল্পনা

প্রয়োজন ও অভাব বুঝিয়া সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অগ্রগতির পরিকল্পনা রচনা করা আবশ্যক। কোন বড় কাজ ভাল করিয়া সুন্দরভাবে করিতে হইলেই 'প্ল্যানিং' প্রয়োজন।

গৃহ-পরিকল্পনা। আমরা যখন বাড়ি তৈরী করি তখন ভাল করিয়া ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়া আগে তাহার 'প্ল্যান' তৈরী করি। কতটা জায়গা, কি উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করা, কি ধরনের গড়ন ও কক্ষবিন্যাস তাহার প্রয়োজন, কত অর্থব্যয় করা হইবে ইত্যাদি নানাদিক বিবেচনা করিয়া 'প্ল্যান' রচনা করা হয়। তারপর সেই প্ল্যান অনুযায়ী গৃহটিকে রূপ দেওয়া হয়। যে-গৃহ এইভাবে প্ল্যান অনুযায়ী গঠন করা হয় তাহা যে শুধু সুন্দর হয় তাহা নহে, বিশেষ উপযোগিতার দিক হইতেও তাহা নিখুঁত হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাহা না করিয়া, কিছু না ভাবিয়া বা চিন্তা করিয়া যদি প্রথম হইতেই ইঁট দিয়া ঘর গাঁথিতে আরম্ভ করি এবং যখন যেরকম যেদিকে খুশী বা খেয়াল ঘরের পর ঘর তুলিয়া যাই, তাহা হইলে অনেক ঘরসহ একটি ইমারত হয়ত গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা কিম্ভূতকিমাকার তো হইবেই, বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কাজের উপযোগীও হইবে না। ব্যক্তিগত বসবাসের একরকম ঘর, বিদ্যালয়ের একরকম ঘর, হাসপাতালের একরকম, আফিস-আদালতের একরকম, আবার কলকারখানার একরকম। সুতরাং উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী 'প্ল্যান' করিয়া গৃহ নির্মাণ করিতে হয় এবং তাহা না করিলে সেই গৃহ ভালও হয় না, তাহার বিশেষ উপযোগিতাও নষ্ট হয়।

নগর-পরিকল্পনা। একটি গৃহ নির্মাণের জন্য যখন 'প্ল্যান' করা প্রয়োজন এবং করিলে তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখন অনেক গৃহ লইয়া একটি গ্রাম বা নগর গড়িতে হইলে আরও কত ভাল করিয়া 'প্ল্যান' করা প্রয়োজন তাহা সহজেই বোঝা যায়। গ্রামবাসী ও নগরবাসীদের যাহা প্রয়োজন হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি পরিকল্পনা করা যায়, তাহা হইলে গ্রাম ও নগর সুন্দর হইতে পারে। কেবল দেখিতে সুন্দর নহে, মানুষের বসবাসের দিক দিয়াও অনেক আরামপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। হাটবাজার, পথঘাট, নানারকমের বসতবাড়ি, উদ্যান-পার্ক, খেলার মাঠ, সাধারণ স্নানাগার ও ট্যাঙ্ক, আরাম ও বিশ্রামকেন্দ্র, আমোদ-প্রমোদকেন্দ্র, ক্লাব-সংঘ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও

হাসপাতাল, নানাজিনিসের দোকানপাট, স্কুল-কলেজ—এই ধরনের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া যদি গ্রাম ও নগর গঠন করা হয়, তাহা হইলে কে না তাহাতে বাস করিতে চাহিবে? কিন্তু বিনা পরিকল্পনায় যেসব গ্রাম ও নগর গাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে কতরকমের যে অসুবিধা তাহার ঠিক নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, বাজারহাটও হয়ত বহুদূরে আছে। সেখানে বাস করাই বিপজ্জনক। সুতরাং 'প্ল্যানিং' বা পরিকল্পনার যে কত সুবিধা এবং তাহা বর্তমান সমাজে মানুষের জীবনে যে কত প্রয়োজন, তাহা গ্রাম ও নগর পরিকল্পনার এই সামান্য আভাস হইতে বুঝিতে পারা যায়।

সমাজ-পরিকল্পনা। এইবার সমাজ-পরিকল্পনার বিশালতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা ধারণা হইবে। কয়েকজন লোকের গৃহ, কয়েকশত লোকের গ্রাম, কয়েকহাজার লোকের নগর যদি 'প্ল্যান' করিয়া গড়া যায় তবে তাহা যে কত সুন্দর ও বাসোপযোগী হইতে পারে তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। তেমনি আমাদের সমাজটিকেও যদি 'প্ল্যান' করিয়া গড়া যায় তবে তাহা সুন্দর সমাজ, উন্নত সমাজ এবং বহুসমস্যামুক্ত সমাজ হইতে পারে। গ্রাম ও নগরের তুলনায় 'সমাজ' অনেক বড়। হাজার হাজার গ্রাম ও নগর এবং কোটি কোটি মানুষ লইয়া এই 'সমাজ' গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের সমাজ যে কত বিশাল এবং কি তাহার বৈচিত্র্য, তাহা ভারতের বিপুল জনসংখ্যা এবং বিচিত্র জনগোষ্ঠী ও জাতি-উপজাতি হইতে বোঝা যায়। শুধু যে সারা পৃথিবীর সাতভাগের একভাগ লোক ভারতে বাস করে তাহা নহে, কতরকমের লোক এবং সভ্যতায় ও শিক্ষাদীক্ষায় কত উন্নত-অনুন্নত স্তরের লোক তাহার ঠিক নাই। কত ভাষা, কতরকমের বেশভূষা, কতরকমের ধর্মকর্ম ধ্যানধারণা, কতরকমের আচারপ্রথা তাহাও সহজে হিসাব করা যায় না। এতবড় সমাজের এত কোটি কোটি লোক এবং এতরকমের লোকের সমস্যারও অন্ত নাই। সুতরাং এই সমাজকে যদি মজবুত করিয়া, সুস্থ সবল সুন্দর করিয়া এবং যথাসম্ভব সমস্যামুক্ত করিয়া গড়িতে হয়, তাহা হইলে 'প্ল্যানিং' ছাড়া উপায় কি? প্ল্যানিং ছাড়া এক-পাও আমাদের সমাজে চলিবার উপায় নাই। বর্তমান যুগে মানুষের সমস্যা এত বাড়িয়াছে এবং সে সম্বন্ধে মানুষও এত সচেতন হইয়াছে যে পৃথিবীর কোন দেশেই আজ আর

প্ল্যানিং ছাড়া সমাজের উন্নতি বা সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। ভারতের মতো বড় দেশের বিশাল ও বিচিত্র সমাজে তো কোনমতেই সম্ভব নহে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক যোজনা

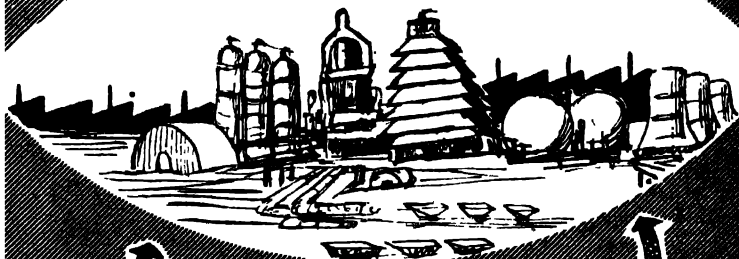
গৃহনির্মাণ ও নগরনির্মাণের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি প্ল্যানের আবশ্যকতা কি। তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কিছুটা ধারণা হইয়াছে। এইবার একটি ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইবে। সংসারের বাবা-কাকা ও অন্যান্য কর্মক্ষম আত্মীয়রা যখন বাহির হইতে টাকা রোজগার করিয়া আনিয়া মা'য়ের হাতে দেন, তখন সংসারের প্রয়োজন বুঝিয়া মা সেই টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ করেন। খাদ্যের জন্য, পোশাকের জন্য, ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য, ডাক্তার বৈদ্যের জন্য—এইভাবে নানাভাগে টাকাটিকে ভাগ করিয়া খরচ করিতে হয়। টাকাতে না কুলাইলে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রতিবেশীর কাছে ধারও করিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থভাগ করিয়া খরচ করাকে বলে 'বাজেট' (budget) করা। প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টকেও এইভাবে 'বাজেট' করিয়া তাহার আয়ের টাকা খরচ করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের আয়ের নানাদিক আছে—বহুরকমের ট্যাক্স, শুল্ক, রাজস্ব, সরকারী বাণিজ্য ইত্যাদি হইতে জাতির বা গবর্ণমেণ্টের আয় হয়। গবর্ণমেণ্ট সেই টাকা আবার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, সমাজের লোকের বিভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন খাতে ভাগ করিয়া ব্যয় করেন। বছরে বছরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে (Finance Minister) সারা ভারতের জন্য এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে রাজ্যের জন্য এইভাবে 'বাজেট' করিতে হয় পরবর্তী বছরের জন্য, এবং সেই বাজেট লোকসভায় ও বিধানসভায় যথাক্রমে আলোচিত হইবার পর পাস হয়। মা আমাদের পরিবারের জন্য যে-কাজ করেন, অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রের জন্য সেই কাজই করিয়া থাকেন।

জাতীয় যোজনা বা প্ল্যানিং (National Planning) কতকটা এই বাজেটের মতো ব্যাপার, তবে তাহার বিস্তার ও বৈচিত্র্য আরও অনেক বেশী। 'বাজেট' একবছরের জন্য করিতে হয়, কিন্তু 'প্ল্যানিং' আরও বেশী সময়ের জন্য—তিন বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর—করিতে হয়। সুতরাং প্ল্যান করার সময় আরও ভাল করিয়া বহুদিক বিচার-বিবেচনা করিয়া,

সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা

পঞ্চ বার্ষিক যোজনা

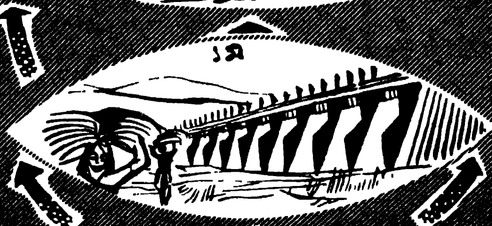
৩য়



২য়



১ম



আর্থিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

আমাদের সমস্যা

আর্থিক ক্ষমতা ও সম্পদের হিসাব করিয়া, সমগ্র জাতির ও সমাজের নানাবিধ অভাব ও প্রয়োজন যাচাই করিয়া করা হইয়া থাকে। দেশের কি কি জিনিসের অভাব আছে, সমাজের প্রয়োজন কতরকমের, কোন্ কোন্ প্রয়োজন ও অভাবের গুরুত্ব বেশী—এইসব নানাদিক দেখিয়া-শুনিয়া 'প্ল্যান' রচনা করিতে হয়। ভারত-সরকার এই ধরনের 'প্ল্যান' এখন পাঁচ বছরের জন্য রচনা করিতেছেন, সেইজন্য ইহাকে আমরা 'পঞ্চবার্ষিক যোজনা বা প্ল্যান' (Five-Year Plan) বলিয়া থাকি। পাঁচ বছরে এই প্ল্যানের কাজ শেষ হইলে আবার পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নূতন আর-একটি প্ল্যান তৈরী করা হয়। কাজটি যে কত দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা আমাদের পরিবারের কর্ত্রী মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। ছোট একটি পরিবারের সমস্ত প্রয়োজন হিসাব করিয়া মিটাইতে তাঁহাকে কত দুশ্চিন্তা ও ঝঞ্ঝাটই না ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ পরিবার লইয়া যে বিশাল ভারতরাষ্ট্র, তাহার জন্য 'প্ল্যান' করা কত কঠিন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

তিনটি পঞ্চবার্ষিক যোজনা। যতদিন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল ততদিন তাহার অভাব-অনটন ও প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। বিদেশী শাসকরা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া দেশের অন্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাইত না। ভারত স্বাধীন হইবার পর (১৯৪৭) প্রথমেই দেশের অভাব ও সমস্যাগুলি দেশবাসীর সামনে স্বভাবতঃই বড় হইয়া দেখা দেয় এবং সেগুলি সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। প্ল্যানিং-এর আবশ্যকতা তাহার আগে হইতেই দেশনেতারা অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ইহাব বাস্তবতা আরও প্রকট হইয়া ওঠে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীগুণী ও বহুদর্শী ব্যক্তিদের লইয়া একটি 'প্ল্যানিং কমিশন' (Planning Commission) গঠন করা হয় এবং তাঁহাদের উপর একটি প্ল্যানের খসড়া রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে 'প্ল্যানিং কমিশন' প্ল্যানের খসড়া-সহ একটি রিপোর্ট দাখিল করেন এবং তাহা বাহিরের লোকের আলোচনার জন্য প্রকাশ করা হয়। আলোচনার পর পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া এই 'প্ল্যান' কার্যকর করার জন্য গৃহীত হয় ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে। ইহা আমাদের 'প্রথম

পঞ্চবার্ষিক যোজনা' (১৯৫১-৫৬) । ইহার পর আরও দুইটি 'পঞ্চবার্ষিক যোজনার' কাজ হইয়াছে এবং হইতেছে—দ্বিতীয় যোজনা (১৯৫১-৫৬) এবং তৃতীয় যোজনা (১৯৫১-৫৬) । বর্তমানে তৃতীয় যোজনা অনুযায়ী কাজ চলিতেছে।

যোজনার লক্ষ্য। ভারতের নূতন সংবিধানে ও দিগ্‌দর্শী নীতিতে বলা হইয়াছে যে জাতীয় সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা, অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে। আরও একটি বড় কথা বলা হইয়াছে যে উন্নয়নের কাজ এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে গ্রাম ও নগরের মধ্যে, কিংবা গ্রামবাসীর ও নগরবাসীর মৌলিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কোন অসমতা না থাকে এবং দেশের উৎপন্ন সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের আয়ত্তে না আসে। অর্থাৎ আর্থিক বৈষম্য ও অসমতা যেন না বাড়িয়া ক্রমে কমিতে থাকে। প্রধানত এই লক্ষ্যের দিকে নজর রাখিয়াই 'প্ল্যান' তৈরী করা হইয়াছে। লক্ষ্যগুলি আরও পরিষ্কার করিয়া এইভাবে বলা যাইতে পারে:

১। জাতীয় সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি

২। জাতীয় শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন।

৩। কাজকর্মের সুযোগ ও সংস্থান।

৪। অর্থের ও আয়ের ব্যবধান দূর করিয়া সামাজিক সাম্য স্থাপন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা প্রথম অভিজ্ঞতার স্তরে ছিল বলিয়া সবদিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা পরীক্ষা করা হইয়াছে। তবু প্ল্যান করিয়া কাজ করিলে সবক্ষেত্রেই যে কিছুটা উন্নতি হইতে পারে তাহা প্রথম যোজনার ফলাফল হইতেও বুঝিতে পারা যায়। প্রথম যোজনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল তাহা নির্দেশ করা হইতেছে:

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	বৃদ্ধির পরিমাণ
খাদ্যশস্য (লক্ষ টন)	: ৫৪০	: ৬৪৯	: + ১০৯
বৈদ্যুতিক শক্তি (লক্ষ কিলওয়াট)	: ২৩	: ৩৪	: + ১১
সেচ ব্যবস্থা (লক্ষ একর)	: ৫১০	: ৬৫০	: + ১৪০
ইস্পাত (লক্ষ টন)	: ৯.৮	: ১২.৮	: + ৩

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	বৃদ্ধির পরিমাণ
ঢালা লোহা (লক্ষ টন)	১৫.৭	১৭.৯	+ ২.২
লোকোমোটিভ	৩	১৭৯	+ ১৭৬
হাসপাতালের বেড	১১৩০০০	১৩৬০০০ (১৯৫৪-৫৫)	
প্রাথমিক বিদ্যালয় (হাজার)	২০৯.৭	২৮০	+ ৭০.৩
বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১৭৫১	১৫,৮০০	+ ১৪,০৪৯

এখানে কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি নির্দেশ করা হইল। এই অগ্রগতি পাঁচ বছরের মধ্যে খুব যে উল্লেখযোগ্য তাহা নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, অর্থনীতিক্ষেত্রে যেখানে উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল, সেইখানেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সেই ক্ষেত্রটি হইল—লোহাইস্পাত, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি গুরুশিল্পের ক্ষেত্র। এই গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের দিকে প্রথম যোজনায় খুব বেশী দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ আর্থিক। গুরুশিল্প (heavy industries) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। একটি বড় লোহা-ইস্পাতের কারখানা ভাল করিয়া গড়িতে হইলে কোটি কোটি টাকা লাগে। তাহা ছাড়া যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা এবং বৈদেশিক সহযোগিতারও প্রশ্ন আছে। প্রথম যোজনার সময় ইহার কোনটাই সহজলভ্য ছিল না এবং অভিজ্ঞতাও তখন সামান্যই ছিল, এই কারণে খুব উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নতি কিছু প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার মধ্যে সম্ভব হয় নাই।

শিল্পোন্নয়ন নীতি ১৯৫৬

প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা শেষ হইবার পর ভারতসরকার সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া শিল্পোন্নয়নের একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতি একটি প্রস্তাবাকারে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই Industrial Policy Resolution 1956 (৩০ এপ্রিল ১৯৫৬) নামে খ্যাত। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই শিল্পোন্নয়ন প্রস্তাবটি একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব বা নীতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের অর্থনীতিক অগ্রগতির ধারার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়

পঞ্চবার্ষিক যোজনার প্রধান স্তম্ভ হইল ১৯৫৬ সালের এই শিল্পনীতি। এই শিল্পনীতিতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল—

১। ভারতের আর্থিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শিল্পায়নের (industrialisation) গতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২। শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গুরুশিল্পের (heavy industries) ও যন্ত্রনির্মাণশিল্পের (machine-making industries) প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। শিল্পক্ষেত্রের এই দিকটিতে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

৩। রাষ্ট্রের আয়ত্ত শিল্পক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে।

৪। শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্যোগকেও যতদূর সম্ভব এই নীতি অনুযায়ী উৎসাহ দিতে হইবে। শিল্পের ব্যক্তিগত মালিকরা যদি রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির মূল আদর্শ মানিয়া চলেন তাহা হইলে সরকারী সহযোগিতা লাভে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন না।

৫। এই শিল্পনীতি পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক যোজনার ভিত্তি হইবে এবং ভারতের অর্থনীতিক বনিয়াদকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। ভারতের দ্রুতবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থান (employment) এইভাবে বেশী করিয়া করা সম্ভব হইবে এবং তাহা না হইলে সমস্ত কর্মক্ষম লোকের জন্য উপযুক্ত কর্মের সংস্থান করা সম্ভব হইবে না।

৬। এই শিল্পনীতি অনুসরণ করিলে যে দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশের সম্পদও অনেক বাড়িবে। কিন্তু সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে এই আর্থিক সম্পদ দেশের মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত না হয় এবং সমাজে শ্রেণীগত ব্যবধান না বাড়াইয়া তোলে।

শিল্পনীতির এই ঘোষণা হইতে বুঝিতে পারা যায় ভারত-সরকারের উদ্দেশ্য কি। লোহা-ইস্পাতের মতো গুরুশিল্পের ও যন্ত্রনির্মাণশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার না হইলে কোন দেশের প্রকৃত শিল্পোন্নতি হইতে পারে না। আধুনিক শিল্প মাত্রই যন্ত্রচালিত শিল্প, সুতরাং শিল্পোন্নতির জন্য সবার আগে প্রয়োজন যন্ত্রপাতির। এই যন্ত্রপাতির জন্য যদি বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে শিল্পক্ষেত্রে কখনই স্বাবলম্বী হওয়া যায় না। কাজেই নিজের দেশে আগে যন্ত্রনির্মাণের ব্যবস্থা করিতে হয়। এমন কোন

যন্ত্র বা হাতিয়ার নাই যাহা লোহা-ইস্পাত ছাড়া তৈরী করা যায়। সুতরাং যন্ত্র গড়িতে হইলে নানারকমের লোহা ও ইস্পাত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা প্রয়োজন। ইহার কোনটাই ছোটখাট শিল্পকারখানার কাজ নহে, সবাই বড় বড় শিল্পকারখানায় উৎপাদন করিতে হয়। সেইজন্য এইগুলিকে ভারী শিল্প বা গুরুশিল্প বলে।

এই গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিল্পায়নের কোন ক্ষেত্রেই এক পাও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। একটি কাপড়ের কল বসাইতে হইলে প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতি। যে-কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করিতে হইলে আগে যন্ত্রপাতি চাই। সুতরাং যন্ত্র-উৎপাদন-শিল্প এবং তাহার মূল উপকরণ লোহা-ইস্পাতের শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হইলে অন্য কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব নহে। এই জন্যই ১৯৫৬ সালের শিল্পায়ন-নীতিতে গুরুশিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে বেশী। এইসব গুরুশিল্পের কারখানায় যে-সব জিনিস উৎপন্ন হয় তাহা কাপড় চিনি কাগজ ইত্যাদির মতো সোজাসুজি মানুষে ভোগ করিতে পারে না, অথচ এই ধরনের ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের কাজে লাগে। যে-সব বস্তু আমরা সোজাসুজি ভোগ করি—খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি—সেগুলিকে 'ভোগ্যবস্তু' (consumer goods) বলে। যে-সব বস্তু—যেমন ইস্পাত ইঞ্জিন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি—অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনের কাজে লাগে সেগুলিকে আমরা 'উৎপাদক-বস্তু' (producer goods) বলি। উৎপাদক-বস্তু না থাকিলে যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন করা যায় না। সেই জন্য আসল অর্থনীথিক অগ্রগতি নির্ভর করে উৎপাদক-বস্তুর প্রাচুর্যের উপর।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা

এই নূতন শিল্পনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান রচনা করা হইয়াছে। প্রথম যোজনায় যেখানে বৃহৎ ও মধ্যস্তরের শিল্পের জন্য ১৪৮ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় যোজনায় সেখানে ৬১৭ কোটি টাকা (প্রায় পাঁচগুণ বেশী) নিয়োগ করা হয়। তৃতীয় যোজনায় গুরুশিল্প ও খনিজের খাতে ২৫০০ কোটি টাকা নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় যোজনার চারগুণের বেশী এবং প্রথম যোজনার প্রায় বিশগুণ। বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি (power)

উৎপাদনের খাতে প্রথম যোজনায় ২৬০ কোটি টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় যোজনায় ৪২৭ কোটি টাকা (প্রায় দ্বিগুণ) নিয়োগ করা হয়। তৃতীয় যোজনায় এই শক্তি-উৎপাদন খাতে ৯৭৫ কোটি টাকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় যোজনার দ্বিগুণের বেশী এবং প্রথম যোজনার প্রায় চারগুণ। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে, তৃতীয় যোজনায় বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে যে ২৫০০ কোটি টাকা নিয়োগ করা হইবে তাহার প্রায় অর্ধেক ১২০০ কোটি টাকা ধাতুশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই দুইটি শিল্প গুরুশিল্পের মধ্যে সর্বপ্রধান, এই কারণে এই দুইটি শিল্পের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (এই বিষয়ে আগে আরও আলোচনা করা হইয়াছে—সপ্তম প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যায়)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনার এই মূলধন নিয়োগের পদ্ধতি হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে ভারত-সরকার ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপ দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা সার্থক হইলে শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুগোপযোগী অগ্রগতি ভারতের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং সমগ্র এসিয়ার মধ্যে বিশিষ্ট শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া তাহার পক্ষে প্রতিপত্তি লাভ করাও অসম্ভব হইবে না।

ভারতের সামাজিক অগ্রগতি। ১ এপ্রিল ১৯৬১ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার ১০ বছরের উন্নয়নের কাজ শেষ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কোন্ দিকে কি উন্নতি হইয়াছে সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার।

এই ১০ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি বাড়িলেও প্রত্যেক কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির গড়পড়তা আয় বাড়িয়াছে ১৬% অর্থাৎ আয় ১০০ টাকা ইইলে তাহা ১১৬ টাকা হইয়াছে। কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন বাড়িয়াছে প্রায় ৪১% এবং শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে প্রায় ১০০%, অর্থাৎ দ্বিগুণ। কয়েকটি প্রধান ফসলের একর হিসাবে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছে, যেমন চালের উৎপাদন—একরপ্রতি ৬৯৪ পাউণ্ড হইতে প্রায় ৮০৭ পাউণ্ড পর্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার উৎসাহ দিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতের কৃষকদের পক্ষে একরপ্রতি ৩০০০ হইতে ৯০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত চাল উৎপাদন করা সম্ভব। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী চাল

৩২

উৎপাদন করে জাপানী কৃষকরা, গড়ে একরপ্রতি প্রায় ৪০০০ পাউণ্ড। ভারতের কৃষকদের চাল উৎপাদনের সাধারণ হার গড়ে একরপ্রতি ১০০০ পাউণ্ডের কম হইলেও প্রতিযোগিতার প্রেরণা দিয়া যখন দেখা গিয়াছে যে তাহা ৩০০০-৯০০০ হইতে পারে, তখন কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন(yield) যে আমাদের যথেষ্ট বাড়িতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ১০ বছরে (১৯৫১-৫৬) শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন গড়ে প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়াছে প্রায় আড়াইগুণ। নানারকমের যন্ত্রপাতির উৎপাদনও অনেক বাড়িয়াছে। ১৯৫১ সালে মাত্র ১৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৬০ সালে ইহা ১৬০ কোটি টাকার হইয়াছে। বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের উৎপাদন ৭ কোটি টাকা হইতে প্রায় ৪৬ কোটি টাকা পর্যন্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ছয়গুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। আগে যে-সমস্ত জিনিস ভারতে তৈরী হইত না, তাহাও এখন তৈরী করা হইতেছে—যেমন বয়েলার, মিলং মেশিন, ডিজেল রোড-রোলার, সালফা ও অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ, ডি. ডি. টি., নিউজ প্রিণ্ট কাগজ, লোকোমোটিভ ও কোচ, অটোমোবাইল ও বিমান ইত্যাদি। শিল্পোৎপাদনের এই গতি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভারত কোন্ পথে পা বাড়াইয়াছে। বড় বড় মূলশিল্প ও গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠার দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহা ছাড়া যন্ত্রযুগে কোন দেশের পক্ষে আত্মনির্ভর অর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব নহে।

শিল্পোন্নতি করিতে হইলে যন্ত্রপাতি চালাইবার উপযোগী বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা প্রয়োজন। ইহার জন্য নূতন বৈদ্যুতিক থার্মাল স্টেশন স্থাপন করিয়া এবং নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। গত ১০ বছরে প্রায় আড়াইগুণ বৈদ্যুতিক শক্তি বাড়িয়াছে ২৩ লক্ষ কিলওয়াট হইতে প্রায় ৫৭ লক্ষ কিলওয়াট হইয়াছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গত ১০ বছরে ৩৬৮৭টি গ্রাম ও নগর হইতে ২৩০০০ গ্রাম ও নগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা ভারতের মোট গ্রাম ও নগরের সামান্য একটি অংশ মাত্র, তবু কিছুই না হওয়া অপেক্ষা অন্তত কিছু যে হইয়াছে ইহাই আশার কথা।

বৈদ্যুতিক শক্তি ছাড়া শিল্পোন্নত দেশের জন্য যানবাহন ও যোগাযোগ-

ব্যবস্থার প্রসার একান্ত প্রয়োজন এবং সেইজন্য যতদূর সম্ভব এই ব্যবস্থা করারও চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১২০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন করা হইয়াছে এবং ১৩০০ মাইল একমুখী রেলপথ ডবল বা দ্বিমুখী করা হইয়াছে। লোকোমোটিভের সংখ্যা ২৫% বাড়িয়া ১০,৬০০ হইয়াছে। ডাকঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং টেলিফোন প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে।

তৃতীয় যোজনার লক্ষ্য। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কথা মনে রাখিয়া তৃতীয় যোজনায় খাদ্যফসল বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আগামী ৫ বছরে (১৯৬১-৬৬) খাদ্যফসলের উৎপাদন অন্তত দ্বিগুণ গতিতে বৃদ্ধি করা হইবে স্থির হইয়াছে। ইহা ছাড়া কারখানাশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনার মিলিত অগ্রগতির প্রায় সমান বলা চলে। তৃতীয় যোজনার কয়েকটি বিশেষ সিদ্ধান্ত হইতে তাহা বোঝা যাইবে :

মোট মূলধন

তৃতীয় যোজনায় অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য মোট ১০,৪০০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইবে স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকার মূলধন গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিবেন এবং ৪১০০ কোটি টাকা শিল্পপতিরা ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগ করিবেন। আগেকার দুইটি পঞ্চবার্ষিক যোজনায় মোট ১০,১১০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল। শুধু তৃতীয় যোজনাতে ৫ বছরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা আরও ৩০০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ গত ১০ বছরে (১৯৫১-৬১) যে টাকা ভারতের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির খাতে ব্যয় করা হইয়াছিল, আগামী ৫ বছরে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে।

কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য

ক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রত্যেক কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির আয় অন্তত ১৭% বাড়ানো হইবে।

খ। ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষার

ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রামে সম্ভব না হইলেও গ্রামের কাছাকাছি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

গ। '৫০০০ লোকের বাস আছে এরকম সমস্ত টাউনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ১০০ গ্রামের মধ্যে অন্তত ৫টি গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো দিতে হইবে।

ঘ। ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের জন্য নূতন কাজের ব্যবস্থা করা হইবে।

ঙ। অন্তত ৩০% কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

চ। আরও ২ কোটি একর নূতন জমিতে সেচব্যবস্থা করা হইবে।

ছ। অন্তত ৭০% শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো হইবে।

জ। ইস্পাত উৎপাদন ৬৯ লক্ষ টন পর্যন্ত করিতে হইবে এবং ১ কোটি ৯২ লক্ষ টন পর্যন্ত উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ঝ। যন্ত্রনির্মাণশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসারে বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে।

ঞ। রাসায়নিক সার উৎপাদন সাতগুণ বাড়াইতে হইবে।

ট। বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বিগুণ বাড়াইতে হইবে।

ঠ। রেলের মালবহন ক্ষমতা ৫৯% বাড়ানো হইবে।

তৃতীয় যোজনার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না, দেওয়ার প্রয়োজনও নাই। যোজনার মূল লক্ষ্য কি এবং ভারতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির ধারা কি, তাহা বুঝিবার পক্ষে যাহা জানা প্রয়োজন তাঁহাই শুধু এখানে উল্লেখ করা হইল।

তৃতীয় যোজনার মোট মূলধন ও প্রধান লক্ষ্যগুলি বিচার করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতিক আত্মনির্ভরতা যোজনার উদ্দেশ্য। মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, মোট মূলধনের প্রায় ২০% কৃষি ও সেচের জন্য, ২৯% শিল্পায়নের জন্য এবং ১৬% সমাজকল্যাণকর কাজের (social services) জন্য নিয়োগ করা হইবে। শিল্পায়নের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, কারণ সর্বক্ষেত্রে শিল্পোন্নতি না হইলে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়া যায় না। শিল্পায়নের অগ্রগতির উপর কৃষির উন্নতিও নির্ভর করে। বর্তমানে ভারতে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষি-কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার না করিলে উপায় নাই। কোথা হইতে এইসব

যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে? ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার, কম্বাইন ইত্যাদি? বাহির হইতে যদি এইসব কৃষির যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়, তাহা হইলে অর্থনীতিক্ষেত্রে কি করিয়া আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব হইবে? সুতরাং শিল্পায়ন ও শিল্পের উন্নতি সকলের আগে প্রয়োজন, কৃষির উন্নতিও তাহার উপর নির্ভর করে। এইজন্য যদিও ভারতে কৃষিসমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা, তাহা হইলেও ভারত-সরকার প্রত্যেকটি যোজনায় কৃষির উন্নতির দিকে বিশেষ নজর রাখিয়াও শিল্পের অগ্রগতির জন্য বেশী মূলধন নিয়োগ করা সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার উপর গুরুত্বও দিয়াছেন বেশী।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি

ভারত স্বাধীন হইবার পর সাধারণ লোকের যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে খুবই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। তাহার আগে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ভারতের স্থান ছিল সকলের নিচে। যতরকমের রোগব্যাধি ও খারাপ রোগ আছে, তাহাদের দৌরাত্ম্য ভারতেই ছিল সবচেয়ে বেশী। প্রথমত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে লোকের স্বাস্থ্যের মূলশক্তি ক্ষয় হইয়া যাইত, এবং স্বভাবতই ক্ষীণ-জীবী দুর্বল লোক সমস্ত ব্যাধির আকর হইয়া উঠিত। লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরিত, কালাজ্বরে মরিত, কলেরায় মরিত, অন্যান্য রোগের তো কথাই নাই। না ছিল ডাক্তারবৈদ্য, না ছিল ঔষধপত্র, না ছিল চিকিৎসার ব্যবস্থা। গ্রামাঞ্চলে সামান্য একজন মেডিক্যাল স্কুলে পাশ করা এল. এম. এফ. ডাক্তার খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, অশিক্ষিত হাতুড়েরা এবং জাদুমন্ত্র ও কবচ-মাদুলির ব্যবসায়ীরা লোকের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিত। শিশুমৃত্যু, মায়ের মৃত্যু, অকালমৃত্যু—এইগুলি ছিল ভারতের বড় কলঙ্ক।

এখন আর ভারতের এই কলঙ্কের দিন নাই। গত দশ-পনের বছরের মধ্যে ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সবদিক দিয়া আশ্চর্য উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতে মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ২৫জন (২৫.৯), ১৯৫৬ সালে ইহা হইয়াছে হাজারকরা ২১ জন (২১.৬)। শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১৯৫১ সালে হাজারকরা ১৫৪ জন (১৫৪.৬), ১৯৬১ সালে হইয়াছে ১৩৫ জন।

প্রসূতি-মৃত্যুর হার ছিল ১৯৩৮ সালে হাজারকরা ২০ জন, ১৯৫১ সালে হইয়াছে ১২ জন (১২'৪)।

	১৯৫১ (প্রতি হাজারে)		১৯৫১
মৃত্যু :	২৫	:	২১
শিশু মৃত্যু :	১৫৪	:	১৩৫
প্রসূতিমৃত্যু :	২০ (১৯৩৮ সন)	:	১২

যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস সেখানে হাজারকরা একজন করিয়া মৃত্যুর হার কমিয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। হাজারে একজন মানে একলক্ষে ১০০ জন এবং এককোটিতে ১০,০০০ জন, ৪০ কোটিতে গড়ে ৪০,০০০ জন। অর্থাৎ দশ বছর আগে নানা রোগব্যাধিতে যাহারা মরিয়া যাইত সেরকম লক্ষ লক্ষ লোক আজ প্রাণে বাঁচিতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শিশু আছে, প্রসূতিও আছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে ক্রমেই দ্রুতহারে বাড়িতেছে তাহার একটি বড় কারণ হইল মৃত্যুর হার কমিয়া যাওয়া। মাত্র ১০ বছর আগে ১৯৫১ সালে ভারতজনের গড়পড়তা পরমায়ু ছিল ৩২ বছর, বর্তমানে ইহা বাড়িয়া ৪২ বছর হইয়াছে। মাত্র ১০ বছরে দশ বছর পরমায়ু বৃদ্ধি হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই পরমায়ু-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সাধারণ ভারতজনের জীবনীশক্তি বৃদ্ধির লক্ষণ। দশবছরে জনস্বাস্থ্যের এই অগ্রগতি বাস্তবিকই চমকপ্রদ।

স্বাস্থ্যের সমস্যা। তাই বলিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে, এমন চিন্তা করিবার কারণ নাই। স্বাস্থ্য-সমস্যার অন্ত নাই এবং তাহা সমাধান করাও সহজসাধ্য নহে। মৃত্যুর হার কমিয়াছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে এবং সাধারণের জীবনীশক্তি বাড়িলে হয়ত আরও কিছু কমিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব নহে। কয়েকটি রোগব্যাধির প্রকোপ কমিয়াছে, হয়ত দুই-চারটি ব্যাধি একেবারে নির্মূল করাও সম্ভব হইবে, কিন্তু মানুষকে একেবারে যাবতীয় রোগব্যাধিমুক্ত করা সম্ভব হইবে না। সেই সব রোগের আধিক্য বা প্রাবল্য কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ডাক্তারবৈদ্য, চিকিৎসাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদির সংখ্যা আরও অনেক বাড়াইতে হইবে। ঔষধপত্র



মা ও শিশুর স্বাস্থ্যশ্রী

সমস্ত নিজেদের দেশে তৈরী করার এবং সুলভ মূল্যে তাহা সাধারণের সহজ-লভ্য করার চেষ্টা করিতে হইবে। রোগের কেবল চিকিৎসা হইলেই চলিবে না, তাহার প্রতিষেধের (Prevention) ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কথায় বলে 'Prevention is better than cure'—চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ অপেক্ষা প্রতিষেধ অনেক ভাল। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ইহা আদর্শ নীতি। ক্ষয়রোগ ও কলেরায় আমাদের দেশে বহু লোকের মৃত্যু হয়। আজকাল এই

দুইটি ব্যাধির চিকিৎসার অনেক ঔষধপত্র ও ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাধিগুলির প্রতিষেধ সম্ভব। জীবনধারণের পরিবেশ যদি স্বাস্থ্যকর হয়, পরিচ্ছন্ন হয়, পুষ্টিকর খাদ্য যদি লোকের পক্ষে খাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে ক্ষয়রোগ ও কলেরার মতো ব্যাধি দেশ হইতে নির্মূল করা কঠিন নহে। 'ইনজেকশন' দিয়া যে কাজ হইবে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া। বহু জায়গায় উত্তম পানীয় জলেরই ব্যবস্থা নাই। অথচ প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ছাত্রদেরও জানা আছে যে দূষিত পানীয় জল কতরকমের রোগব্যাধির কারণ। সুতরাং ভারতের প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে উত্তম পানীয় জলের সরবরাহ করাও এক বৃহৎ সমস্যা এবং স্বাস্থ্যের সহিত তাহার সম্পর্কও প্রত্যক্ষ। এরকম আরও সমস্যা আছে। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য তৃতীয় যোজনায় ৩৪২ কোটি টাকা স্বাস্থ্যোন্নতি খাতে ব্যয় করা হইবে ঠিক হইয়াছে এবং ইহা দ্বিতীয় যোজনার প্রায় ৫০% বেশী। কিভাবে ইহা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজে লাগানো হইবে তাহার আভাস দেওয়া হইতেছে :

স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা প্রথম হইতেই ভারত-সরকারের লক্ষ্য ছিল। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি (health-centres) হইবে জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির প্রাথমিক ভিত্তি। কেন্দ্রগুলিতে অন্তত ৪টি হইতে ৬টি করিয়া হাসপাতাল-বেড থাকিবে, এবং একজন শিক্ষিত ডাক্তার, নার্স-ধাত্রী ও স্যানিটেরিয়ান থাকিবেন। প্রথম যোজনায় সামান্য কয়েকটি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় যোজনার শেষে প্রায় ২৮০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করা হয়। তৃতীয় যোজনায় ইহা বাড়াইয়া ৫০০০ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

গ্রাম ও গ্রামবাসীর সংখ্যার তুলনায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা যে খুব বেশী তাহা নহে। একেবারে গ্রামাঞ্চলে যেখানে কোনরকম চিকিৎসাদির ব্যবস্থা ছিল না, প্রায় বিনা চিকিৎসায় অসুখ-বিসুখে সকলকে ভুগিতে হইত, সেখানে ইহা যৎসামান্য হইলেও ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু এরকম লক্ষাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করিতে না পারিলে গ্রামের লোকের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নহে। তাহা করার বড় অসুবিধা হইতেছে শিক্ষিত ডাক্তাররা গ্রামের দিকে যাইতে রাজী হন না, শহরেই থাকিতে চান। সেইজন্য

ডাক্তারদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়া গ্রামে পাঠাইবার চেষ্টা করা হইতেছে এবং আশা করা যায় ক্রমে এই অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে।

তৃতীয় যোজনায় নানারকম রোগব্যাধির প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে ম্যালেরিয়া ও বসন্ত (small pox) রোগের উপর, কারণ এই ব্যাধি দুইটি ভারতের একটি চিরন্তন সমস্যা বলা চলে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার। ১৯৫৩ সাল হইতে ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের জন্য একটি বিরাট পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় যেখানে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোক ভুগিত ও মরিত, এখন সেখানে তাহা কমিয়া ১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে যদি ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ এতদূর কমানো সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এদেশকে সম্পূর্ণ ম্যালেরিয়ামুক্ত করা সম্ভব হইবে।

বসন্তরোগের প্রতিকার। টিকা (vaccination) নেওয়া আমাদের দেশের লোকের এখনও সংস্কার আছে এবং ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন নহে। এই সংস্কার ও জড়তা কাটাইয়া জনসাধারণের মধ্যে টিকার প্রচলনের চেষ্টা করা হইতেছে। আগের তুলনায় বসন্তের প্রকোপ অবশ্য অনেক কমিয়াছে, তবে এখনও পাঁচ-ছয় বছর অন্তর ইহা প্রবল মহামারীরূপে দেখা দেয়। তৃতীয় যোজনায় ঠিক হইয়াছে যে পরবর্তী মহামারীর আগেই যাহাতে ভারতের সমস্ত লোককে টিকা দেওয়া যায়।

ক্ষয়রোগ ও যক্ষ্মা। ১৯৫৮ সালে ভারতের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল দেশব্যাপী যক্ষ্মারোগের একটি সার্ভে করেন। তাহাতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছে বা ভুগিতে পারে এরকম সম্ভবনা আছে। আরও দেখা যায় যে ৪৫ বছর বয়সের পর এই রোগ লোকের বেশী হইয়া থাকে। ১৯৪৮ সাল হইতে বি. সি. জি. টিকার সাহায্যে এই রোগ প্রতিষেধের চেষ্টা করা হইতেছে। দ্বিতীয় যোজনার শেষে প্রায় ১২ কোটি লোককে এই টিকা দেওয়া হয় এবং তৃতায় যোজনায়

আরও ১০ কোটি লোককে দেওয়া হইবে ঠিক হইয়াছে। যক্ষ্মারোগের সেনেটোরিয়াম, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বেডসংখ্যাও অনেক বাড়ানো হইয়াছে :

	১৯৫০		১৯৬০
সেনেটোরিয়াম :	৪৯	:	৭১
হাসপাতাল :	৩৫	:	৭০
ক্লিনিক :	১১০	:	২২৩
বেড :	১০,৩৭১	:	২৫,০০০

তৃতীয় যোজনায় ইহা আরও বেশী বাড়ানো হইবে ঠিক হইয়াছে।

এইরকম প্রত্যেকটি ব্যাধির প্রতিকারের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের দ্বারা প্রতিকার। এই প্রতিকারের নিশ্চয় প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমস্ত প্রতিকারের (রোগব্যাধির) শ্রেষ্ঠ প্রতিকার হইতেছে প্রতিষেধক। প্রতিষেধের জন্য প্রযোজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাঁটি নির্ভেজাল খাদ্য। সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এদিকে ভারত-সরকার বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভারতের জাতীয় কলঙ্ক—ভেজাল খাদ্য

ভারতের সবচেয়ে বড় জাতীয় কলঙ্ক হইতেছে 'ভেজাল খাদ্য'। পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে ভারতের মতো এরকম ভেজাল খাদ্যের অখণ্ড প্রতিপত্তি নাই। সেইজন্য ইহাকে 'জাতীয় কলঙ্ক' বলিতেছি। ১৯৫৪ সালে ভারত-সরকার ভেজাল খাদ্য নিবারণের জন্য আইন পাশ করেন। তাহাতে ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায়ীদের কঠোর দণ্ড দেওযার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এই আইন খাতা-পত্রেই এখনও পর্যন্ত আছে এবং যেভাবে ইহার প্রয়োগ করা হয় কার্য-ক্ষেত্রে তাহা আদৌ কার্যকর বলিয়া মনে হয় না। ভেজালদাররা দুইচারশত টাকা জরিমানা দিয়া বেকসুর খালাস হইয়া যায় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে আবার খাদ্যে ভেজাল দিতে আরম্ভ করে। কারণ জরিমানার টাকা তাহাদের এক-ঘণ্টার আয়। যাহারা চালে কাঁকর মেশায়, আটাময়দায় অখাদ্য বীজের গুঁড়া দেয়, দুধ মাখন ঘি প্রভৃতি কোন খাদ্যের আসলটুকু রাখে না, এমন কি শিশুর খাদ্যে ও ঔষধপত্রে পর্যন্ত মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ মিশাইতে কুণ্ঠিত হয় না,

তাহাদের আদালতে আনিয়া দিনের পর দিন আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করা এবং অবশেষে জরিমানা করা নিতান্তই প্রহসন বলিয়া মনে হয়। বস্তুত আমাদের দেশে ভেজালদারদের সংখ্যা প্রতিদিন যে বাড়িয়া যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড। এবিষয়ে ভারত-সরকারের আরও অনেক বেশী সজাগ হওয়া প্রয়োজন এবং আরও অনেক কঠোরভাবে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। যতদিন ভেজাল খাদ্যের কলঙ্ক দূর করা সম্ভব হইবে না, ততদিন জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির বহু পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইবে।

এই বিষয়ে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকেরও সামাজিক কর্তব্য আছে। ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায়ীদের সামাজিকভাবে একঘরে করিলে বা বয়কট করিলে খুব ভাল ফল হইতে পারে। অনেক সময় আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করি। তাহার ফলেও দুষ্ট লোকেরা আস্কারা পায় এবং সাধারণ লোকের স্বভাবশৈথিল্যের সুযোগ লইয়া নিজেদের কুকাজ হাসিল করে।

শিক্ষাসমস্যা

শিক্ষার অগ্রগতি। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেমন নানাদিকে ভারতের খুবই বিস্ময়কর অগ্রগতি হইয়াছে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহাই অনেকটা হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহা আরও দ্রুত হইয়াছে কারণ শিক্ষার প্রতি লোকের মনোভাব, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধ, শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদির আমূল-পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তন হইয়াছে ভারত স্বাধীন হইবার পর। জীবনযাত্রার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। এই-সব কারণে অতি সাধারণ লোকের কাছেও আজ শিক্ষার সমাদর বাড়িয়াছে, মূল্য ও মর্যাদাও বাড়িয়াছে। সাধারণ চাষী, নিরক্ষর কারিগর সকলেই আজ তাহাদের সন্তানদের শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত। তাহা ছাড়া শিক্ষা কেবল আজ ছেলেদের জন্য নহে, মেয়েদের জন্যও যে সমান প্রয়োজন, এই বোধও সকলের হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আজ কোন পার্থক্য নাই, সকলরকমের শিক্ষাতেই আজ ছেলেমেয়েদের অধিকার সমান। প্রতিভা ও যোগ্যতার দিক দিয়া মেয়েরা যে ছেলেদের তুলনায় কোনদিক দিয়াই

১৭-২৩ বছর

১ লক্ষ

৪ ১৯৫০-৫১



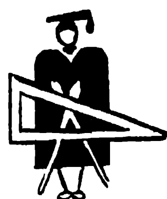
১০ ১৯৫০-৫১

সাহিত্য
বিজ্ঞান
কমার্স

১৫ ১৯৫১-৫৬

১ হাজার

৪৬ ১৯৫০-৫১



১৫২ ১৯৫০-৫১

ইঞ্জিনিয়ারিং
টেকনিকাল
ডাক্তারী

২১৫ ১৯৫১-৫৬

উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি : ১৯৫০-৬৬

খাটো নহে, আজ তাহা শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেয়েরা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছে ও করিতেছে।

এইসব কারণে শিক্ষার তাগিদ আজ স্বাধীন ভারতে অনেক বেশী বাড়িয়াছে। আগে ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্ধেকের বেশী বালক-বালিকার প্রাথমিক অ-আ ক-খ শিক্ষারই কোন ব্যবস্থা ছিল না। শতকরা ৫ জন ছেলেমেয়ের মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ হইত এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষালাভ শতকরা ১ জনের ভাগ্যে কোনরকমে ঘটিত। অর্থাৎ শিক্ষা ছিল তখন বিত্তবান ও বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তের অধিকারক্ষেত্র, সাধারণ লোক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না, তাহাদের আর্থিক সংগতি ও উৎসাহ কোনটাই ছিল না। বর্তমানে শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা আর নাই। শিক্ষার যে কতদূর পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কয়েকটি তথ্য হইতে বোঝা সহজ হইবে।

দশ বছর আগে যত বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পাইত, তাহা অপেক্ষা আরও প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেশী বালক-বালিকা আজ প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে। ১৯৫১ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যাহা ছিল, আজ তাহা প্রায় আড়াইগুণ বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া ১৭ বছর বয়সের বেশী ছেলেমেয়েরা—যাহারা কলেজবিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিক্ষালাভ করিতেছে—তাহাদের সংখ্যা আগের তুলনায় গত দশবছরে আরও ১০ লক্ষ বাড়িয়াছে। শিক্ষাবিষয়ে নিচের সংখ্যাসূচী হইতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিষ্কার হইবে ;

শিক্ষার অগ্রগতি : ১৯৫০-১৯৬৫

স্কুলের ছাত্রসংখ্যা (১০ লক্ষের হিসাব)			
৬-১১ বছর :	১৯-২ :	৩৪-৩ :	৪৯-৬
১১-১৪ বছর :	৩-১ :	৬-৩ :	৯·৮
১৪-১৭ বছর :	১-২ :	২-৯ :	৪-৫
কলেজের ছাত্রসংখ্যা (হাজার হিসাবে)			
১৭-২৩ :	৪০৬	১০৫২	১৫১৫

সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য :	৩৬০	৯০০	১৩০০
টেকনিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল ইত্যাদি :	৪৬	১৫২	২১৫

ইহা যে অতিদ্রুত অগ্রগতি তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয় যোজনার লক্ষ্য হইতেছে—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরও ২ কোটি বেশী ছাত্রের শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা করা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল শিক্ষার ছাত্রসংখ্যা আরও ৪ লক্ষ ৬০ হাজার বৃদ্ধি করা এবং ১১ বছর বয়স পর্যন্ত দেশের সমস্ত বালক-বালিকাকে বিনাখরচে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া। এই লক্ষ্য খুবই বড় লক্ষ্য। আগামী ৪-৫ বছরে যদি এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিক্ষিত দেশের মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করিবে।

পরিবার-পরিকল্পনা

ভারতের জনসংখ্যা কত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে আগে সে-বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। গত দশ বছরে প্রায় ৮ কোটি লোক বাড়িয়াছে। পরবর্তী দশ বছরে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী লোক বাড়িবে বলিয়া মনে হয়, কারণ এখন দেশে মৃত্যুর হার কমিয়াছে, লোকের জীবনযাত্রা অনেক উন্নত হইয়াছে, সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী বৃদ্ধি পাইবে ছাড়া কমিবে না। এই হার বজায় থাকিলে আগামী ১০ বছরে (১৯৬০-৭২) আরও প্রায় ১০-১২ কোটি লোক বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। দেশের আর্থিক উন্নতি যতই হোক, লোকসংখ্যা যদি এইভাবে অতিদ্রুত বাড়িয়া যায় তাহা হইলে কোন উন্নতিতেই কিছু করা সম্ভব হইবে না। কারণ উন্নতির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে (যেমন পঞ্চবার্ষিক যোজনাগুলি) তাহা হিসাব করিয়া করা হইতেছে। সঠিক হিসাব ছাড়া কোন ভাল ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা কখনও করা যায় না। সামান্য একটি সংসার ভাল করিয়া চালাইতে হইলে সমস্ত বিষয়ে হিসাব করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন একটি বিষয়ে হিসাবের গরমিল হইলে, অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থাও গণ্ডগোল হইয়া যায়। এই হিসাবের মধ্যে মূলবিষয় হইল পরিবারের লোকসংখ্যা। দশজনের পরিবার হঠাৎ যদি পনেরজনের হইয়া যায় তাহা হইলে শুধু যে

খাদ্যতেই টান পড়ে তাহা নহে, বাসস্থান শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই ওলটপালট হইয়া যায়। তাহা সামলানো রীতিমত সমস্যার ব্যাপার হইয়া ওঠে।

সংসার ও পরিবারের দিক হইতে যাহা সত্য, দেশ জাতি ও সমাজের দিক হইতে তাহা আরও অনেক বেশী সত্য। পঞ্চবার্ষিক যোজনাগুলিতে দেশের বহু প্রয়োজন ও অভাবের কথা বিচার-বিবেচনা করিয়া করা হইতেছে। ইহার মধ্যে চিন্তার মূলবিষয় হইতেছে লোকসংখ্যা। পরিকল্পনা কাহার জন্য? নিশ্চয় লোকের জন্য। খাদ্য উৎপাদনের কথা ধরা যাক। পাঁচ বছরে কতটা খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইলে আমাদের অভাব মোটামুটি মিটিতে পারে তাহা কি করিয়া হিসাব করা হইবে? কত লোকের জন্য খাদ্য দরকার সেই হিসাব অনুযায়ী ফসল বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। মনে করা যাক এখন দেশে ১০০ লোক আছে এবং আগামী পাঁচ বছরে জন্ম-মৃত্যুর যোগ-বিয়োগ করিয়া আরও ১০ জন বাড়িতে পারে ধরা হইল। এই ১১০ জনের জন্য খাদ্যফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি পরিকল্পনা করা হইল। কিন্তু দেখা গেল লোকের মৃত্যুর হারের যে হিসাব করা হইয়াছিল তাহা কমিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ লোকের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে এবং ইহা সুখের কথা) এবং তাহার সহিত জন্মের হারও হিসাব অনুযায়ী বাড়িয়াছে। ১১০ জনের বদলে ১২০ জন লোক হইয়া গিয়াছে। ১১০ জন লোকের কথা মনে করিয়া যে-সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছিল তাহাই সফল হওয়া কঠিন। তাহাতে আবার বোঝার উপর যদি আরও বোঝা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে সমস্যার কিনারা পাওয়া কঠিন হইয়া ওঠে। সমস্ত বাজেট, প্ল্যানিং গণ্ডগোল হইয়া যায়। এই বাড়তি লোক কি খাইবে, কোথায় থাকিবে, কি পরিবে, কোথায় লেখাপড়া শিখিবে, কোথায় বা কাজকর্ম করিবে—এইসব বিষয় আবার নূতন করিয়া ভাবিতে হয়। সেইজন্য আবার নূতন করিয়া হিসাব করারও দরকার হয়। কিন্তু তাহা করিলেই বা কি হইবে? নূতন হিসাব করিতে-না-করিতেই আবার লোকসংখ্যা হয়ত এমন বাড়িয়া যাইবে যে সেই হিসাবও বাতিল করিতে হইবে।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে লোক যখন বাড়িতেছে তখন লোকের হিসাব একটু বেশী করিয়া ধরিলেই হয়! তাহা হইলে তো কোন গণ্ডগোল হয় না, সমস্ত হাঙ্গামা চুকিয়া যায়। ১০ জনের পরিবারে যদি



২০ জনের হিসাব করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কোন গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। কথাটা মনে হয় বটে ঠিক, কিন্তু যতটা মনে হয় ততটা ঠিক নহে। সকলের আগে আর্থিক সামর্থ্য ও সংগতির প্রশ্ন আছে, সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নহে। ব্যবস্থা করিলে তো ভাল হয়, কিন্তু কোথা হইতে করা হইবে? বর্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি, কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন যদি ৮০ কোটি লোকের ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন তাহা হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে সমস্ত দুশ্চিন্তা চলিয়া যায়। ঠিক কথা, কিন্তু ব্যবস্থাটি কোথা হইতে হইবে! ব্যবস্থা করিতে তো বহু টাকার দরকার। টাকা যদি টাকা না হইয়া ভেরাণ্ডার বীজ হইত তাহা হইলেও তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিক যোজনায় কত শত কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইতেছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই টাকা যোগাড় করিতেই ভারতকে বাহিরে সকল দেশের কাছে হাত পাতিতে হইতেছে। টাকা যদি খুশীমত পাওয়া যাইত তাহা হইলে ১০০ কোটি লোকের জন্য প্ল্যান করিতেই বা আপত্তি কি? ৫ জন লোকের সংসারই যেখানে চলে না, সেখানে ১৫ জন লোকের ব্যবস্থা করিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় জানিয়াও কি তাহা করা সম্ভব?

করিয়া বুঝাইবার দায়িত্ব লইতে হইবে। পরিষ্কার করিয়া তাহাদের বলিতে হইবে যে জন্ম-মৃত্যু যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে অসুখ-বিসুখ হইলে আমরা ডাক্তার ডাকি কেন? হাসপাতালে যাই কেন? মৃত্যু যদি অদৃষ্টে থাকেই তবে ডাক্তার ও হাসপাতাল কি করিবে? কিন্তু তবু আমরা ডাক্তার ডাকি, ঔষধ খাই এবং হাসপাতালেও যাই। অসুখে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। এইরকম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে আমাদের নিজেদের চিন্তার মধ্যেই অসংগতি আছে। মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছা বিশ্বাস করিয়াও ডাক্তারের কাছে দৌড়াই, অর্থাৎ বিশ্বাস করি যে নিজে চেষ্টা করিলেও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। একদিকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, অন্যদিকে ডাক্তারে বিশ্বাস—এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে কোন সংগতি নাই।

মৃত্যুর ভয়ে যদি ডাক্তারের কাছে যাই (ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও), তাহা হইলে জন্মের ভয়ে ডাক্তারের কাছে যাইব না কেন? জন্মের 'ভয়' বলা হইতেছে এইজন্য যে অত্যধিক সন্তানের জন্ম অনেক সময় পরিবারের পক্ষে ভয়ের কারণও হইতে পারে। জন্মরহস্য যদি নিজেরা না বুঝি তাহাতেও ক্ষতি নাই। নিজেদের অসুখ-বিসুখ আমরা কি সব বুঝি? বুঝি না বলিয়াই ডাক্তারের কাছে যাই। তেমনি জন্মরহস্যের ব্যাপারও ডাক্তাররা বুঝাইয়া দিবেন এবং তাহা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় কি তাহাও তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাদের শুধু দরকার এই বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

এই উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পরিবার-পরিকল্পনার ক্লিনিক স্থাপন করিতেছেন। কেন্দ্রীয়-সরকার ও রাজ্য-সরকারের অধীনে এই পরিবার-পরিকল্পনার কাজ তদারক করিবার জন্য স্বতন্ত্র 'বোর্ড' স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথম যোজনায় এই কাজ সামান্যভাবে আরম্ভ হইলেও ১৯৬১ সালের গোড়ায় দ্বিতীয় যোজনার শেষে পরিবার-পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ১১০০ এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ৫৫০ ক্লিনিক স্থাপিত হয়। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহু টাকা ব্যয় করা হইতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক গতি দেখিয়া ভারত-সরকার অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় এই খাতে অন্ততঃ ২৭ কোটি টাকা (দ্বিতীয় যোজনার প্রায় ছয়গুণ) খরচ করা হইবে ঠিক হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে এই খরচ বাড়াইয়া ৫০ কোটি টাকা করারও ব্যবস্থা



লেডি-ডাক্তার পরিবার-পরিকল্পনার উপদেশ দিতেছেন

আছে। ১৯৬১ সালের মধ্যে ৮২০০ পরিবার নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে ঠিক হইয়াছে। ইহার চারভাগের তিনভাগ গ্রামাঞ্চলে এবং একভাগ শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনায় ইহাকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বলা যায় না। তৃতীয় যোজনার শেষে মাত্র ৮ হাজার পরিবার-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র স্থাপিত হইলে উদ্দেশ্য বিশেষ সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্তত ইহার দশগুণ বেশী নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ছোট ছোট ফিল্মের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত লোকের মধ্যে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের কথা প্রচার করাও আবশ্যক। যত দিন না দেশের লোকের মন হইতে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে দীর্ঘকালের সংস্কার দূর হইবে, যতদিন না লোকে বুঝিতে শিখিবে যে জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই আমরা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি, বিশেষ করিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্তে, ততদিন কেবল ক্লিনিক স্থাপন করিয়া বিশেষ কোন কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য শিক্ষামূলক প্রচারকার্যের দিকে গবর্ণমেণ্টের উচিত বিশেষ নজর দেওয়া। কেবল এই কাজের জন্য গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকাদের দল গঠন করিয়া গ্রামাঞ্চলে পাঠানো দরকার। জনপ্রিয় ছায়াচিত্র, যাত্রা-থিয়েটার ইত্যাদির ভিতর দিয়াও ইহার তাৎপর্য সাধারণ লোককে সহজে বুঝানো সম্ভব হইতে পারে।

সমষ্টি-উন্নয়ন বা সামুদায়িক বিকাশ

সামুদায়িক বিকাশ (Community Development)। ‘সামুদায়িক বিকাশ’ বা ‘Community Development’ কথাটি আজকাল আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। পথে-ঘাটে, শহরে-গ্রামে সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের মুখে ‘কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট’ ও বি.ডি.ও. (‘ব্লক’ ডেভালাপমেণ্ট অফিসারকে B. D. O. বলা হয়) কথা দুইটি শোনা যায়। সুতরাং সমষ্টি-উন্নয়ন আন্দোলন দেশের লোকের মধ্যে বেশ ব্যাপক সমাজচেতনা সঞ্চার করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কথা হইল, সমষ্টি-উন্নয়ন কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি?

সমাজে বাস করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির (individual) ও প্রত্যেক গোষ্ঠীর (group) কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেমন

শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন দেখা গিয়াছে যে আমরা অনেক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া পণ্ডিত হই বটে, কিন্তু বহু বিষয়ে আমাদের জ্ঞান তো দূরের কথা, কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নাই। যিনি ডাক্তারীবিদ্যা জানেন, ইঞ্জিনিয়ারিংবিদ্যা জানেন, তিনি স্বদেশের ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং না জানার জন্য তাঁহার সংকোচও নাই। এই ধরনের শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলিয়া ক্রমে এই 'সমাজবিদ্যা' (Social Studies) বিষয় পৃথিবীর সর্বত্র ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য করা হইতেছে। আমাদের দেশেও হইতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তেমনি কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান (general knowledge) ও বোধ (sense) থাকা প্রয়োজন। সমাজে বাস করিতে হইলে এইরকম কতকগুলি বোধ থাকা আবশ্যক। এই ধরনের প্রাথমিক বোধ হইল—প্রত্যেক ব্যক্তির বোঝা দরকার যে, সে একটি 'সামাজিক জীব' (social being) এবং যেহেতু তাহার মতো বহু মানুষকে লইয়া 'সমাজ' গঠিত হইয়াছে, সেইজন্য বহু মানুষের স্বার্থের সহিত তাহার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থও জড়িত এবং সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া ও মানাইয়া চলাও তাহার কর্তব্য। একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিলে যে অনেক কঠিন কাজ অল্প আয়াসে করা যায়, একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। যেমন গ্রামের পথঘাট, পুকুর-ডোবা পরিষ্কার রাখা বা লোকের অভ্যাস পরিচ্ছন্ন করা। গ্রামের লোক সকলে একত্রে মিলিয়া এই কাজে ব্রতী হইলে ইহা করিতে কতদিন সময় লাগে? এই একতাবোধ, সমাজবোধ ও গোষ্ঠীচেতনা ভারতের গ্রামে গ্রামে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা হইল 'সামুদায়িক বিকাশ' পরিযোজনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

ঝড়ের সময় বড় একটি গাছ উপড়াইয়া গ্রামের পথের উপর পড়িয়াছে। এমন ঘটনা প্রায় কালবৈশাখী ও বর্ষাবাদলের সময় ঘটিয়া থাকে। গাছের জন্য পথে গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ হইয়াছে, এমনকি লোকজনের চলাচলেরও যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকটি লোক যদি উৎপাটিত গাছটির দিকে চাহিয়া ভাবিতে থাকে—'তাই তো, এই গাছ সরানোর সাধ্য আমার নাই, কে ইহা সরাইবে'—তাহা হইলে পথের বাধা কোনদিন দূর হইবে না। কিন্তু গ্রামের দুইচারজন উৎসাহী লোক যদি আরও বিশ-পঞ্চাশজন গ্রামের লোক ডাকিয়া, সকলে মিলিয়া দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়া

গাছটি সরাইতে উদ্‌যোগী হয়, তাহা হইলে পথের বাধাটি দূর করিতে কতক্ষণ লাগে। বেশীক্ষণ লাগে না, কাহারও একার পরিশ্রমও বেশী হয় না, অথচ, বিশাল বাধাটি সহজেই দূর হইয়া যায়। এই শিক্ষাটি আমাদের দেশের লোককে দিবার জন্যই সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে সমস্যার অন্ত নাই। বড় বড় শহরেই কতরকমের সমস্যা রহিয়াছে, গ্রামে তো কথাই নাই। পথঘাটের সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, গৃহসমস্যা, কৃষিকাজ পশুপালন মাছচাষ ইত্যাদির সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা—এইরকম অনন্ত সমস্যাচক্রে গ্রামের লোক ঘুরপাক খাইতেছে। সমাধানের জন্য হয় ঈশ্বর ও অদৃষ্টের মুখের দিকে, আর না-হয় গবর্নমেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শেষে মানুষের এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে তাহার নিজের কি শক্তিসামর্থ্য আছে না-আছে তাহা আর মনে থাকে না। পরনির্ভরতা মানুষকে যেমন পঙ্গু করিতে পারে সেরকম আর কিছুতেই পারে না। সামুদায়িক বিকাশের লক্ষ্য হইতেছে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মানুষকে 'স্বাবলম্বী' হইতে শিক্ষা দেওয়া।

তাহা হইলে সামুদায়িক বিকাশের লক্ষ্য হইতেছে দুইটি—প্রথমত ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোককে স্বাবলম্বী হইতে বলা—দ্বিতীয় ঐক্যবদ্ধ হইয়া, সকলে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া। লোকে যখন পরনির্ভর হয় না, স্বাবলম্বী হয়, তখন তাহার নিজের কর্মশক্তি ও উদ্‌যোগ-উৎসাহ দুই-ই অনেক বাড়িয়া যায়। তাহার উপর এই ধরনের ১০০ জন স্বাবলম্বী লোক যদি একযোগে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিবে পণ করে, তাহা হইলে কত কাজ ও কত সমস্যার সমাধান যে তাহারা করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের ভারত-সরকার এই ধরনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়াই সামুদায়িক বিকাশের বা সমষ্টি-উন্নয়নের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট উদ্‌যোগীও হইয়াছেন।

তবে এমন অনেক কাজকর্ম আছে যাহা সকলে স্বাবলম্বী হইয়া, মিলিয়া-মিশিয়া করিলেও করা যায় না। তাহার জন্য অর্থ চাই, গুণী লোক চাই। যেমন দশটি গ্রামের মধ্যে ছোট একটি কারখানা করা দরকার হইতে পারে। তাহার জন্য টাকা তো চাই-ই, যন্ত্রপাতি চাই, গুণী ও বিদ্বান কারিগর চাই। লোকের পক্ষে সমস্ত শক্তি দিয়াও তাহা করা সম্ভব নহে। ভারত-



সামুদায়িক বিকাশে বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র

সরকার তখন বলিবেন—গ্রামের লোকের যতদূর সাধ্য আগে তাহা করিতে হইবে। যেমন কারখানার জন্ম, কি হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের জন্ম, জায়গা যোগাড় করিতে হইবে, যথাসাধ্য অর্থ ও সকলে মিলিয়া তুলিতে হইবে, কর্তৃপক্ষ তাহা দেখিবেন এবং দেখিয়া খুশী হইলে সর্বপ্রকারে তাহাদের সাহায্য করিবেন। সরকার যে বাকি সবটুকু একেবারে দিয়া সাহায্য করিবেন তাহা নহে। এমনভাবে সাহায্য করিবেন যাহাতে সেই অঞ্চলের লোক কাজটি আরম্ভ করিতে পারে। তারপর আবার স্থানীয় লোকদের নিজেদের চেষ্টায় কাজটি আগাইয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে সরকার হয়ত আবার সাহায্য করিবেন। সমষ্টি-উন্নয়নের কাজে সরকারী সহযোগিতা এই নীতির উপর নির্ভর করে। এই নীতির গুরুত্বও খুব বেশী। কারণ লোকে যদি জানিতে পারে যে এইটুকু পরিমাণ কাজ করিলে বাকিটুকু সবই সরকারী চেষ্টায় হইবে, তাহা হইলে স্থানীয় লোকের উদ্যম-উৎসাহ ঐটুকু করিবার পরেই নিভিয়া যাইবে, আবার আগের মতো তাহারা পরনির্ভর ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবে। সমষ্টি-উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্যই সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হইবে।

কেবল সরকারী সহযোগিতা নহে, সরকারী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বও এই কারণে খুব সাবধানে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বিধেয়। সমষ্টি-উন্নয়ন-বিভাগের সরকারী কর্মচারী ও আমলারা যদি পদে পদে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে স্থানীয় লোকের উদ্যম-উৎসাহে ভাঁটা পড়িবে, ক্রমেই তাহারা উদাসীন হইবে এবং সমস্ত ব্যাপারটি 'সরকারী উন্নয়নের' ব্যাপার হইয়া যাইবে, সমষ্টি-উন্নয়নের 'সমষ্টিত্ব' বলিয়া কিছু থাকিবে না।

সাম্প্রদায়িক বিকাশের এই মূলনীতি ও আদর্শগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা যেমন দেশের প্রত্যেক লোকের ও জনসমষ্টির মনে রাখা কর্তব্য, তেমনি গবর্নমেণ্টেরও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। যে-কোন পক্ষ—জনসমষ্টি বা গবর্নমেণ্ট—এই মূলনীতির কথা যদি ভুলিয়া গিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে হয়ত উন্নয়নের কিছু কাজ হইবে, কিন্তু তাহার সহিত প্রকৃত সমষ্টি-উন্নয়নের কোন সম্পর্ক বিশেষ থাকিবে না। জনসমষ্টিকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ইহা তাহাদেরই স্বার্থে রচিত এবং গবর্নমেণ্টকেও মনে রাখিতে হইবে যে সরকারী সহযোগিতা ও ক্ষমতা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করার একমাত্র উদ্দেশ্য জনসাধারণকে তাহাদের এই স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ ও সক্রিয় করা।

সামুদায়িক বিকাশের পরিকল্পনা ও বিস্তার

পরিকল্পনা। সামুদায়িক বিকাশের পরিকল্পনার বয়স ১৯৫৫ সালে ১০ বছর পূর্ণ হইবে। ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর তারিখ হইতে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের দেশে কাজ আরম্ভ হয়। যখন আরম্ভ হয় তখন সারা ভারতবর্ষে ৫৫টি 'প্রজেক্ট' বা পরিকল্পনাকেন্দ্র বাছাই করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি কেন্দ্র প্রায় ৫০০ বর্গমাইল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল এবং তাহাতে প্রায় ৩০০ গ্রাম ও ২ লক্ষ লোকের বাস ছিল। পরে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া গিয়া এই পরিকল্পনার অনেক সংশোধন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে।

সামুদায়িক বিকাশের কাজ আরম্ভ করা হয় এক-একটি 'ব্লক' (block) গঠন করিয়া এবং সাধারণত প্রত্যেক ব্লকে ১০০টি করিয়া গ্রাম থাকে। তাহাতে প্রত্যেকটি ব্লকের সীমানা প্রায় ১৫০-২০০ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং লোকসংখ্যা হয় প্রায় ৬০।৭০ হাজার। ১৯৫৮ সালের আগে সমষ্টি-উন্নয়নের কাজকর্ম তিনটি পর্বে (three phases) ভাগ করা হইত এইভাবে :

১। জাতীয় সম্প্রসারণ পর্ব (National Extension Service Stage বলা হইত, সংক্ষেপে N. E. S.)। তিন বছর ধরিয়া এই পর্বের কাজ চলিত এবং ছোট পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইত।

২। পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন পর্ব (Intensive Development Stage বলা হইত)। এই দ্বিতীয় পর্বে পরিকল্পনাটিকে আরও বিস্তৃত ও বড় করিয়া কাজ সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইত।

৩। পরবর্তী উন্নয়ন পর্ব (Post-Intensive Development Stage বলা হইত)। এই তৃতীয় পর্বে যথাসম্ভব অল্প খরচে পরিকল্পনাটিকে চালু রাখাই ছিল প্রধান কর্তব্য।

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করা হইয়াছে। বর্তমানে প্রথম পর্বের উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করিবার আগে অন্তত একবছর প্রত্যেক ব্লকে প্রস্তুতির কাজ করিতে হয়। ইহাকে বলা হয় 'pre-extension phase' বা উন্নয়ন-কাজ আরম্ভ করিবার আগে প্রস্তুতির পর্ব। এই প্রস্তুতির পর্বে প্রধানত আঞ্চলিক কৃষিকর্মের উন্নতির দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয় বেশী।

একবছর প্রস্তুতির পর প্রথম পর্বেই পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয় ৫ বছরের জন্য। পাঁচ বছর ধরিয়া পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের কাজই চলিতে থাকে। পরবর্তী পর্বে আরও ৫ বছর ধরিয়া এই উন্নয়নের কাজ চলে, তবে ইহার জন্য সামুদায়িক বিকাশের সরকারী বিভাগ হইতে (Community Development Ministry) আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ কম থাকে। তাহা থাকিলেও এই ব্যবস্থা আছে যে প্রয়োজন হইলে সরকারী অন্যান্য দফতর হইতে (যেমন কৃষি, শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) বেশী পরিমাণে আর্থিক সাহায্যও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তখন আর সমষ্টি-উন্নয়ন-বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিতে বাধ্য থাকিবে না, প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য সরকারী বিভাগ আঞ্চলিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

গ্রাম-পঞ্চায়েত ও সামুদায়িক বিকাশ

পঞ্চায়েত ও সমষ্টি-উন্নয়ন। ১৯৫৯ সালে সমষ্টি-উন্নয়ন সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করিয়া ভারত-সরকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি, মহিলা-মণ্ডল, যুবসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে সোজাসুজি সমষ্টি-উন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্মের বেশীর ভাগ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত-সরকারের উদ্দেশ্য হইল, স্থানীয় সমষ্টি-উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব স্থানীয় লোকজনকে সমবেতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান (যেমন পঞ্চায়েত) ও অন্যান্য গ্রাম্য সংঘ-সমিতি ও সমবায়গুলিকে অগ্রণী হইয়া এই কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যে-কোন ব্লকের পরিকল্পনা রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে তাহা কার্যকর করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ এই গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে করিতে হইবে। ব্লকের সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের যথাসম্ভব এই কাজে সাহায্য করিবেন। গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক দিয়া ইহা খুবই কার্যকর নীতি এবং ইহা সফল হইলে ভারতরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভিত্তি যে সুদৃঢ় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি 'পঞ্চায়েতী-রাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-সরকার যে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছেন তাহার একটি অন্যতম কারণ হইল, সামুদায়িক বিকাশ পরিকল্পনার সহিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গণতন্ত্রের ভিত



পঞ্চায়েত গৃহ ও সভা

দৃঢ় করা। গ্রামের স্তরে 'গ্রাম-পঞ্চায়েত', ব্লকের স্তরে 'ব্লক-পঞ্চায়েত সমিতি' এবং জেলার স্তরে 'জেলা-পরিষদ' গঠন করিয়া এই সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ আসাম মহীশূর মাদ্রাজ উড়িষ্যা ও রাজস্থানে 'পঞ্চায়েতী-রাজ' এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশও এই পথে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করিতেছে। কেরলপ্রদেশে প্রায় ১৫০ পঞ্চায়েতকে স্থানীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচনা ও কাজকর্ম করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গুজরাট মহারাষ্ট্র ও বিহার রাজ্যেও পঞ্চায়েতী-রাজ কি ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গেও মোটামুটি কাজ মন্দ হইতেছে না।

বিভিন্ন প্রদেশে সামুদায়িক বিকাশ পরিকল্পনার অগ্রগতি কতদূর হইয়াছে তাহা নিচের এই নির্দেশিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে:

(অক্টোবর ১৯৬০)

	ব্লক'-সংখ্যা		ব্লকভুক্ত জনসংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)		গ্রামসংখ্যা (শত হিসাবে)
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৮১	:	১·৮৮	:	১৯·৩
আসাম	৮৪	:	·৪৫	:	১৪·১
বিহার	৩৫৫	:	২·৩৭	:	৪৬·০
গুজরাট	১২৯	:	·৮৬	:	১১·০
কেরল	৮৭	:	·৭৮	:	·৩১
মধ্যপ্রদেশ	২৬২	:	১·৬১	:	৪৮·৪
মাদ্রাজ	২১১	:	১·৫৯	:	১২·১
মহারাষ্ট্র	২৩৮	:	১·৫৭	:	২৪·৩
মহীশূর	১৬৪	:	১·০৯	:	১৮·১
উড়িষ্যা	১৭৬	:	১·১৬	:	২৭·১
পাঞ্জাব	১৫৩	:	১·০৪	:	১৪·০
রাজস্থান	১৩৯	:	·৯০	:	২০·৫
উত্তরপ্রদেশ	৫১৮	:	৩·৩৫	:	৬৯·৯
পশ্চিমবঙ্গ	১৭৩	:	১·২০	:	২২·৭

প্রথম ও দ্বিতীয় উন্নয়ন-পর্বের (Stage I ও Stage II) 'ব্লক' মিলাইয়া সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অগ্রগতি আশাপ্রদ।

বর্তমানে সারা ভারতে প্রায় ৩৭০,০০০ গ্রাম (অর্থাৎ ভারতের মোট গ্রামের লোকের প্রায় অর্ধেক) সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের প্রত্যেকটি গ্রাম ও গ্রামের লোককে এই পরিকল্পনাভুক্ত করা যাইবে আশা করা যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েতী-রাজের সহিত সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার সংযোগ ঘটানো সম্ভব হইলে ভারতরাষ্ট্র গণতন্ত্রের পরীক্ষায় এক নূতন পন্থা ও আদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে। সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যখন আজ সঙ্কটাপন্ন, তখন ভারতের এই নূতন পরীক্ষার সাফল্য পৃথিবীর বহু জাতি ও মানুষের মনে নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিবে।

QUESTIONS

Group A

1. Is there any problem of growing population in India? Why it is a problem? How far does it affect India's plans for development?

2. Is there any need for stabilising the growth of India's population? What are the ways by which it can be done?

3. Why planning is necessary for building up a New India? Give a critical estimate of the objectives and achievements of India's Five-Year Plans.

4. "The aim of health programmes under the Five-Year Plans has been to promote a progressive improvement in the level of India's national health." Discuss the statement.

5. "Since Independence, India has pushed hard to improve health and health-services for its people." Discuss the statement.

6. Write what you know about the progress made so far in the different fields of education in India, since Independence.

7. "The demand for education has been steadily rising in India since Independence." Discuss the statement.

8. What is Community Development? How far has the Community Development movement succeeded in fostering self-reliance in the individual and initiative in the village community of India?

9. "*Panchayati Raj* has considerable significance for Community Development." Discuss the statement.

Group B

I Choose the correct one out of three answers provided:

(a) *Planning*:

1. Planning is necessary for the development of a backward country like India.
2. Planning is necessary for the industrial development of a predominantly agricultural country like India.
*3. Planning is necessary for the most effective and balanced utilisation of any country's resources.

(b) *Community Development*:

1. Community Development means the development of a community.
*2. The aim of the Community Development movement is to help in the harmonious development of both the individual and the Community.
3. The aim of the Community Development movement is to help in the growth of a community, and of an individual.

II Choose the most appropriate answer out of six purposes suggested:

(a) *Family Planning* is necessary in India because

1. the death-rate is falling.
2. we have food shortage.
3. there is housing crisis.
4. the birth-rate is increasing.

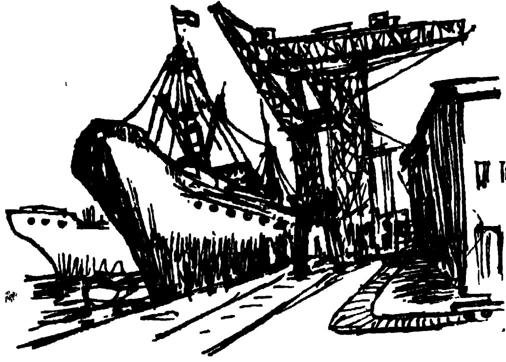
*5. the rate of population growth is higher than the rate at which incomes and standard of living can be raised.

6. there is unemployment problem.

(b) The *demand for technical education* has been steadily rising in India since Independence because :

1. it offers employment.
2. it elevates social status.
3. it is not expensive.
4. it is better than literary education.
*5. it has greater need and employment potential in an industrially developing country.
6. it helps in the growth of our personality.

* তারকাচিহ্নিত উত্তরগুলি 'correct' ও 'appropriate'. এই প্রশ্ন-গুলিকে নানাভাবে ঘুরাইয়া করা যাইতে পারে—উদ্দেশ্য হইল, ছাত্ররা বিষয়-বস্তুটি ঠিকমত বুঝিয়াছে কিনা তাহাই যাচাই করা।



দশম প্রকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

ভূমিকা। ভারতের সহিত বাহির-বিশ্বের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক বহুকালের প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই ভারতের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যসূত্রে লেনদেন চলিত এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে চীন, গ্রীকরাজ্য, সিংহল ও দক্ষিণপূর্ব-এসিয়ার সহিত বাণিজ্যসূত্রেই ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীকদের লেখায় ভারতীয় নাবিকদের দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকেও ভারতীয় বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রার অনেক বর্ণনা আছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে বেশ সমৃদ্ধ ছিল, এইসব কাহিনী ও বিবরণ হইতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

পশ্চিম-এসিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত স্থলপথে পারস্য, মেসোপোতেমিয়া ও এসিয়া-মাইনরের ভিতর দিয়া। এপথ বহুকালের প্রাচীন পথ, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার কাল পর্যন্ত ইহার সীমারেখা টানা যায়। চীনের প্রাচীন রেশমের বাণিজ্য এই পথ ধরিয়া চলিত। মধ্যে মধ্যে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইলে বাণিজ্যের পণ্য ভারতের পশ্চিম-উপকূলের বন্দরে পাঠানো হইত, সেখান হইতে সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগর বা লোহিতসাগরের পথে চালান দেওয়া হইত। উত্তরভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণভারতের বাণিজ্য চলিত সমুদ্রপথে। পশ্চিম-

---

Unit 10 (b) India's Foreign Trade - commodities we generally export and commodities we import—countries with which most of the trading take place—change in the nature of Trade, especially with reference to Trade Balance.

উপকূলের বন্দর হইতে মিশরের ভিতর দিয়া ইউরোপ পর্যন্ত এবং পূর্ব-উপকূলের বন্দর হইতে দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ায় বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত। বণিকদের প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায়, আরবের বন্দর হইতে বণিকেরা বাণিজ্য-পোতে যাত্রা করিয়া, বর্ষাকালে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ৪০ দিনে মালাবার উপকূলের বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইতেন। ব্যবসায়ের কাজকর্ম শেষ করিয়া আবার শীতকালে পৌষ-মাঘ মাসে তাঁহারা ফিরিয়া যাইতেন। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা যে দক্ষিণভারতের উপকূল অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে বাণিজ্যের জন্য কিছুদিন পর্যন্ত বসবাসও করিতেন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে পণ্ডিচেরির কাছে আরিকামেডু বাণিজ্য-কেন্দ্রে রোমান মুদ্রা এবং মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এইসব নিদর্শন হইতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রাচীনত্ব ও সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত সূক্ষ্ম মসলিন ও সুতির কাপড়, রেশম, হাতির দাঁতের জিনিস, মসলাপাতি ইত্যাদি এবং বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হইত তামা, টিন, কাঁচের জিনিস, রুপোর জিনিস, প্রবাল, এমনকি রাজা-মহারাজাদের জন্য বিদেশী গায়িকা ও নর্তকী পর্যন্ত। প্রধানত প্রাচীনকালের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিলাসের সামগ্রীরই লেনদেন হইত। বর্তমানকালে বৈদেশিক বাণিজ্য কেবল বিলাসের দ্রব্য লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। দেশের ও দশের প্রয়োজনে যখন যে-জিনিস কাজে লাগে, তখন সেই জিনিস নিজের দেশে না থাকিলে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। তেমনি নিজেদের যে-সব জিনিসের চাহিদা বিদেশে আছে তাহা প্রয়োজন হইলে নিজেরা ভোগ না করিয়া কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া হইলেও বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। নিজেদের জিনিস বাহিরে রপ্তানি না করিলে বিদেশের টাকা উপার্জন করা সম্ভব নহে, এবং তাহা না করিতে পারিলে বিদেশের জিনিসও নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানি করা যায় না। আমদানি করিলে দেশের টাকা বাহিরে চলিয়া যাইবে।

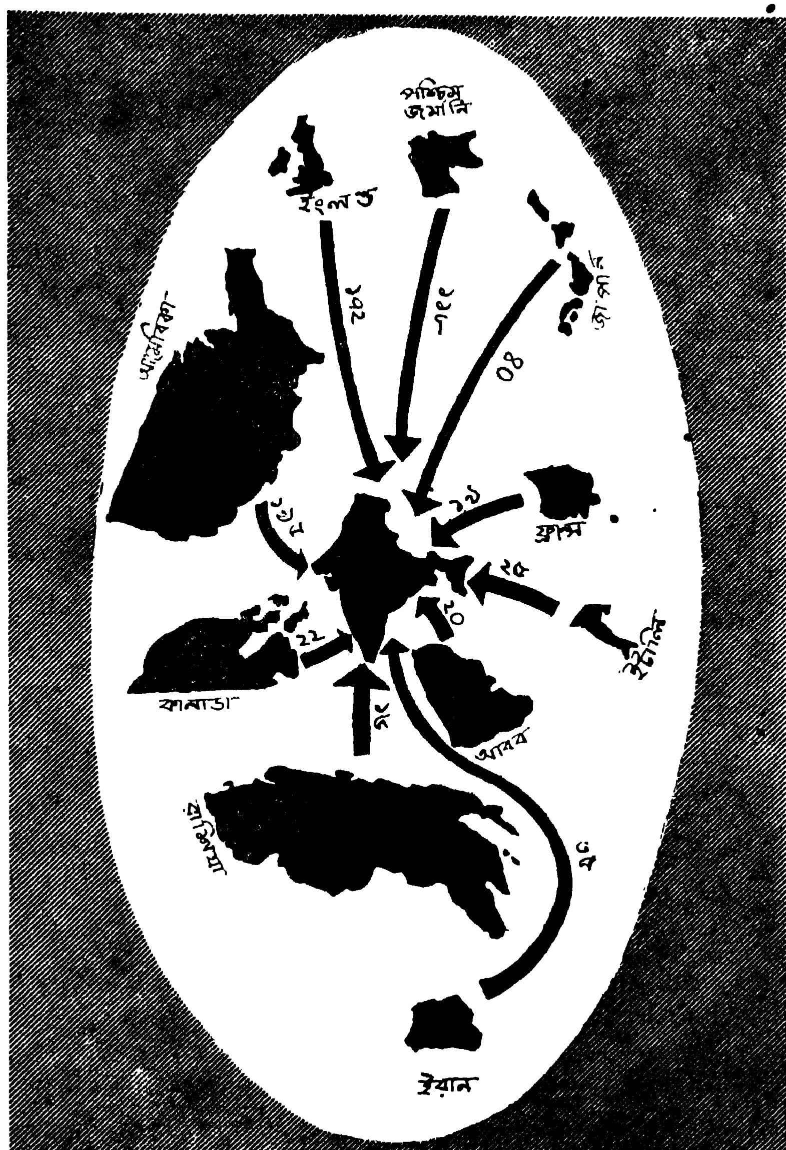
বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি

বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি তাহা হইলে কি হওয়া উচিত? বাণিজ্যের আদান-প্রদান বা আমদানি-রপ্তানি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাহাতে

দুইপক্ষের দেনা ও পাওনা পরিশোধ হইয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের হিসাব নিকাশ চুকাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘটে না, দেনা-পাওনা সবসময় কিছু-না-কিছু থাকে। যে-কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন দেনা না থাকা ভাল, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই। তবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ প্রয়োজনে বা ঘটনাচক্রে দেনা না করিয়া উপায় থাকে না, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি মধ্যে মধ্যে অর্থনীতিক অবস্থার চাপে পড়িয়া বাহিরে দেনা করিতে হয়। টাকা ধার লইয়াও দেনা করা যায়, আবার কোন দেশের জিনিসপত্র আমদানি করিয়াও দেনা করা যায়। ভারত-সরকারকে বর্তমানে এই দুই কাজই মধ্যে মধ্যে করিতে হয়। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি ও বহু জিনিসপত্র এখনও বাহির হইতে আমদানি না করিলে চলে না। রপ্তানিও যতটা পরিমাণে করিলে ভাল হয় তাহাও এখন আমরা করিতে পারি না, অর্থাৎ করিবার মতো ঠিক অবস্থা হয় নাই। তবু বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতির কথা মনে রাখিয়া ভারত-সরকার বিদেশে পণ্য রপ্তানির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া বিদেশ হইতে আমদানিও যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারত-সরকারের এই সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে পরে আমরা আরও কিছু আলোচনা করিব। এখন আমাদের এইটুকু মনে রাখিলে চলিবে যে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি হইতেছে যথাসম্ভব বাহিরের জিনিস কম আমদানি করিয়া নিজেদের ঘরের জিনিস বাহিরে রপ্তানি করার চেষ্টা করা এবং তাঁহার বিনিময়ে টাকা ঘরে আনা। প্রাচীন ভারতের সদাগররা বাণিজ্যতরী জিনিসপত্রে বোঝাই করিয়া বিদেশযাত্রা করিতেন এবং ঘরে ফিরিয়া আসিতেন সেই তরী সোনার মোহরে ভর্তি করিয়া। বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদেরও এই সদাগরদের মতো স্বদেশের জিনিস বিদেশে বেচিয়া তরী বোঝাই করিয়া সোনার মোহর ঘরে আনিতে হইবে।

বর্তমান ভারতের আমদানি ও রপ্তানি

বর্তমান ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি কোন্‌দিকে তাহা গত কয়েকবছরের আমদানি ও রপ্তানির ধারা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। সেই ধারাটি এই :



ভারতের আমদানির গতি

	আমদানি	(কোটি টাকার হিসাব)	রপ্তানি
১৯৫৭-৫৮ :	৯৯৩'৫৮	:	৬২১'৩১
১৯৫৮-৫৯ :	৮০৪'৫৫	:	৫৭০'১৪
১৯৫৯-৬০ :	৮৫১'৪২	:	৬৪৫'৭২

পরিষ্কার দেখা যাইতেছে গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আমদানি বেশ খানিকটা কমিয়াছে এবং রপ্তানি সামান্য কিছুটা বাড়িয়াছে, যদিও তাহা খুব আশাপ্রদ নহে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ৬২৩ কোটি টাকার জিনিস ভারতে আমদানি করা হইত এবং রপ্তানি করা হইত প্রায় ৬০১ কোটি টাকার জিনিস। দশ বছরে, ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে, রপ্তানি মাত্র ৪৪ কোটি টাকার মতো বাড়িয়াছে। আমদানি কমিয়াছে বলা হইতেছে এইজন্য যে ১৯৫৭ ৫৮ সালে আমদানি প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া প্রায় ৯৯৩ কোটি টাকার মতো হইয়াছিল এবং গত তিন-চার বছরে তাহা প্রায় ১৪০ কোটি টাকার মতো কমিয়াছে। অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালের পর হইতে আমদানি কমাইবার জন্য ভারত-সরকার যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন তাহা বোঝা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাব হইতে এই নীতির ফলাফল কি তাহা বোঝা যাইবে :

বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা

(কোটি টাকার হিসাব)

১৯৫৭-৫৮	:	—৩৭২'২৭
১৯৫৮-৫৯	:	—২৩৪'৪১
১৯৫৯-৬০	:	—২০৫'৭০

হিসাবে 'বিয়োগের' চিহ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের নিজেদের ধনভাণ্ডারে বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় যোগ নাই, বরং খানিকটা বিয়োগ হইয়াছে। এই বিয়োগের কারণ—আমরা বেশী আমদানি করিয়াছি এবং রপ্তানি কম করিয়াছি। সেইজন্য আমাদের পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশী হইয়াছে।

কিন্তু তাহার পর কি হইয়াছে বা হইতেছে? ১৯৫৭-৫৮ সালে আমাদের দেনা ছিল প্রায় ৩৭২ কোটি টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে ইহা প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা কমিয়া যায় এবং ১৯৫৯-৬০ সালে তাহা অপেক্ষা আরও ২৯ কোটি টাকা কমে। অর্থাৎ এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে গত তিন-চার বছর ধরিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের দেনা ধারাবাহিকভাবে কমিতেছে। এই ধারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারত-সরকার বৈদেশিক ক্ষেত্রে বিশেষ একটি বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন। সেই নীতিটি কি? আগে আমরা যাহা বলিয়াছি সেই নীতি—আমদানি যথাসম্ভব কমাইতে থাকা এবং রপ্তানি কিছুটা কষ্ট স্বীকার করিয়াও যতদূর সাধ্য বাড়ানো। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবপত্রে আমাদের দেনা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। যত রপ্তানি বাড়িতে থাকিবে এবং আমদানি কমিবে তত আমাদের দেনাও কমিবে, এবং রপ্তানির অবস্থা খুব ভাল হইলে এমনও হইতে পারে যে অন্যের কাছে আমাদের কিছু পাওনা হইবে, বিদেশ হইতে টাকা উপার্জন করিয়া আনিয়া স্বদেশের ভাণ্ডারে জমা করিতে পারিব। তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হিসাবপত্রের খাতায় আমাদের টাকার অঙ্কের পাশে বিয়োগচিহ্নের বদলে যোগচিহ্ন (+) বসিবে।

আমদানির জিনিসপত্র

বিদেশ হইতে বর্তমানে ভারতে যেসব জিনিস আমদানি করা হয় তাহার মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি :

১। উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি

২। খাদ্যশস্য

৩। ব্যবহার্য বস্তু

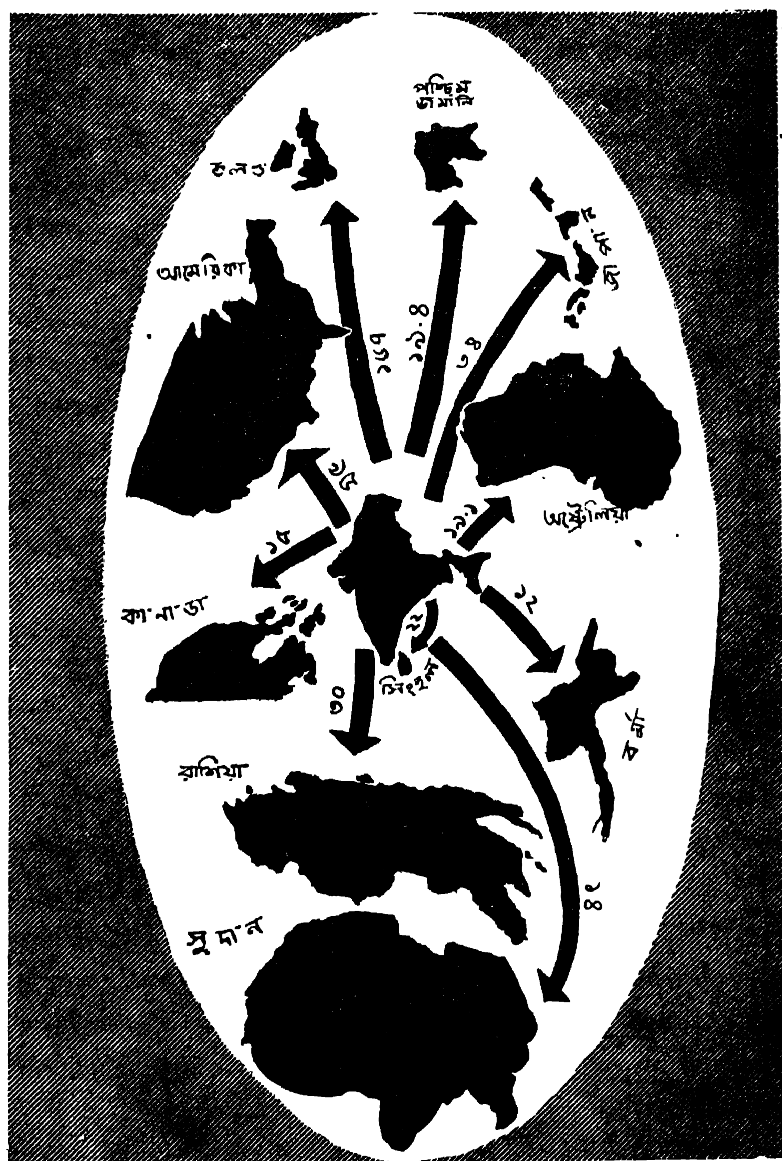
৪। কাঁচামাল

ইহার মধ্যে খাদ্যশস্যের আমদানি বিশেষ আমরা কমাইতে পারি নাই বরং ১৯৫৬-৬০ সালের মধ্যে ইহা বেশ কিছুটা বাড়িয়াছে—১০৭ কোটি হইতে ১৫৫ কোটি হইয়াছে। উৎপাদনের উপযোগী জিনিস ও যন্ত্রপাতির আমদানি ক্রমে কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই শ্রেণীর জিনিস (capital goods) ১৯৫৭-৫৮ সালে আমদানি করা হইয়াছিল প্রায় ৩৭৮ কোটি টাকার, পরে ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা ক্রমে কমিয়া হইয়াছে ৩৫৩ কোটি টাকা

ও ২৭৬ কোটি টাকা। বোঝা যায়, উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি বা capital goods ইহার মধ্যে আমাদের দেশে কিছু উৎপাদন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমদানি কমানোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ভোগ্য বা ব্যবহার্য বস্তু (consumer goods)। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ১২৩ কোটি টাকার ভোগ্যবস্তু আমদানি করা হইত, ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে ইহা কমাইয়া ৬৫ কোটি টাকার মতো করা হয়। ভোগ্যবস্তুর আমদানি কমাইয়া দেওয়ার ফলে দেশের লোকের কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বহু বিদেশী ভাল জিনিস বাজারে এখন সহজে পাওয়া যায় না, যদিও বা পাওয়া যায় তাহার মূল্য দুই-তিন-চারগুণ বাড়িয়াছে। যাঁহারা ভোগী ও বিলাসী লোক তাঁহাদের অবশ্য খুবই অসুবিধা হইতেছে, কিন্তু সাধারণ লোকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বিলাতী বা বিদেশী জিনিস ব্যবহার না করিলে যাঁহাদের আভিজাত্য বজায় থাকে না, তাঁহারাই ভারত-সরকারের ব্যবহার্য বস্তুর আমদানি কমাইবার নীতির বিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থনীতির ছাত্রদের জানা আছে যে দেশীয় জিনিস বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিয়া তাহার পোষকতা না করিলে কখনও কোন দেশে দেশীয় শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি হইতে পারে না। বিলাতের বা জার্মানির কোন কোন জিনিস রাতারাতি বাজারের সেরা জিনিস হয় নাই। বহুকাল ধরিয়া দেশ-বিদেশের লোক এইসব জিনিসের পোষকতা করিয়াছে বলিয়া ঐসব দেশে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার ফলে জিনিসও ভাল হইয়াছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বহু জিনিস যাহা আগে বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত, তাহা এখন এদেশেই উৎপাদন করা হইতেছে। ব্যবহার্য বস্তুর আমদানি কমাইয়া দিয়া ভারত-সরকার স্বদেশের এইসব নূতন শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহারে উৎসাহ দিতেছেন। যে-কোন জাতীয়-সরকার বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এই উৎসাহ দিতে বাধ্য। তাহাতে দেশের মুষ্টিমেয় ভোগবিলাসী লোকের যদি কিছু অসুবিধা হয়, দেশের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাহা করা উচিত।

রপ্তানির জিনিসপত্র

ভারত হইতে রপ্তানি করা প্রধানত ভেজিটেবল তেল, বীজ, সুতির কাপড়, চামড়া, পাট ও পাটের তৈরী



ভারতের রপ্তানির গতি

জিনিস, চা ইত্যাদি। ইংলণ্ড ও দক্ষিণপূর্ব-এসিয়ার বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের সহিত চীনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতের বস্ত্রব্যবসায়ীদের এই অঞ্চলে রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্প্রতি অনেক সুবিধা হইয়াছে। উপরন্তু ভারতীয় পাটের জিনিসের চাহিদা চীনে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং তাহাতে পাটব্যবসায়ীদেরও রপ্তানির সুবিধা হইয়াছে। কতকগুলি দেশের সহিত চুক্তি আছে যে তাহারা কোন জিনিসপত্র কিনিলে ভারতীয় টাকায় মূল্য শোধ করিবে। এই সমস্ত দেশের সহিত ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য সম্প্রতি বেশ খানিকটা বাড়িয়াছে এবং তাহাতে উপকৃত হইয়াছেন চামড়া, পাটের জিনিস ও চা ব্যবসায়ীরা। রপ্তানির জিনিসের দিক হইতে বিচার করিলে ১৯৫৯-৬০ সালে দেখা যায় যে সুতির কাপড়ের ব্যবসায়ীরা লাভবান লইয়াছেন সবচেয়ে বেশী (১৮ কোটি টাকা), তারপর চামড়ার ব্যবসায়ীরা (১৬ কোটি টাকা), তেলের খোল (১১ কোটি টাকা) এবং ভেজিটেবল তৈল ও তেলবীজের ব্যবসায়ীরা (১০ কোটি টাকা)। কিন্তু কাঁচা তুলা ও চায়ের রপ্তানিতে অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় ৮ কোটি টাকা করিয়া কম বাণিজ্য হইয়াছে।

রপ্তানিতে উৎসাহদান

ভারত-সরকার রপ্তানিতে কখনও কম উৎসাহ দেন নাই, তবে সম্প্রতি নানা উপায়ে ব্যবসায়ীদের আরও বেশী উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে-সমস্ত শিল্পের মালিকরা প্রধানত রপ্তানি করিবার জন্য জিনিসপত্র উৎপাদন করিবেন বা করিতেছেন তাঁহাদের নানারকম উৎসাহ দিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই উৎসাহদানের পরিকল্পনাগুলিকে (incentive schemes) শিল্পমালিকরা যথাসম্ভব কাজে লাগাইয়া রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এইসব পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান হইতেছে এইগুলি :

১। বাহির হইতে জিনিসপত্র আমদানি করিবার জন্য 'লাইসেন্স' দেওয়া। জিনিসপত্র বলিতে শুধু রপ্তানি-শিল্পের উৎপাদনের উপযোগী জিনিসপত্র বুঝাইতেছে।

২। শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল (raw materials) আমদানি ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদক-বস্তুর আমদানির সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া।



ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি

যতরকমের সম্ভব জিনিসপত্রের আমদানি কমানোই যে ভারত-সরকারের বাণিজ্যনীতির প্রধান লক্ষ্য, একথা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমদানির এই সুবিধা দেওয়া হইতেছে কেন, এই প্রশ্ন মনে জাগিতে পারে। এদেশের লোকের ভোগে লাগে এরকম কোন জিনিসের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য শিল্পমালিকদের এই সুবিধা আপাতত দেওয়া হইতেছে না। সুবিধা দেওয়া হইতেছে শুধু সেই সমস্ত শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যাহা বিদেশে রপ্তানি করা হইবে। যেমন মিলের কাপড়। মিলমালিক যদি তাঁহার কলকারখানা বড় করিয়া বেশী কাপড় উৎপাদন করিতে চান এবং তাহা এই দেশের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া মুনাফা করা তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ভারত-সরকারের কাছে তিনি তাঁহার মিলের প্রসারের জন্য কোন যন্ত্রপাতি বা জিনিস আমদানি করার অনুমতি চাহিলে পাইবেন না। ভারত-সরকার তাঁহাকে বলিবেন—"আমাদের দেশে কাপড়কলের যন্ত্রপাতি (textile machineries) তৈরী করা হইতেছে, দরকার হইলে সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া কারখানা বড় করার চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে

যদি বেশীদিন সময় লাগে তো লাগুক, দেশের জন্য আপাতত কিছুদিন কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবার কোন তাগিদ নাই। এই অবস্থায় বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া ঘরের টাকা বাহিরে দিয়া আসার কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহার জন্য ভারত-সরকার অনুমতি দিতেও অক্ষম।"

কিন্তু যদি কোন কাপড়কলের মালিক ভারত-সরকারকে আশ্বাস দেন যে তিনি তাঁহার মিলের আরও দুইটি ইউনিট বাড়াইবেন এবং সেই ইউনিট দুইটিতে যতটা পরিমাণে নূতন কাপড় উৎপাদন করা সম্ভব হইবে তাহা সম্পূর্ণ বাহিরে রপ্তানির জন্য ব্যবহার করা হইবে, তাহা হইলে ভারত-সরকার হয়ত বিদেশ হইতেও তাঁহাকে যন্ত্রপাতি বা যে-কোন জিনিস আমদানি করার লাইসেন্স দিতে পারেন। এই রকম শুধু কাপড় নহে, যে-কোন জিনিস রপ্তানি-বাণিজ্যে যদি কাজে লাগে তাহা হইলে ভারত-সরকার তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় অসুবিধা ও বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। এককথায় ভারত-সরকারের এই বাণিজ্যনীতিকে রপ্তানি-নীতি বলা যায়, অর্থাৎ বাহিরে যত পার মাল পাঠাও এবং ঘরে যত পার টাকা আন। যতদূর সম্ভব ঘরের টাকা বাহিরে দিও না, এবং তাহার জন্য কিছুদিন যদি ভোগবিলাস কমাইতে হয়, প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবহার কমাইয়া দিয়া কষ্ট করিতে হয় এবং স্বদেশে উৎপন্ন জিনিসের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য কিছুটা অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়, দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির কথা ভাবিয়া তাহা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বর্তমানে ইহাই ভারত-সরকারের রপ্তানি ও আমদানির নীতি।

রপ্তানিবৃদ্ধির ব্যবস্থা

রপ্তানিবৃদ্ধির জন্য শিল্পমালিকদের উৎসাহদানের পরিকল্পনা ছাড়াও ভারত-সরকার ১৯৫৭ সালে একটি 'বৈদেশিক বাণিজ্যবোর্ড' (Foreign Trade Board) এবং একটি স্বতন্ত্র 'রপ্তানিবৃদ্ধির বিভাগ' (Directorate of Export Promotion) গঠন করেন। এই ডাইরেক্টোরেটের একটি করিয়া শাখা কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে আছে। ইহার কাজ হইল, রপ্তানি-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্পমালিকদের নানারকম পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া, পাসপোর্ট ভিসা বিদেশী-টাকা লাইসেন্স বাণিজ্যচুক্তি ইত্যাদি পাওয়া ও করার ব্যাপারে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা। এই বোর্ড ও ডাইরেক্টোরেট ছাড়াও

ভারত-সরকার এক-একটি জিনিসের রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা দেখিবার জন্য একটি করিয়া 'কাউন্সিল' (Export Promotion Council বলা হয়) গঠন করিয়াছেন। যে-সমস্ত জিনিসের রপ্তানি বাড়াইবার জন্য আলাদা কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল সুতির কাপড়, সিল্ক ও রেয়নের কাপড়, প্ল্যাস্টিক ও লিনোলিয়ম, তামাক, খেলার জিনিসপত্র, কেমিক্যাল্‌স, চামড়া, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জিনিসপত্র, অভ্র ও মসলাপাতি। ইহা ছাড়া রপ্তানির ব্যাপারে একটি উপদেষ্টা-সমিতিও গঠন করা হইয়াছে। রপ্তানির বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধে এই সমিতির অভিজ্ঞ সভ্যরা ভারত-সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইসব বিধিব্যবস্থা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় ভারত-সরকার রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ভারতীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পণ্যের প্রচারের জন্য প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ১৯৬০ সালে এই ধরনের আন্তর্জাতিক পণ্য-প্রদর্শনী হল্যাণ্ড আমেরিকা ফ্রান্স তুরস্ক যুগোস্লাভিয়া ইটালি পশ্চিম-জার্মানি ও ভিয়েনাতে হইয়াছিল এবং ইহার সবগুলিতেই ভারত-সরকার যোগদানও করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় পণ্যের প্রচারের ব্যবস্থা করা ছাড়াও, মধ্যে মধ্যে বাহিরে শুধু ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিছুদিন আগে এই ধরনের ভারতীয় পণ্যপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল আফ্রিকার কেনিয়া টাঙ্গানিকা উগাণ্ডা প্রভৃতি স্থানে। বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যকেন্দ্রে ভারতীয় পণ্যের প্রচারের জন্য 'শো-রুম' রাখারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্যের গতি

বাণিজ্যের গতি। ভারতের রপ্তানি ও আমদানি দুইরকম বাণিজ্যের প্রধান অংশীদার হইল ইংলণ্ড ও আমেরিকা। ভারতের রপ্তানি পণ্যের প্রধান ক্রেতা ইংলণ্ড এবং আমদানি-পণ্যের প্রধান সরবরাহক আমেরিকা। ১৯৫২ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সাত বছরের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব বর্তমানে পাওয়া যায়। এই সাত বছরের হিসাবের পরিপূর্ণ তালিকা

যাচাই করিবার আপাতত আমাদের প্রয়োজন নাই। কেবল ১৯৫৯ সালের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব দেখিলে আমরা ভারতের রপ্তানি-আমদানির গতি কোন্‌দিকে বুঝিতে পারিব :

১৯৫৯ সাল। ভারতের রপ্তানি

লক্ষ টাকার হিসাব

ইংলণ্ড	:	১৬৭·৬৪
আমেরিকা	:	৯৫·১২
জাপান	:	৩৯·৩৮
সোভিয়েট রাশিয়া	:	৩০·৩৪
সিংহল	:	২২·১৪
পশ্চিম-জার্মানি	:	১৯·৪৪
অস্ট্রেলিয়া	:	১৯·১৫
কানাডা	:	১৫·১২
সুডান	:	১৪·৬২
বর্মা	:	১২·৬২

ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে দেখা যায় প্রথম স্থান ইংলণ্ডের, দ্বিতীয় স্থান আমেরিকার, তৃতীয় স্থান জাপানের, চতুর্থ স্থান সোভিয়েট রাশিয়ার, পঞ্চম স্থান সিংহলের, ষষ্ঠ স্থান পশ্চিম-জার্মানির, সপ্তম স্থান অষ্ট্রেলিয়ার, অষ্টম স্থান কানাডার, নবম স্থান সুডানের ও দশম স্থান বর্মার। পরে যে ইহার অদল-বদল হইবে না এমন কোন কথা নাই। তবে এসিয়ার অন্যতম দেশ হিসাবে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির গতি ভবিষ্যতে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মনে হয় ইউরোপ আমেরিকার দিকেই প্রবল থাকিবে। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেশ প্রায় পৌনে দুইশত বছর ধরিয়া ইংলণ্ডের শাসনে ছিল বলিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের (কাপড় সিল্ক ইত্যাদি) উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের যে ধারণা ও বিশ্বাস আছে, ইউরোপে আর কাহারও তাহা নাই। বর্ত্তমানে এই ধারণা অন্যত্র গড়িয়া তুলিতে হইতেছে। ইংলণ্ড ভারতীয় রপ্তানির প্রধান ক্ষেত্র হইবার ইহাও একটি কারণ বলিয়া মনে হয়।

ভারতে কোন্ কোন্ দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করা হয় এইবার তাহা দেখা যাক। কি কি জিনিস প্রধানত আমরা বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকি আগে তাহা বলা হইয়াছে।

১৯৫৯ সাল। ভারতের আমদানি

লক্ষ টাকার হিসাব

আমেরিকা	:	১৯৫.৪৩
ইংলণ্ড	:	১৭২.৭২
পশ্চিম-জার্মানি	:	১১৮.৭২
জাপান	:	৪০.৯৬
ইরান	:	৩৫.৫৬
ইটালি	:	২৫.৮৬
কানাডা	:	২২.২১
সৌদি-আরব	:	২০.০৫
ফ্রান্স	:	১৯.১০
সোভিয়েট রাশিয়া	:	১০.৬৫

ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে দেখা যায় প্রথম স্থান আমেরিকার, দ্বিতীয় স্থান ইংলণ্ডের, তৃতীয় স্থান পশ্চিম-জার্মানির, চতুর্থ স্থান জাপানের, পঞ্চম স্থান ইরানের, ষষ্ঠ স্থান ইটালির, সপ্তম স্থান কানাডার, অষ্টম স্থান সৌদি-আরবের নবম স্থান ফ্রান্সের ও দশম স্থান সোভিয়েট রাশিয়ার। আমদানির এই রূপও ভবিষ্যতে বদলাইয়া যাইতে পারে, তবে ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রাধান্য। কাঁচা তুলা, খনিজ তেল, কেরোসিন তেল ইত্যাদির জন্য অদূর-প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এই তালিকার মধ্যে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু বৈদ্যুতিক ও সাধারণ যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল, সামরিক সরঞ্জাম, যানবাহন ও যোগাযোগের জিনিসপত্র, লোহা ও ইস্পাত ইত্যাদির আমদানির জন্য ভারতকে যে প্রধানত পাশ্চাত্য দেশগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা এই তালিকা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারত অনুন্নত ছিল। শিল্পায়নক্ষেত্রে ভারতকে ব্যাপক উন্নয়ন-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে হইতেছে শিল্পোন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হইবার জন্য। এই পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য বর্তমান অবস্থায়

যে তাহাকে বিদেশের পণ্য আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার মধ্যেও (১৯৫৬-৬১) দেখা গিয়াছিল যে গড়ে প্রতি বছরে প্রায় ১০৫০ কোটি টাকার বিদেশী পণ্য ভারতে আমদানি করা হইয়াছে। এই আমদানির বদলে এই সময় ভারত হইতে প্রতি বছরে গড়ে প্রায় ৬১০ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি করা হইয়াছিল :

১৯৫৬-৬১ সাল

গড়ে প্রতি বছরে আমদানি	১০৫০ কোটি টাকা
গড়ে প্রতি বছরে রপ্তানি	৬১০ কোটি টাকা
গড়ে প্রতি বছরে ঘাটতি	৪৪০ কোটি টাকা

বৈদেশিক বাণিজ্যের খাতে ভারতে এই ঘাটতি সহজে পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজকর্ম আরও কিছুদিন জোর দিয়া চালাইতে হইবে এবং তাহা চালাইতে হইলে বিদেশ হইতে উৎপাদক-বস্তু ও প্রয়োজনীয় উপকরণও আমদানি করিতে হইবে। সুতরাং ভারতের বাণিজ্য-তহবিল (trade balance) আরও কিছুকাল ঘাটতি থাকিবে।

ঘাটতি পূরণের উপায়। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি পূরণের উপায় কি? উপায় হইল দুইটি।

১। উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি লৌহ-ইস্পাত, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মূল কেমিক্যাল ইত্যাদি যত শীঘ্র পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা আমাদের দেশে উৎপাদন করিতে পারিব, তত শীঘ্র বিদেশ হইতে এইসব জিনিস আমদানি করার প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ উৎপাদক-বস্তু (capital goods) ও শিল্পের মৌল উপকরণ (basic materials) উৎপাদনে আত্মনির্ভর না হইলে বিদেশের জিনিস আমদানি কমানো সম্ভব হইবে না।

২। ভারতের যে-সমস্ত পণ্যের চাহিদা আছে বিদেশে তাহার উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়াইয়া রপ্তানিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রপ্তানি যত আমরা বাড়াইতে পারিব তত আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি কমিবে। এইজন্য ভারত সরকার ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভারতের বর্তমান শিল্পোন্নতির গতি বজায় থাকিলে এবং রপ্তানি-নীতি কার্যকর করিতে পারিলে, ভারত-সরকার আশা করেন আগামী ১০ বছরের মধ্যে

(১৯৭১-৭২ সাল) আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-তহবিলের ঘাটতি পূরণ হইয়া যাইবে।

তৃতীয় যোজনায় বৈদেশিক বাণিজ্য। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় বৈদেশিক বাণিজ্যের এই নীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে। আমদানি যথাসম্ভব কমাইতে হইবে এবং রপ্তানি যথাসাধ্য বাড়াইতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় (১৯৫৬-৬১) গড়ে প্রতি বছরে ৬১০ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি করা হইয়াছে। তৃতীয় যোজনায় ঠিক হইয়াছে যে এই রপ্তানি বাড়াইয়া বছরে অন্তত ৬৯০ কোটি টাকা করা হইবে, অর্থাৎ বছরে প্রায় ৮০ কোটি টাকা করিয়া রপ্তানি বাড়ানো হইবে। তাহা হইলে তৃতীয় যোজনার মধ্যে (১৯৬১-৬৬) পাঁচবছরে সর্বসাকুল্যে রপ্তানির পরিমাণ হইবে ৬৯০ কোটি × ৫ = ৩৪৫০ কোটি টাকা।

রপ্তানি-বাণিজ্যে যে-সব জিনিসের চাহিদা বেশী—যেমন চা কফি তামাক কাপড় মসলা পাট ভেজিটেবল-তেল ইত্যাদি—সেই সব জিনিসের উৎপাদন বাড়াইবারও ব্যবস্থা তৃতীয় যোজনায় করা হইয়াছে। রপ্তানি করা হইবে বলিয়াই এই জিনিসগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন

ভারত-সরকার একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) স্থাপন করিয়াছেন (১৯৫৬)। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এই কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। যতরকম উপায়ে সম্ভব ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসারের পন্থা উদ্ভাবন করা কর্পোরেশনের অন্যতম কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন' সাধারণত এই কাজগুলি করিয়া থাকেন :

১। যে-সব দেশ হইতে শিল্পায়নের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানি করিতে হয়, সেইসব দেশে বিশেষ করিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা। তাহা করিতে হইলে যে-শ্রেণীর ভারতীয় পণ্যের চাহিদা সেই সব দেশে বেশী, সেগুলির উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

২। পৃথিবীর কোন্ দেশে কি কি ভারতীয় পণ্যের চাহিদা চেষ্টা করিলে

হইতে পারে তাহা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে চাহিদা তৈরী করা। অর্থাৎ ভারতীয় পণ্যের জন্য বাহিরে ভাল বাজার খোঁজ করা এবং বাজার তৈরী করা কর্পোরেশনের একটি বড় কাজ।

৩। যে দেশের সহিত যতদূর সম্ভব পণ্য-বিনিময়ের শর্তে বাণিজ্যের চুক্তি করা, অর্থাৎ আমাদের জিনিস দিয়া অন্যের জিনিস নেওয়ার ব্যবস্থা করা। ইহা করিতে পারিলে বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা থাকে না, পণ্যের বদলে পণ্য দিয়া দেনা-পাওনা শোধ করা যাইতে পারে।

৪। শিল্পের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ যাহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা বেশী পরিমাণে একসঙ্গে আনিয়া বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসময়ে সরবরাহ করা। ইহাতে পৃথকভাবে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আমদানির ব্যাপার লইয়া ঝঞ্ঝাট করিতে হয় না এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়ার ফলে তাহার উৎপাদনের কাজও ভালভাবে চলিতে পারে।

মোটামুটি এই ধরনের কয়েকটি দায়িত্ব 'স্টেট-ট্রেডিং কর্পোরেশনে'র উপর দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা পালিত হইলে ভারতের শিল্পোৎপাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না, রপ্তানি-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে। কর্পোরেশনের চেষ্টায় কয়েকটি জিনিসের রপ্তানির সুবিধাও হইয়াছে—যেমন খনিজ পদার্থ, চা কফি লবণ পশম কুটিরশিল্প ইত্যাদি। জাপান ও অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশের সহিত বিশেষ বাণিজ্যচুক্তি করিয়া ভারতের খনিজ ও লোহা রপ্তানিতেও কর্পোরেশন অনেক সাহায্য করিয়াছে। ১৯৫৬ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৫৯-৬০ সালের শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন প্রায় ১২০ কোটি টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়াছে, তাহার মধ্যে শুধু ১৯৫৯-৬০ সালের পরিমাণ হইল ৪৫ কোটি টাকা (রপ্তানি ১৬½ কোটি টাকা, আমদানি ২৮½ কোটি টাকা)। ক্রমে বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কাজকর্ম যে আরও বাড়িতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই বিবরণ হইতে তাহার অর্থনীতিক অগ্রগতির যে আভাস পাওয়া যায় তাহা আশাপ্রদ। মাত্র ১০ বছরে দেশের নীতিক ভিত্তি নূতন করিয়া গঠন করিয়া বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এইটুকু হওয়াও সহজ কথা নহে। দুইটি মাত্র পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজ

শেষ করিয়া, বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার সমস্ত সমস্যা যথসম্ভব সামলাইয়া, যদি এতটুকু পর্যন্ত করা সম্ভব হইয়া থাকে, আশা করা যায় তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনার উন্নয়ন ও উৎপাদনের কাজ শেষ হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রেও বাহিরের লক্ষ্মী আমাদের ঘরে আসিবেন, অর্থাৎ দেশের জিনিস বিদেশে পাঠাইয়া আমরা ঘরে টাকা আনিতে পারিব। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বা তহবিলও (trade balance) আমাদের পাওনার দিকে অনেক ভারী হইবে এবং বিদেশের ঋণ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব।

QUESTIONS

Group A

1. What are the commodities which India exports and the principal countries to which India exports ?

2. What are the commodities which India imports and the principal countries from which India imports ?

3. What is the present foreign trade policy of our National Government ?

রপ্তানি বাড়ানো ও আমদানি কমানো—ইহাই আমাদের বর্তমান বাণিজ্যনীতি। এই বিষয়ে লিখিতে হইবে।

4. Why our Government has adopted the policy of export promotion and import restriction ? How the Government is trying to intensify export promotion ?

স্বদেশের শিল্পোন্নতির জন্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যে যাহাতে আমরা আত্মনির্ভর হইতে পারি সেইজন্য ভারত-সরকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানি কমানো এবং স্বদেশী দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ানোর কথা বলিতেছেন। কেন — তাহা বুঝাইয়া লিখিতে হইবে।

5. What is State Trading Corporation ? When and for what purpose was it established ? How is it functioning at present ?

Group B

I. Mark out the things which do not belong to the group :

Group A : *Our Principal Exports*

Food, Capital goods, Tea, Cotton fabrics, Leather, Jute, Wheat, Woolen goods.

Group B : *Our Principal Imports*

Coffee, Vegetable oil, Chemicals, Machineries, Hides and Skins, Coal, Tobacco.

II. (a) Exports 100, Imports 100 = Balance (0)
(b) Exports 80, Imports 100 = Balance (— 20)
(c) Exports 100, Imports 80 = Balance (+ 20)

Which one of the above three positions do you think most favourable—a, b or c ?

III.

	EXPORTS			IMPORTS	
1.	Tea	: Rs. 100	1.	Machineries	: Rs. 200
2.	Cotton fabrics	: Rs. 80	2.	Chemicals	: Rs. 100
3.	Leather	: Rs. 70	3.	Wheat	: Rs. 100
4.	Sugar	: Rs. 60	4.	Rice	: Rs. 100
5.	Coffee	: Rs. 60	5.	Electricals	: Rs. 100
6.	Vegetable oil	: Rs. 50	6.	Iron and steel	: Rs. 100
7.	Tobacco	: Rs. 50	7.	Military equipment	: Rs. 100

If we have the above exports and imports in one year, what would be the 'trade balance'? Can you call it 'favourable'?

এখানে রপ্তানি ৪৭০৲ এবং আমদানি ৮০০৲, কাজেই 'trade balance' হইল (—৩৩০৲)। ইহা 'unfavourable' বা অবাঞ্ছনীয় তহবিল।

IV. Choose the *most appropriate* answer out of three purposes suggested :

(a) *Export promotion* is necessary
because : 1. our goods can be sold in foreign markets.
2. our goods get good publicity abroad.

*3. our industries can grow and we can bring in more wealth from foreign countries.

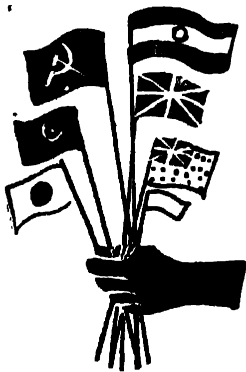
(b) *Import restriction* is necessary

because : *1. it encourages national industries and favours the growth of a national market for national goods.

2. we should not use foreign goods.

3. we can save our money.

*তারকাচিহ্নিত উত্তরগুলি 'most appropriate.'



দশম প্রকরণ। তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি

ভূমিকা। ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক (National Emblem) সারনাথের অশোকস্তম্ভের শিরোভাগ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কেবল মূর্তিকলার জন্য ইহা জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, ভারতের জাতীয় আদর্শ ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ইহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতের কোন্ আদর্শ ও ঐতিহ্য এই প্রতীকের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে? অহিংসা ও শান্তির আদর্শ। এই আদর্শ কতকালের প্রাচীন?

বেদ-উপনিষদের কালে ঋষিদের কণ্ঠে এই আদর্শ ভারতভূমিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে:

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ
অন্তরীক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিঃ

সুতরাং এই আদর্শ হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। এই আদর্শই গৌতম বুদ্ধ ও ভারতের শত শত সাধকপুরুষের কণ্ঠে যুগে যুগে ধ্বনিত হইয়াছে। আর প্রাচীন ভারতের সম্রাটদের মধ্যে প্রিয়দর্শী অশোক এই অহিংসা ও শান্তির আদর্শকে ইহলোকের জনসমাজে বাস্তব রূপ দিবার আন্তরিক চেষ্টা

---

10 (c) India's foreign policy—Policy of Non-Alignment—participation in World Organisation—India's efforts in the preservation of world peace—India's place in the comity of Nations.

করিয়াছিলেন। কেবল ভারতের ইতিহাসে নহে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাই সম্রাট অশোক লোকচিত্তজয়ী হইয়াছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আদর্শ

জাতীয় আদর্শই আন্তর্জাতিক আদর্শকে রূপায়িত করে। জাতীয় আদর্শের মধ্যে প্রতিফলিত হয় জাতীয় চরিত্র। যে-কোন ব্যক্তির জীবনের আদর্শের মধ্যে যেমন তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতিফলন হয়, রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যেও তেমনি রাষ্ট্রের আসল চরিত্র ফুটিয়া ওঠে। অশোকস্তম্ভের শিরোভাগ যাহা জাতীয় আদর্শের প্রতীকরূপে ভারতরাষ্ট্রে গৃহীত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য কি?

বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব বারাণসীর অদূরে সারনাথে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সারনাথেই বুদ্ধ তাঁহার সাধনালব্ধ শান্তি মৈত্রী ও অহিংসার বাণী ভারতজন ও বিশ্বজনের কাছে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক তাই সারনাথে একটি শিলাস্তম্ভ স্থাপন করিয়া শান্তি ও অহিংসার আদর্শের কথা তাহার গায়ে খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন। সারনাথের অশোকস্তম্ভের শিরোভাগটি তাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সারনাথের অশোকস্তম্ভের শীর্ষে চারটি সিংহ পিঠাপিঠি দাঁড়াইয়া আছে, তিনটিকে দেখা যায়, একটিকে সামনের দিক হইতে দেখা যায় না। মধ্যে আছে একটি ধর্মচক্র। ভারত-সরকার ইহাকেই জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল দেবনাগরী অক্ষরে উপনিষদের বাণী 'সত্যমেব জয়তে' নিচে খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শান্তি, অহিংসা ও সত্য—ইহাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই জাতীয় আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাইয়াছে।

ভারতের শান্তিনীতি

ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ হইল শান্তি অহিংসা মৈত্রী ও সত্যনিষ্ঠা। এই আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'পঞ্চশীল' আদর্শের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের 'শীল'-সাধনা হইতে 'পঞ্চশীল' কথার উৎপত্তি। 'শীল' হইল

চরিত্রের এক-একটি অবলম্বন বা নীতি, শীলের ভিত্তির উপর চরিত্র গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু 'পঞ্চশীল' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই পাঁচটি নীতির কথা উল্লেখ করেন:

১। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সত্তার অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতা স্বীকার করা।

২। কাহাকেও আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া।

৩। কাহারও ঘরোয়া বা জাতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

৩। সকল রাষ্ট্রকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং কোন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

৫। শান্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করার আদর্শ মানিয়া চলা।

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত ইন্দোনেসিয়ার 'বান্দুং সম্মেলনে' (Bandung Conference) এসিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি রাষ্ট্র এই পঞ্চশীলের আদর্শ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী একটি যুগ্ম-বিবৃতিতে পঞ্চশীল নীতি সমর্থন করেন। ক্রমে যুগোস্লাভিয়া চেকোস্লোভাকিযা পোল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও পঞ্চশীলের প্রশংসা করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পঞ্চশীলের শান্তি, সহাবস্থান ও অহিংসার আদর্শ সারা পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই পঞ্চশীল ভারতে পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান স্তম্ভ বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সাল হইতে ১৯৬২ সালের মধ্যে অন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বহু বিরোধ, সংঘর্ষ, এমনকি মধ্যে মধ্যে মহাযুদ্ধের সম্ভাবনাও ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়াছে, কিন্তু ভারত কোনদিন কোন স্বার্থের জন্য কখনও অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ হইতে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই। বর্তমান পৃথিবীতে যে হিংসা ও হানাহানির পথে কখনও বিশ্বমানবের মঙ্গল হইতে পারে না, এসত্য ভারত উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস সত্যের জয় হইবেই। যাহারা ভিন্নপথের পথিক তাহাদের একদিন এই সত্যে বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহা না হইলে পৃথিবীতে শান্তি নাই, মানুষেরও মঙ্গল নাই, এমন হিংসাত্মক হানাহানিতে মানবজাতি পর্যন্ত পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

অপক্ষপাতিতা-নীতি

অপক্ষপাতিতা-নীতি (Policy of Non-Alignment) কাহাকে বলে ? কাহারও প্রতি কোন পক্ষপাতিতা নাই এমন যে নীতি তাহাকেই অপক্ষ-পাতিতা-নীতি বলা যায়। শান্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করার আদর্শ মানিয়া চলিবার জন্য ভারতরাষ্ট্রকে এই অপক্ষপাতিতা-নীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্বদাই পালন করিতে হয়। তাহা না করিয়া উপায় নাই। কেন নাই ?

মনে করা যাক্—একটি পাড়ায় ক খ গ ঘ চারিটি পরিবার বাস করে। ক শান্তিতে বাস করিতে চায়। কিন্তু শান্তিতে বাস করিতে চাহিলেই যে করা যাইবে এমন কোন কথা নাই। খ জোর করিয়া ক-কে খোঁচাইতে পারে, খ গ ঘ পরস্পর বিবাদ করিতে পারে। ক তখন কি করিবে ? যে তাহাকে বিরক্ত করিতেছে তাহার সহিত আপসে মিটমাট করার চেষ্টা করিবে, উপরন্তু খ গ ঘ যাহাতে পরস্পর বিবাদ না করে তাহারও চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। খ হয়ত ক-এর কাছে গ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল, গ ও ঘ করিল খ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ। সকলের সব অভিযোগ ধৈর্য ধরিয়া শুনিয়া ক চেষ্টা করিবে যাহাতে তাহাদের বিবাদ-বিরোধ মিটিতে পারে এমন একটি উপায় ঠিক করিতে। কিন্তু পরস্পরের অভিযোগ শুনিবার সময় ক যদি খ-গ-ঘ যে-কোন একজনের বা দুইজনের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে অন্যরা আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, বিশেষ দলভুক্ত মনে করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। ফলে কি হইবে ? চারিটি পরিবারের মধ্যে দুইটি বা তিনটি 'দল' হইয়া গিয়া দলাদলি ও বিরোধ আরও বাড়িয়া যাইবে, এবং ক-এর আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শান্তিতে অন্যদের সহিত সহাবস্থান করা আর সম্ভব হইবে না। কাজেই 'ক' যদি বাস্তবিকই শান্তি চায়, তাহা হইলে বিবদমান প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের সহিত তাহাকে একই মনোভাব লইয়া মেলামেশা করিতে হইবে, কাহারও প্রতি কোন কারণে পক্ষপাতিতা প্রকাশ করিলে চলিবে না। শান্তির সহিত অপক্ষপাতিতার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তাহা এই ছোট দৃষ্টান্তটি হইতে পরিষ্কার বোঝা যায়। এই কারণে ভারত-সরকার অপক্ষপাতিকে শান্তিনীতির বনিয়াদ বলিয়া মনে করেন এবং অজস্র বাধাবিঘ্নের মধ্যেও তাঁহারা এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার প্রয়োজনবোধ করেন নাই।

ভারতের এই অপক্ষপাতিতা-নীতির ফল আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে যে কতখানি শুভ হইয়াছে তাহা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি আজ প্রধানত দুইটি বড় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে যুদ্ধক্ষেত্রের দুইপক্ষের শিবিরের সহিত তুলনা করা যায়। একটি সাধারণ ধন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শিবির, আর-একটি সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শিবির। প্রথম শিবিরের প্রধান নায়ক আমেরিকা, দ্বিতীয় শিবিরের প্রধান নায়ক সোভিয়েট রাশিয়া। দুই শিবিরের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিবাদ-বিরোধ লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে বিরোধ এমন তীব্র হইয়া ওঠে যে মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা দেয় এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না যে এই বিরোধের কোনদিন মীমাংসা হইবে।

এই দুই পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতের পক্ষে কি করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বৈঠা ধরিয়া রাখা সম্ভব হইতেছে? একমাত্র অপক্ষপাতিতার জন্য। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের রাষ্ট্রগোষ্ঠী ছাড়াও একদল রাষ্ট্র আছে—যেমন 'সংযুক্ত আরব রিপাবলিক', আফ্রিকার কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্র—যাহারা কোন শিবিরের সহিত নিজেদের স্বার্থ ও আদর্শ জড়িত করিতে রাজী নহে। এই তৃতীয় দলের রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্তা হইয়া উঠিয়াছে ভারত। ভারতের ধীর স্থির শান্ত সংযত মৈত্রীর বাণী আজ তাহাদের প্রধান আশাভরসা, রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে চলার পথের শ্রেষ্ঠ সম্বল। শুধু তাহাই নহে, ভারতের অপক্ষপাতিতার জন্য আজ দুইটি প্রধান বিরোধী শিবিরের রাষ্ট্রগোষ্ঠীও বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভারতের মুখাপেক্ষী হইয়াছে। একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া, অন্যদিকে আমেরিকা, দুইপক্ষই আজ ভারতের মধ্যস্থতার উপর সমান নির্ভরশীল ও আস্থাবান। আজ বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে যে-কোন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতের নির্ভিক প্রতিবাদ ও সমালোচনার সশ্রদ্ধ শ্রোতা সকলে। অস্ত্রবলের তুলনায় নীতিবল ও আদর্শবল যে কত বেশী শক্তিশালী, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে ও বিতর্কে ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেইজন্য অস্ত্রবলে বলীয়ান রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই ভারতের নীতিবলকে আজও অশ্রদ্ধা বা অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই।

ভারতের অপক্ষপাতিতা-নীতি যে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ভারত-রাশিয়ার ও ভারত-আমেরিকার



প্রীতি-মৈত্রীর সম্পর্ক। দুইপক্ষের কোন অপ্রীতিকর প্ররোচনাতেই ভারত কাহারও সহিত এই প্রীতির সম্পর্ক ত্যাগ করে নাই। ভারতভূমিতে আজ সোভিয়েট রাশিয়ার ও আমেরিকার সহযোগিতা অর্থনীতিক্ষেত্র হইতে শিক্ষা-সংস্কৃতিক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত, এবং সকলের সহযোগিতা ভারতের কাম্য। বাহিরের রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধানেও ভারত সহযোগিতা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কোরিয়ার যুদ্ধে এবং আফ্রিকা-এসিয়ার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে ও নানাবিধ সমস্যার সমাধানে ভারত যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা দলনির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে।

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থান

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থান আজ এই নীতির দ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতের আন্তর্জাতিক কর্মধারা হইতে এই অপক্ষপাতিতা, শান্তি অহিংসা ও মৈত্রীর নীতিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

পঞ্চদশ সাধারণ সভার বৈঠক। ২০ সেপ্টেম্বর হইতে ২০ ডিসেম্বর ১৯৬০ পর্যন্ত নিউইয়র্কে ইউ. এন. ও.'র 'জেনারেল অ্যাসেম্বলি'র বৈঠক হয়। এতবড় বৈঠক বোধহয় 'ইউ. এন. ও.-র ইতিহাসে আগে আর কখনও হয় নাই। বড়-ছোট-মাঝারি সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার অসাধারণ গুরুত্বের জন্যই এই প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে যে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের কথা আগে বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। দুইপক্ষের কেহই বিরোধের অবসানের কথা চিন্তা না করিয়া এমন পথে অগ্রসর হইতেছিল যে হঠাৎ কোন সামান্য কারণ অবলম্বন করিয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই জিদ ধরিয়া বসিয়াছিল কেহ কাহারও কাছে নতি স্বীকার করিবে না। এই সময় ইউ. এন্. ও.-র সাধারণ সভার বৈঠক হয় নিউ ইয়র্কে। এই বৈঠকে ঘানা, ইন্দোনেসিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের সহিত ভারত একযোগে প্রস্তাব করে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে অবিলম্বে সাক্ষাৎ মিলন ও আলাপ-আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কেবল তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থে নহে। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে উভয়পক্ষের নায়কদের এই মিলনের প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তাব অবশ্য গৃহীত হয় নাই।

জেনেভা বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে আলোচনার জন্য এবং যত শীঘ্র সম্ভব সর্বসম্মতিক্রমে নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া ভারত একটি প্রস্তাব পেশ করে। পারমাণবিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করিবার জন্যও আর-একটি প্রস্তাব ভারতীয় প্রতিনিধি পেশ করেন। প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থন। আফ্রিকা-এসিয়ার বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিয়া ভারত সকলের জন্য রাষ্ট্রসংঘে নির্ভয়ে সংগ্রাম করিয়াছে। কঙ্গো, আলজিরিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্র হইলেও ভারত তাহাদের স্বাধীনরাষ্ট্রের যোগ্য মর্যাদা দিবার প্রস্তাব করিয়াছে রাষ্ট্রসংঘে এবং এই সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ন্যায্য দাবীদাওয়া সমর্থন করিয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার পঞ্চদশ বৈঠকে

(১৯৬০) আফ্রিকা-এসিয়ার আরও ২৪টি রাষ্ট্রের সহিত একযোগে ভারত প্রস্তাব করে যে এখনও যে-সমস্ত দেশ বিদেশী শাসনে বা অভিভাবকত্বে আছে তাহাদের সকলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই প্রস্তাব সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থান কোথায় ও ভুমিকা কি তাহা এই সব দৃষ্টান্ত হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জন্য ভারত আজ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রমঞ্চে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। আধুনিক অস্ত্রবলে বলীয়ান নহে এরকম ছোটবড় সকল রাষ্ট্রের উপর ভারতের অখণ্ড প্রভাব আজ বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও হিংসার বস্তু হইয়াছে। আমেরিকা বা রাশিয়া মারণাস্ত্রের হুমকি দিয়া যাহা করিতে পারে না, ভারত অনায়াসে তাহা নৈতিক শক্তির জোরে করিতে পারে—ইহা হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে এক আশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এইজন্য যাহারা মারণাস্ত্র বিশ্বাসী এবং হিংসাত্মক শক্তির সাধক। তাহারাও ভারতের এই আদর্শ-নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর যাহারা আজও অতীতের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নির্যাতন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোগ করিতেছে, তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ সহায় ও মুখপাত্র ভারত। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের আদর্শ হইল সকল জাতি ও রাষ্ট্রকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া এবং এই আদর্শের অন্যতম ধারক-বাহক হইল আজ ভারত।

আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পথে ভারত

এসিয়া আফ্রিকা আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সৌহার্দের সম্পর্কের মধ্যে ভারতের মৈত্রীনীতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে। সৌহার্দের সম্পর্ক কেবল যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে, অর্থনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হইতেছে।

এসিয়া। দক্ষিণপূর্ব এসিয়া, পূর্ব-এসিয়া ও পশ্চিম-এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সৌহার্দের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। থাইল্যাণ্ড, লাওস কাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম সকলকে ভারত অর্থনীতিক উন্নয়ন ও রাজনীতিক

শান্তিরক্ষার ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। ইন্দোনেসিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো যখন ১৯৬০ সালে ভারতভ্রমণে আসেন তখন ভারত ও ইন্দোনেসিয়ার মধ্যে সেনাবাহিনীর সহযোগিতার চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

পূর্ব-এসিয়ায় সম্প্রতি ভারত-চীনের মৈত্রীবন্ধন সীমানা-সমস্যা লইয়া শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারত-জাপানের মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের যুবরাজ ও রাজকুমারী ভারত-সফরে আসিয়া এই বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। অর্থনীতিক্ষেত্রে ভারতের সহিত জাপানের সহযোগিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য উভয়ের মধ্যে একাধিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

পশ্চিম-এসিয়ায় ইরান ইরাক জর্ডান লেবানন তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সৌহার্দ সর্বক্ষেত্রেই বজায় রহিয়াছে। চীনদেশে ইরানের স্বার্থ ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই দেখাশুনা করিয়াছেন। ভারত-ইরানের মধ্যে এক বিমান চলাচলের চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছে (আগস্ট ১৯৬০)। ইরাকের সহিতও ভারতের মধুর সম্পর্ক আছে। ইরাকের প্রতিনিধিরা উন্নয়ন-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ভারতে যাতায়াত করিয়াছেন, ভারতীয় প্রতিনিধিরা বাণিজ্যবিষয়ে আলোচনার জন্য বাগদাদে গিয়াছেন। জর্ডানের সহিতও ভারত বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজে লেবানন-সফরে গিয়াছিলেন এবং লেবাননবাসীর আন্তরিক প্রীতির প্রকাশে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তুরস্কের আমন্ত্রণেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন তুরস্ক সফর করেন, তখন তুরস্কবাসীর সম্বর্ধনায় তিনি অভিভূত হন। পশ্চিম-এসিয়ার জর্ডান লেবাননের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকেও যে ভারত কতখানি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়া থাকে তাহা এই সম্পর্ক হইতে বোঝা যায়। ভারতের এই প্রকৃত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষ করিয়া এসিয়া-আফ্রিকায় ভারতের অখণ্ড প্রতিপত্তির মূল কারণ এই আন্তর্জাতিক সমতাবোধ ও অপক্ষপাতিতা।

আফ্রিকা। কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকা ছাড়া, আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সৌহার্দের সম্পর্ক সম্প্রতি আরও গভীর হইয়াছে। ভারতের সহিত 'সংযুক্ত আরব রিপাবলিকে'র সম্পর্ক যে কত প্রীতিপূর্ণ

তাহা প্রেসিডেণ্ট নাসের ও পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক হইতেও বোঝা যায়। প্রেসিডেণ্ট নাসের নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে বর্তমান পৃথিবীতে একজন রাষ্ট্রনায়ক তাঁহার রাজনীতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু। নেহরু-নাসেরের ব্যক্তিগত প্রীতিবন্ধন আজ সারা পৃথিবীর আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছে।

আলজিরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারত পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে এবং বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে আলজিরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। মরক্কোর সহিত ভারত বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ এবং মরক্কোর স্থানীয় নির্বাচন (election) তদারক ও ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারকে পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছে। প্যাট্রিস লুবুম্বার প্রধানমন্ত্রীত্বে যখন কঙ্গোর জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় তখন ভারত তাহা সমর্থন করে। ম্যাডাগাস্কার স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাইবার পর ভারত তাহার স্বাধীনতা-উৎসবে যোগদান করে।

পশ্চিম-আফ্রিকায় ক্যামারুন, তোগোল্যাণ্ড, ঘনা ও নাইগেরিয়া ১৯৬০ সালের জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা অর্জন করে। ভারত সানন্দে এই সব রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-উৎসবে যোগদান করে।

কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকার বিজাতীয় জাতিবিদ্বেষনীতির সহিত ভারত কোনরকম সহযোগিতা করিতে পারে নাই। সেখানকার ভারতীয়দের উপর অমানুষিক সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারত শুধু দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ভারতের এই প্রতিবাদ আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্র সমর্থন করিয়াছে এবং ঘনা ও নাইগেরিয়া এই কারণে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে অর্থনীতিক্ষেত্রে বয়কট করিবে সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

ঈথিওপিয়ার সহিতও ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে। ঈথিও-পিয়ার সেনাদলের শিক্ষার জন্য ভারতে সামরিক শিক্ষাশিবির পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় সেনাবিভাগের অভিজ্ঞ কর্মচারীরা ঈথিওপিয়ায় সামরিক শিক্ষার জন্য একটি আকাডেমি স্থাপনেরও ব্যবস্থা করিতেছেন। আফ্রিকার সহিত ভারতের মৈত্রীবন্ধন এইভাবে সর্বক্ষেত্রে দৃঢ় হইয়াছে ও হইতেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকা। ইউরোপে কমিউনিস্ট ও অকমি

দুই দলের প্রত্যেক রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সদ্‌ভাব রহিয়াছে, কারণ রাজনীতিক আদর্শদ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া কোন বিশেষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পক্ষ অ... করা ভারতের পররাষ্ট্রনীতিবিরুদ্ধ। তাই সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের পোল্যাণ্ড রুমানিয়া বুলগেরিয়া চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত ভারতের যেমন বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, ইটালি ফ্রান্স বেলজিয়াম হল্যাণ্ড পশ্চিম-জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিতও অনুরূপ সম্পর্ক ভারতের আছে। কাহারও বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য কাহারও সহিত এই সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেদন করিতে ভারত কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। স্বাধীনতালাভের পর ভারত-ইংলণ্ডের সম্পর্কেও কোন প্রকার তিক্ততার সৃষ্টি হয় নাই, বরং 'কমনওয়েলথ' রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আদর্শের বন্ধনে এই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হইয়াছে।

আমেরিকা মহাদেশে কানাডা, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র হইতে মেক্সিকো ও দক্ষিণআমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতের আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রহিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যেমন আগে সোভিয়েট রাশিয়া সফর করিয়াছেন, তেমনি পরে আমেরিকা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে সফর করিয়া এই সৌহার্দের সম্পর্ক দৃঢ় করিয়াছেন।

প্রতিবেশী-রাষ্ট্র। পাকিস্তান নেপাল ভুটান সিকিম বর্মা সিংহল আফগানিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের সহিত ভারত সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। অপক্ষপাতিতা-নীতির একটি বড় বিপদ হইল এই যে ইহাতে অনেক সময় অন্যের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। যাহারা কোন বিশেষ দলভুক্ত হইতে না পারিলে নিজেরা ভরসা পায় না, তাহারা ভারতের অপক্ষপাতিতা যে সমসময় বুঝিতে পারিবে এমন নিশ্চয়তা নাই। পাকিস্তান-ভারতের সম্পর্ক হইতে এবং সম্প্রতি নেপাল-ভারতের সম্পর্ক হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভারতের শান্তি অহিংসা মৈত্রী ও অপক্ষপাতিতার আদর্শের তাৎপর্য পাকিস্তান উপলব্ধি করিতে পারে না, উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে ডিক্টেটরী শাসনব্যবস্থায় সম্ভবও নহে। সেইজন্য ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের মধ্যে নানাকারণে প্রায় তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং দুই প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের মধ্যে বাহিরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকিলেও ভিতরে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বলিয়া কিছু নাই।

ভারতের সহিত চীনের বন্ধুত্ব সীমান্তের ব্যাপারে বেশ কিছুটা সম্প্রতি

ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এমন কি তাহা লইয়া যুদ্ধ বাধাইতেও চীন দ্বিধা করে নাই। ইহারই সুযোগ লইয়া স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রগুলি ভারত-নেপালের সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। অথচ ভারত-নেপালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক দীর্ঘকালের স্থায়ী সম্পর্ক, তাহা সহজে ক্ষুণ্ণ হইবার কথা নহে। এ-সম্পর্ক কেবল রাজনীতির সম্পর্ক নহে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ও ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক। তবু অবিশ্বাস এমন জিনিস যে একবার ইহা মনে বাসা বাঁধিলে পরস্পরের মধুর সম্পর্কও বিষাইয়া তোলে। এই অবিশ্বাস আজ নেপালের মনে বাহিরের স্বার্থপর কয়েকটি রাষ্ট্র জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নেপালের সহিত ভারত যথাসাধ্য প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখারই চেষ্টা করিতেছে এবং মনে হয় নেপালের মনে সম্প্রতি নানাকারণে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে দূর হইয়া যাইবে।

বর্মা সিংহল ও আফগানিস্তানের সহিত ভারতের মৈত্রীবন্ধন কোন কারণে শিথিল হয় নাই, বরং সম্প্রতি আরও দৃঢ় হইয়াছে। প্রতিবেশীর সহিত যেরকম সম্প্রীতির সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় তাহা ইহাদের সহিত ভারত সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে। ভুটান ও সিকিমরাজ্যের সহিতও ভারত বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহা ছিন্ন হইবার কোন কারণ নাই। উভয় রাজ্যের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় ভারত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এই পক্ষপাতশূন্য মিত্রতার সম্পর্কের মধ্যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল আদর্শ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অপক্ষপাতিতা অবশ্যই ইহার ভিত্তি, কিন্তু তাহা কাপুরুষ ও দুর্বলের অপক্ষপাতিতা নহে। রাজনীতিক আদর্শদ্বন্দ্বে ভারতের পক্ষপাতিতা নাই, ইহাই অপক্ষপাতিতার মূল কথা। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের জন্য, আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য ভারত সবসময় সত্যের পক্ষপাতী, ন্যায়ের পক্ষপাতী এবং শান্তির পক্ষপাতী। যাহারা হিংসা ও অশান্তির পথে চলিতে চায়, অন্যায় ও অসত্য সমর্থন করে, ভারত তাহাদের নীতিবিরোধী এবং প্রকাশ্যে এই বিরোধ ঘোষণা করিতেও তাহার 'অপক্ষপাতিতায়' কোনদিন বাধে নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের অপক্ষপাতিতা যে নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর নহে, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। ভারতের এই পররাষ্ট্রনীতি তাহার স্বাতন্ত্র্য ও নৈতিক শক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, ইহার মধ্যে দুর্বলতার স্থান নাই।

QUESTIONS

Group A

1. "The aim of India's foreign policy is to promote international peace and cooperation." Discuss the statement, with reference to India's Policy of Non-Alignment.

2. Write what you know about India's participation in World Organisations and her efforts in the promotion of World Peace.

3. Write a short essay on the necessity of World Peace today.

Group B

1. Choose the *most appropriate* answer out of four purposes suggested :

(a) *Pancha Sheela* is desirable

because : 1. it is an old Indian concept.

2. it helps one country to dominate.

*3. it helps nations to live together peacefully.

4. it creates less international trouble.

(b) *World Peace* is desirable

because : 1. World War is bad.

2. it promotes happiness.

3. people do not want war.

*4. in the modern age of atomic weapons war may lead to the annihilation of mankind and none would emerge victorious to gain anything.

*তারকাচিহ্নিত উত্তরগুলি 'most appropriate.'



পরিশিষ্ট

সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা পাঠসমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'ইতিহাস' ও 'ভূগোল' বিষয় দুইটির বিকল্প পাঠ্যবিষয় (alternative subject) করিয়াছেন 'সমাজবিদ্যা' (Social studies)। কেন এই নূতন বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য করা হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে ভারতবর্ষকে আরও সমগ্রভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তাহার সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাহা বিচার করিতে পারে, সেইজন্য ইতিহাস ও ভূগোলের বদলে সমাজবিদ্যা পাঠ্য করা হইল ("Social studies has been introduced as an alternative course to History and Geography *to enable our boys and girls to know India as a whole and in relation to other parts of the world.*")। ইতিহাস ও ভূগোল সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য এই নূতন বিষয়বস্তুর মধ্যেও দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা সমাজবিদ্যা বিষয়ের মূল উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতটুকু দেওয়া আবশ্যক ততটুকুই দেওয়া হইয়াছে, অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয় নাই। পাঠ্যবস্তুর বিষয়-বিভাগ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিধি সম্বন্ধে ধারণা হইবে। বিষয়গুলি এই ঃ

ক। ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ;

খ। মানুষের জীবনের প্রধান প্রয়োজন ও চাহিদা ;

গ। সেই প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইবার জন্য বিবিধ কাজকর্ম ;

ঘ। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ;

ঙ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও নূতন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের কাহিনী ;

চ। বর্তমান ভারত : নূতন ভারতরাষ্ট্রের বিবিধ অর্থ-নীতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার বৃত্তান্ত ;

ছ। বিশ্বের সহিত ভারতের সংযোগ ও সম্পর্ক—আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ—এক অভিন্ন বিশ্বমানব-পরিবারের ধারণা।

এই বিষয়গুলির উপর একবার চোখ বুলাইলেই বুঝিতে পারা যায়, সমাজবিদ্যার ভিতর দিয়া ছেলেমেয়েদের কি ধরনের শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। যে-শিক্ষা না হইলে কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না, দেশের ছেলেমেয়েদের সেই শিক্ষা দিবার জন্যই 'সমাজবিদ্যা' পাঠ্য করা হইয়াছে।

'ইতিহাস' পড়িয়া আমরা সুদূর অতীতকাল হইতে আধুনিক-কাল পর্যন্ত দেশের ও পৃথিবীর ইতিহাস জানিতে পারি, 'ভূগোল' পড়িয়া ভৌগোলিক তথ্য আয়ত্ত করি। কিন্তু যে-ইতিহাস ছাত্রদের পাঠ্য তাহা সন-তারিখ ও রাজা-রাজড়ার নামের দীর্ঘ নীরস তালিকা ছাড়া কিছু নহে। অথচ ইতিহাস হইল মানুষের সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ইতিহাস, যুগে যুগে তাহার পরিবর্তন ও জয়যাত্রার ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস আজও রচনা করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভূগোলও কেবল দেশের নাম, রাজধানীর নাম, নদনদী-পাহাড়পর্বতের নাম অথবা বিবিধ অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যের নামের

সুদীর্ঘ ক্যাটালগ নহে। সভ্যতার ইতিহাস হইল মানুষ ও প্রকৃতির সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ইতিহাস। কেন সংঘাত ও কেমন করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, ভূগোল তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। কিন্তু ছাত্রদের পাঠ্য ভূগোলের মধ্যে বর্তমানে এই শিক্ষার স্থান কতটুকু? সামান্য যেটুকু আছে তাহাও অতিরিক্ত অপ্রীতিকর তথ্য গিলিতে গিয়া ছাত্ররা শিখিতে পারে না। এইজন্য ছাত্রজীবনে ইতিহাস ও ভূগোল বেশীর ভাগ ছাত্রের কাছে অতিকায় দৈত্য-দানবের মতো ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হয় এবং কৈশোরের মূল্যবান সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া তাহারা যে কয়েকটি রাজার নাম, যুদ্ধের কাহিনী ও দেশের নাম মুখস্ত করে, তাহা পরীক্ষার মর্মান্তিক প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পর খুব সহজেই ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া যেন একটি কঠিন দায় হইতে মুক্ত হয়।

'সমাজবিদ্যা' বিষয়ের মধ্যে যতটুকু ইতিহাস ও ভূগোল আছে শুধু সেইটুকু পাঠ করিলেই ছাত্ররা এই বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইবে। কেন হইবে? কারণ ইতিহাস ও ভূগোলের সহিত মানুষের সমাজ-জীবনের সংযোগ কোথায় এবং তাহা কত গভীর, সমাজবিদ্যার মধ্যে সেইভাবে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সমাজবিদ্যার পাঠ্যবস্তু সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ আলোচনা করিলে ইহা পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

প্রথমে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বর্তমান স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আভাস দেওয়া হইয়াছে। দেশটি আমাদের কিরকম এবং দেশের মানুষ হিসাবে বর্তমানে আমাদের মর্যাদা কতখানি, তাহাই এই ভূমিকার আলোচ্য। এই ভূমিকার পর মানুষ হিসাবে জীবনধারণ করিতে হইলে যে কয়েকটি জিনিস না হইলে চলে না, সেই দি-

অবতারণা করা হইয়াছে। এই ধরনের জিনিস হইল—খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, এবং অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী ও 'সার্ভিস'। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের বিবরণপ্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত তাহাদের সম্পর্ক কতখানি এবং জাতিগত সংস্কার ও রুচির সহিতই বা তাহার সংযোগ কতটুকু। বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোল, দুইটি বিষয়কেই, সরস ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের খাদ্য বস্ত্র ও গৃহের আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে মানুষ মূলত সর্বত্র এক, প্রাকৃতিক পরিবেশের ও জাতিগত ঐতিহ্যের ভিন্নতার জন্য বাহিরের বৈচিত্র্য মানবসমাজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনে যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আছে, পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতির জীবনেও তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্র রহিয়াছে।

অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলিয়া সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষের জীবনসংগ্রামের ও কাজকর্মের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মানুষের নানারকমের বৃত্তি, কর্ম ও পেশার মধ্যে প্রধান হইল কৃষিকর্ম, পশুপালন, বনজ ও খনিজ উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন, কুটিরশিল্প, যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি। ভারতের পটভূমিতে এইসব বিষয়ের বৃত্তান্ত দিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এখানেও ইতিহাস ও ভূগোল কিছুটা আসিয়াছে, কিন্তু সামাজিক জীবন-যাত্রার সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়া যতটুকু আসা সম্ভব তাহাই আসিয়াছে।

যানবাহন ও যোগাযোগের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সুদূর অতীতকাল হইতে বর্তমান বিমান ও রকেট-'স্পেসশিপে'র যুগ পর্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। বিমানের যুগে যানবাহনের

আশ্চর্য উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, এই উন্নতির ফলে দেশের সহিত দেশের দূরত্ব এবং মানুষের সহিত মানুষের ব্যবধান বর্তমান যুগে কতখানি কমিয়া গিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উন্নতির ফলেই আজ বিশ্বমানবের ঐক্য এবং এক অখণ্ড বিশ্বের স্বপ্ন বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই কারণে যানবাহনের ইতিহাসের পর বিশ্বমানবিক ঐক্যের প্রসঙ্গটিরও অবতারণা করা হইয়াছে।*

ইহার পর তিনটি বিষয় যথাক্রমে পঠিতব্য—(ক) ভারত-সংস্কৃতির ধারা, (খ) জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও নূতন ভারতরাষ্ট্র এবং (গ) বর্তমান ভারতে শিল্প-উন্নয়ন ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা, পুনর্গঠন-প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক শান্তি-মৈত্রীনীতি—ইহা আগাগোড়া 'ইতিহাস', কিন্তু ইতিহাসের ধারাটিকে এখানে সুদূর অতীতকাল হইতে একেবারে বর্তমানকাল পর্যন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে। অতীতের 'ইতিহাস' প্রসঙ্গে রাজরাজড়া অথবা যুদ্ধবিগ্রহ-চক্রান্তের কথা বলা হয় নাই, সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভারতসংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, ভারতের ধর্ম ভাষা শিল্পকলা স্থাপত্য সংগীত ও নৃত্যকলা, ইহাই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। অতীত হইতে বর্তমানে পদক্ষেপ করিবার আগে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। তারপর ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইয়া কিভাবে আমরা নূতন ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া তুলিতেছি, অর্থাৎ নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছি তাহারই বিবরণ দিয়া শেষ করা হইয়াছে।

'সমাজবিদ্যা' বিষয় পাঠ্য করার উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যেক

---

* এই পর্যন্ত বিষয়বস্তুকে একনম্বর হইতে সাতনম্বর প্রকরণ (Units 1 to 7) এবং এগার নম্বর প্রকরণে (Unit 11) বিভক্ত করিয়া সমাজবিদ্যার 'প্রথম প্রশ্নপত্র' (First Paper 100 marks) নির্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টম, নবম ও দশম প্রকরণের বিষয়বস্তু লইয়া 'দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র' (Second Paper—100 marks) নির্দিষ্ট হইয়াছে। মোট ২০০ নম্বরের দুইটি প্রশ্নপত্র

ছেলেমেয়েকে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারার সহিত পরিচিত করাইয়া অতীত ও বর্তমানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে সাহায্য করা। পাঠ্যবস্তুর মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়গুলি আছে, কিন্তু পৃথকভাবে নাই—আগাগোড়া সমস্ত বিষয়ের মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে। জীবন ও সমাজের গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝিয়া যাহাতে দেশের যুবা-সম্প্রদায় বর্তমান সমাজ-জীবনের সহিত নিজেদের জীবনেরও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে এবং বিদ্যা-বুদ্ধিতে স্বাবলম্বী হয়, সেইজন্যই 'সমাজবিদ্যা' আজকাল আমাদের দেশে, এবং পৃথিবীর সকল দেশেই, ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য করা হইয়াছে ও হইতেছে।
